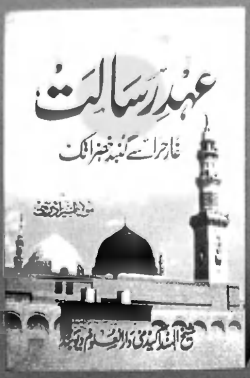
মাওলানা আসীর আদরবী

নূরের পর্বত থেকে সবুজ গম্বুজ

মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন





লেখক পরিচিতি

মাওলানা নিযামুদ্দীন আসীর আদরবী

উর্দু সাহিত্যের বিশাল আকাশে এক খ্যাতিমান নক্ষত্র। জামিয়া ইসলামিয়া তালাব বেনারসের শিক্ষক। উর্দু সাহিত্যের মর্যাদাশীল পত্রিকা তরজমানুল ইসলাম-এর সম্পাদক। দক্ষ সাংবাদিক শেকড়স্পর্শী গবেষক ও নন্দিত গদ্যশিল্পী। উর্দুর প্রাচীন ও আধুনিক রীতির নন্দিত মিশেলে প্রতিষ্ঠিত তাঁর স্বতন্ত্র স্টাইল। তাঁর লেখায় সারল্য ও শিল্প প্রাকৃতিক সৌহার্দে গলাগলি করে সৃষ্টি করে আবেগ ও আকর্ষণের চুম্বক। লেখায় তথ্যের প্রাচুর্য এনে দেয় কালজয়ের অঙ্গীকার। বিন্যাস বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনার মোহন স্বাতন্ত্র্য ও গভীর পাঠমনস্ক চরিত্র তাঁকে করেছে নন্দিত তারকা।

দারুল উলূম দেওবন্দের শাইখুল হিন্দ একাডেমির মতো মর্যাদাশীল প্রতিষ্ঠান প্রকাশ করেছে তাঁর বেশক'টি গ্রন্থ। তিনি মাওলানা কিরানবীর দারুল মুআল্লিফীন-এর প্রথম সারির লেখক। ইসলামী চিন্তা-দর্শন ও আদর্শের আপসহীন সৈনিক ও নিমগ্ন পাঠক—আসীর আদরবী—ফুলে ফলে পূর্ণ থাকুক তাঁর প্রতিটি ভোর।

অনুবাদক পরিচিতি

মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন
জন্ম ২০ নভেম্বর ১৯৬৭, মুন্সীগঞ্জ
দাওরায়ে হাদীস ও আরবী সাহিত্যে উচ্চতর ডিগ্রি, দারুল উলূম দেওবন্দ
পেশা : শিক্ষকতা
প্রিয় দেশ : বাংলাদেশ
প্রিয় শহর : মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওয়ারা

প্রকাশিত গ্রন্থ সত্তরটির বেশি

উল্লেখযোগ্য মৌলিক গ্রন্থ
ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ (সা.), ভয়-স্বপ্ন সংগ্রাম, নারীর শত্রু মিত্র, সাহসের গল্প, সাহিত্যের ক্লাস, বক্তৃতার ক্লাস, ইসলামে জীবিকার নিরাপত্তা, ভুবনজয়ী নারী, শহীদানের গল্প শোন (১-৩), আমাদের নবীজীর ১০০ মুজেযা, ইসলাম একালের ধর্ম, আমার ধর্ম আমার গর্ব, কালের কথা ধর্মের কথা, আকাশে অঙ্কিত নাম, বড় যদি হতে চাও।

অনূদিত গ্রন্থ
কুরআন অধ্যয়নের মূলনীতি, তাজা ঈমানের ডাক, হালাল হারাম, আমেরিকান নওমুসলিমদের ঈমানদীপ্ত কাহিনী, ইসলাম একমাত্র জীবনবিধান, হাদীসের দর্পণে আমাদের কাল, মানবতার নবী, আলোকিত নারী, দেশে দেশে, ইসলাম ও ফ্যাশনের সংঘাত, নির্বাচিত বয়ান (১-২), ভারতীয় নওমুসলিমদের ঈমানজাগানিয়া সাক্ষাৎকার, আল্লাহকে যদি পেতে চাও, সেরা মনীষীদের সেরা ভাষণ প্রভৃতি।

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

মাওলানা আসীর আদরবী

নূরের পর্বত থেকে সবুজ গম্বুজ

মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী ™

নূরের পর্বত থেকে সবুজ গম্বুজ

মূল	মাওলানা আসীর আদরবী
অনুবাদ	মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন
চতুর্থ মুদ্রণ	একুশে বইমেলা ২০২২
প্রথম প্রকাশ	মার্চ ২০১৮
প্রচ্ছদ	মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম
মুদ্রণ	শাহরিয়ার প্রিন্টিং প্রেস ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা-১১০০।
একমাত্র পরিবেশক	রাহনুমা প্রকাশনী ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা। যোগাযোগ : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯।

মূল্য : ৬০০/- (ছয়শ টাকা) মাত্র

NOORER PORBAT THEKE SOBOZ GOMBHUZ
Writer : Mawlana Ascer Adrobee. Published by : Rahnuma Prokashoni.
Price : Tk. 600.00, US $ 012.00 only.

ISBN 978-984-93220-6-1
E-mail : rahnumaprokashoni@gmail.com
www.rahnumabd.com

ভক্তিপূর্ণ উপহার

ওগো দোজাহানের বাদশাহ!

سر جھکائے ہوئے دیدۂ نم آئے ہیں
شرم کہتے ہوئے آتی ہے کہ ہم آئے ہیں

নমিতমস্তক সজলনয়নে এসেছি দুয়ারে তোমার
মরি লজ্জায়–কোন্ মুখে বলি, হাজির ভক্ত অধম!

তোমার শানসজ্জিত দরবারে উপস্থিত এক রিক্ত ভিখিরি!
যার সামনে উন্মুক্ত তার পাপের খাতা—সে কোন্ সাহসে
বলবে—আমি এসেছি ওগো শাহানশাহ্!
তবুও জানি, তুমি সারাজাহানের রহমত।
সেই ভরসায় হাজির এই ক্ষুদ্র উপহার হাতে
এক উম্মত কাঙাল!

–আসীর আদরবী

লেখকের কথা

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করেছিলেন সারাজাহানের রহমত স্বরূপ। তাঁর আবির্ভাব ছিল আল্লাহবিস্মৃতি ও কুফুরির অন্ধকার জগতে এক অবিনাশী আলোকবর্তিকা। নিহতপ্রায় মানবতার নতুন জীবন ছিল তাঁর আগমন। হিংস্রতা ও পাশবিকতার বনে উন্মত্ত উদভ্রান্ত মানবতাকে তিনি তুলে এনেছিলেন মানবিক সম্মান মর্যাদা ও চিরসবুজ বসন্তের বাগানে।

সত্যিই এটা বিস্ময়কর—যেই মহান সত্তা আগমন করেছিলেন মানবতার শ্রেষ্ঠ বহু রূপে। শান্তি স্বস্তি ও শৃঙ্খলার পাথেয় হাতে—তিনি জীবনে কখনো স্পর্শ পাননি একদণ্ড শান্তির, একমুহূর্ত স্বস্তির। শান্ত মনে এই মাটির পৃথিবীতে শ্বাস গ্রহণের সুযোগ হয়নি তাঁর কখনো। যিনি ছিলেন অসংখ্য বিক্ষত হৃদয়ের প্রার্থিত উপশম—আঘাতে আঘাতে তাঁকে করা হয়েছে বরাবর বিক্ষত। প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের তেইশ বছরের জীবন যেন উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ অগ্নিসাগরের মাঝখানে টলটলায়মান একটি ক্ষুদ্র দীপ। রাত দিন যে কোনো সময় সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে!

এমনি বেদনাদায়ক পরিবেশে ও ভীতিকর পরিস্থিতির ভেতর দিয়েই তিনি ছড়িয়ে গেছেন ইসলামের মহৎ বাণী। দান করেছেন ইসলামের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা। ইসলামী জীবনের চিত্রকে পূর্ণ করেছেন যথার্থ রঙে, নিখুঁত অঙ্কনে। এই তেইশ

বছরব্যাপী চলেছে নাগাতার যুদ্ধ। উদ্দেশ্য পবিত্র এই দীনকে নিশ্চিহ্ন করে দাও। দীন ও তাঁর পবিত্র সত্তাকে অত্যাচারী অহঙ্কারীর বিনাশী থাবা ও অবিরত হামলা থেকে বাঁচাবার জন্যে অসহায় মজলুমের মতো অবিরাম লড়তে হয়েছে তাঁকে।

মক্কার তেরো বছরের নবুওয়তের জীবনে সামান্য কিছু মানুষ ইসলাম কবুল করেছেন। তাদের সংখ্যা এতটাই কম ছিল—নিজেদের দেশে নিজেদের জীবনরক্ষাও তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে বাধ্য হয়ে তাদেরকে মাতৃভূমি ছাড়তে হয়েছে। মক্কা মুকাররমায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেরোটি বছর কাটিয়েছেন তাঁর কতিপয় একনিষ্ঠ অনুরক্তের সঙ্গে। মক্কার কোনো অতি বীর পুরুষও ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কুরাইশ অতি কৌশলে তার ধমনী, রক্ত থেকে বীরত্ব ও সাহসের সবটুকু শক্তি শুষে নিত। তাই মক্কার কেউ ইসলাম গ্রহণ করামাত্র কুরাইশদের শত্রুতা ও প্রতিরোধের দরিয়ায় ঢেউ ভাঙতে শুরু করত। প্রবল উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ তাদেরকে তৃণের মতো ভাসিয়ে নিয়ে যেত।

নবদীক্ষিত মুসলমানদের ক্ষুদ্র কোনো কাফেলা কখনো ঘুরে দাঁড়াবার অবস্থা হলে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধার্ত পশুর মতো তাদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ত। তারপর তাদের শক্তি ও সাহসকে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিত। এভাবে ক্ষণে ক্ষণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণলতায় সত্য ও সুন্দরে নিবাস নির্মিত হচ্ছিল আর শত্রুর ক্ষুব্ধ অনলে পুড়ে তা বারবার ছাই হচ্ছিল। ফলে মক্কার তেরো বছরের অধ্যায়ে ইসলাম কখনো পূর্ণরূপে প্রকাশিত ও বিকশিত হতে পারেনি।

এই দীর্ঘ সময়ে এখানে কোনো মসজিদ নির্মিত হয়নি। ধ্বনিত হয়নি মহান রবের একত্ববাদের ধ্বনি কোনো উঁচু মিনার চূড়া থেকে। ইসলামের ইবাদতদর্শনের বুনিয়াদ ও ভিত্তি নামায রোযা হজ যাকাতের মতো আমলগুলোও হতে

পারেনি স্বরূপে দৃশ্যমান। একান্তে গোপনে একাকী আদায় করা হতো নামায। খোলামেলা জামাতের সঙ্গে নামায আদায়ের উপায় ছিল না। মুসলমানদের নয়নকাড়া সম্মিলিত ইবাদত জুমাও আদায় করা যায়নি মক্কার জীবনে।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছিলেন—যেখানে ইসলামের সামগ্রিক জীবন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে আর তার ফল ও বরকত সমাজের প্রতিটি মানুষকে স্পর্শ করবে। কিন্তু সেই সুযোগ আর হয়নি। মদীনায় একটুখানি আশ্রয় অর্জিত হলেও ইসলামের শত্রুরা বরাবর আঘাত ও আক্রমণের গর্জন ও বর্ষণে সদা বিষাক্ত করে রেখেছিল।

তারপরও ইসলামের মূলরূপ তিনি মদীনায় তুলে ধরেছিলেন। পরিপূর্ণ একটি জীবনবিধান তিনি বাস্তবে রূপায়িত করে দেখিয়েছেন। পুরো সমাজকে ধর্মের আদলে নতুনরূপে ঢেলে সাজিয়েছেন। জীবনের প্রতিটি অধ্যায়কে শক্তিমান আইন ও আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের এমন এক পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান রচনা করেছেন—মানুষ যদি ওই আইন ও মূলনীতি অনুসরণ করে তাহলে আজো ইসলামের সমাজব্যবস্থা পৃথিবীর সকল কথিত উন্নত সমাজব্যবস্থাকে ছাড়িয়ে যাবে—পরিচ্ছন্নতা পবিত্রতা স্বস্তি শান্তি ও নিরাপত্তায়। পৃথিবী দেখবে এমন শান্তিপূর্ণ হৃদয়শীলত করা সমাজ—যার প্রত্যাশায় এই আধুনিক পৃথিবী অস্থির চঞ্চল!

তালাব বেনারস ভারত
৩০ নভেম্বর ১৯৯৮

আসীর আদরবী
জামিয়া ইসলামিয়া রেওড়ি

অনুবাদকের কথা

নবীজীবনী—আমার পাঠ ও চর্চার সবচে' প্রিয় বিষয়। আসীর আদরবীও আমার প্রিয় লেখকদের অন্যতম। তাঁর লেখার তথ্য যেমন আমাকে ঋদ্ধ করে, বর্ণনার ভাষা ও শিল্প অনুভূতি জুড়ে ছড়িয়ে দেয় প্রাণের উত্তাপ। তাঁর প্রবন্ধ-সংকলন *আফকারে আলম* তো আধুনিক উর্দু গদ্যের শ্রেষ্ঠ নমুনা।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে লেখবার একটা নীরব তৃষ্ণা সবসময় অনুভব করি। বিশেষ করে নবীজির সরল ও শুদ্ধ জীবনীগ্রন্থের প্রয়োজন ও অভাব অনুভব করি ভেতর থেকে। যারা সাধারণ শিক্ষিত তাদের উপযোগী গ্রন্থের অভাবের কথা—বিশেষ করে সচেতন আলেমগণ ভালো করেই উপলব্ধি করেন। মাওলানা আসীর আদরবীর এই গ্রন্থ ওই অভাবের জায়গাটা কিছুটা হলেও পূরণ করবে—আশা রাখি।

উর্দু ভাষার সাহিত্য-মহলে তিনি আলোচিত বিখ্যাত ও স্বীকৃত। তাঁর *তাহরীকে আযাদী আওর মুসলমান, এহইয়ায়ে ইসলাম কী আযীয তাহরীক, মাওলানা কাসেম নানুতবী, বিশ বড়ে মুসলমান, তারীখে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ, তাফসীরোঁ মে ইসরাঈলী রেওয়ায়াত, ফনে আসমাউর রিজাল, মাআছিরে শাইখুল ইসলাম রহ.* প্রভৃতি গ্রন্থ আলেমসমাজে ব্যাপক সমাদর লাভ করেছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা পঞ্চাশটির বেশি। মাওলানা ওয়াহীদুজ্জামান কিরানবীর *দারুল*

মুয়াল্লিকীন দেওবন্দ এবং *শাইখুল হিন্দ একাডেমি* তাঁর অনেক বই প্রকাশ করেছে। লেখকের প্রতি অকুণ্ঠ আস্থার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট। যখন তাঁর লেখা *গারে হেরা সে গুম্বজে খাদরা* তক গ্রন্থখানি হাতে পাই যুগপৎ আনন্দিত ও শিহরিত হই। বইটি অনুবাদ করতে পেরে আমি তৃপ্ত।

আরও আনন্দের কথা বইটি যখন ছাপার জন্য প্রেসে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে প্রিয় ছাত্র মাওলানা ইউনুসের মাধ্যমে ফোনে কথা হয় মুহতারাম লেখকের সঙ্গে। লেখক বিষয়টি জানতে পেরে আনন্দে আপ্লুত হন। অধম অনুবাদককে অনুমতি দানে কৃতার্থ করেন। এই উদারতা সত্যিই মনে রাখবার মতো।

আমার ইচ্ছা ছিল, প্রকাশনায় যত্নবান কোনো প্রতিষ্ঠান বইটি ছাপার ভার নিলে ভালো লাগবে। আমি আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ *রাহনুমা* বইটি প্রকাশ করছে বলে।

এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ দয়াময় কবুল করুন। আমাদের সকলকে ঠাঁই দান করুন প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পতাকার ছায়ায় হাশরের ময়দানে। আমীন—ইয়া রাব্বাল আলামীন।

وصلى الله تعلى على خير خلقه سيد المرسلين وعلى اٰله واصحابه اجمعين

ঢাকা।
০২. ০১. ২০১৮ ঈসায়ী

দোয়ার মুহতাজ
মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন

সূচিপত্র

ইসলামের সূচনা—২৯
প্রসারিত হলো আলোর বৃত্ত—২৯
ছড়াতে থাকে আলো—৩০
আলোকিত হলো নবী-পরিবার—৩১
প্রথম মুসলমান—৩১
আবু বকর সিদ্দীকের প্রভাব ও বিস্তার—৩২
আবু বকর সিদ্দীকের কর্মকৌশল—৩৩
তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা—৩৫
খালেদ ইবনে সাঈদের ইসলাম গ্রহণ—৩৬
হযরত আবু বকর এবং হযরত তালহার
প্রতি নিষ্ঠুর নির্যাতন—৩৭
গোপন তাবলীগ—৩৮
হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর
ঈমানী দুঃসাহস—৪০
আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ভাষণ—৪১
নবীজি কেমন আছেন?—৪২
চরম সতর্কতা—৪২
প্রিয় নবীজির কদমে—৪৩
হযরত আবু বকরের মায়ের ইসলাম গ্রহণ—৪৪
মুসলমান হলেন হযরত হামযা—৪৫
আবু যর গিফারীর ইসলাম গ্রহণ—৪৭
জমাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণ—৪৯
মুসলমানদের দুর্দশা—৫০
হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস
রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা—৫০

নবুওয়তের ঘোষণা—৫১
আবু লাহাবের দুষ্টুমি—৫২
সাফা পর্বতের ডাক—৫৩
জ্বলে উঠে শত্রুতার অগ্নিশিখা—৫৪
যুল মাজায বাজারে—৫৫
চ্যালেঞ্জের মুখে আবু তালেব—৫৬
আবু জেহেলের মূর্খতা—৫৮
তাঁর প্রতি জঘন্য আচরণ—৬০
অপমানিত করার ষড়যন্ত্র—৬১
জঘন্যতার ঘৃণ্য প্রকাশ—৬৩
মুশরিকদের ভয়াবহ পরিকল্পনা—৬৩
ভয়াবহ চ্যালেঞ্জ—৬৫
ব্যর্থতার পর—৬৬
মানসিক নির্যাতন—৬৭
বিপদের পাহাড় ভেঙে পড়ল—৭২
হযরত বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু—৭৪
দাস-দাসীদের প্রতি অত্যাচারের কেয়ামত—৭৫
হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযিয়াল্লাহু আনহু
ও তাঁর পরিবার—৭৫
খাব্বাব ইবনুল আরাত—৭৬
একই সঙ্গে স্বীকৃতি এবং বিদ্বেষ—৭৮
মক্কার মুশরিকদের পরিকল্পনা—৮০
ভেঙে পড়ে সর্বগ্রাসী অহংকার—৮৩
চূড়ান্ত নিচুতা—৮৭
মজলুম মুসলমানদের দেশত্যাগ—৮৯
আবিসিনিয়ায় হিজরত—৯১
হিজরতের পথে দ্বিতীয় কাফেলা—৯২
শয়তানের দীর্ঘ হাত—৯২

কুরাইশ-প্রতিনিধি আবিসিনিয়ায়—৯৩
চরম লজ্জিত বদনে—৯৭
উমর ইবনুল খাত্তাব—৯৭
অসম্ভব হলো সম্ভব—৯৮
আল্লাহু আকবারের স্লোগান—১০২
কুরাইশ-সম্প্রদায়, শোনো!—১০৩
মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল আবু জেহেল—১০৫
মুসলমান হলো নাজরানের খ্রিস্টান-কাফেলা—১০৬
আবিসিনিয়া থেকে ফিরে এলেন কয়েকজন—১০৮
আবার সেই ভয়াবহ জীবন—১১০
নির্যাতনের মুখে হযরত আবু সালামা
রাযিয়াল্লাহু আনহু—১১২
বেড়ে গেল কুরাইশের অস্থিরতা—১১৩
মুসলমানদের বিরুদ্ধে সামাজিক বয়কট—১১৪
লেখা হলো অঙ্গীকারনামা—১১৪
পামর চলে পামরের দলে—১১৫
কষ্ট ও বিপদের দুঃসহকাল—১১৫
সাহায্যের চেষ্টা এবং তার পরিণতি—১১৬
হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর
হিজরতের ভাবনা—১১৭
আমার কারও আশ্রয়ের প্রয়োজন নেই—১২০
উঁইপোকা খেয়ে ফেলে অঙ্গীকারনামা—১২১
হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
সংবাদ—১২৫
বয়কট অবসানের পর—১২৬
তোফায়েল ইবনে আমর আদ-দুসীর ইসলাম গ্রহণ—১২৭
জ্বলে উঠল অলৌকিক প্রদীপ—১২৯
মুসলমান হলো বিখ্যাত পালোয়ান রোকানা—১৩০

পরাক্রমশালীর প্রতিশোধ—১৩১
মেরাজ—১৩৩
একে বলে বিশ্বাস!—১৩৩
পরীক্ষা—১৩৫
নামাযের বিধান ও তার সময়—১৩৬
টুকরো হলো চাঁদ—১৩৬
আবু তালেবের মৃত্যু—১৩৮
হযরত খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার ইন্তেকাল—১৩৯
হযরত আয়েশা ও হযরত সাওদা নবীজির ঘরে—১৪১
আবু তালেবের মৃত্যুর পর—১৪২
আবু লাহাব আবু লাহাবই রয়ে গেল—১৪৩
অন্তহীন মুসিবত—১৪৫
তায়েফের পথে—১৪৬
এক চাক্ষুষ সাক্ষীর বর্ণনা—১৪৯
ভেঙে পড়ল বিপদের পাহাড়—১৫০
বিভিন্ন আরবগোত্রে আশ্রয়ের চেষ্টা—১৫২
শুধু ব্যর্থতা আর ব্যর্থতা—১৫৫
হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কথা—১৫৬
আশার আলো—১৫৭
মদীনার আনসারদের ইসলাম গ্রহণ—১৫৯
মদীনায় ইসলাম—১৬৩
প্রশস্ত হলো ঈমানের আলোকবৃত্ত—১৬৩
সাদ ইবনে মুআযের অবিরাম চেষ্টা—১৬৮
হজের দ্বিতীয় মওসুম—১৬৮
পরিস্থিতি পর্যালোচনা—১৭২
প্রতিনিধি নির্বাচন—১৭৩
বিসর্জনের অনুপম অঙ্গীকার—১৭৪
নেমে এল পরীক্ষা—১৭৫

আমর ইবনুল জামুহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর
ইসলাম গ্রহণ—১৭৭
আশ্রয়ের এক নতুন ঠিকানা—১৭৮
মক্কার একটি মহল্লা বিরান হয়ে গেল—১৮২
মুসলমানদের নতুন বসতি—১৮২
মুশরিকদের ধোঁকাবাজি—১৮৩
হযরত উমরের হিজরতের কাফেলা—১৮৫
বাধাগ্রস্ত হলেন হযরত সুহায়েল রাযিয়াল্লাহু আনহু—১৮৫
মদীনায় মুহাজিরদের ঠিকানা—১৮৭
ঘুম হারাম হয়ে পড়ে মুশরিকদের—১৮৭
সাধারণ মুসলমানদের হিজরতের পর—১৮৮
দারুন নাদওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত—১৮৯
সিদ্ধান্ত হলো হত্যার—১৯২
হিজরতের প্রস্তুতি—১৯৩
হন্তারকদের ভিড়ে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম—১৯৪
শত্রু যখন শক্তিমান রক্ষাকর্তা তখন
অধিকতর শক্তিমান—১৯৫
হিজরতের পথে—১৯৬
হযরত আসমার দুঃসাহস—১৯৮
অর্থকড়ির ব্যবস্থা—১৯৮
শত উট পুরস্কার—১৯৯
আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন—২০০
পুরস্কারের নেশায় পাগল হয়ে উঠে মানুষ—২০১
সুরাকা ইবনে জাশাম—২০১
কথা রেখেছিল সুরাকা—২০৪
কুরাইশ ক্ষুব্ধ হলো সুরাকার প্রতি—২০৪
উম্মে মাবাদের তাঁবুতে—২০৬

আবু মাবাদের বিস্ময়—২০৭
অভ্যর্থনার ধুম—২০৮
মুসলমানদের ভিড়—২০৯
মক্কায় নবুওয়তের তেরো বছর—২১০
অবতীর্ণ হতো কুরআন—২১৩
ইয়াসরিব হলো মাদীনাতুর রাসূল—২১৪
আলী ইবনে আবু তালেব মদীনায়—২১৫
মূর্তিবিনাশী এক আনসারী—২১৬
শহরে প্রবেশ—২১৭
মসজিদে নববীর স্থান—২১৯
মেজবানের অনুভূতি—২২০
ভাবনায় আতিথেয়তার হক—২২১
আতিথেয়তার হক—২২১
উপহার উপঢৌকন—২২২
মক্কা থেকে স্বজনদের আগমন—২২৩
নবীজির মেজবানের সম্মান—২২৪
মুসলমানদের হিজরী সন—২২৫
একটি সূক্ষ্ম দর্শন—২২৭
একজন বড় ইহুদি আলেমের ইসলাম গ্রহণ—২২৮
নবীজির দরবারে হোয়াই ইবনে আখতাব—২২৯
সালমান ফারসির ইসলাম গ্রহণ—২৩০
মসজিদে নববী নির্মাণ—২৩০
ভাই ভাই—২৩৩
ভ্রাতৃত্বও এমন!—২৩৫
ইহুদিদের একটি ভয়ংকর মিথ্যা প্রচারণা—২৩৬
নবীজির ঘরে জননী আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা—২৩৭
আজানের সূচনা—২৩৮
মদীনায় ইসলামের বিজয়—২৪০

মোনাফেকদের বিদ্রূপ এবং...—২৪১
মদীনা হলো ইসলামের রাজধানী—২৪৩
পর্যবেক্ষণ এবং সংবাদমাধ্যম—২৪৫
সর্বপ্রথম সাহসী পদক্ষেপ—২৪৬
দ্বিতীয় দল প্রেরিত হলো—২৪৭
আরেকটি দল—২৪৮
কেবলা পরিবর্তন—২৪৮
রোযার বিধান—২৪৮
বদর যুদ্ধ : ইসলামের বিজয়ের সূচনা—২৪৯
বিচক্ষণতা এবং সুচিন্তিত কর্মকৌশল—২৫০
আবু সুফিয়ানের সতর্কতা—২৫১
মক্কার তৎপরতা—২৫১
গোপন রইল না স্বপ্ন—২৫২
আবু সুফিয়ানের প্রতিনিধি মক্কায়—২৫৩
মুসলমানদের বাহিনী—২৫৪
লড়াই হবে কার সঙ্গে?—২৫৬
শঙ্কা অনুভব করল আবু সুফিয়ান—২৫৭
মতামত চাইলেন আনসারদের—২৫৮
বদর যুদ্ধ—২৬০
নিহত হলো আবু জেহেল—২৬১
শেষ হলো যুদ্ধ—২৬২
যুদ্ধবন্দিদের বিষয়—২৬৩
মক্কায় রোল পড়ল বিলাপের—২৬৪
আবু লাহাবের পরিণতি—২৬৬
নবীকন্যা হযরত যায়নাবের প্রত্যাগমন—২৬৭
কসম করল আবু সুফিয়ান—২৬৮
ইয়াসরিব এখন মদীনা—২৭০
হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষের কয়েকটি ঘটনা—২৭১

বনু কায়নাকা—২৭২
উসকানিমূলক ঘটনা—২৭৩
কাব ইবনে আশরাফ : নিকৃষ্টতর শত্রু—২৭৫
ওহুদ যুদ্ধ—২৭৮
জয়ের পর নেমে এল পরাজয়—২৮৫
যুদ্ধের প্রভাব—২৮৭
যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর—২৮৮
কয়েকটি হৃদয়বিদারক দৃশ্য—২৮৮
ধৈর্য ও সংযমের মূর্তপ্রকাশ—২৮৯
বিষ ছড়াতে লাগল ইহুদি এবং মোনাফেক-সম্প্রদায়—২৯১
ওহুদ যুদ্ধের পরিশিষ্ট—২৯১
মোনাফেক মোনাফেকই থাকবে—২৯৩
হিজরতের চতুর্থ বছর—২৯৪
আবু সুফিয়ানের ষড়যন্ত্র এবং তার জবাব—২৯৬
বীরে মাউনার হৃদয়বিদারক ঘটনা—২৯৮
একটি ভুল হত্যা—৩০০
বনু নাজীরের ষড়যন্ত্র—৩০১
বনু নাজীরের বিরুদ্ধে লড়াই—৩০২
নির্বাসনে বনু নাজীর—৩০৩
নিচুতা ও নির্লজ্জতার উদাহরণ—৩০৩
মুসলমান হলো দু'জন ইহুদি—৩০৪
বিভিন্ন গোত্রের তৎপরতার প্রতি দৃষ্টিপাত—৩০৫
কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা—৩০৫
খন্দকের যুদ্ধ—৩০৭
সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে নবীজির পরামর্শ—৩০৯
চুক্তিভঙ্গ করল বনু কোরায়যা—৩১১
যুদ্ধের ময়দানে হযরত নাঈম ইবনে মাসউদ—৩১৪
বনু কোরায়যাকে গাদ্দারির শাস্তি—৩১৯

অপরাধীদের অনুসন্ধান ও শাস্তিদান—৩২২
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা—৩২৪
হযরত যায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহা নববী হেরেমে—৩২৪
পর্দার বিধান—৩২৬
হিজরতের ষষ্ঠ সাল—৩২৮
গাযওয়ায়ে যীকারাদ—৩২৯
গাযওয়ায়ে বনুল মুস্তালিক—৩৩১
অপবাদের ঘটনা—৩৩৩
হুদায়বিয়ার সন্ধি—৩৪০
নবীজির প্রতিনিধি—৩৪৫
কুরাইশদের গোয়েন্দা—৩৪৬
নবীজির দ্বিতীয় প্রতিনিধি—৩৪৭
হযরত উসমান মক্কা শহরে—৩৪৭
বায়আতুর রিদওয়ান—৩৪৮
আপসের চেষ্টা—৩৪৯
সন্ধিপত্র—৩৫০
শেকলপরা এক মুসলমান—৩৫২
হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন—৩৫৩
মক্কার মুশরিকদের কয়েদখানায় অসহায় মুসলমান—৩৫৪
রহিত হলো সন্ধিপত্রের এক দফা—৩৫৫
মুসলিম নারীদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে না—৩৫৭
আবুল আসের ইসলাম গ্রহণ—৩৫৭
রাষ্ট্রপ্রধানদের দীনের দাওয়াত—৩৫৮
খায়বার যুদ্ধ—৩৬০
সর্বশেষ দুর্গ—৩৬২
প্রচণ্ড লড়াই—৩৬৩
ইহুদি-সম্প্রদায় হলো মজদুর জাতি—৩৬৪
আরও কিছু বিধি-বিধান—৩৬৫

খায়বার থেকে প্রত্যাবর্তন—৩৬৬
খায়বারের সম্পদ বণ্টন—৩৬৭
আবিসিনিয়ার মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন—৩৬৭
উমরাতুল কাযা—৩৬৮
মক্কা বিজয়—৩৭১
আমর ইবনুল আসের গল্প—৩৭২
খালেদ ইবনুল ওলীদের আত্মকাহিনী—৩৭৬
মোতার যুদ্ধ—৩৭৮
মুসলিম-বাহিনীর প্রত্যাবর্তন—৩৮০
মক্কা বিজয়—৩৮২
শপথ ভঙ্গ করে কুরাইশ—৩৮৩
বনু খুযায়ার দ্বিতীয় প্রতিনিধি—৩৮৪
আবু সুফিয়ান মদীনায়—৩৮৫
চুক্তিভঙ্গের শাস্তিদানের প্রস্তুতি—৩৮৬
একটি গোপন চিঠি—৩৮৬
মক্কার পথে—৩৮৮
মুসলমান হলেন আবু সুফিয়ান—৩৮৮
মুসলিম-বাহিনীর দৃশ্য—৩৮৯
সাধারণ ঘোষণা—৩৯০
প্রতিরোধের ব্যর্থ প্রয়াস—৩৯১
ক্ষমার অযোগ্য অপরাধী—৩৯১
হযরত উম্মে হানীর আশ্রয়ে কয়েকজন অপরাধী—৩৯৪
সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা—৩৯৫
তিনশো ষাটটি মূর্তি—৩৯৭
মক্কার হেরেমের উদ্দেশ্যে বিশেষ ঘোষণা—৩৯৭
উযযা মূর্তি ভাঙার আদেশ—৩৯৯
ইসলামের শপথ—৪০০
গাযওয়ায়ে হাওয়াযিন—৪০৩

একটি অসঙ্গত আবদার—৪০৪
গনিমতের সুসংবাদ—৪০৫
শত্রুদলের সঙ্গে লড়াই—৪০৫
বিজয়—৪০৬
সংরক্ষিত হলো গনিমতের সম্পদ—৪০৮
আওতাস যুদ্ধ—৪০৮
নবীজির দুধবোন শাইমা—৪০৯
তায়েফ যুদ্ধ—৪১০
গনিমতের সম্পদ বণ্টন—৪১২
বিষণ্ন মদীনার আনসার—৪১৫
মদীনায় প্রত্যাবর্তন—৪১৭
বিখ্যাত এক কবির ইসলাম গ্রহণ—৪১৮
অষ্টম হিজরীর আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা—৪২০
তাবুক যুদ্ধ—৪২২
প্রচারিত সংবাদটি ছিল ভুল—৪২৪
মসজিদে যেরার—৪২৫
হযরত কাব ইবনে মালেকের ঘটনা—৪২৬
সাকীফ গোত্রের ইসলাম গ্রহণ—৪৩০
বিখ্যাত মোনাফেকের মৃত্যু—৪৩২
হজের আমীর করা হলো হযরত আবু বকরকে—৪৩৩
নবম হিজরীর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা—৪৩৫
বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের আগমন এবং ইসলাম কবুল—৪৩৬
প্রতিনিধিদলগুলোর সংক্ষিপ্ত তালিকা—৪৩৭
বিদায় হজ—৪৩৮
ইয়েমেনে ইসলামের দাওয়াত—৪৩৯
ভবিষ্যদ্বাণী—৪৪০
বিদায় হজ—৪৪০
হিজরতের একাদশ বছর—৪৪৫

রুটিনে পরিবর্তন—৪৪৭
ইবনে আব্বাস এবং আলী ইবনে আবু তালেব—৪৫১
লেখার ঘটনা—৪৫১
তিনটি উপদেশ—৪৫২
স্মরণ করলেন আবু বকর সিদ্দীককে—৪৫৩
সাহাবায়ে কেরামের আশঙ্কা—৪৫৩
সর্বশেষ ভাষণ—৪৫৪
নামায পড়াবে আবু বকর—৪৫৪
ওফাতের পূর্বে—৪৫৫
হযরত আবু বকরের অন্তর্দৃষ্টি—৪৫৮
ওফাতের পর—৪৬০
গোসল—৪৬১
দাফন—৪৬১
দাফনের পর—৪৬২
সর্বত্র ছেয়ে যায় বেদনার মেঘ—৪৬৩

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

পড়ুন!
আমি পড়তে পারি না।
পড়ুন!
আমি পড়তে পারি না।
পড়ুন—

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

পড়ো তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন—সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড থেকে। পড়ো, আর তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন—শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না। [আলাক ১-৫]

হযরত জিবরাঈল—রুহুল আমীন! হেরা গুহায় মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তার বাণী নিয়ে এসেছেন। তিনি এসে জগতের সবচেয়ে মহান ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বকে সর্বোচ্চ ও সবচেয়ে মর্যাদাবান আসন নবুওয়ত ও রেসালাতের পদমর্যাদায় সমাসীন হওয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন। হযরত মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমীপে জিবরাঈলের আগমনের অর্থই ছিল—মূর্খতার রাত পোহাবার সময় আসন্ন। পথভ্রষ্টতা ও আল্লাহবিস্মৃতির অন্ধকার—এবার বিদায়! অত্যাসন্ন সত্য ও হেদায়েতের সূর্যোদয়। এই সূর্যের আলোয় মানবতার পৃথিবী হবে আলোর জগৎ। নূরের পর্বত হেরার চূড়ায় উদিত

হতে যাচ্ছে এক সূর্য—যার আলোকরশ্মি শুধু মরু-আরবের বালুকাময় প্রান্তরকেই নয়, পুরো মানববিশ্বকে আলোয় আলোয় ভরে দেবে।

হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম ছিলেন পূর্ণ প্রস্তুত। আরশ থেকে আদেশ এল। সঙ্গে সঙ্গে নেমে এলেন মাটির পৃথিবীতে। সেইখানে নেমে এলেন—যাকে একদা ফসলশূন্য ভূমি বলা হয়েছে। যেখানে আছে আল্লাহর ঘর—যাকে আবাদ করেছিলেন হযরত ইবরাহিম ও হযরত ইসমাঈল আলাইহিমাস সালাম। যে মাটির অধিপতি এখন কুরাইশ। যে ঘর নির্মিত হয়েছিল এক আল্লাহর ইবাদতের জন্যে—সে ঘরে এখন শত শত মূর্তির উষ্ণ পূজোৎসব। বালুকাময় আরবের এই অঞ্চলটির নাম রাখা হয়েছে মক্কা। এই জনবসতি থেকে সামান্য দূরে—প্রায় তিন মাইল ব্যবধানে একটি পাহাড়। তার চূড়ায় একটি গুহা। সেই গুহায় ইবাদতমগ্ন আল্লাহর এক বান্দা—ঔদার্য যোগ্যতা চরিত্র ও পবিত্রতায় যিনি ফেরেশতাদের চোখেও ঈর্ষণীয়। যার পরম সম্মানিত নামখানা হলো—মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব। বিশ্বস্ত জিবরাঈল আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুওয়তের মুকুট নিয়ে এসেছেন। সেই মুকুট তার মাথায় পরিয়ে শোনালেন আল্লাহর বাণী। নবুওয়ত -পত্রের প্রথম কথা 'ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযি খালাক' পাঠ করে শোনালেন। এই বাণী পাঠমাত্র তিনি শুধু সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে মর্যাদাশীল মানবই নন—পুরো বিশ্বের রাজাধিরাজের আসনে সমাসীন তিনি। জগতের সৃষ্টিকর্তা তাকে দান করলেন পথহারা মানবতাকে সরল পথ দেখাবার মহান দায়িত্ব—

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا.

আমি আপনাকে সমগ্র মানবের জন্যে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করেছি। [সাবা : ২৮]

সুতরাং আপনি এখন আর শুধু আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ নন। এখন থেকে আপনি আল্লাহর রাসূল এবং সব নবী-রাসূলের শেষ প্রদীপ। আপনি পুরো জাহানের রহমত—

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ.

ইসলামের সূচনা

জগতের সৃষ্টিকর্তা মানববিশ্বে তাঁর বিধি-বিধান পৌঁছে দেওয়ার মহান দায়িত্ব যখন হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অর্পণ করেন, তখন তিনি পাহাড়সম এই দায়িত্বের কথা ভেবে কম্পিত হন। হেরাগুহা—যেখানে ফেরেশতা তাকে দায়িত্বের এই বাণী পৌঁছে দেন, সেখানে তৃতীয় কেউ ছিল না। সেখান থেকে মক্কায় ফিরে সর্বপ্রথম যাকে তিনি এই দায়িত্বের কথা জানান, জানান মনের অস্থিরতার কথা—তিনি তাঁর জীবনসঙ্গিনী হযরত খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা। অতঃপর তার সান্ত্বনার বাণী অস্থির তপ্ত মনে স্বস্তির কোমল হাওয়া বইয়ে দেয়। হযরত খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাঁকে বলেন—আপনার জীবন মানবিক সকল শ্রেষ্ঠ গুণের আধার। এই ঘটনায় আপনার অস্থির হওয়ার কিছু নেই। তারপরও আরও স্বস্তি ও সান্ত্বনার জন্যে সত্তর বছরের অভিজ্ঞ জগৎদ্রষ্টা চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নাওফালের কাছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে যান। তার সমর্থন সত্যায়ন ও সত্যভাষণে বিষয়টি আরও উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। অতর্কিত অস্থিরতার কারণে অস্পষ্ট হাকিকত আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে। ভাইয়ের অকুণ্ঠ সরল স্বীকৃতিতে হযরত খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার অন্তরও হয়ে উঠে পূর্ণ ভারমুক্ত। অন্তর আগে থেকেই আকীর্ণ ছিল বিশ্বাসে ভালোবাসায়। খোদার পরে তিনিই ছিলেন তার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তা। তাই তিনি সর্বপ্রথম তার নবুওয়ত ও রেসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন। খাতামুল আম্বিয়া সায়্যিদুল মুরসালিনের প্রতি সর্বপ্রথম ঈমানদারের আসন জয় করে নেন।[১]

প্রসারিত হলো আলোর বৃত্ত

এখনো তাকে দাওয়াত ও তাবলীগের আদেশ দেওয়া হয়নি। মহান ও বিশাল এই কর্তব্য সম্পাদনের জন্যে কিছু শক্তি ও সমর্থনের প্রয়োজন ছিল। উপায় উপকরণের এই পৃথিবীতে নবুওয়তের দায়িত্ব পালন করতে

---

১. *মিশকাতের সূত্রে বুখারী ও মুসলিম, ৫২২ পৃ; ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩ : ২; ইবনুল আসীর, আল-কামিল ফিত তারীখ, ১ : ৪৭৯।*

হলে—মানবিক মন মেজাজ অন্তর ও চিন্তার গ্রন্থি-উন্মোচনও ছিল বড় কাজ। অবাধ্যতা বিরোধিতা বিদ্রোহ ও যুক্তিহীন প্রতিরোধের শত আশঙ্কার কথা মাথায় রেখে গভীর চিন্তা-ভাবনা সতর্কতা ও কৌশলে পথ চলার সময় ছিল এটা। কুদরতের অদৃশ্য হাত ছিল উপায় উপকরণ নির্মাণে সক্রিয়। পরিবেশ ক্রমে অনুকূল করার আয়োজন হচ্ছিল অদৃশ্য ইশারায়।

হযরত খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার ক্রীতদাস ছিল যায়েদ ইবনে হারেসা। তার স্বভাব চিন্তা ছিল সুস্থ নির্মল। তাই তিনি যখন তার মনিব হযরত খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে দেখেছেন—মনে বিশ্বাসে আলোকিত হয়ে উঠছেন নতুন আলো মেখে, তখন তিনিও নিজেকে ওই নতুন আলোকে আলোকিত করার সংকল্পে দৃঢ় হন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে ইসলাম কবুল করেন।[১]

ছড়াতে থাকে আলো

তখনো পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়নি, তবে ওহীর মাধ্যমে বিশেষ এক ধরনের ইবাদত তাঁকে শেখানো হয়েছিল। সেই ইবাদতে রুকু সেজদা ছিল। পরে তাকেই নামায নাম দেওয়া হয়েছে। তিনি সেই ইবাদতেই মশগুল ছিলেন। এরই মধ্যে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এসে উপস্থিত হন। তখন তাঁর বয়স প্রায় আট বছর।[২]

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তখনো হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তত্ত্বাবধানেই লালিত পালিত হচ্ছিলেন। তিনি জানতে চাইলেন—এটা কী? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাঁকে জানালেন—আমি আল্লাহ তাআলার নবী এবং রাসূল। সঙ্গে তাকে ঈমান আনতেও বললেন। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তার বাবার বিষয়ে শঙ্কা প্রকাশ করলেন। কিছুক্ষণ পর খানিকটা ভেবে-চিন্তে এবং এটা নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবেন, এই প্রত্যয়ে ইসলাম কবুল করেন।

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ২৪।

২ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ১ : ২৬৪; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ২৪; ইবনে সায়্যিদুন নাস *উয়ুনুল আসার* গ্রন্থে লিখেছেন—তখন তার বয়স ছিল আঠারো বছর; কেউ বলেছেন—দশ বছর, আবার কেউ বলেছেন বারো বছর; ১ : ১৮০।

আলোকিত হলো নবী-পরিবার

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত ও রেসালাত যারা স্বীকার করে নিয়েছেন, যারা স্বীকার করেছেন আল্লাহ এক এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রেরিত রাসূল, তাদের তিনজনের সকলেই নবী-পরিবারের লোক। তাদের বসবাস একই ছাদের নিচে। তারা পরস্পরে পরিচিত, একান্ত অপন।[১]

তখনো পর্যন্ত এই পরিবারের বাইরে কারও কাছে তিনি তাঁর নবুওয়ত এবং রেসালাতের কথা প্রকাশ করেননি। অবশ্য ঘরের সকলেই একই চিন্তা ও বিশ্বাসের বলয়ে একীভূত বলে অন্তরে স্বস্তি অনুভূত হচ্ছিল। কারণ, উদ্দেশ্য ছিল বিষয়টি যেন গোপন থাকে। ঘরের তিনজন সদস্যই মুসলমান হয়ে যাওয়ার ফলে নবুওয়তের ঘোষণার আগেই বিষয়টি বাইরে জানাজানি হওয়ার ভয় কেটে যায়। কারণ, এতে পুরো জনপদ শত্রু হয়ে ওঠার আশঙ্কা ছিল।

প্রথম মুসলমান

কয়েকদিন পর প্রিয় নবীজির খেদমতে তাঁর একান্ত বন্ধু হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু আগমন করেন। কথাপ্রসঙ্গে নবীজি কেন ওয়ারাকা ইবনে নাওফালের কাছে গিয়েছিলেন, জানতে চান। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন—এ কথা আপনাকে কে বলল? আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সরল উত্তর—খাদিজা।[২]

এতে অনুমান হয় বিষয়টি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতটা গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। তিনি চাচ্ছিলেন, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নবুওয়তের ঘোষণা দেবার নির্দেশ আসার পূর্বে কেউ যেন জানতে না পারে। কারণ তিনি জানতেন—তাঁর চারপাশে যাদের বসবাস, তারা প্রচণ্ড জেদি হিংস্র নির্মম যুদ্ধবাজ এবং ফেতনাপ্রিয় চরিত্রের

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ১ : ২৫৯-২৬৫।

২ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৯।

লোক। সামান্য বিষয়ে লড়াই ঝগড়া বাধিয়ে দেওয়া তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। মূর্তিশালায় সংরক্ষিত তাদের ভগবানদের বিরোধিতা তারা মেনে নিতে পারবে না। তারা তাদের যাপিত রেওয়াজ, বংশানুক্রমিকভাবে অর্জিত সংস্কার এবং শিরকি বিশ্বাসে ইস্পাতের মতো কঠোর। এমন ভয়ানক পরিবেশে গোপনীয়তার প্রতি যত্নবান থাকাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। এ কারণেই ঘনিষ্ট বন্ধুর মুখে কুরাইশদের যাপিত ধর্মের বিপরীতে নতুন ধর্মের বাণী শুনে তিনি বিস্মিত হয়েছেন। তারপরও হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পুরোনো এবং একনিষ্ঠ বন্ধু। তাই তার উত্তরে বলেছেন—হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা আমাকে নবী করে পাঠিয়েছেন। আমি আপনাকে এক আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াত দিচ্ছি। তিনি এক অদ্বিতীয় লা-শরিক। এর উত্তরে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি আপনার কথা সত্য বলে স্বীকার করছি এবং আপনার প্রতি ঈমান আনছি।[১]

আবু বকর সিদ্দীকের প্রভাব ও বিস্তার

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন মক্কার একজন চরিত্রবান ধনী ব্যবসায়ী। মক্কায় তার সম্মান ছিল, সুনাম ছিল। মক্কার সকলেই তাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখত। তিনিও সকলের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতেন, সকলের কল্যাণ কামনা করতেন। ফলে মক্কার লোকেরা নানা বিষয়ে তার সঙ্গে পরামর্শ করতে আসত। তার পরামর্শ চোখ বুজে গ্রহণ করত। সফলও হতো। এককথায় তিনি সাধারণ অসাধারণ সকলেরই শরণালয় ছিলেন। তার বৈঠকখানায় প্রতিদিন ব্যবসায়ীরা আসত, আসত সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গও। কেউ আসত ব্যবসায়িক পরামর্শ নিতে, কেউ আসত নানা লেনদেন উপলক্ষে। ব্যবসায়িক সফর করবার পূর্বে পরামর্শের জন্যে তো আসতই। তার এই বৈঠকে ব্যবসা-বাণিজ্যের আলোচনার ফাঁকে সমসাময়িক বিষয়াশয়ের কথাও উঠত। সদ্য ঘটিত নানা ঘটনা ও বিষয়ের অবশ্য-আলোচনা প্রাণ পেত এখানে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে তারা এসব বিষয়ে পরামর্শ চাইত।

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩:২৭

এই হিসেবে বলা যায়, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর অবস্থান ওই সময়ে ওই জনবসতির একজন সম্মানিত উদারপ্রাণ সর্বজনপ্রিয় নেতার মতো। তাদের কাছে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কথা খুবই মর্যাদাশীল বিবেচিত হতো। তারা তার যে কোনো পরামর্শকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখত।[১]

কারও সঙ্গে তার শত্রুতা ছিল না। তার প্রতিও কারও ক্ষোভ কিংবা বিদ্বেষ ছিল না। সকল মজলিসে তিনি ছিলেন সকলের প্রিয়। সকলেই তাকে পরম শ্রদ্ধার নজরে দেখত।

যখন তিনি হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তার অন্তর পূর্ণরূপে বদলে যায়। তখন পর্যন্ত নবীজির পরিবারের বাইরে কেউ মুসলমান হননি। সিদ্দীকে আকবরই সর্বপ্রথম মুসলমান। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের বাণী তখনো সকল দৃষ্টির অন্তরালে। পর্দাবৃত এই মহাসত্যের কথা জানেন শুধু তাঁর জীবনসঙ্গিনী, ঘরের ভৃত্য এবং তাঁর অধীনে লালিত-পালিত এক কিশোর। এদের কেউই বাস্তবিকভাবে না কিছু করবার ক্ষমতা রাখেন, না ভাববার কিংবা বলবার ক্ষমতা রাখেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-ই সর্বপ্রথম হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের ভাবনা চিন্তা ও কম্পন নিজের মধ্যে ধারণ করেন। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন নবুওয়তের সূর্য আর আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু নবুওয়তের আয়না। সূর্য আয়নায় বিম্বিত হয়। সেই বিম্বিত আলো চারদিককার অন্ধকার কোণে বিচ্ছুরিত হতে থাকে। আয়না যে-মুখি হয়, সেই দিকটা আলোয় আলোয় উদ্ভাসিত হতে থাকে।

আবু বকর সিদ্দীকের কর্মকৌশল

আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বৈঠকে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি বরাবর আসা-যাওয়া করতেন, তাদের মধ্যে যারা তার আস্থাভাজন এবং যাদের সম্পর্কে তার বিশ্বাস ছিল—তারা তার কথা মানবেন, আর যদি না

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম* ১:২৬৮

মানেন, নিজেদের মধ্যেই সেটা সীমাবদ্ধ রাখবেন, কোনোরূপ ঝগড়া বাধাবেন না—মজলিস শেষে প্রতিদিনই তাদের কাউকে কাউকে ডেকে বসাতেন। একান্তে তার সামনে একত্ববাদের কথা বলতেন, তাওহীদ সম্পর্কে আলোচনা করতেন। বোঝাতেন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহকে [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহ তাআলা নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। মূর্তিপূজা একটি বোকামি কাণ্ড। আল্লাহ এক—তিনিই বিশ্বজগতের স্রষ্টা। তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করো। আর স্বীকার করে নাও মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।

আমার ধারণা—এটাই সত্য ধর্ম। মনে হয়—এটাই শুদ্ধ এবং যৌক্তিক। আমি এই দীনকে সঠিক মনে করি। এই দীনকে আমি বিশ্বাস করি। আপনিও এই দীন গ্রহণ করুন। আপনার জন্যে ভালো হবে।

তার কথা হতো আবেগঘন এবং ক্রিয়াশীল। যে সকল সম্মানিত ব্যক্তিকে তিনি নির্বাচন করে পালাক্রমে ইসলামের কথা বলেছেন, একান্তে বসে বুঝিয়েছেন—তাদের সকলেই ইসলাম কবুল করেছেন। তিনি পালাক্রমে প্রত্যেককে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে গেছেন। তারা তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছেন ।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর দাওয়াতে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম কয়েকজন হলেন—হযরত উসমান ইবনে আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু, যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রাযিয়াল্লাহু আনহু, আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস এবং তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু।[১]

আজ যদিও আমরা এক-দুই লাইনে এই মহান মনীষীদের নাম লিখে শেষ করে ফেলছি কিন্তু তাদের মহান অবদানের কথা আমাদের ইসলামের ইতিহাসের হাজার হাজার পৃষ্ঠাকে অলঙ্কৃত করে রেখেছে।

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ১ : ২৬৯; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ২৯; ইবনুল আসীর, *আল-কামিল ফিত তারীখ*, ১ : ৪৮ ; ইবনে সায়্যিদুন নাস, *উয়ুনুল আসার*, ১ : ১৮৩।

তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি বিশ্বাস ও আস্থার কারণে মানুষ তার কাছে বরাবর আসত। একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়েও তার সঙ্গে পরামর্শ করত। অথচ তখনো তাদের জানা ছিল না তিনি তাদের ধর্মে নেই। তিনি একটি নতুন ধর্ম কবুল করেছেন।

এই সময়কারই একটি ঘটনা। হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ সফরে গিয়েছিলেন। পথে আকস্মিকভাবেই একজন যাজকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। যাজক তাকে প্রশ্ন করেন—আচ্ছা, তোমাদের মক্কায় কি আহমদ নামে কোনো ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছেন—যিনি নতুন একটি ধর্মের দাওয়াত দেন? আমি বললাম, আপনি কোন আহমদের কথা বলছেন? যাজক বললেন, আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব। আমি বললাম, তিনি কোনো নতুন ধর্মের দাওয়াত দেন বলে তো আমার জানা নেই। যাজক বললেন, খুব শীঘ্রই একজন রাসূলের আবির্ভাব হবে। তিনি মানুষকে মূর্তিপূজা করতে নিষেধ করবেন। ইসলামধর্মের দাওয়াত দেবেন। আমার ধারণা, তাঁর আবির্ভাব হয়েছে। আমাদের ধর্মগ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে বিশদ আলোচনা রয়েছে।

তালহা সফর থেকে এসে একদিন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সঙ্গে যাজকের ঘটনাটিও উল্লেখ করেন। তারপর জানতে চান, আচ্ছা, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ কি ইসলামধর্মের দাওয়াত দিচ্ছেন আর আপনি কি তার অনুসরণ করছেন! হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, কথা সত্য। তিনি সত্য ধর্মের দাওয়াত দিচ্ছেন। হযরত তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর অন্তরে যাজকের কথা আগেই রেখাপাত করে রেখেছিল। তাই হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন বললেন, তুমিও আমার সঙ্গে চলো এবং ইসলাম কবুল করে নাও। হযরত তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু বিনা বাক্যে তার সঙ্গে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হন এবং ইসলাম কবুল করেন।[১]

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ২৯।

খালেদ ইবনে সাঈদের ইসলাম গ্রহণ

ইসলামের দাওয়াতের কাজ চূড়ান্ত গোপনীয়তার সঙ্গে চলছিল। এরই মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তারা একান্ত বিশ্বস্ত এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে চাপাকণ্ঠে ইসলামের আলোচনা করতেন। ফলে মক্কার কোনো কোনো ঘর ও পরিবারে ইসলামের আলোচনা একটু একটু করে হতে থাকে। এই আলোচনার পরশে অন্তর যাদের ভাগ্যবান, তারা জাগতে থাকেন। একের পর এক বিস্ময়কর ঘটনারও প্রকাশ হতে থাকে। খালেদ ইবনে সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি একেবারে প্রথম দিককার।

খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু একবার স্বপ্নে দেখলেন—অনেক বড় একটি পরিখা। তাতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। তিনি সেই অগ্নিময় পরিখার তীরে দাঁড়িয়ে আছেন। অগ্নিময় পরিখায় তিনি ঠিক পড়তে যাবেন, এমন সময় মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ সেখানে উপস্থিত। তিনি উভয় হাতে তার কোমর চেপে ধরে নিরাপদে সরিয়ে আনেন। ফলে খালেদ ইবনে সাঈদ অগ্নিময় পরিখায় নিপতিত হওয়া থেকে বেঁচে যান। ভয়াবহ এই খাব দেখামাত্র তার ঘুম ভেঙে যায়। রাতে আর কোনোক্রমেই তিনি ঘুমাতে পারেন না।

প্রত্যুষে ছুটে আসেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে। রাতে-দেখা স্বপ্নটি সবিস্তারে বর্ণনা করেন। সবকিছু শোনার পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন—দ্যাখো, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল্লাহর রাসূল। তিনি তোমার এক বিশ্বস্ত শুভাকাঙ্ক্ষী। তিনি তোমাকে দোজখের আগুন থেকে বাঁচাতে পারেন। সুতরাং তুমি আমার সঙ্গে চলো।

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আজয়াদ মহল্লায় অবস্থান করছিলেন। আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু খালেদ ইবনে সাঈদকে নিয়ে সোজা সেখানে চলে যান। দরবারে উপস্থিত হওয়ার পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ঈমানের দাওয়াত দেন। খালেদ ইবনে সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু নবীজির কথা শোনার পর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করে মূর্তিপূজা থেকে তওবা করেন। প্রাণ খুলে উচ্চারণ করেন—

اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله.

ঈমান আনলেন হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু। সঙ্গে মুখোমুখি হলেন কঠিন পরীক্ষার। কোনোভাবে তার বাবা সাঈদ বিষয়টি জানতে পারেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার অন্য ছেলেদের পাঠিয়ে দেন খালেদকে খুঁজে আনতে। তারা হযরত খালেদকে ধরে নিয়ে আসেন। সাঈদ সোজা তার কাছে প্রকৃত ঘটনাটি জানতে চান। হযরত খালেদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-ও কোনোরূপ লুকোচুরি না করে সরল সত্যটি বলে দেন। সঙ্গে সঙ্গে তার বাবা এবং ভাইগণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। মুহূর্তে আঘাতে আঘাতে তাকে পিষে ফেলে। এক ভাইয়ের হাতে একটি লোহার টুকরা ছিল। সেই লোহা দিয়ে সে হযরত খালেদের মাথায় আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোতে থাকে। আর তার ক্ষুব্ধ পিতা মুখের ওপর কসম করে বলে দেন—আজ থেকে আর কোনো দিন তুমি আমার ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না। এই ঘরে তোমার খানাপিনা সব নিষিদ্ধ। এই মুহূর্তে তুমি আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাও। তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। এদিকে হযরত খালেদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর অন্তরে ঈমান ততক্ষণে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। তিনিও মুখের ওপর বলে দেন, আপনি আমার খানাপিনা বন্ধ করে দিচ্ছেন? আমার রিজিকদাতা তো আল্লাহ। এই রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে ওঠেন। তারপর আর কোনো দিন তিনি বাবার ঘরে ফিরে যাননি।[১]

হযরত আবু বকর এবং হযরত তালহার প্রতি নিষ্ঠুর নির্যাতন

হযরত তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম কবুল করার পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে ফিরছিলেন। কীভাবে যেন বিষয়টি মক্কার মুশরিক কুরাইশ-সম্প্রদায় জানতে পারে। তারা কোনোভাবে সংবাদ পায় আবু বকর আজ তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহকেও তার বাপ-দাদার ধর্ম থেকে বের করে নিয়েছে। তালহা নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছে। ঘটনাটি নাওফাল ইবনে খুয়াইলিদ ইবনে আল আদাবিয়্যাও জানতে পারে।

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৩২।

নাওফাল মক্কার অন্যতম বীরপুরুষ। এ অঞ্চলে তাকে শেরে কুরাইশ—কুরাইশী বাঘ বলে ডাকা হয়। গায়ে রাজ্যের শক্তি। এই নাওফাল হযরত আবু বকর এবং হযরত তালহাকে আসতে দেখে পথে দাঁড়িয়ে যায়। কাছাকাছি আসার পর ছুটে গিয়ে উভয়জনকে ধরে একটি রশিতে বেঁধে ফেলে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর গোত্র বনু তাইমের লোকেরা সেখানেই ছিল। কিন্তু নাওফালের হাত থেকে তাকে ছাড়িয়ে আনবার সাহস তারা করতে পারেনি। বিষয়টি যখন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারেন ব্যথিত হন, সীমাহীন আহত হন। সঙ্গে সঙ্গে তার পবিত্র মুখ থেকে বেরিয়ে আসে—

اللهم اكفنا شر ابن العدوية.

হে আল্লাহ, আদাবিয়্যা-পুত্রের অনিষ্ট থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো।

গোপন তাবলীগ

ভয়াবহ এই প্রতিকূল পরিবেশেও দাওয়াত চলতে থাকে ভোরের বাতাসের মতো তিরতির করে। একান্ত গোপনে। আস্থাভাজন থেকে আস্থাভাজনে। এই গোপন সংগ্রামে সকলের অগ্রে ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু। এই সময়ে যারা ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন, তাদের অধিকাংশই হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মাধ্যমে ইসলাম কবুল করেছেন। তবে গোপনীয়তা ছিল এতটাই কঠোর ও নিশ্ছিদ্র, যারা মুসলমান হতেন তারাও ঠিক জানতেন না, এই কাফেলায় আর কে বা কারা আছেন।

গোপন এই তাবলীগের মাধ্যমে যে সকল ভাগ্যবান ইসলাম কবুল করেন, ক্রমাগত তাদের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। একসময় তাদের সংখ্যা চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশে পৌঁছে যায়। ইসলামের প্রথম সারির এই ভাগ্যবান কাফেলা—পাক কুরআনে যাদেরকে প্রথম ও অগ্রণী বলা হয়েছে—তাদের একটি তালিকা এখানে আমরা তুলে ধরছি। এই তালিকায় তারাও রয়েছেন, ইসলাম কবুল করার পর যারা নিজেদের ঘরে একান্ত আপনজনদের দাওয়াত দিয়েছেন। তাদের দাওয়াতে তাদের স্ত্রী

সন্তান কিংবা ভাই-বোন ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদের হাত ধরে তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুজন। ইসলামের প্রাথমিক তিন বছরে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাদের তালিকা আমরা এখানে পত্রস্থ করছি। অবশ্য এই তালিকায় তাঁরা অন্তর্ভুক্ত নন, যারা একেবারে সূচনাতে ইসলাম গ্রহণে ধন্য হয়েছেন—যেমন : উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজা, যায়েদ ইবনে হারেসা, আলী ইবনে আবু তালেব, আবু বকর সিদ্দীক, উসমান ইবনে আফফান, যুবায়ের ইবনুল আওয়াম, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস, তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন।

এদের পর যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাদের তালিকাটি নিম্নরূপঃ

আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ, আবু সালামাহ আবদুল্লাহ ইবনে আসাদ, আরকান ইবনে আবুল আরকান, উসমান ইবনে মাযউন, তাদালা ইবনে মাযউন, আবদুল্লাহ ইবনে মাযউন, উবায়দা ইবনে হারেস, সাঈদ ইবনে যায়েদ, তার স্ত্রী উম্মে জামিল ফাতেমা বিনতুল খাত্তাব, হযরত আবু বকরের কন্যা হযরত আসমা, হযরত আয়েশা, খাব্বাব ইবনুল আরাত, উমাইর ইবনে আবুল ওয়াক্কাস, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, মাসউদ ইবনে রাবীআ, সুলায়ত ইবনে আমর, হাতেব ইবনে আমর, আইয়াশ ইবনে আবু রাবীআ ইবনুল মুগীরা, তার স্ত্রী আসমা বিনতে সালামাহ, খুনাইস ইবনে খুদালাহ, আমের ইবনে রাবীআ, আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ, আবু আহমাদ ইবনে জাহাশ, জাফর ইবনে আবু তালেব, তার স্ত্রী আসমা বিনতে উমায়েস, হাতেব ইবনুল হারেস, তার স্ত্রী ফাতেমা বিনতুল মুহাল্লাল, খাত্তাব ইবনুল হারেস, তার স্ত্রী তাকিয়্যাহ বিনতে ইয়াসার, মামার ইবনুল হারেস, সায়েব ইবনে উসমান, মুত্তালিব ইবনে আযহার, তার স্ত্রী রামলাহ বিনতে আবু আউফ, নুআইম ইবনে আবদুল্লাহ আন নাহহাম, আমের ইবনে ফুহায়রা—হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর আজাদকৃত গোলাম, খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনুল আস, তার স্ত্রী উমায়নাহ বিনতে খালাফ ইবনে আসআদ, হাতেব ইবনে আমর, আবু হুযায়ফা ইবনে উতবা ইবনে রাবীআ, ওয়াতিদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্দে মানাফ, খালেদ ইবনুল বুকায়ের, আমের ইবনুল বুকায়ের, আকেল ইবনুল বুকায়ের, আয়ায ইবনুল বুকায়ের,

আম্মার ইবনে ইয়াসির, সুহাইব ইবনে সিনান, নামির ইবনে তাসিত—রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন। ভাগ্যবান এই কাফেলা গোপন তাবলীগকালে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেন।[১]

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ঈমানী দুঃসাহস

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন দাওয়াতের আবেগে উদ্দীপ্ত। এক্ষেত্রে তিনি কোনোরূপ আশঙ্কা কিংবা কোনো রক্তচক্ষুকে পরোয়া করতেন না। ভেতর থেকে সব রকমের অন্যায় অবিচার বরদাশত করার জন্যে সদা প্রস্তুত থাকতেন। অবশ্য সময়ের প্রেক্ষিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন গোপনীয়তার প্রতি চরম যত্নবান। কারণ, তখনো পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নবুওয়তের ঘোষণা বা দাওয়াত ও তাবলীগের আদেশ আসেনি। তাই গোপনে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। যদিও ব্যক্তি আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন খুবই ধৈর্যশীল এবং মার্জিত স্বভাবের মানুষ। তবুও হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সত্য দীনের বিষয়ে ছিলেন পরম আবেগাকুল। তিনি চাচ্ছিলেন ইসলামের দ্রুত বিজয়। তা ছাড়া তিনি এরই মধ্যে কত জন ইসলাম কবুল করে ধন্য হয়েছেন, সেই সংখ্যাও জানতেন। তাই যখন প্রায় চল্লিশ জনের মতো ইসলামের শান্তিময় শামিয়ানার নিচে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন তিনি হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রস্তাব করেন—আমি একদিন সকলের সামনে পবিত্র হেরেমে দাঁড়িয়ে ইসলামের দাওয়াত দিতে চাই। তিনি হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সঙ্গে করে পবিত্র হেরেমে উপস্থিত হন। অবসর সময়ে মক্কার মুশরিক কুরাইশরা সাধারণত সেখানে বসেই আড্ডা দিত। তাদের জমজমাট মজলিস হচ্ছিল। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে গিয়ে চুপচাপ বসে পড়েন। আর আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে যান ভাষণের উদ্দেশ্যে।

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ১ : ২৬৯-২৭২; ইবনে সায়্যিদুন নাস, *উয়ুনুল আসার*, ১ : ১৮৩-১৮৬; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৩৭।

আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ভাষণ

এরই মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাদেরকেও পবিত্র হেরেমে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছিল। তারা যথাসময়ে হেরেমে পৌঁছে যান। একসঙ্গে নয়। প্রত্যেক মুসলমান তার খানদানের লোকদের সঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে উপবিষ্ট। এরই মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়ালেন। মক্কার মুশরিকদের উদ্দেশে বললেন—

তোমরা প্রাণহীন মূর্তিদের পূজা ছেড়ে বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তা এক আল্লাহর ইবাদত করো। সেই সঙ্গে তিনি হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের ঘোষণা দিয়ে বললেন—*মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল ও নবী। তোমরা তাঁর নবুওয়ত ও রেসালাতের প্রতি ঈমান আনো।*

কথা এতটুকুই বলতে পেরেছিলেন। উপস্থিত মুশরিক-সম্প্রদায় নিজেদের আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। চরম উত্তেজনায় হামলে পড়ে আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর। তা ছাড়া যারা যারা এরই মধ্যে বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে নতুন ধর্ম কবুল করেছে বলে তাদের জানা ছিল, ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ওপরও। পুরো হেরেম জুড়ে এক ভয়াবহ হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। ক্ষুধার্ত বাঘের মতো মুশরিকদল মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি তাদের ক্ষোভ ছিল মাত্রাহীন। তাই তাঁর প্রতি তেড়ে আসে একসঙ্গে অনেকে। বিশেষ করে উতবা ইবনে রাবীআ পায়ের জুতায় হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মুখে এমনভাবে আঘাতের পর আঘাত করতে থাকে—তার নাক চেহারার সঙ্গে মিশে যায়। মাটিতে ফেলে দিয়ে তার পেটের ওপর উভয় পায়ে পিষতে থাকে। অবশেষে সকলেই ধরে নেয় আবু বকর মারা গেছেন। এই অবস্থায় আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কবিলা বনু তাইম ছুটে আসে। তারা মুশরিকদেরকে চেঁচিয়ে বলে, যদি সত্যিই আবু বকর নিহত হয়ে থাকেন, তা হলে কুরাইশদের ভালো হবে না। আমরা একেকজন করে এর প্রতিশোধ নেব। তাদের এই ক্ষুব্ধ চিৎকারে মুশরিকদল ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে। বনু তাইম আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তুলে বাড়িতে নিয়ে আসে। তার মাকে বলে, এর যত্ন

নাও। কিছু খানাপিনা করাতে চেষ্টা করো। তারপর তারা নিজ নিজ ঘরে চলে যায়।[১]

নবীজি কেমন আছেন?

যখন সকলেই চলে যায়, ধীরে ধীরে হুঁশ ফিরে পান আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু। তখন চোখ খুলে স্বীয় জননীকে সর্বপ্রথম প্রশ্ন করেন—নবীজি কেমন আছেন? তিনি ভেবেছিলেন, আমার সঙ্গে হয়তো মুশরিকের দল নবীজির প্রতিও কোনো দুর্ব্যবহার করে থাকবে। তাই চেতনা ফিরে পাওয়ার পর নিজের ব্যথা ও যন্ত্রণার কথা বলেননি, বরং সর্বপ্রথম জানতে চেয়েছেন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন। তার মা কসম করে বললেন—তোমার বন্ধুর কথা আমার কিছুই জানা নেই। হযরত আবু বকর তখন অনুনয় বিনয় করে বললেন—আপনি এখনই খাত্তাবের কন্যা উম্মে জামিলের ঘরে যান। তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন, নবীজি কেমন আছেন।[২]

চরম সতর্কতা

হযরত আবু বকরের মা উম্মুল খায়ের উম্মে জামিলের ঘরে ছুটে যান। গিয়ে বলেন—আবু বকর তোমার কাছে জানতে চেয়েছে, তার বন্ধু মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ কেমন আছেন। উম্মে জামিল বললেন, আমি আবু বকর কিংবা মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহর খবর কীভাবে জানব? তবে আপনি যদি চান, তা হলে আমি আপনার ছেলে আবু বকরকে দেখতে যেতে পারি। উম্মুল খায়ের বললেন—এটা খুবই ভালো প্রস্তাব। খাত্তাবের কন্যা উম্মে জামিলকে নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন হযরত আবু বকরের মা। উম্মে জামিল এখানে এসে দেখলেন আবু বকরের অবস্থা চরম আশঙ্কাজনক। আঘাতে

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৩০।

২ উম্মে জামিলের নাম ফাতেমা বিনতুল খাত্তাব। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বোন। সাঈদ ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার স্বামী। একেবারে সূচনাপর্বে স্বামী স্ত্রী ইসলাম কবুল করেছিলেন। এই বোনের মাধ্যমেই পরে হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম কবুল করেন।- আসীর আদরবী

আঘাতে বিচূর্ণ দেহ। চেহারা দেখে তাকে চেনাই দায়। মনে হয়, তার জীবন ঘনিয়ে এসেছে। হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর এই অবস্থা দেখে অলক্ষে চিৎকার করে ওঠেন উম্মে জামিল। বলেন—আল্লাহ এই জালেমদের ধ্বংস করুন। জালেমরা তাকে এভাবে মেরেছে! হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন বলেন—তুমি আগে বলো, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন? উম্মে জামিল বললেন, আপনার মা উম্মুল খায়ের দাঁড়িয়ে আছেন। তার সামনে তো আমি কিছু বলতে পারি না। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে আশ্বস্ত করলেন। আমার মা জানলে কোনো সমস্যা নেই। তিনি এই কথা কাউকে বলবেন না। উম্মে জামিল তখন বললেন, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালো আছেন, নিরাপদে আছেন। এখন তিনি ইবনুল আরকামের ঘরে অবস্থান করছেন।

প্রিয় নবীজির কদমে

এ কথা শুনেই হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলে ওঠেন—তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে নবীজির কাছে নিয়ে না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর কসম, আমি কিছু খাব না, পান করব না। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর এই দৃঢ়প্রত্যয়ে কোমলমতি এই দুই নারী ঘাবড়ে যান। ভাবতে থাকেন, কীভাবে আমরা আবু বকরকে নবীজির দরবারে পৌঁছাই! কারণ, কোনোভাবে যদি মক্কার মুশরিকদল নবীজির ঠিকানা পেয়ে যায়, তা হলে আবার সেখানে হামলা করারও আশঙ্কা রয়েছে। অবশেষে তারা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আশ্বস্ত করেন—যে করেই হোক আমরা তোমাকে নবীজির কাছে পৌঁছে দেব। যখন সন্ধ্যা নামে, নামে ঘন অন্ধকার, নেমে আসে নিস্তব্ধতা, থেমে যায় মানুষের চলাচল, পথ এবং সরু গলিগুলোও সুনসান নীরবতায় প্রাণহীন হয়ে পড়ে, কোথাও কোনো পা ফেলার শব্দ নেই, তখন এই দুই নারী হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ধরে তোলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের কাঁধে ভর করে উঠে দাঁড়ান। একপাশে তার মমতাময়ী জননী, অপরপাশে উম্মে জামিল। উভয়ের কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে পা ফেলে চলতে থাকেন এবং ধীরে

ধীরে পৌঁছে যান হযরত ইবনুল আরকামের ঘরে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দেখে আবেগে, বেদনায় অস্থির হয়ে পড়েন। জড়িয়ে ধরেন গভীর ভালোবাসায়। সেখানে উপস্থিত মুসলমানগণও চুম্বকের মতো ছুটে আসেন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পাশে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর অবস্থা দেখে কোনোভাবেই বরদাশত করতে পারছিলেন না হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় নবীজির এই অস্থিরতা দেখে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমার মা-বাবা আপনার জন্যে কুরবান হোক! ইনশাআল্লাহ আমার কিছুই হবে না। তবে জালেমরা অবশ্যই শাস্তি পাবে।[১]

হযরত আবু বকরের মায়ের ইসলাম গ্রহণ

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে একটাই চিন্তা—কীভাবে আল্লাহর দীনকে ছড়িয়ে দিতে পারি। তার সারা শরীর আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত। এই অবস্থা দেখে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুসলমানগণ অশ্রুসজল। অথচ হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মন সেখানে চঞ্চল। শরীরের ওপর দিয়ে বয়ে-যাওয়া ঝড় ফেরাতে পারেনি তার বিশ্বাসের স্রোত। এই অবস্থাতেও তিনি প্রিয় নবীজির কাছে সবিনয়ে আরজ করছেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইনি আমার মা। আমার প্রতি তার মমতার অন্ত নেই। আপনি আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করে দিন আল্লাহ তাআলা যেন তাকে ঈমান নসিব করেন। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে দুআ করলেন এবং তাকে ঈমানের দাওয়াত দিলেন। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম কবুল করলেন। শামিল হলেন মুসলমানদের ভাগ্যবান কাফেলায়। ঈমানের ধনে প্রাণ পূর্ণ করে ঘরে ফিরে এলেন আবু বকর-জননী উম্মুল খায়ের। হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে গেলেন দারুল আরকামে প্রিয় নবীজির সান্নিধ্যে। তখন সেখানে আটত্রিশ জন মুসলমান অবস্থান করছিলেন। এখন হযরত আবু বকরকে নিয়ে দারুল আরকামে অবস্থানরত মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়াল উনচল্লিশ।

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৩০।

মুসলমান হলেন হযরত হামযা

ইসলামের সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং দুর্মুখ শত্রু ছিল আবু জেহেল। নিজের বংশ ও শক্তির প্রতি ছিল অন্তহীন অহংকার। কুরাইশের কাছে তার মর্যাদা ছিল শিখরে। ইসলামের শত্রুতায় ছিল চরম অন্ধ। নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর আচরণ করতে কুণ্ঠিত হতো না। মন্দ থেকে মন্দতর পথ গ্রহণ করতেও তার বাঁধত না। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত সত্তাকে আক্রমণ করার, জুলুম ও আঘাতে বিপর্যস্ত করার কোনো উপায় সে হাতছাড়া করত না। কুরাইশ-সম্প্রদায়—বিশেষ করে তাদের যুবক-সমাজ তার ইঙ্গিতে উঠবস করত। ফলে সে এ তল্লাটের বাঘ হয়ে ওঠে।

একদিনকার ঘটনা। সাফা পাহাড়ের কাছে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়। মুখোমুখি হতেই গালিগালাজ করতে শুরু করে। বকাঝকা এবং গালিগালাজে অপমানের সীমা ছাড়িয়ে যায়। এটা সেই দিনকার ঘটনা, যেদিন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু মুশরিকদের হাতে আক্রান্ত হন। আক্রান্ত হন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরম ধৈর্যের সঙ্গে কোনোক্রমে আবু জেহেলের সামনে থেকে সরে পড়েন। এদিকে নবীজির চাচা হযরত হামযা গিয়েছিলেন শিকারে। শিকার থেকে ফেরার পথে কেউ তাকে জানিয়ে দেয়—আবু জেহেল তার ভাতিজাকে অপমান করেছে। বকাঝকা করেছে। হযরত হামযার আত্মমর্যাদাবোধে আগুন জ্বলে ওঠে। ভাবতে থাকেন—কী, আবু জেহেল আমার খান্দানকে এতটা দুর্বল এবং ক্ষুদ্র ভেবেছে! তখনো তিনি মুসলমান হননি, কিন্তু তার বংশের প্রিয় প্রদীপকে লাঞ্ছিত করা হয়েছে এ কথা শুনতেই রাগে-ক্ষোভে বেসামাল হয়ে পড়েন। সোজা ছুটে যান বায়তুল্লাহর কাছে। সেখানে মজলিস জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছিল আবু জেহেল। হামযা সোজা তার কাছে চলে যান। হাতে ধনুক ছিল। এক টানে ধনুক উঁচু করে আবু জেহেলের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করেন। মাথা ফেটে যায়। দরদর করে রক্ত ঝরতে থাকে। গর্জে ওঠেন হামযা—তুমি আমাদের খান্দানকে অপমান করেছ। আমরা কি এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছি, তুমি আমাদের

দিকে আঙুল তুলবে! এখন থেকে আমিও দেখে নেব আমার ভাতিজা মুহাম্মাদকে কে কষ্ট দেয়?[১]

আবু জেহেলকে রক্তাক্ত দেখে বনু মাখযুমের লোকজন প্রতিশোধের নেশায় ছুটে আসে—তারাও দেখে নেবে হামযাকে। তারা হামযাকে মুখোমুখি প্রশ্ন করে বসে—তুমিও মনে হয় ধর্মহারা হয়ে পড়েছ! বাপ-দাদার ধর্মকে হয়তো তুমিও ছেড়ে দিয়েছ, নইলে ভাতিজার সাহায্যে এভাবে উন্মত্ত হয়ে উঠতে না। হামযা বললেন, পৃথিবীর সবাই জানে, আমি মুসলমান নই। কিন্তু এখন দেখে নেব, আমাকে মুসলমান হওয়ার পথে কে বাধা দেয়। কারও সাহস থাকলে সামনে এসে আমাকে বাধা দিক। যদি বাবার শুদ্ধ সন্তান হয়ে থাকো, তা হলে সামনে এসে দাঁড়াও।

আবু জেহেল লক্ষ করল, পরিস্থিতি অন্যদিকে গড়াচ্ছে। এখনই রক্তারক্তি বেধে যেতে পারে। তাই সে নিজেই কথার বাঁক ঘুরাবার জন্যে বলল—আবু উমারা, হামযাকে কিছু বোলো না। আমি তার ভাতিজাকে খুব খারাপ কথা বলেছি। তার রাগ হওয়া ঠিক আছে। এদিকে চরম এই ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ অবস্থায় হযরত হামযা হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছুটে আসেন। এসেই বলেন—আমাকে মুসলমান করুন। হামযা সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলেন প্রচণ্ড রাগের মাথায়। তাই পরের দিন কিছুটা বিব্রত হলেন এবং হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে মনের অস্থিরতার কথা জানান। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্যে দুআ করলেন। পরকালে শান্তি ও আজাবের কথা বললেন। ঈমানের হাকিকত তুলে ধরলেন। তুলে ধরলেন আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে হিসাব-কিতাবের কথাও। নবীজির কথায় তার মনে স্বস্তি ফিরে আসে। কেটে যায় শয়তানের অসঅসা। সরল কণ্ঠে স্বীকার করে নেন—আমার অন্তর এখন পূর্ণ আশ্বস্ত। আমি বুঝতে পারছি ইসলামই সত্য ধর্ম।

হযরত হামযা ইসলাম গ্রহণ করায় মুসলমানগণ খুবই আনন্দিত হন। কারণ, হযরত হামযা ছিলেন কুরাইশদের মধ্যে এক মহান বীর। অন্যদিকে

---

১ ইবনুল আসীর, *আল-কামিল ফিত তারীখ*, ১ : ৫০১; ইবনে সায়্যিদুন নাস, *উয়ূনুল আসার*, ১ : ১৯৬; *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ১ : ৩১২।

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা, দুধভাই এবং সমবয়স্ক।[১]

আবু যর গিফারীর ইসলাম গ্রহণ

এতদিন পর্যন্ত যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তারা সকলেই মক্কার অধিবাসী এবং এখানকার নানা গোত্রের সন্তান। সতর্ক গোপনীয়তার কারণে মক্কার বাইরের গোত্রগুলোর মধ্যে ইসলামের দাওয়াতের কোনো প্রশ্নই ছিল না। তা ছাড়া এখানকার প্রতিকূলতাই তো ভয়াবহ। কিন্তু মক্কার মুশরিক-সম্প্রদায় এবং ইসলামের শত্রুদের ক্ষুব্ধ ও অসঙ্গত আচার - আচরণের কারণে মক্কার বাইরেও হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের কথা একটু একটু করে ছড়াতে থাকে।

গিফার কবিলা মক্কা শহর থেকে বেশ দূরে। কোনোক্রমে কথা সেখানেও পৌঁছে যায়। আবু যর গিফারী জানতে পারেন মক্কায় একজন নবীর আবির্ভাব হয়েছে। তিনি ছিলেন সত্যসন্ধানী। কথাটি শোনামাত্র তার সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে ভাই আনিসকে মক্কায় পাঠিয়ে দেন। আনিস মক্কা থেকে ফিরে গিয়ে কোনো পরিপূর্ণ জবাব দিতে পারেননি। আবু যর গিফারী তখন সিদ্ধান্ত নেন—নিজেই মক্কা আসবেন। মক্কায় ছুটে আসেন। অবস্থান গ্রহণ করেন হেরেম শরীফে। এখানে এসেই তিনি অনুমান করেন পরিস্থিতি খুবই উত্তপ্ত এবং প্রতিকূল। তার কাছে মনে হয়, এখানকার প্রতিটি মানুষই মুসলমান এবং ইসলামের শত্রু। তাই কারও কাছেই তিনি হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঠিকানা জানতে চাননি। এরই মধ্যে একদিন হযরত আলী ইবনে আবু তালেবের সঙ্গে দেখা হয়, কিন্তু কোনো কথা হয়নি। দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনের সাক্ষাতে হযরত আলী তার কাছে জানতে চান—এখানে কী উদ্দেশ্যে এসেছেন? আবু যর গিফারী পূর্ণ সতর্কতার সঙ্গে কসম দিয়ে বলেন—এক ব্যক্তি শুনেছি নবুওয়তের দাবি করেছেন, আমি তাঁর সন্ধানে এসেছি। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আপনি সত্য শুনেছেন। আল্লাহ তাআলা একজন নবী

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* ৩:৩৩

পাঠিয়েছেন। কিন্তু তাঁর কাছে যাওয়ার পথে পথে রয়েছে নানা আশঙ্কা। এমন হতে পারে, আপনি আমাকে অনুসরণ করে হাঁটতে থাকবেন। দৃশ্যত যেন আমার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক আছে, সেটা কোনোক্রমেই বোঝা না যায়। তারপর আমি যে ঘরে প্রবেশ করব, আপনি সে ঘরে প্রবেশ করবেন। এভাবে তৃতীয় দিন গিয়ে আবু যর গিফারী হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হন। ইসলাম কবুল করেন। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পরামর্শ দিয়ে বলেন—এখন চুপচাপ তুমি তোমার এলাকায় ফিরে যাও। সেখানে গিয়ে দীনের দাওয়াত দিতে থাকো। আল্লাহ তাআলা এর প্রতিদান দেবেন। হযরত আবু যর গিফারী বললেন, এখানে আমি আমার ঈমানের ঘোষণা না করে আমার কবিলায় ফিরে যাব না। তারপর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবার থেকে উঠে সোজা এসে হাজির হন কাবার পবিত্র চত্বরে। উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন—

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله.

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। সাক্ষ্য দিচ্ছি, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

এ কথা শোনামাত্র সেখানে উপস্থিত মুশরিকরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে রক্তাক্ত করে। আবু যর গিফারী মাটিতে পড়ে যান। ঠিক এমন সময় সেখানে উপস্থিত হন হযরত আব্বাস। তিনি ভালো করে লক্ষ করেন—লোকটা গিফার কবিলার মনে হচ্ছে। তারপর উপস্থিত সকলকে বলেন—তোমরা একে মেরে কাজটা ঠিক করনি। কারণ, এদের জনবসতির পাশ দিয়েই তোমাদের ব্যবসায়ী কাফেলা আসা-যাওয়া করে। এই কবিলা তোমাদের শত্রু হয়ে পড়লে ব্যবসা বন্ধ হয়ে পড়বে। এ কথা শোনার পর সকলেই যার যার মতো কেটে পড়ে। জানে বেঁচে যান হযরত আবু যর গিফারী।[১]

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৩৪।

জমাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণ

মক্কার বাইরে থেকে এসে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে আরেকটি নাম হলো হযরত জমাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু। আজদ শানুআহ গোত্রের সদস্য। দক্ষ তান্ত্রিক। তান্ত্রিক হিসেবে সকলেই তাকে চিনত। মক্কায় আসার পর মুশরিক-সম্প্রদায় তাকে বলল—এখানে একজন পাগল আছে। তুমি তো ঝাড়-ফুঁক করে পাগল ভালো করতে পারো। ফুঁকটুক দিয়ে এর পাগলামিটাও দূর করে দাও। জমাদ ঠিকানা জানতে চাইলেন। তারপর সোজা হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে পৌঁছে গেলেন। গিয়ে বললেন, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো মন্দ বাতাসে আক্রান্ত হয়, তা হলে আমি ঝাড়-ফুঁক করে তাকে সুস্থ করে দিতে পারি। যদি আপনার ওপর কোনো ধরনের মন্দ কিছু করা হয়ে থাকে, তা হলে আমি আপনাকে ঝেড়ে দিতে পারি। এর উত্তরে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

ان الحمد لله، نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له.

সকল প্রশংসা আল্লাহর। আমি তাঁরই প্রশংসা করি। তাঁর কাছেই সাহায্য চাই। তিনি যাকে পথ দেখান, কেউ তাকে পথহারা করতে পারে না। তিনি কাউকে পথহারা করলে কেউ তাকে পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক, লা শরিক।

জমাদের কথার পিঠে এই ছিল নবীজির উত্তর। এই কয়টা কথা শোনার পর জমাদ বলেছিলেন—আমি কবি ও জাদুকরদের কথা শুনেছি, শুনেছি তান্ত্রিকদের কথাও, কিন্তু আজ পর্যন্ত এতটা মর্যাদাশীল কোনো বাণী আমি শুনিনি। এ তো ভাষা-সাহিত্যের এক অথৈ সাগর। এতটুকুতেই জমাদ বুঝতে পারেন নিঃসন্দেহে তিনি সত্য নবী। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল। তিনি নিজেই বলেন—হে রাসূল, আপনার হাত প্রসারিত করুন। আমাকে বায়আত করুন। নবীজি তাকে ঈমানের শিক্ষা দান করেন। তার কবিলার জন্যে দুআ করেন।[১]

---

১ *মুসলিম শরীফের সূত্রে মেশকাত* ৫২৫; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৩৬।

জমাদ এসেছিলেন নবীজির চিকিৎসা করতে অথচ তিনি নিজেই ছিলেন অসুস্থ। নিজের চিকিৎসা করিয়ে তৃপ্ত মনে ফিরে গেছেন আপন নিবাসে।

মুসলমানদের দুর্দশা

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন বছর পর্যন্ত নীরবে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। কারণ, এটাই ছিল তখন আল্লাহর নির্দেশ। তিন বছর পূর্ণ হওয়ার পর চতুর্থ বর্ষে নির্দেশ এল ঘোষণা করে ঈমানের দাওয়াত দিন। এর প্রেক্ষিতে মুশরিকদের পক্ষ থেকে আপতিত জুলুম অত্যাচারকে নীরবে সহ্য করুন। তিন বছরের এই ক্ষুদ্র পরিসরে যারা ইসলাম কবুল করেছেন, তারা সংখ্যায় যেমন ছিলেন অল্প, শক্তিতেও ছিলেন নেহাত দুর্বল। মুশরিকদের ভয়ে তারা ঘরেও ইবাদত করতে পারতেন না, ঘরের বাইরেও না। কারণ, ঘরে এক-দুইজন ইসলাম কবুল করলেও অবশিষ্টরা মুশরিক—বাপ-দাদার ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ঘরে ইবাদত করলেও বাইরে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। আর মুশরিকদের মোকাবেলা করার কোনো শক্তিও তাদের নেই। অবশ্য তখনো পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়নি। রুকু-সেজদাসহ দুই রাকাত পড়া হতো। নামাযের সময় হলে প্রত্যেকেই নিকটতম কোনো পাহাড়, টিলা কিংবা কোনো গোপন জায়গায় গিয়ে একাকী নামায পড়ে নিত। তারপরও ভয়ে অন্তর কাঁপতে থাকত—পাছে কোনো মুশরিক দেখে ফেলে।

হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা

এরই মধ্যে মক্কার কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তারপরও পুরো মক্কা একদিকে। চিন্তা বিশ্বাস আবেগ ও কথায় তারা একজোট। মুসলমানদের বিরোধিতায় একে অপরের বন্ধু। যখনই কারও সম্পর্কে জানতে পারত—লোকটি মুসলমান হয়েছে—সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর হামলে পড়ত। লোকটি তাদের সমাজে যত মর্যাদাশীলই হোক, ইসলাম কবুল করার সঙ্গে সঙ্গে তার সকল মান-মর্যাদা বাতাসে উড়ে যেত। ওই মুসলমানের পক্ষে কোনো মুশরিক একটি শব্দ পর্যন্ত বলত না। ধর্ম বদলের পর সে সকলের শত্রু—শুধুই শত্রু। তার প্রতি কোনো ধরনের ছাড় ভদ্রতা কিংবা সৌজন্য দেখানো তারা বৈধ মনে করত না।

সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন কুরাইশদের সম্ভ্রান্তদের একজন। ইসলাম কবুল করার পর কয়েকজন সঙ্গীসহ মক্কার একটি পাহাড়ি ঘাঁটিতে লুকিয়ে নামায পড়ছিলেন। ঘটনাক্রমে সে পথে যাচ্ছিল কয়েকজন মুশরিক। তারা মুসলমানদের নামায পড়তে দেখে ফেলে। দেখামাত্র দ্রুত ছুটে আসে। গালমন্দ পাড়তে থাকে। ধীরে ধীরে সেটা হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ায়। হযরত সাদ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। সামান্য দূরে একটি উটের লম্বা হাড় পড়া ছিল। তুলে এনে এক মুশরিকের মাথায় আঘাত করেন। মাথা ফেঁটে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় চিৎকার করতে করতে ছুটে পালায়।[১]

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, আক্রান্ত মুশরিকের নাম আবদুল্লাহ ইবনে খাতাল। মক্কা বিজয়ের সময় যাদের ক্ষমার অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়, তাদের মধ্যে এই হতভাগাও ছিল। এই সময় তাকে হত্যা করা হয়।

নবুওয়তের ঘোষণা

যেদিন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথায় নবুওয়তের মুকুট স্থাপিত হয়, সেদিন থেকেই তাঁর দায়িত্ববোধ ক্রমাগত বাড়তে থাকে। আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুওয়তের ঘোষণার আদেশ আসেনি বলে তিনি ব্যাপকভাবে কোনো মজলিস কিংবা সভায় তার ঘোষণা দেননি। হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পীড়াপীড়িতে একবার হেরেম শরীফে আগমন করেন। তারপর নীরবে বসে থাকেন। হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর নবুওয়ত ও রেসালাতের ঘোষণা দেন। পরিণতিতে সংঘটিত হয় এক হৃদয়বিদারক ঘটনা। প্রাণে বেঁচে যান আবু বকর। ক্ষুধার্ত রক্তপিপাসু বাঘ অসহায় শিকারের সঙ্গে যে আচরণ করে ক্ষুব্ধ কুরাইশ-সম্প্রদায় আবু বকরের সঙ্গে সেরকম আচরণই করে।

এই সময়টায় দাওয়াতের পদ্ধতি ছিল—যাদের প্রতি আস্থা ছিল পাহাড়-সমান, দাওয়াত কবুল না করলেও গোপন রহস্য ফাঁস করবে না, এমন বিশ্বাস ছিল—কেবল তাদেরকেই একান্তে ডেকে কথা বলতেন। এক

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৩৭; *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ১ : ২৭৫।

আল্লাহর ইবাদত এবং হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তকে মেনে নেওয়ার জন্যে দাওয়াত দিতেন। যারা ভাগ্যবান, তারা এই দাওয়াত কবুল করতেন। ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রিত হতেন। তিন বছর ধারাবাহিকভাবে এই নিয়মে দাওয়াত চলতে থাকে। এই সময়ে সীমিত পরিসরে কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। কারণ, পরিবেশ ছিল প্রচণ্ড প্রতিকূল এবং অগ্নিতপ্ত। কারও মনে কখনো ইসলাম গ্রহণের প্রেরণা বুদবুদ ছড়ালেও মুসলমানদের প্রতি কাফের-সম্প্রদায়ের অবিচার ও সীমালঙ্ঘন দেখে নিজে নিজেই চুপসে যেত। যারা ইসলাম কবুল করেছেন, তারাও সে কথা গোপনই রাখতেন। বেঈমান-সমাজ মক্কা জুড়ে এতটাই ভয়াবহ ত্রাস ছড়িয়ে রেখেছিল—এক মুসলমান অপর মুসলমানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করারও সাহস করত না। পাছে কেউ জেনে ফেলে—আমি মুসলমান! অবশ্য এই সময় ধীরে ধীরে তাদের সকলের অন্তরে এই চরম প্রতিকূল অবিচারী পরিবেশেও ঈমান বদ্ধমূল হয়ে উঠে। তাদের বিশ্বাসে বিন্দুমাত্র ফাটল ধরেনি। এই পরিস্থিতিতেই আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ আসে—

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ.

তোমাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তা ঘোষণা করে দাও। [হিজর : ৯৪]

নবুওয়তের বাণী ঘোষণা করো। জুলুম-অত্যাচার নীরবে সহ্য করো।

অতঃপর তাঁকে তাঁর খান্দানে খোলামেলা দাওয়াতের আদেশ করা হয়,

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ.

তোমার নিকটতম স্বজনদের সতর্ক করো।[১] [হিজর : ৯৬]

আবু লাহাবের দুষ্টুমি

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে দীনের দাওয়াত দিতে আদিষ্ট হলেন, তখন তার পন্থা ভাবতে

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ১ : ২৭৪; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৩৯।

থাকেন। খান্দানের লোকসংখ্যা তখন প্রায় চল্লিশ জন। তিনি তাদের জন্যে খানাপিনার আয়োজন করলেন। সকলেই উপস্থিত হওয়ার পর খাবার পরিবেশিত হলো। ভেবেছেন খানাপিনা শেষ হওয়ার পর তিনি তার মূল বক্তব্য উপস্থাপন করবেন। মজলিসে অন্যদের সঙ্গে নবীজির চাচা আবু লাহাবও ছিল। নবীজির কথা শুরু হওয়ার আগেই আবু লাহাব বলে উঠল—আমার মনে হচ্ছে কি, এই লোক তোমাদের বিবেক-বুদ্ধি হত্যা করেছে। তোমাদের হৃদয় ও চিন্তায় যাদু করেছে—অর্থাৎ এর কথা শোনার কোনো মানে হয় না। আবু লাহাবের কথা শুনতেই উপস্থিত সকলে বাতাসের গতি বুঝতে পারে। ফলে একসঙ্গে সকলে উঠে যায়।[১]

অবশ্য কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেছেন, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় তার খান্দানকে সমবেত করেন এবং তাদের উদ্দেশে বলেন—হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানগণ, আল্লাহর কসম, আজ পর্যন্ত পুরো আরবে আমার চেয়ে উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ বাণী নিয়ে কোনো ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেননি। আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি যে বাণী নিয়ে এসেছি, তাতে তোমাদের দুনিয়া-আখেরাত—উভয় জাহানের কল্যাণ রয়েছে।[২]

সাফা পর্বতের ডাক

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর খান্দানের লোকদেরকে ডেকে নবুওয়তের ঘোষণা দিলেন, তখন আবু লাহাবের ষড়যন্ত্রে মজলিস ভেঙে যায়। কিছু লোক এরপর বিষয়টি নিয়ে হাসি-তামাশা করে। তাঁর আমন্ত্রণ বাতাসে উড়িয়ে দেয়। তিনি যেমন আশা করেছিলেন, তেমন কোনো ফল হাতে আসেনি। এই পরিস্থিতিতে আরবদের সমকালীন প্রথা অনুযায়ী নবুওয়তের সাধারণ ঘোষণার উদ্দেশ্যে তিনি মক্কার সাফা পর্বতে উঠে দাঁড়ান এবং 'ইয়া সবাহাহ' বলে সকলকে আমন্ত্রণ জানান। এই সতর্কবাণী কানে পড়তেই মক্কার লোকজন সমবেত হতে থাকে। কোনো অসুবিধার কারণে যারা আসতে পারেনি, তারাও

---

১ ইবনুল আসীর, *আল-কামিল ফিত তারীখ*, ১ : ৪৮৭; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৩৯।

২ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৩৯।

তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে দেয়। সকলে যথানিয়মে সমবেত হওয়ার পর তিনি তাদের উদ্দেশে বলেন—

হে আবদুল মুত্তালিব, ফিহির এবং কাবের সন্তানগণ, আমি যদি তোমাদেরকে বলি—এই পাহাড়ের পেছনে একটি সশস্ত্রবাহিনী দাঁড়িয়ে আছে, তারা তোমাদের ওপর আক্রমণ করতে প্রস্তুত! তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে? সকলে এক সুরে বলল—হ্যাঁ, অবশ্যই বিশ্বাস করব। এরপর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—আমি তোমাদেরকে সেই আজাব সম্পর্কে সতর্ক করতে এসেছি, পরকালে তোমাদেরকে যার মুখোমুখি হতে হবে।[১]

আবু লাহাব ছিল কাফেলার একেবারে সম্মুখভাগে। এ কথা শুনতেই জমিন থেকে মুঠ ভরে কঙ্কর তুলে নবীজির দিকে ছুঁড়ে মারে এবং চেঁচিয়ে বলে—

تبا لك سائر اليوم اما دعوتنا الا لهذا.

নাশ হোক তোমার! এই জন্যে তুমি আমাদেরকে এখানে ডেকে এনেছ![২]

প্রিয় নবীজির এই চেষ্টাও আপাত ব্যর্থ হয়। অবশ্য গৃহীত এই দু'টি পদক্ষেপের ফলে পুরো মক্কায় নবীজির নবুওয়ত ও রেসালাতের কথা ছড়িয়ে পড়ে। সকলের কানেই গুঞ্জরিত হতে থাকে আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদের [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] দাবি—সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তা তাঁকে নবী করে পাঠিয়েছেন।

জ্বলে উঠে শত্রুতার অগ্নিশিখা

আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের ঘোষণা এবং মূর্তিদের বিষোদ্‌গার কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিল না মক্কার মুশরিক-সম্প্রদায়। ফলে মক্কার পুরো জনবসতি হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং

---

১ ইবনুল আসীর, *আল-কামিল ফিত তারীখ*, ১ : ৪৮৬; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৩৮।

২ ইবনুল আসীর, *আল-কামিল ফিত তারীখ*, ১ : ৪৮৬; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৩৮।

সাধারণ মুসলমানদের জন্যে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়। প্রত্যেক মুশরিক সাধ্যমতো বিরোধিতা চালিয়ে যেতে থাকে। মুসলমানদেরকে এবং হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উপহাস করা, বিদ্রূপ করা, বদনাম করা, আঘাত করা—এককথায় সম্ভব সকল পন্থায় কষ্ট দিতে থাকে। এই কষ্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা সকলেই ছিল স্বাধীন। এই বিরোধিতায় তারা সকলে একে অপরের বন্ধু সমকণ্ঠ এবং সমচিন্তক। শুধু আবু তালেব একমাত্র ব্যক্তি, যিনি হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে ছিলেন এক নিরাপদ আশ্রয়। তার কারণে সম্মিলিতভাবে নবীজির ওপর কোনো আক্রমণের সাহস কেউ করত না। তবে ভেতরে ভেতরে যে পরিকল্পনা ক্রমাগত দৃঢ় হয়ে উঠছিল তা হলো, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শারীরিক অস্তিত্বকেই নির্মূল করে দিতে হবে—এটাই ছিল তাদের আত্মিক তৃপ্তি ও স্বস্তির একমাত্র উপায়। প্রিয় নবীজির শত্রুতা ও বিরোধিতায় সবার আগে আবু জেহেলের পাশাপাশি ছিল তাঁর চাচা আবদুল উয্যা ইবনে আবদুল মুত্তালিব। মানুষ তাকে আবু লাহাব বলেই ডাকত। আবু লাহাবের পাশাপাশি তার স্ত্রী উম্মে জামিল আরওয়া বিনতে হারব ইবনে উমাইয়াও নবীজির বিরোধিতায় সদা স্বামীর পাশে থাকত। স্বামী-স্ত্রী সর্বদা হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চোখে চোখে রাখত। যেখানেই তিনি দাওয়াত ও তাবলীগের লক্ষ্যে গমন করতেন, দেখতেন এই আবু লাহাব ও তার স্ত্রী উপস্থিত। তারা সেখানে চেঁচামেচি বাধিয়ে দিত।

যুল মাজায বাজারে

বনুদ দুওয়াইলির এক ব্যক্তি রাবীআ ইবনে আব্বাদ। তিনি জাহেলি যুগের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন—একবার আমি যুলমাজায বাজারে দাঁড়িয়ে আছি। দেখলাম, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাজারের কিছু লোককে লক্ষ্য করে বলছেন—হে লোকসকল, আল্লাহর একত্ববাদকে মেনে নাও। মূর্তিপূজা ছেড়ে দাও। আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক কোরো না। তোমরা যদি এ কথা মানো, তা হলে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম হবে।

তিনি যখন কথা বলছিলেন, তাঁর সামনে অনেক মানুষ। সকলেই মনোযোগে তাঁর কথা শুনছে। এরই মধ্যে দেখলাম এই ভিড়ের কাছে দাঁড়িয়ে একজন ব্যক্তি। দেখতে সুদর্শন। উজ্জ্বল মুখ। মাথায় দীর্ঘ চুল। দুই পাশে দু'টি খোপা করে বাঁধা। ট্যারা চোখ। লোকটি চেঁচিয়ে বলতে লাগল—এর কথা তোমরা শুনো না—এ হচ্ছে ধর্মহারা। লোকটির চেঁচামেচিতে সকলের মনোযোগ ছিন্ন হয়ে পড়ল। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাজারের আরেক দিকে ছুটে গেলেন। লোকটিও তাঁর পিছু নিল। লক্ষ করলাম, তিনি যেখানেই যাচ্ছিলেন শ্রোতাদের মনোযোগ ধ্বংস করার জন্যে লোকটি সেখানেই ছুটে যাচ্ছে। দেখে আমি খুবই আশ্চর্য হলাম। লোকজনকে জিজ্ঞেস করলাম—এই লোকটি কে? তারা বলল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু লাহাব।[১]

চ্যালেঞ্জের মুখে আবু তালেব

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু তাঁর নবুওয়তের ঘোষণা সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন, খোলামেলা ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বেড়াচ্ছেন, মানুষকে ডাকছেন এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে, প্রাণহীন মূর্তিদের পূজা করতে নিষেধ করছেন ও সব মূর্তির নিন্দা করছেন, ফলে মক্কার মুশরিক-সম্প্রদায় প্রচণ্ড যন্ত্রণায় এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে পড়ে যায়। রাগে ক্রোধে তারা রক্তের ঢোঁক গিলতে থাকে। আবু তালেবের সাহায্য ও তত্ত্বাবধানের কারণে কঠোর কোনো পদক্ষেপও নিতে পারছিল না। যে কোনো কঠোর পদক্ষেপ মাথায় আসতেই ভাবতে হয় সম্ভ্রান্ত আবু তালেবের কথা। তাই তারা বারবার আবু তালেবের কাছে অভিযোগ নিয়ে হাজির হয়। কিন্তু এতে পরিস্থিতিতে কোনো লক্ষণীয় প্রভাব তারা খুঁজে পায় না। ভেবে-চিন্তে তারা কুরাইশদের একটি প্রতিনিধিদল আবু তালেবের কাছে পাঠায়। এই দলে ছিল—উতবা ইবনে রাবীআ, শায়বা ইবনে রাবীআ, আবুল বুখতারি ইবনে হিশাম, আসওয়াদ ইবনে আবদুল মুত্তালিব, ওলীদ ইবনে মুগীরা, আবু জেহেল ইবনে হিশাম, আমেল ইবনে ওয়াইল, নাবীহ ইবনে হাজ্জাজ, মুনাব্বিহ ইবনে হাজ্জাজ।

---

১ ইবনুল আসীর, *আল-কামিল ফিত তারীখ*, ১ : ৪৯৩; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৪১।

এই প্রতিনিধি দল আবু তালেবকে গিয়ে বলে—আপনার ভাতিজা আমাদের জীবন কোণঠাসা করে তুলেছে। আমাদের মজলিস এবং মসজিদে সোজা পৌঁছে যাচ্ছে। আমাদের ধর্মের নিন্দা করে করে আমাদের বিষিয়ে তুলেছে। আপনি তাকে নিষেধ করুন এবং বাধা দিন। অন্যথায় পরিণতি মন্দ হতে পারে। আমরা তখন যা করার, তা-ই করব।

কুরাইশ-নেতৃবৃন্দ আবু তালেবকে চ্যালেঞ্জের বাণী শুনিয়ে চলে যায়। আবু তালেব তখন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডেকে পাঠান। বলেন—আজ কুরাইশ-নেতৃবৃন্দ আমার কাছে এসেছিল। তারা বলে গেল—মুহাম্মাদকে [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলুন আমাদেরকে যেন কষ্ট না দেয়, অন্যথায় পরিণতি ভালো হবে না। দ্যাখো, তুমি তোমার প্রতিও সদয় হও এবং আমার প্রতিও। আমার ওপর কোনো অসাধ্য ভার চাপিয়ে দিয়ো না। তোমার সম্প্রদায় অপছন্দ করে, এমন কোনো কাজ কোরো না। তাদেরকেও মন্দ কিছু বোলো না। চাচার কথা শুনে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পারেন গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা ঘটে গেছে। হয়তো চাচা আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাচ্ছেন কিংবা আমাকে মুশরিকদের অনুগ্রহের হাতে তুলে দিতে চাচ্ছেন। আমার সঙ্গ নিশ্চয় তার জন্যে অসহনীয় বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইসব ভেবে তিনি চাচা আবু তালেবকে বললেন—চাচাজান, যদি আমার এক হাতে সূর্য, আরেক হাতে চাঁদও এনে রাখা হয় আর আমাকে এই দীনের প্রচার বন্ধ করে দিতে বলা হয়—তবুও আমি এর প্রচার ছাড়তে পারব না। হয়তো আল্লাহ তাআলা এই দীনকে বিজয় দান করবেন অথবা এর প্রচারে আমি আমার জীবন বিলিয়ে দেব।[১]

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই কথাগুলো বলছিলেন, তখন তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠে। বিন্দু বিন্দু অশ্রুকণায় বুক ভিজতে থাকে। এ কথা বলে তিনি বেরিয়ে যেতে উদ্যত হন। আবু তালেব এই হৃদয়বিদারক মর্মস্পর্শী দৃশ্য সহ্য করতে পারলেন না। বেদনায়

---

১ ইবনুল আসীর, *আল-কামিল ফিত তারীখ*, ১ :৪ ৮৯; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৪২।

তার অন্তরও কেঁপে উঠল। তিনি আবেগঘন কণ্ঠে ডাকলেন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। বললেন—ভাতিজা, শোনো, তুমি যা করছ, করে যাও। আমি কোনো দিন তোমাকে শত্রুদের দয়ার ওপর ছেড়ে দেব না। প্রয়োজনে জীবন দেব কিন্তু তোমার গায়ে আঁচড় লাগতে দেব না। পরে তিনি এই উষ্ণ আবেগে একখানা দীর্ঘকবিতা লিখেছিলেন—যার প্রথম চরণটি ছিল এই—

والله لن يصلوا اليك بجمعهم

حتي او سد في التراب دفينا

শপথ আল্লাহর, তারা সকলে মিলে স্পর্শ করতে পারবে না তোমাকে।
যত দিন না আমার শয্যা হবে সমাধি।

পরবর্তীতে আবু তালেব পূর্ণ দৃঢ়তায় প্রতিষ্ঠিত থাকেন তার এই শপথে। মরণ অবধি এক মুহূর্তের জন্যেও তার ছায়া সরিয়ে নেননি হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর থেকে। তিনি যত দিন বেঁচে ছিলেন, শত্রুপক্ষ বড় কিছু করারও সাহাস করেনি। অবশ্য তারা তাদের ইতর ও সভ্যতাবিবর্জিত আচার-আচরণ চালিয়ে গেছে নির্দ্বিধায়।

আবু জেহেলের মূর্খতা

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রুতায় আবু লাহাবের মতো আবু জেহেলও ছিল সর্বাগ্রে। সকাল-সন্ধ্যা ডুবে থাকত চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের পঙ্কিল-ভাবনায়। কীভাবে হাঙ্গামা বাধানো যায়, নবীজিকে কষ্ট দেওয়া যায় এই ছিল তার অনুক্ষণ চিন্তার বিষয়। একদিন সে তার বন্ধুদের মজলিসে বুক চিতিয়ে বলছিল—তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ কীভাবে মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আমাদের ধর্মের দুর্নাম করছে, আমাদের বাপ-দাদাদের বিষোদগার করছে, আমাদের যুবকদের বলছে পথহারা এবং নির্বোধ; সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয় হলো, আমাদের দেবতাদের পর্যন্ত নিন্দা করছে! তারপর সে চরম উত্তেজনায় ঘোষণা করে বসল—হে কুরাইশ-সম্প্রদায়, শোনো, কাল যদি মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আমাদের মসজিদে আসে আর আমার সামনে নামায পড়ে, তা

হলে আমি একটি পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে যাব। সেজদায় যাওয়ামাত্র পাথরের আঘাতে তার মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। তারপর বনু আব্দে মানাফ আমাকে যা করার করবে—আমি তার পরোয়া করি না।

রাত কেটে যায়। শুরু হয় পরের দিন। আবু জেহেল তার শপথে অবিচল। বড় একটি পাথর সংগ্রহ করে ঠিক সেখানে গিয়ে বসে পড়ে—সাধারণত হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার কাছাকাছি জায়গায় নামায পড়ে থাকেন। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভ্যাসমাফিক হেরেম শরীফে আগমন করেন। এসেই নামাযে দাঁড়িয়ে যান। এরই মধ্যে কুরাইশের লোকজনও প্রতিদিনের রুটিনমাফিক হেরেমের মসজিদে এসে আড্ডা জমিয়ে বসে। সকলের মাথায় দীর্ঘ কেশ। আধবিবস্ত্র উরু। প্রত্যেকেই নেতৃত্বের উষ্ণতায় পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছে। সকলের দৃষ্টি আবু জেহেলের দিকে। আবু জেহেলের গতকালের শপথের কথা ভাবছে সবাই। তারা চিন্তা করছে আবু জেহেল তার শপথে অবিচল আছে তো? সত্যিই কী সে মুহাম্মাদের [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মাথা চূর্ণ করে দিতে পারবে? তাদের মধ্যে প্রচণ্ড উত্তেজনা। সকলের দৃষ্টি অস্থির অপলক।

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ছেন। তিনি যখন সেজদায় গেলেন, আবু জেহেল তার জায়গা থেকে উঠে দাঁড়াল। পাথরখানা হাতে তুলে নিল। এগিয়ে গেল নবীজির দিকে। কিন্তু একি!—কাছে যেতেই সঙ্গে সঙ্গে উল্টো পায়ে পশ্চাদগমন। চেহারা তার রক্তশূন্য, ভীতসন্ত্রস্ত। পাথর যেন তার হাতে চেপে বসেছে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সরে এসে ছুড়ে মারে পাথর। উপবিষ্ট কুরাইশদল বসে বসে তামাশা দেখছিল। তারা ছুটে এল আবু জেহেলের কাছে। সন্ত্রস্ত কণ্ঠে শুধাল, আবুল হিকাম, কী হয়েছে তোমার? তোমার চেহারা রক্তশূন্য কেন? কী হয়েছে বলো? আবু জেহেল ভীত কণ্ঠে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—দ্যাখো, গত রাতে আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম আমি মুহাম্মাদের মাথা পাথরের আঘাতে চূর্ণ করে ফেলব। আজ সে উদ্দেশ্যেই এখানে এসেছিলাম। কিন্তু পাথর হাতে যখন তাঁর কাছে যাই, দেখি কি একটি যুবক উট দাঁড়িয়ে আছে! বিশাল তার মস্তক! খোদার কসম, জীবনে

এত বড় মস্তক কখনো দেখিনি। তার গর্দান দীর্ঘ! বিশ্বাস করো, এত দীর্ঘ গর্দান আজ পর্যন্ত কোনো উটের আমি দেখিনি। তার দাঁতগুলো চরম ভীতিকর! উটটি আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত ছিল। মনে হচ্ছিল, আমাকে মুখে পুরে দাঁতে পিষে ফেলবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে ফিরে আসি। পাথর মারার মতো কোনো হুঁশই আমার ছিল না।[১]

তাঁর প্রতি জঘন্য আচরণ

মুশরিকদের শত্রুতা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এই শত্রুতার টানে তারা নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর আচরণ করতেও কুণ্ঠিত হতো না। সমাজের পতিত অসভ্য বর্বর মানুষ যেসব কাজ করে থাকে, তারা অবলীলায় সেসব আচরণ করে বসত।

আবু জেহেল এবং তার দল মসজিদুল হারামকেই তাদের আড্ডাখানা বানিয়ে রেখেছিল। একবারের ঘটনা। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরেম শরীফে আগমন করেছেন। এসেই নামাযে দাঁড়িয়ে গেছেন। আবু জেহেল বলল, এবার মজা দেখাব। সকলেই বলল, সেটা আবার কী? বলল, অমুক ব্যক্তির উষ্ট্রী বাচ্চা দিয়েছে। তার ময়লা-আবর্জনা অমুক জায়গায় ফেলা হয়েছে। ওগুলো তুলে নিয়ে এসো। মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন সেজদায় যাবে, তখন তার পিঠের ওপর আবর্জনার পুরো স্তূপ চাপিয়ে দাও—যেন মাথা তুলতে না পারে। উকবা ইবনে আবু মুয়ীত বলল, আমি করব এ কাজ। যুবক কয়েকজন বন্ধুসহ ছুটে গেল উকবা। তুলে নিয়ে এল আবর্জনার স্তূপ। তারপর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিঠের ওপর চাপিয়ে দিলো। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবর্জনার স্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছেন। এ দিকে দলসুদ্ধ কুরাইশ-গোষ্ঠী অট্টহাসিতে কাঁপিয়ে তুলেছে হেরেমের চত্বর। আবর্জনা এতটাই ভারী ছিল—হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা উঠাতে পারছিলেন না। কোনোক্রমে বিষয়টি জানতে পারেন হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা। ছুটে আসেন তিনি।

---

১ *মুসলিম শরীফের সূত্রে মেশকাত* ৫২৪; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৪৩; *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ১ : ২১৮-২১৯

অনেক কষ্টে টেনে সরান আবর্জনার স্তূপ। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা তুলে বসেন। দুলালি হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা মহান পিতার প্রতি এই ঘৃণ্য নিকৃষ্ট আচরণে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। লক্ষ করেন কাছেই মক্কার কুরাইশ-নেতারা পিটপিট করে হাসছে। হাসতে হাসতে একে অপরের ওপর ঢলে পড়ছে। হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাদেরকে কড়া ভাষায় শাসিয়ে চলে যান। এই ক্ষুদ্র বালিকাকে কিছু বলবার মতো হিম্মতও তাদের হয়নি।[১]

অপমানিত করার ষড়যন্ত্র

মক্কার কুরাইশ-সম্প্রদায় সদা সুযোগ সন্ধান করে ফিরত—কীভাবে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অন্যের চোখে খাটো করা যায়।

আরশ অঞ্চলের এক ব্যক্তি। নাম কুহলাতুল আসগার। কোনো কাজে মক্কায় এসেছিল। মক্কায় এসে তার উটটি আবু জেহেলের কাছে বেচে দেয়। আবু জেহেল উট নিয়ে চলে যায়। এই প্রবাসী বেচারা যখনই উটের দাম চায়, সে নানা রকমের বাহানা করে কেটে পড়ে। অবশেষে এই আরশী তাগাদা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আবু জেহেল তাকে পয়সাও দিচ্ছে না, আবার উটও ফিরিয়ে দিচ্ছে না। কাবা শরীফের পাশেই মক্কার নেতৃবৃন্দ বসে আছে। তার সামান্য দূরে মসজিদে হারামে ইবাদতে মশগুল হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এমন সময় সেই আরশী মক্কার নেতাদের কাছে এসে বলে, আবুল হিকাম আমার উটের পয়সাটা দিচ্ছে না। আমি একজন বিদেশি মানুষ। আপনারা আমাকে সাহায্য করুন। আমার পয়সাটা আদায় করে দিন। নেতাদের মনে ছিল দুষ্টুমি। তারা হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়ে বলল—ওই যে মসজিদের কোণে এক ব্যক্তি বসে আছেন, তার কাছে যাও। তিনি আবুল হিকামের কাছ থেকে তোমার উটের দামটা আদায় করে দিতে পারবেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল—আবু জেহেল নবীজির সবচেয়ে বড় দুশমন। তাকে দেখতেই আবু জেহেল তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবে। মুখে যা আসে, তা-ই

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৪৪।

বলবে। ফলে এই বিদেশির মন থেকে নবীজির ব্যক্তিত্ব উড়ে যাবে। তা ছাড়া হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও নিজে নিজে অপমানিত ও লাঞ্ছিত বোধ করবেন। বেচারা বিদেশির তো আর ওসব ষড়যন্ত্রের কথা জানা ছিল না। সে সোজা হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চলে যায়। তার দুঃখের কাহিনী তুলে ধরে। তার কথা শুনে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসন ছেড়ে ওঠেন। বিদেশিকে সঙ্গে নিয়ে আবু জেহেলের বাড়ির দিকে হাঁটা দেন। কাবার ছায়ায় উপবিষ্ট কুরাইশ-নেতারা তো ভীষণ খুশি। তির জায়গামতো পড়েছে। এখন দেখা যাবে মজা। তারা তাদের একজনকে পেছনে পাঠিয়ে দেয়—যেন পুরো কাহিনী সবিস্তারে এসে শোনাতে পারে।

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই প্রবাসীকে নিয়ে আবু জেহেলের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ান। দরজায় নক করেন। আবু জেহেল ভেতর থেকে জানতে চায়—কে? হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের নাম বলেন। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে আবু জেহেল। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখোমুখি হতেই তার চেহারা রক্তশূন্য। প্রবল দ্রুততায় তার শ্বাস উঠানামা করছে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর উটের দামটা এখনই পরিশোধ করে দাও। এর হক পরিশোধ না করা পর্যন্ত আমি এখানেই আছি। আবু জেহেল ভীত কম্পিত কণ্ঠে বলল—আপনি এখানেই অপেক্ষা করুন। এখনই আসছি। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে চলে গেল। উটের পুরো মূল্যটা প্রবাসীর হাতে এনে রেখে দিলো। শান্ত মনে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে এলেন। এদিকে কুরাইশ-নেতৃবৃন্দ তামাশা দেখার অপেক্ষায় অধীর। কিন্ত তারা অবাক। আবু জেহেলের গালাগাল শোনা যাচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে না কোনো হৈ চৈ। অবশেষে তাদের প্রেরিত প্রতিনিধি ফিরে এসে বলল—মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] দরজার কড়া নাড়াতেই আবুল হিকাম বেরিয়ে এসেছেন। তারপর ঘরে গিয়ে উটের পুরো মূল্যটা এনে ওই বিদেশির হাতে তুলে দিয়েছেন।[১]

---

১ ইবনে সায়্যিদুন নাস, *উয়ুনুল আসার*, ১ : ২০৪-২০৫; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৪৫।

কিছুক্ষণ পর সেখানে আবু জেহেলও ছুটে আসে। তখন সকলে অধীর কণ্ঠে প্রশ্ন করে—আবুল হিকাম, একি কাণ্ড! আবু জেহেল তখন বলে, আর বোলো না, আমি দরজা খুলে বের হতেই তাঁকে যখন দেখি, তখন আমাকে এমন ভয়াবহ ভীতি পেয়ে বসে—আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। মনে করলাম, মূল্য পরিশোধ করে দেওয়াটাই আমার জন্যে নিরাপদ।

জঘন্যতার ঘৃণ্য প্রকাশ

মুশরিকদের আক্ষেপের অন্ত নেই—আমাদের এই কৌশলও ব্যর্থ হলো। আমরা তাকে অপমান করতে পারলাম না। কিন্তু জঘন্যতা প্রকাশের সুযোগ তো প্রতিদিনই আসে। একদিন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভ্যাসমাফিক মসজিদুল হারামে এসে ইবাদতে মগ্ন হয়েছেন। এই সময় সেখানে এসে উপস্থিত হয় উকবা ইবনে আবু মুয়ীত। প্রিয় নবীজির প্রথম সারির শত্রুদের তৃতীয় ব্যক্তি সে। সে লক্ষ করল, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ছেন। ক্ষোভে তার মাথায় রক্ত উঠে যায়। তার গায়ের চাদরখানা খুলে তার এক প্রান্তে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গ্রীবা মোবারক পেঁচিয়ে সজোরে টানতে থাকে। এদিকে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। ঘটনাক্রমে সেখানে এসে হাজির হন হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি এক ঝাপটায় উকবার হাত থেকে চাদর ছিনিয়ে নেন। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কণ্ঠ তখন মুক্ত হয়। এদিকে এই দৃশ্য দেখে দূরে বসে মক্কার মুশরিকরা অট্টহাসিতে চারপাশ কাঁপিয়ে তোলে। হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নীরবে নবীজিকে সঙ্গে করে সেখান থেকে সরে পড়লেন।[১]

মুশরিকদের ভয়াবহ পরিকল্পনা

মক্কার মুশরিক-সম্প্রদায় অবিরাম হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে দুর্ব্যবহার এবং অশোভন আচরণ করে যাচ্ছিল। রাগে ক্রোধে বরাবর তারা ঠোঁট কাটতে থাকত। তারা নবীজির অস্তিত্বকেই

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৪৬।

বরদাশত করতে পারছিল না। তাদের মূর্তিদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত তার কণ্ঠকে চিরতরে বন্ধ করে দেওয়ার জন্যে তাদের সংগ্রামের অন্ত ছিল না। কিন্তু হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার মতো সাধ্য তাদের ছিল না। আবদুল মুত্তালিবের বংশ যেমন সম্মানিত, তেমন প্রভাবশালী। পুরো কুরাইশের গর্দান তাদের সম্মান ও শ্রদ্ধায় ছিল অবনমিত। তা ছাড়া কুরাইশ ছিল এই খান্দানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। তারা যদি ভুল করে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করে বসে, তা হলে চুক্তিবদ্ধ গোত্রগুলোর প্রতিশোধের হাত থেকে রক্ষা পাবে না—এটা ছিল প্রাচীন আরবের মানিত বিধান। তাই এমন কথা ভাবলেও তার জন্যে কদম উঠাতে পারত না। শুধু রাগে গজগজ করত। দাঁতের ওপর দাঁত পিষত।

সর্বশেষ কৌশল হিসেবে তারা ভাবল, আবু তালেবকে চাপ দিতে হবে। যে কোনো ভাবেই হোক তার তত্ত্বাবধানের ছায়া সরিয়ে ফেলতে হবে। আবু তালেব যদি তার তত্ত্বাবধান ছেড়ে দেন, তখন আমরা যা খুশি করতে পারব। এই উদ্দেশ্যে মুশরিক কুরাইশদের নেতৃবৃন্দ প্রতিনিধিদল কয়েকবার করে আবু তালেবের সঙ্গে দেখা করেছে। বারবার চাপ প্রয়োগ করেছে। কিন্তু আবু তালেবের ছায়া সরাতে পারেনি। ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে। একবার আবু তালেবের কাছে যাওয়ার জন্যে একটি প্রতিনিধিদল গঠিত হয়। সেই দলে কুরাইশদের যে সকল নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—উতবা ইবনে রাবীআ, শায়বা ইবনে রাবীআ, আবু সুফিয়ান, সখর ইবনে হারব, আবুল বুখতারী আমের ইবনে হিশাম, আসওয়াদ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে আসআদ, আবু জেহেল আমর ইবনে হিশাম, ওলীদ ইবনে মুগীরা, নাবীহ ইবনে হাজ্জাজ ইবনে আমের, মুনাব্বিহ ইবনে হাজ্জাজ ইবনে আমের, আমের ইবনে ওয়াইল সাহমী।

এরা সকলে গিয়ে আবু তালেবের কাছে অভিযোগ করে, আপনার ভাতিজা আমাদের মাবুদদের মন্দ বলে। আমাদের ধর্মের সমালোচনা করে। আমাদের যুবকদের পথহারা করে এবং বোকা বানায়। আমাদের বাপ-দাদাদের দোজখি বলে। হয়তো আপনি একে এসব থেকে ফিরিয়ে রাখুন, নইলে আপনি মাঝখান থেকে সরে পড়ুন। তখন কী করতে হয়, আমরাই

বুঝাব। আপনি যখন আমাদের ধর্মের, আমরা একই ধর্মের মানুষ, তখন অবশ্যই আপনাকে এটা করতেই হবে। আবু তালেব বিনম্র ভাষায় খুবই কৌশলে কথাবার্তার ভেতর দিয়ে বিষয়টি কাটিয়ে যান। ফলে সিদ্ধান্তমূলক কোনো কথা ছাড়াই তারা ফিরে আসে।[১]

এই দিনের ব্যর্থতার পর যুবকরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। তাদের মধ্যে ক্ষোভের লাভা ছড়াতে থাকে। তারা নেতাদের বাধ্য করে—আপনারা আবার আবু তালেবের কাছে যান। পরিষ্কার কোনো সিদ্ধান্ত করে আসুন। সম্ভ্রান্ত কুরাইশদের একটি প্রতিনিধিদল পরের দিন আবার আবু তালেবের সঙ্গে মিলিত হয়। তারা খুবই উত্তপ্ত ভাষায় কথাবার্তা বলে। তাদের বক্তব্য হলো—আপনার ভাতিজার কাজ-কর্ম এখন আমাদের বরদাশতের বাইরে। আপনি যদি তাকে ফেরাতে না পারেন, তা হলে আমাদের সামনেও বাধা হয়ে দাঁড়াবেন না। হয় সে বেঁচে থাকবে, নয় আমরা। মক্কার মাটিতে একই সঙ্গে উভয় দল বেঁচে থাকতে পারে না। তারা আবু তালেবকে এভাবে শাসিয়ে চলে যায়।

ভয়াবহ চ্যালেঞ্জ

কুরাইশ-প্রতিনিধিদল বারবার ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাওয়ার পর একটি ভয়াবহ সিদ্ধান্ত নিল। কুরাইশ-সম্প্রদায় উমারা ইবনে ওলীদ ইবনে মুগীরাকে সঙ্গে নিয়ে আবু তালেবের কাছে গেল। তাকে বলল—এই যুবক—উমারা ইবনে ওলীদ কুরাইশদেরই একজন সন্তান। একে আপনি আপনার কাছে রাখুন। রক্তমূল্য হিসেবে রাখুন কিংবা আপনার পুত্র করে রাখুন—সেটা আপনার ইচ্ছা। আর এর বিপরীতে আপনার ভাতিজাকে আমাদের হাতে তুলে দিন। আপনার ভাতিজা আমাদেরকে অসামান্য কষ্ট দিয়েছে। আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। এখন আমরা একটা কিছু করার সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছি। আপনি স্পষ্টভাবে জেনে রাখুন—আপনার ভাতিজা আমাদের সমাজকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। আমাদের শক্তিকে বিচূর্ণ করেছে। আমরা তাকে হত্যা করেই শ্বাস নেব—এটাই

---

১ ইবনুল আসীর, *আল-কামেল ফিত তারীখ*, ১ : ৪৮৮।

আমাদের শেষ এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। আমরা আপনার ভাতিজার রক্তমূল্য হিসেবে আপনার হাতে এই যুবককে তুলে দিয়েছি। এখন আর আপনার এই বিষয়ে নাক গলাবার অধিকার নেই।

আবু তালেব নিজেও মক্কার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং সম্মানিত খান্দানের কর্ণধার। তার আত্মমর্যাদায় ভীষণভাবে ধাক্কা লাগে। তিনিও বলে ওঠেন—খোদার কসম, তোমরা খুবই ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছ। তোমরা আমার সঙ্গে ব্যবসা করতে চাও! আমাকে বোকা ভেবেছ! তোমরা তোমাদের এক সন্তানকে আমার হাতে তুলে দিচ্ছ—আমি তাকে খেতে পড়তে দেব, সুখে শান্তিতে বাঁচিয়ে রাখব, আর এর বিপরীতে আমার ভাতিজাকে হত্যা করবে। মহান প্রভুর শপথ, এটা কোনো দিন সম্ভব না।

আবু তালেবের এই কঠোর মনোভাব ও তপ্ত কথাবার্তায় মুতঈম ইবনে আদীও কিছুটা গরম হয়ে উঠে। সেও বলে উঠে—আবু তালেব, আপনার সঙ্গে আপনার সম্প্রদায় ইনসাফ করেছে। তারা আপনার প্রতি আন্তরিক বলেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে—যে ভাতিজা রাত-দিন আপনাকে মনোকষ্টে ডুবিয়ে রাখছে—আপনি যেন মানসিক এই অস্থিরতা থেকে রেহাই পেতে পারেন। আপনার উচিত এই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া।

এবার আবু তালেব মুতঈম ইবনে আদীকে বললেন—মুতঈম, এ কথা কেন বলছ? তোমরা আমার সঙ্গে ইনসাফ করেছ। বরং বলো—তোমরা আমাকে ছেড়ে দিয়েছ। আমার বিরুদ্ধে তোমরা পুরো সম্প্রদায়কে ক্ষেপিয়ে তোলার ষড়যন্ত্র করে এসেছ। যাও, তোমাদের যা খুশি করো। আর আমিও দেখে নেব। এটাই আমার শেষ ফয়সালা।[১]

ব্যর্থতার পর

অবশেষে মুশরিকদের এই ষড়যন্ত্রও ব্যর্থ হলো। পুরো বিষয়টি তখন আরও জটিল হয়ে উঠল। মক্কার পরিবেশে উষ্ণতা ও উত্তাপ লেলিহান ছড়াতে লাগল। পুরো মক্কা গৃহযুদ্ধের তীরে এসে দাঁড়াল। যেখানেই কয়েকজন মিলিত হচ্ছে, সেখানেই আলোচনা। প্রতিটি মজলিস এবং

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৪৭-৪৮।

প্রতিটি ঘরে একই কথা—এখন আমাদেরকে চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। আবু তালেবও কুরাইশদের এই অপতৎপরতা সম্পর্কে একেবারে বেখবর ছিলেন না। তাই তিনি বনু হাশেম এবং বনু আবদুল মুত্তালিবের সকলকে তার ঘরে ডেকে পাঠলেন। মুসলমান অমুসলমান সকলকেই ডাকলেন। সকলকে সঙ্গে নিয়ে তিনি একটি যৌথ মিটিং করলেন। আবু তালেব তার বংশের সকলের মুরুব্বি। তিনি কুরাইশদের ষড়যন্ত্র এবং প্রস্তুতি সম্পর্কে সকলকে অবহিত করলেন। তারপর বললেন—কুরাইশ ভয়াবহ কোনো সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে। সুতরাং তোমরা তোমাদের মতামত দাও। পরিষ্কার করে বলো—তোমরা আমাদের সঙ্গে থাকবে কি থাকবে না? আবু লাহাব কৌশলে কেটে পড়ে। বনু হাশেম এবং বনু আবদুল মুত্তালিবের অবশিষ্ট সকলে সম্মিলিতভাবে জানিয়ে দেয়—আমরা যে কোনো পরিস্থিতিতে আপনার সঙ্গে আছি। আমরা কখনো কোনো ক্ষেত্রেই পিছু হটব না। যদি বাঁচি একসঙ্গে বাঁচব, যদি মরি একসঙ্গে মরব। আমরা সকলে সম্মিলিতভাবে যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্যে প্রস্তুত আছি।[১]

সম্মিলিত এই সিদ্ধান্ত আবু তালেবের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে। তিনি ভেতরে সাহস অনুভব করেন। তারপর পরিস্থিতির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে সতর্কতার সঙ্গে মেপে মেপে পা ফেলতে থাকেন।

মানসিক নির্যাতন

কোনো একজন পরিশীলিত শিক্ষিত এবং ভদ্র লোককে যদি কিছু মূর্খ ও গোঁয়ার প্রকৃতির লোক ঘিরে ফেলে, অতঃপর তাকে ঘিরে রসিকতা করতে থাকে, তাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে থাকে, তার সঙ্গে অমার্জিত আচরণ করতে থাকে আর তিনি নিঃসঙ্গ হওয়ার কারণে তাদের কোনো সমুচিত জবাব দিতে না পারেন—তা হলে তার কতটা মানসিক কষ্ট হয়, তিনি কতটা যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে থাকেন, তা সহজেই অনুমেয়। মক্কার মুশরিকদের আচার-আচরণ হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৪৯।

অনেকটা এমনই ছিল। তারা যখনই কোথাও পাঁচ-দশজন সমবেত হতো, তখনই হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানসিকভাবে নির্যাতন করতে শুরু করত। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্তরে কঠিন আঘাত পেতেন। সেই আঘাত ও নির্যাতন বরদাশত করা তাঁর জন্যে খুবই কঠিন হয়ে পড়ত। তারপরও তিনি নীরবে নিঃশব্দে তাদের এইসব নির্যাতন হজম করতেন। তাদের অশুভ অমার্জিত আচার-আচরণ মেনে নিতেন। এককথায় হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তাকে তারা উপহাসের পাত্র বানিয়ে রেখেছিল।

তাদের মূর্খতা ও নোংরামি কতটা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, তার একটা উপমা দিই। একদিনের ঘটনা। সবে সন্ধ্যা হয়েছে। সূর্য ডোবার পর কুরাইশের আট-দশজন ব্যক্তি কাবা শরীফের পাশেই বসে আছে। এরই মধ্যে একজনের মনে একটা কুমতলব মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সে প্রস্তাব করল—আমাদের একজনকে পাঠিয়ে মুহাম্মাদকে [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এখানে কি আনা যায় না? সে গিয়ে বলবে—কুরাইশের কয়েকজন সম্মানিত ব্যক্তি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছেন। তারপর মজা করা যাবে।

তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল। সোজা গিয়ে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, কাবা শরীফের পেছনে কয়েকজন সম্মানিত ব্যক্তি বসা আছেন। তারা আপনার অপেক্ষায় আছেন। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ভেবে সঙ্গে সঙ্গে উঠে যান—হয়তো তাদের পাথরঅন্তর গলতে শুরু করেছে। যদি আন্তরিকভাবে আলোচনা করি হয়তোবা তাদের কেউ ইসলাম কবুল করবে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগত ব্যক্তির সঙ্গে সোজা কুরাইশদের মজলিসে গিয়ে হাজির হলেন। তিনি সেখানে উপস্থিত হওয়ার পর তাদের একজন এই বলে কথা শুরু করে—আচ্ছা, আপনার পূর্বে কি আরবদের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছেন, যিনি এতটা বিরোধ সৃষ্টি করেছেন? আপনি বরাবর আমাদের বাপ-দাদা এবং আমাদের মাবুদদের সমালোচনা করে বেড়াচ্ছেন। আমাদের যুবকদেরকে পথহারা করছেন। বেদীন করছেন। আপনি তো আমাদের

সমাজকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়েছেন। এমন কোন মন্দ কাজটা আছে, যা আপনি করেননি? তারপরও এত দিন আমরা বরদাশত করেছি। আজ আমরা আপনাকে একটি কথা বলছি। আপনি খুব ভেবে-চিন্তে উত্তর দেবেন। আপনার যদি সম্পদের লোভ থাকে, তা হলে আপনার ভালো করেই জানা আছে, আমরা এই মক্কার সম্পদশালী মানুষ। আপনার যতটুকু সম্পদ প্রয়োজন আমরা একত্রিত করে আপনার পায়ের কাছে রেখে দেব। তারপরও আপনি আর আমাদের মাবুদদের বিরুদ্ধে কিছু বলবেন না। আর আপনি যদি বলেন, সম্পদ নয়, আমি চাই সম্মান ও নেতৃত্ব—তা হলে আমরা সকলে সম্মিলিতভাবে আপনাকে নেতা হিসেবে বরণ করে নেব। আর যদি আপনার ওপর কোনো জিন ভূত আছর করে থাকে—যারা আপনাকে পেরেশান করছে এবং আপনাকে এই জাতীয় কাজ করতে বাধ্য করছে, তা হলে বলুন—আমরা যত পয়সা খরচ করতে হয় করব, তবুও আপনার চিকিৎসা করাব। আমাদের এই প্রস্তাবগুলোর মধ্যে আপনার যেটা পছন্দ হয় বলুন। আমরা মেনে নিতে প্রস্তুত আছি।

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাবেননি, তারা এই জাতীয় কথা বলবার জন্যে তাঁকে ডেকেছে। তিনি যা ভেবেছিলেন, তার পুরো বিপরীত পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে অনেকটা বিব্রত। তারপর বললেন—সম্পদের প্রতি আমার বিশেষ কোনো আগ্রহ নেই। আমার অন্তরে শাসক কিংবা নেতা হওয়ারও কোনো স্বপ্ন নেই। আর আমাকে কোনো জিন ভূতও পায়নি। আল্লাহ তাআলা আমাকে কিতাব দিয়ে নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন। আমাকে আদেশ করেছেন—আমি যেন উত্তম কর্মশীলদেরকে বেহেশতের সুসংবাদ দিই আর অন্যায় কর্মশীলদেরকে দোজখ সম্পর্কে সতর্ক করি। আমি তো কেবল আল্লাহর হুকুম পালন করে যাচ্ছি। আমি তোমাদের শত্রু নই, কল্যাণকামী। তোমরা যদি আমার কথা মেনে নাও, তা হলে দুনিয়া-আখেরাতে পুরস্কৃত হবে। আর যদি অস্বীকার করো, বিরোধিতা করো, তা হলে আমি আল্লাহর জন্যে তোমাদের সকল নির্যাতন বরদাশত করব। আল্লাহ তাআলাই আমার এবং তোমাদের মাঝে ফয়সালা করে দেবেন।

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ধীরচিত্ত যথার্থ উত্তর শোনার পর—তারা যদি অন্তরে সামান্যতম ভদ্রতাও লালন করত—চুপ হয়ে যেত। কিন্তু তাদের মন ও অন্তর ছিল ক্লেদপূর্ণ। তাদের একজন বলে উঠল—আপনার ভালো করেই জানা আছে, আমরা সম্পদশালী এবং ধনী মানুষ। আমাদের ধন-সম্পদের কোনো অভাব নেই। তবে আমাদের এই মক্কাকে চারদিক থেকে পাহাড় ঘিরে রেখেছে। ফলে আমরা এক আবদ্ধ পরিবেশে পড়ে আছি। আপনি আপনার খোদার কাছে দুআ করুন—তিনি যখন আপনাকে নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন—তখন এই পাহাড়গুলো যেন এখান থেকে তুলে অন্য কোথাও নিয়ে রেখে দেন। আমাদের শহরটা তখন বিস্তৃত হবে। আমরা এখানে একটা খোলা ময়দান পাব।

আরেকজন বলে উঠল—যখন এখানে একটা বিশাল ময়দান হয়ে যাবে, তখন এখানে একটা নদীও প্রবাহিত করে দিন। সিরিয়া ও ইরাকের মতো পানি সংগ্রহ করাটা আমাদের জন্যে সহজ হবে। আরেকজন বলে উঠল—মৃত্যুর পর যখন প্রতিটি মানুষই পুনরায় জীবিত হবে বলছেন, তখন আমাদের বাপ-দাদাদেরকে জীবিত করে দেখান। কারণ তারা খুবই ভদ্র এবং সত্যবাদী মানুষ ছিল। আমরা তাদেরই সন্তান। বিশেষ করে আমাদের উচ্চতর পূর্বপুরুষ কুসাই ইবনে কিলাবকে অবশ্যই পুনরুজ্জীবিত করুন। আমরা তার কাছেই জানতে চাইব—আপনি সত্যবাদী নাকি মিথ্যাবাদী? তিনি যেটা বলবেন, আমরা সেটা মেনে নেব। আমরা আপনাকে যে কয়টা প্রস্তাব করলাম, আপনি আপনার খোদাকে বলে সেগুলো করে দেখান। তারপর আমরা আপনাকে রাসূল হিসেবে মেনে নেব এবং যথার্থ সম্মান করব।

তাদের এইসব ফালতু কথাবার্তার পিঠে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু এইটুকু বললেন—এসব কাজের জন্যে আমাকে পাঠানো হয়নি। তাদের বোকামিপ্রসূত কথাবার্তার ধারাবাহিকতা অবশ্য বন্ধ হলো না। আরেক ব্যক্তি বলে উঠল—আচ্ছা, আপনি আপনার খোদাকে বলুন একজন ফেরেশতা পাঠিয়ে দিতে। ফেরেশতা এসে বলুক—আপনি আল্লাহর রাসূল এবং ফেরেশতা এসে আপনার জন্যে বাগ-বাগিচা তৈরি করে দিক। ধনভাণ্ডার প্রস্তুত করে দিক। সোনা-রুপার মহল বানিয়ে দিক।

তারপর নিশ্চিন্ত মনে আপনি আপনার নবুওয়তের কাজ চালিয়ে যেতে থাকুন। আমরা তো লক্ষ করছি—আপনাকে আপনার খোদা এত বড় দায়িত্ব দিয়েছেন, অথচ আপনাকেই আবার সামান্য রুটি-রুজির জন্যে বাজারে ঘুরতে হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হয়। আমাদের মতোই লেনদেন করতে হয়। তা হলে আমাদের আর আপনার মধ্যে কী পার্থক্য রইল? আরেকজন বলল, আপনি বলছেন—আল্লাহ তাআলাই সবকিছু করেন। সৎকর্মশীলদের তিনি বেহেশত দান করবেন। আর মন্দলোকদেরকে দেবেন দোজখ। তা হলে আপনি আপনার প্রভুকে বলুন—তিনি যেন আকাশটা ভেঙে আমাদের মাথার ওপর ছেড়ে দেন। আমরা আপনার খোদার আজাব দেখতে চাই। আমরা আপনার ধর্ম কবুল করতে চাই না। আমরা দেখতে চাই—কোন পাহাড়টি এনে আমাদের মাথার ওপর ভাঙছেন। আরেকজন বলে উঠল, আপনি বলছেন—আল্লাহ তাআলা সবকিছু জানেন। তা হলে তাঁর এ কথাও জানবার কথা, আমরা আপনাকে এখানে মজা করবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছি, মুসলমান হওয়ার জন্যে নয়। তা হলে তিনি কেন আপনাকে এ কথা বলে দেননি—ওখানে যেয়ো না, ওখানে যাওয়াটা অর্থহীন, অথচ আমাদের ডাক পেতেই আপনি ছুটে এসেছেন।

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখলেন, তাদের অর্থহীন প্রলাপ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে, তখন তিনি সেখান থেকে উঠে চলে এলেন। মজলিসে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুপাতো ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া ইবনে মুগীরাও ছিল। সেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে উঠে এল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে বলতে লাগল—তারা তো আপনাকে অনেক বড় বড় প্রস্তাব করেছে। আপনি তাদের কোনো প্রস্তাবই কবুল করলেন না। তা ছাড়া আপনার সত্যতা জানার জন্যে বেশ কিছু বিষয় তারা দাবি করেছে। আপনি কোনোটারই উত্তর দেননি। তারা বলেছে, আপনি আপনার প্রভুকে বলে আজাব ডেকে আনতে। আপনি সেটাও করেননি। খোদার কসম, আমরা কোনো দিনই ঈমান আনব না।[১]

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৫০-৫১।

বিপদের পাহাড় ভেঙে পড়ল

এবার মুশরিক-সম্প্রদায় তাদের কৌশল বদলাল। তারা সিদ্ধান্ত নিল, এরই মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, শক্তি খাটিয়ে হলেও তাদেরকে বাপ-দাদার ধর্মে ফিরিয়ে আনতে হবে। উদ্দেশ্য, ইসলাম প্রচার যেন থেমে যায়। আরবদের সমাজ-ব্যবস্থা ছিল কবিলাকেন্দ্রিক। তাদের এই সমাজব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল কঠোরতা। কোনো ব্যক্তি তার কবিলার মর্জির বাইরে একটি শব্দ উচ্চারণ করতে পারত না। স্বীয় কবিলাকে উপেক্ষা করে এক পা চলতে পারত না। কেউ যদি এমন ভুল পথে পা ফেলত, সঙ্গে সঙ্গে তার জীবন সংকীর্ণ হয়ে পড়ত। চারদিক থেকে বিপদ নেমে আসত। তার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক সামাজিক বয়কট হতো। মানুষ তার সঙ্গে মেলামেশা ছেড়ে দিত। বিয়ে-শাদি বিপদাপদ এবং সুখ-দুঃখে তার পাশে কেউ দাঁড়াত না। এককথায় মৃত্যুর আগেই যেন সে মৃত হয়ে যেত। এটাই ছিল কবিলাকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার বুনিয়াদি রূপ।

আবু তালেবের কাছে মুশরিকদের প্রতিনিধিদল বারবার গিয়েছে। তাদের মতলব হাসিল হয়নি। তাদের এই অবিরাম ব্যর্থতা পরিবেশকে তাপিয়ে তুলেছে। মুশরিক-সম্প্রদায় ভেবেছে—এই পরিবেশটাকে আমাদের স্বার্থে ব্যবহার করা উচিত। এই পরিকল্পনা থেকেই তারা মক্কার চারপাশে বসবাসকারী সকল কবিলার কর্ণধারদের ডেকে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেয়। চিন্তা করে, তাদের মন-মানসিকতাও আমাদের অনুকূল করে গড়ে তুলবার প্রয়োজন আছে। পরামর্শ করে তারা কবিলার নেতাদেরকে ডেকে এনে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বোঝাবার চেষ্টা করে—মক্কার এক ব্যক্তি আমাদের পিতৃধর্মের বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করেছে। এই ব্যক্তি আমাদের মাবুদদের সমালোচনা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। নতুন ধর্মের প্রতি দাওয়াত দিচ্ছে। এরই মধ্যে কিছু লোক তার ধর্ম গ্রহণ করে নিয়েছে। এই প্রেক্ষিতে মক্কার নেতৃবৃন্দ তাদের বাপ-দাদার ধর্ম সংরক্ষণকল্পে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, কোনো কবিলার কেউ যদি মুসলমান হয়ে যায়, তা হলে সেই কবিলার দায়িত্ব হলো—যে কোনো মূল্যে তাকে ইসলামবর্জনে বাধ্য করা। এর জন্যে যতটা কঠোর হওয়া প্রয়োজন কঠোর হবে, যতটা শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন শাস্তি দেবে। বাধ্য করবে তারা যেন লাত ও উয্যাকে মেনে নেয়। পরিপূর্ণরূপে ইসলাম থেকে মুখ ফিরয়ে নেয়।

এককথায় মক্কার মুশরিক-সম্প্রদায় বাতাসে যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দেয়। চারদিকে দুর্বল মুসলমানদের ওপর নেমে আসে নির্যাতনের ভয়াবহ কেয়ামত। কারও সম্পর্কে কোনোভাবে যদি জানতে পারত—এই লোক ইসলাম কবুল করেছে—সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাতকড়া পরিয়ে দেওয়া হতো। তার পা শেকল দিয়ে বেঁধে দেওয়া হতো। ঠিক দুপুরবেলা যখন সূর্য মাথার ওপর এসে দাঁড়াত, আরবের তপ্ত লু হাওয়া যখন মরুভূমির জানোয়ারদের জন্যেও অসহ্য হয়ে উঠত, পাথরের পিঠ তাওয়ার মতো আগুন হয়ে উঠত, তখন অসহায় আশ্রয়হীন মুসলমানদের এই তাপিত পাথরের ওপর শুইয়ে দেওয়া হতো। তাদের বেত্রাঘাত করা হতো। লোহা গরম করে পিঠে এবং বুকে ছ্যাঁকা দেওয়া হতো। হাতে এবং গলায় রশি বেঁধে শিশু-কিশোরদের হাতে তুলে দেওয়া হতো। তারা রশি ধরে পাথরের ওপর তাদেরকে হেঁচড়াতে থাকত। এই দৃশ্য দেখে অন্যেরা উল্লাসে ফেটে পড়ত।

অসহায় মজলুমদের এই বেদনাঘন দৃশ্য দেখে পাথরস্বভাব মানুষও বেদনায় গলে যেত। কিন্তু মুশরিকদের অন্তরে সামান্য দয়া-মায়ার উদ্রেক হতো না। মানবতার কোনো বাতাস তাদেরকে স্পর্শ করত না। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বরাবর তাঁর জানবাজ এবং জীবনমরণ উৎসর্গকারী সঙ্গীদের হৃদয়বিদারক এইসব ঘটনা শুনতেন। নীরবে কাঁদতেন। কিন্তু তাদেরকে বাঁচাবার কোনো উপায় ছিল না। তা ছাড়া স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও হৃদয়হীন পশুস্বভাব রক্তপিপাসু শত্রুবেষ্টিত ছিলেন। অবশ্য আল্লাহ তাআলা দুর্বল এই মুসলমানদের অন্তরকে যেন নির্মাণ করেছিলেন ধৈর্য ও সহনশীলতার ইস্পাতে। ভয়াবহ বর্ণনাতীত এত সব নির্যাতনের পরেও এক মুহূর্তের জন্যে তারা বিশ্বাসে দ্বিধান্বিত হননি। ইসলামের বাণী ছাড়েননি। সব রকমের জুলুম অবিচার নিঃশব্দে সয়ে গেছেন। নির্যাতনের আঘাতে আঘাতে তাদের অন্তরে ঈমান এতটাই দৃঢ় ও বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল—মুশরিকদের বেত্রাঘাত কিংবা গরম লোহার ছ্যাঁকা মুহূর্তের জন্যে তাদেরকে টলাতে পারেনি।

হযরত বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু

একেবারে প্রথমদিকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, হযরত বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদেরই অন্যতম একজন। নাম তার বেলাল ইবনে রাবাহ। মায়ের নাম হামামাহ। তিনি ছিলেন হাবশি ক্রীতদাস। আরবদের কাছে ক্রীতদাসরা ছিল পালিত জন্তু-জানোয়ারদের মতো। কোনো মালিক যদি তার ক্রীতদাসকে খুন করে ফেলে—এ নিয়ে কারও কথা বলবার অধিকার ছিল না। হযরত বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন হাবশি, তার ওপর ক্রীতদাস। এত কিছু সত্ত্বেও তিনি ইসলাম কবুল করেছেন। যে ইসলামধর্মকে নিশ্চিহ্ন করবার জন্যে মক্কার মুশরিক-সম্প্রদায় জীবন বাজি রেখে লড়ে যাচ্ছিল, হযরত বেলাল সেই ইসলামকে বুকে তুলে নিয়েছেন। একজন ক্রীতদাসের এত বড় দুঃসাহস! মালিকের মর্জির বিরুদ্ধে নতুন ধর্ম কবুল করে নেওয়াটা ছিল এক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এত বড় অপরাধ—যাকে ক্ষমা করা যায় না, এড়িয়ে যাওয়া যায় না। মে ও জুন মাসে যখন মক্কার আবহাওয়া অগ্নিসেদ্ধ হয়ে উঠে, আকাশ পাহাড়ের ওপর আগুন বর্ষণ করতে থাকে, ঠিক সেই সময়ে দুপুরবেলা মালিক উমাইয়া ইবনে খালফ হযরত বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ধরে ময়দানে নিয়ে যেত। তারপর তাপিত পাথরের ওপর চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে অন্য দুইজন ব্যক্তির সহযোগিতায় ভারী একটি পাথর তুলে তার বুকের ওপর রেখে দিত। প্রচণ্ড ওজনদার পাথরের চাপে তার বুকের হাড় ভেঙে চুরমার হওয়ার উপক্রম হতো। এই অবস্থায় আকাশ থেকে বর্ষিত আগুনে পুড়তে থাকতেন হযরত বেলাল। নিচে তপ্ত পাথর। বুকের ওপর বিশাল পাথর। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে নির্মম জল্লাদ। চেঁচিয়ে বলছে, নড়তে পারবে না। পাথর সরাতে পরবে না। হয় মরে যাও, নয় মুহাম্মাদের ধর্ম ছেড়ে দিয়ে লাত-উয্যায় ফিরে এসো। মুক্তির এই দুই পথ। তোমার জন্যে তৃতীয় কোনো পথ খোলা নেই। কিন্তু ভেবে বিস্মিত হতে হয়—ঈমানের শক্তি, বিশ্বাসের দৃঢ়তা, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আবেগ ও আস্থা হযরত বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এতটাই অচঞ্চল করে তুলেছিল—তিনি দাঁড়িয়ে আছেন মৃত্যুর দুয়ারে, কয়েক কদম দূরে মৃত্যু তার জন্যে অপেক্ষমাণ, অথচ তিনি তার মালিক কিংবা জল্লাদকে স্পষ্ট ভাষায় মুখের

ওপর বলে দিচ্ছেন, আল্লাহ এক—তাঁর কোনো শরিক নেই! তিনি যেন কারও কাছে সামান্য অনুগ্রহ পেতেও প্রস্তুত নন।[১]

দাস-দাসীদের প্রতি অত্যাচারের কেয়ামত

এটা একা হযরত বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘটনা নয়। দাস-দাসীদের যে-ই ইসলাম কবুল করছিল, তার ওপর নেমে আসছিল নির্যাতনের এই ভয়াবহ দুর্দশা। অমানবিক এই নির্যাতনের শিকার মজলুম সাহাবীগণের মধ্যে হযরত আমের ইবনে ফুহাইরা, উম্মে উমাইস, যানীরাহ, নাহদিয়্যা এবং তার কন্যা—সকলেই শামিল ছিলেন। তাদের প্রতি তাদের মালিকদের বর্ণনাতীত নির্যাতনের কাহিনী আমাদের ইতিহাসগ্রন্থের পাতায় পাতায় সংরক্ষিত আছে। বনু মুআম্মালের একজন দাসী। জাহেলিয়াতের যামানায়—হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বরাবর কষ্ট দিতেন। ইসলাম কবুল করা ছাড়া তাঁর এবং তাঁদের আর কোনো অপরাধ ছিল না। শুধু ইসলামের বাণী মুখে উচ্চারণ করায় তাঁদেরকে প্রতিনিয়ত মুখোমুখি হতে হতো ভাষাতীত নির্যাতনের। তাঁদের সামনে মুক্তির কোনো পথ ছিল না। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু পকেটের পয়সা খরচ করে এইসব দাস-দাসীদেরকে তাদের মালিকদের কাছ থেকে তাদের দাবি অনুযায়ী মূল্য দিয়ে কিনে এনে আজাদ করে দিয়েছেন। ভাগ্যবান এই আল্লাহর বান্দা-বান্দিগণ ঈমানের ধন পেয়েছিলেন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে। আর গোলামির জিঞ্জির থেকে মুক্তি লাভ করেছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বদান্যতায়।

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর পরিবার

হযরত আম্মার তার বাবা ইয়াসির এবং তার মা সুমাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুম—সকলেই ইসলাম লাভে ধন্য হয়েছিলেন। তারা ছিলেন বনু মাখযুমের ক্রীতদাস। এটা ছিল আবু জেহেলের খান্দান। মুশরিক-সম্প্রদায় জানতে পারে হযরত আম্মারের পুরো পরিবার ইসলাম কবুল করেছে।

---

১ ইবনুল আসীর জাযারী, *আল-কামিল*, ১ : ৪৯০; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৫৭-৫৮।

তাদের মধ্যে প্রতিশোধের আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠে। ভাগ্যবান এই পরিবারের প্রত্যেকের ওপর চলতে থাকে নিয়মিত নির্যাতন। মক্কার গ্রীষ্মে ঠিক দুপুরে যখন আকাশ উদার চিত্তে অগ্নি বর্ষণ করত, তখন তাদেরকে ধরে এনে পাথুরে ময়দানে বসিয়ে দেওয়া হতো। সূর্যাস্ত পর্যন্ত তারা অগ্নিদগ্ধ পাথরের ওপর জ্বলতে থাকত এবং পুড়তে থাকত। মাঝেমধ্যে যখন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পথ দিয়ে যেতেন আর তাদেরকে দুপুরের আগুনে পুড়তে দেখতেন, তখন বেদনায় তাঁর হৃদয় দীর্ণ হতো। বেদনাবিধুর কণ্ঠে তাদেরকে এই বলে সান্ত্বনা দিতেন—

صبرا ال ياسر موعدكم الجنة.

হে ইয়াসির-পরিবার, ধৈর্য ধরো। তোমাদের জন্যে রয়েছে বেহেশতের অঙ্গীকার।

ভয়াবহ এই শাস্তির মধ্যে ফেলেও শান্ত হতে পারত না মক্কার মুশরিক-সম্প্রদায়। একদিন আবু জেহেল এসে হযরত আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মা হযরত সুমাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহার বুকে একটি বর্শা ছুঁড়ে মারে। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন শহীদ সুমাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা। ইসলামের ইতিহাসে সম্মানিত এই নারীই সর্বপ্রথম শাহাদাতের গৌরব অর্জন করেন।[১]

খাব্বাব ইবনুল আরাত

হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত রাযিয়াল্লাহু আনহু-ও ক্রীতদাস ছিলেন। কামারের কাজ করতেন। এই বিপদসঙ্কুল সময়ে তিনিও ইসলাম কবুল করেন। তাকে এই কারণে পাশবিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। পিষ্ট হতে হয় বর্ণনাতীত জুলুমে। সামাজিকভাবে ছিলেন নেহাত দুর্বল। অন্তর ছিল ইস্পাতের মতো কঠিন। নির্যাতনের ভয়াবহ ঝড় তার পর্বতসম ঈমানকে এক বিন্দু টলাতে পারেনি। বনু তামীম গোত্রের লোক ছিলেন। ইসলাম পূর্বকালে ধরে এনে তাকে মক্কার বাজারে বেচে দিয়েছিল। ফলে বাধ্য হয়ে তাকে ক্রীতদাসের জীবন মেনে নিতে হয়। একেবারে প্রথম কালে যে

---

১ ইবনুল আসীর আল-জাযারী, *আল-কামিল*, ১ : ৪৯১; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৫৮।

ক'জন ভাগ্যবান ইসলামের ছোঁয়ায় ধন্য হয়েছিলেন, ধন্য হয়েছিলেন ইসলামের বাণী উচ্চারণে, তাদের মাঝে হযরত খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-ও ছিলেন। বিস্ময়কর বিষয় হলো, মক্কার সম্ভ্রান্ত বাসিন্দাগণ সময়ের প্রতিকূলতায় বাধ্য হয়ে নিজেদের ইসলামকে গোপন রেখেছেন। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া যারা খোলামেলা নিজেদের ঈমানের কথা ঘোষণা করেছিলেন, তারা প্রায় সকলেই ছিলেন এই দুর্বল শ্রেণির দাস-দাসী। হযরত সুহাইব, হযরত বেলাল, হযরত আম্মার, হযরত সুমাইয়া, হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন তাদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হযরত খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি মুশরিকদের চাপ ক্রমাগত বাড়তে থাকে। কিন্তু তিনি ঈমানে অবিচল। একদিন ইতর এই মুশরিকদল আগুনে তাপিত একটি পাথর হযরত খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পিঠের ওপর চাপিয়ে দেয়। এই অঙ্গারসম পাথরের আগুনে পুড়তে থাকে তার পিঠ। জ্বলতে থাকে তার শরীরের মাংস। মাংসপোড়া গন্ধে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখতে থাকে এই নির্মম মুশরিক-সম্প্রদায়। ধীরে ধীরে হযরত খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর শরীর থেকে বেরিয়ে আসা বিগলিত চর্বির পরশে শীতল হয়ে পড়ে আগুনে পোড়া পাথর। হযরত খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পিঠে এই পোড়া দাগ মরণ পর্যন্ত ছিল।[১]

হযরত খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমি আস ইবনে ওয়াইলকে তার ফরমায়েশে একটি তরবারি বানিয়ে দিয়েছিলাম। আমি যখন তার দাম চাইতে যাই, তখন এই নরাধম আমাকে বলে—আগে মুহাম্মাদের [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সঙ্গ ছাড়ো, লাত-উয্যার পূজা ধরো, তারপর দাম পাবে।

আরেকদিন তার কাছে মূল্য চেয়ে গেলে বলে—তোমাদের নবী তো বলে বেড়াচ্ছেন মানুষ মারা যাওয়ার পর পুনরায় জীবিত হবে। সুতরাং তোমাকে যখন পুনরায় জীবিত করা হবে, তখন যদি আমার কাছে পয়সা

---

১ *উসদুল গাবাহ*, ১ : ৫৯১-৫৯২; ইবনুল আসীর জাযারী, *আল-কামিল*, ১ : ৪৯১।

থাকে, তা হলে আমি তোমাকে এর মূল্য দিয়ে দেব। এখন দিতে পারব না।

মাঝেমধ্যে এমনও হতো, দু'-চারজন মুশরিক মিলে হযরত খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পা ধরে পাথুরে মাঠে হেঁচড়াতে থাকত। তিনি উভয় হাতে নিজেকে আগলে ধরে বাঁচবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু বাঁচতে পারতেন না। সারা শরীর জখমে ভরে যেত। রক্তে ভেসে যেত পুরো দেহ। একবার এই জালেমের দল তাঁকে জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর চিৎ করে শুইয়ে দেয়। আগুন না নেভা পর্যন্ত তাকে অঙ্গারের ওপর চেপে ধরে রাখে।[১]

একই সঙ্গে স্বীকৃতি এবং বিদ্বেষ

ওলীদ ইবনে মুগীরা ছিল মক্কার মুশরিকদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। ধনবান ছিল। প্রভাবশালী ছিল। তার সামনে কেউ কথা বলবার সাহস করত না। বয়সও হয়েছিল বেশ। একবার সে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে হাজির। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন ওলীদ ইসলামের ঘোর দুশমন। তাই তিনি তার সঙ্গে কথা বলা কিংবা দীনের দাওয়াত দেওয়া সমীচীন মনে করলেন না। ওলীদ আসতেই হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল হয়ে পড়লেন। ওলীদও নিঃশব্দে শুনতে লাগল। কুরআন তেলাওয়াত তাকে এতটাই আত্মভোলা করে দিলো—সে ভুলেই গেল—আমি শত্রুর মজলিসে বসে আছি। তার অন্তরব্যাপী তখন ঝড় বইছে। ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে চেহারা। অবশেষে কোনো কথাবার্তা না বলে চুপচাপ উঠে চলে যায়। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও নীরবে অবলোকন করেন তার প্রস্থানদৃশ্য।

মক্কার মুশরিক-সম্প্রদায় বরাবর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়ে রাখত। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কিত ছোট ছোট কথা ও বিষয়কে গভীর মনযোগে তারা অনুসন্ধান করে ফিরত। তারা জানতে পারে আজ ওলীদ

---

১ *উসদুল গাবাহ*, ১ :৫৯১-৫৯২।

ইবনে মুগীরা হযরত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসেছে। এসে দরবারে খামোশ বসে থেকেছে। তারপর তার হাবভাব কেমন যেন ভিন্নরকম মনে হচ্ছে। মনে হয় তার ওপর মুহাম্মাদের [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যাদু পড়েছে। বিষয়টি নিয়ে সে নিজেও ভাবিত। কথাটি যখন আবু জেহেল জানতে পারে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে ওলীদের কাছে। এসে বিনয়ের সঙ্গে বলে, চাচাজান, আমরা সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি—বড় অঙ্কের অর্থ আপনাকে দেব। কারণ, আমরা অনুভব করছি, মুহাম্মাদের [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সঙ্গে সাক্ষাতের পর আপনার অবস্থা কেমন যেন বদলে গেছে। ওলীদ তখন আবু জেহেলকে বলল, কুরাইশদের সকলেই জানে আমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী। সুতরাং পয়সা দিয়ে আমি কী করব? আর আমার প্রতি সন্দেহ করারও প্রয়োজন নেই। তবে আমি এ কথা স্বীকার না করে পারব না—মুহাম্মাদের [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কথা খুবই উঁচু স্তরের এবং উপমাহীন। কাব্য এবং সাহিত্য সম্পর্কে আমার ভালো ধারণা আছে। বিখ্যাত কবিদের বড় বড় কবিতা আমার স্মৃতিতে সংরক্ষিত আছে। মানুষ কেন, জিনদের কবিতাও আমি মুখস্থ করে রেখেছি। তারপরও আমি কসম করে বলব, মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যে বাণী পাঠ করে শোনান, তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং অনুপম। তাঁর কথায় যেমন মাধুর্য আছে, তেমনি আছে অন্তরকে টেনে নেওয়ার এক অব্যক্ত চুম্বকশক্তি। তাঁর বাণীর সামনে আরবদের কাব্যসাহিত্য অর্থহীন। তাঁর বাণী হৃদয়কে সিক্ত করে এবং মস্তিষ্ককে করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবনত।

ওলীদের মুখে এমন স্পষ্টতর বক্তব্য শুনে আবু জেহেলের সন্দেহ আরও বেড়ে যায়। সে আবেদনের সুরে বলে—চাচা, মানুষ আপনার এই কথায় আশ্বস্ত হতে পারবে না। আপনাকে মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলতে হবে। ওলীদ কিছুটা বিরক্ত হয়ে উঠে। আবু জেহেলকে এই বলে বিদায় করে দেয়, তুমি এখন চলে যাও। আমি ভেবে-চিন্তে বলি। তারপর ওলীদ দুশ্চিন্তায় ডুবে যায়। ভাবতে থাকে, মানুষ আমার প্রতি মন্দ ধারণা করছে। এভাবে চলতে থাকলে আমার সম্মান এবং ব্যক্তিত্ব হারাবার ভয় আছে। তাই সে পরের দিন সকলের

সামনে বলে, ভাইয়েরা আমার, মুহাম্মাদের [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বাণী মূলত যাদু! শোনামাত্র মন ও মস্তিষ্ককে যাদুগ্রস্ত করে ফেলে। এছাড়া আর কিছুই নয়।[১]

মক্কার মুশরিকদের পরিকল্পনা

মূর্খতার যুগে হজের নামে মক্কায় মেলা বসত। এই মেলা মুশরিকদের প্রচলিত রেওয়াজ মোতাবেক পালিত হতো। সেকালে পালিত এই মেলা আমাদের ভারতের তীর্থস্থানে যে সকল মেলা অনুষ্ঠিত হয়, তা থেকে আলাদা কিছু ছিল না। রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তীর্থযাত্রীরা দলে দলে ছুটে আসে। তারপর নিজ নিজ আকিদা-বিশ্বাস ও রসম-রেওয়াজমাফিক কিছু অনুষ্ঠান পালন করে ফিরে যায়। মূর্খতার কালে হজ-অনুষ্ঠান ছিল অনেকটা এরকম।

হজের মওসুম সমাগত। মক্কার বাইরে থেকে বিভিন্ন গোত্রের বিপুল মানুষ এতে অংশগ্রহণ করবে। তাই মক্কার মুশরিক-সম্প্রদায় এ উপলক্ষে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডার পরিকল্পনা তৈরি এবং কর্মসূচি প্রণয়নে মিটিং ডাকল। এই মিটিংয়ের মূল আয়োজক ওলীদ ইবনে মুগীরা। ওলীদ মক্কার সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। যখন সকলেই সমবেত হলো, তখন ওলীদ তাদের উদ্দেশে বলতে শুরু করল, হজের মওসুম সমাগত। বাইরে থেকে আগত গোত্রগুলো নিশ্চয় মুহাম্মাদের [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করবে। আর মুহাম্মাদও নিশ্চয় তাদের স্বীয় ধর্মের দাওয়াত দেবে। আশ্চর্য হবার কিছুই নেই, কোনো গোত্র হয়তো তার ধর্ম কবুল করে বসবে। এতে করে আমাদের জন্যে বড় রকমের সংকট সৃষ্টি হবে। তাই তাদের সঙ্গে যেন মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মিলিত হতে না পারে, সেজন্যে আমাদেরকে কঠোর ভূমিকা পালন করতে হবে। আমাদের সকলে মিলে এজন্যে কোনো সম্মিলিত পলিসি নির্ধারণ করতে হবে। তার বিরুদ্ধে ঠিক কী ধরনের প্রোপাগান্ডা আমরা করতে পারি এবং তার পদ্ধতি কী হবে, তাও পূর্ব থেকেই ঠিক করে নিতে হবে। উদ্দেশ্য, যেন আমাদের প্রত্যেকে এক

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৬০-৬১।

সুরে কথা বলতে পারে। এমন যেন না হয়, একেক জনের কথা একেক রকম হলো। এতে করে আগত লোকদের মধ্যে মন্দ প্রভাব পড়বে। তাই আমাদের সকলে মিলে এখনই তার বিরুদ্ধে উত্থাপন করা যেতে পারে, এমন অভিযোগের এটি তালিকা তৈরি করে নিতে হবে। তারপর সকলে মিলে এই তালিকায় উল্লেখিত অভিযোগগুলো নিজ নিজ জায়গা থেকে বলতে থাকবে। আমাদের পরস্পরের কথায় তখন কোনোরূপ বিরোধ থাকবে না।

উপস্থিত সকলে মিলে বলল, আপনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি। আমরা সমাগত এই হজ উপলক্ষে কী সব অভিযোগ প্রচার করতে পারি, আপনিই ঠিক করে দিন। ওলীদ বলল, না। বরং তোমরা সকলে নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করো। তোমরা কে কী বলতে চাও, সেটা আগে শুনি। তারপর আমার কাছে যেটা সঙ্গত মনে হয়, বলব। উপস্থিত সভাসদ নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করে। কেউ কেউ বলে, আমরা আগত লোকদের কাছে মুহাম্মাদকে [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] একজন জ্যোতিষী বলে প্রচার করব। ওলীদ বলল, এটা হবে না। তোমার এই কথা কেউ মানবে না। কারণ, আমরা সকলেই জ্যোতিষীদের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে মোটামুটি জানি। মুহাম্মাদের [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মধ্যে তেমন কোনো বিষয় দেখা যায় না। আরেকজন বলল, আমরা প্রচার করব, এই লোকটা পাগল, অপ্রকৃতিস্থ। ওলীদ বলল, এই মতও যথার্থ নয়। কারণ, তার কোনো কাজকর্ম পাগলামির রেখায় পড়ে না। তোমাদের এই অভিযোগ কেউ কানে তুলবে না। তৃতীয় এক ব্যক্তি বলল, আমরা বলব, এ হচ্ছে একজন কবি। ওলীদ বলল, তোমার এ কথাও বাজারে চলবে না। পুরো আরব কবি ও কবিতা সম্পর্কে খুব ভালো জানে। তাই তার কথাকে কবিতা বলে প্রচার করা নিজেদেরকে মূর্খ বলারই নামান্তর হবে। সুতরাং তাকে কবি বলে বিশেষ কোনো সুবিধা করতে পারবে না। অন্য একজন বলল, আমরা তাকে যাদুকর বলে প্রচার করতে পারি। ওলীদ এরও প্রতিবাদ করে বলল, দ্যাখো, যাদু এবং যাদুবিদ্যার প্রচলিত নিয়ম-নীতির কোনোটাই তার কাজকর্মের সঙ্গে মেলে না। এই ধরনের কথা প্রচার করলে মানুষ সহজেই ধরতে পারবে, তোমরা তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলছ।

ঘুরে ফিরে নানা অভিযোগ উঠল। ওলীদ একটা একটা করে সব ক'টা যুক্তি দিয়ে উড়িয়ে দিলো। অবশেষে উপস্থিত সভাসদগণ আরজ করল—তা হলে আপনিই সিদ্ধান্তমূলক কোনো পরামর্শ দিন। আমরা সকলে আপনার কথা মেনে নেব। তারপর সেভাবেই প্রচার-প্রোপাগান্ডা চালাব। এবার ওলীদ এই বলে মত প্রকাশ করল, আমার মনে হয় কি, তার বিরুদ্ধে যাদুকর বলে প্রোপাগান্ডা করলে কিছুটা স্বার্থক হতে পারে। তবে মানুষকে এও বলতে হবে—সাধারণ যাদুকরদের মতো যাদুকর নয় মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]। তার যাদু অত্যন্ত প্রভাবশালী ও ধ্বংসাত্মক। তার যাদু সুদূরপ্রসারী এবং ভয়াবহ। এই লোক যাদুর মাধ্যমে মানুষকে তাদের বাপ-দাদার ধর্ম বিমুখ করে। মানুষকে তাদের পূজিত মাবুদ লাত-উয্যা থেকে বিমুখ করে। যাদুর মাধ্যমে পিতা-পুত্রের মাঝে লড়াই বাধিয়ে দেয়। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সৃষ্টি করে বিচ্ছেদ। ভাইকে ভাইয়ের শত্রু বানিয়ে দেয়। এর যাদুতে মানুষ তার খান্দানের শত্রু হয়ে উঠে। এই কথাগুলো তোমরা যত বলবে, তার প্রমাণও দেখাতে পারবে। এই মক্কাতেই তোমরা এর শত শত উপমা পাবে। ফলে, তোমাদের কথায় শক্তি হবে। তোমাদের কথা মানুষের হৃদয় ও মস্তিষ্কে আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। উপস্থিত সকলেই অবনত চিত্তে ওলীদের কথাগুলো মেনে নেয়। এখানেই বৈঠক সমাপ্ত হয়।[১]

হজের মওসুম আগত হলে মক্কার সকল কুরাইশ-মুশরিক মিলে প্রতিটি পথে, পথের বাঁকে বাঁকে আসন গ্রহণ করে। তারপর আগত বিদেশিদের মাঝে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডার ঝড় বইয়ে দেয়। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও হজসমাবেশের অপেক্ষায় ছিলেন। হজের মওসুম সমাগত হলে তিনিও দাওয়াতের উদ্দেশ্যে পথে নেমে পড়েন। তারপর যখনই তিনি কারও সঙ্গে একান্তে কথা বলতে শুরু করতেন—দেখা যেত, কোনো না কোনো মুশরিক সেখানে পৌঁছে যেত। তারপর তাদের মিটিংয়ে উপস্থাপিত অভিযোগগুলো ওই ব্যক্তির সামনে আওড়াতে থাকত। ফলে দেখা যেত নিরিবিলি ও স্বস্তিপূর্ণ পরিবেশে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো

---

১ ইবনে সায়্যিদুন নাস, *উয়ুনুল আসার*, ১ : ১৯১।

কথা বলতে পারতেন না। কারও সঙ্গে কিছু সময় কথা হলে এবং সেই ব্যক্তি তাঁর কথায় প্রভাবিত হলে—দেখা গেছে সঙ্গে সঙ্গে মুশরিকদল ছুটে এসে মুহূর্তের মধ্যে তার মন ও মস্তিষ্ক থেকে নবীজির দাওয়াতের আলোকরেখাগুলো মুছে দিত। ফলে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত ও আবেদন-নিবেদন হাওয়ায় মিলিয়ে যেত। তার কোনো প্রচেষ্টাই দৃশ্যত সফলতার মুখ দেখত না। এভাবে বেশ কয়েকটি হজের মওসুম আসে এবং চলে যায়। দীনের দাওয়াত বারবার গভীর আবেগে উচ্চারিত হয় বটে, কিন্তু মুশরিকদের প্রোপাগান্ডার ঝড়ে তোতাপাখির মধুর আওয়াজের মতোই নিষ্ফল হারিয়ে যায়।[১]

ভেঙে পড়ে সর্বগ্রাসী অহংকার

সব ধরনের পূর্বপ্রতিরোধ সত্ত্বেও ধীরে ধীরে কিছু কিছু মানুষ ইসলামের ছায়াতলে সমবেত হতে থাকে। তাদের ইসলাম গ্রহণের এই সংবাদ মুশরিকদের অন্তরে বিঁধতে থাকে তিরের মতো। তারা জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর যেন এপাশ-ওপাশ করতে থাকে। চরম অস্থিরতায় প্রতিমুহূর্তেই নতুন নতুন স্কিম বানাতে থাকে। সাজাতে থাকে ষড়যন্ত্রের নতুন নতুন ফাঁদ। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কীভাবে অপমানিত করা যায়, কীভাবে খাটো করা যায়, কীভাবে তার ব্যক্তিত্বকে তুচ্ছ করা যায়, তাঁর বাণীকে হালকা করা যায়, তাঁর দাওয়াত ও তাবলীগকে করা যায় অর্থহীন—এ নিয়ে তাদের প্রজেক্ট ও পরিকল্পনার কোনো অন্ত নেই। এমনিতে কুরাইশ-মুশরিকদের হাতে সময় ছিল প্রচুর। তাদের হাতে অবসরের অন্ত নেই। তারা বছরে দুইবার ব্যবসায়িক সফর করত। একবার সিরিয়ায়। আরেকবার ইয়েমেনে। এই দুই সফরে যা আয় হতো, তাতে তাদের পুরো বছর চলে যেত। অবশিষ্ট সময় তাদের কাটত নিশ্চিন্ত। এই দু'টি সফর পার করার পর অবশিষ্ট পুরো বছর তারা মক্কায় কাটাত। দিঘল এই অবসর সময়ে তারা ডুবে থাকত সব দুষ্ট পরিকল্পনায়।

একদিনের ঘটনা। এক মজলিসে উপবিষ্ট কুরাইশ-নেতৃবৃন্দ। এমন সময় এক ব্যক্তি প্রস্তাব করল—আমরা কি এমন একজন মানুষ খুঁজে বের করতে

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৬১; *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ১ : ২৮৩-২৮৪।

পারি—যিনি একই সঙ্গে কবি, জ্যোতিষী এবং যাদুকর। সেই ব্যক্তি গিয়ে মুখোমুখি হবে এই নতুন নবীর। তারপর স্বীয় কথার ধাঁধায় তাঁকে নির্বাক করে দেবে। তখন হয়তো তাঁর সাহস ভেঙে পড়বে। এই প্রস্তাব শোনার পর উপস্থিত সকলেই কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে উকবা ইবনে রাবীআর বিষয়ে একমত হলো। সকলে মিলে ঠিক করল—উকবা যাবে। মুহাম্মাদের [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সঙ্গে প্রশ্নোত্তর করে তাঁর মুখ বন্ধ করে দেবে। উকবা সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত। ব্যক্তিগতভাবে উকবা তার বাগাড়ম্বরতা ও বাকমাধুর্যতায় ছিল চরম গর্বিত। তার বিশ্বাস ছিল—আমি গিয়ে মুহাম্মাদের [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মুখ বন্ধ করে দেব। সে মজলিস থেকে উঠে সোজা মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর খেদমতে গিয়ে হাজির হয়। ভালো করে আসন পেতে বসে। তারপর শুরু করে প্রশ্নোত্তর।

প্রথমেই হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করে—মুহাম্মাদ, আপনি উত্তম, না আবদুল্লাহ? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব।

উকবা আবার প্রশ্ন করল—আচ্ছা, আপনি শ্রেষ্ঠ, না আপনার দাদা আবদুল মুত্তালিব? নবীজি এবারও নীরব।

উকবা এবার ব্যাখ্যা করে বলতে শুরু করল—আপনি যদি বলেন, আমার বাবা আবদুল্লাহ এবং আমার দাদা আবদুল মুত্তালিব আমার চেয়ে উত্তম—তা হলে তো আপনার ভালো করেই জানা আছে, তারা সকলেই মূর্তিপূজা করতেন, অথচ আপনি বরাবর মূর্তিপূজার নিন্দা করেন। সুতরাং তারা কীভাবে শ্রেষ্ঠ হলেন? আর আপনি যদি মনে করেন—আপনি তাদের চেয়ে উত্তম, তা হলে আপনি বলুন, কথাটা আমি আপনার মুখে শুনতে চাই। নবীজি এবারও নীরব।

উকবার শরীরে এবার উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ল। ক্ষোভে খেদে কম্পিত উকবা বলতে লাগল—পুরো আরবে কারও ঘরে আপনার মতো নালায়েক সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। আপনি আপনার অভিশাপে পুরো সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করেছেন। আমাদের একতাকে ভেঙে দিয়েছেন। আমাদের ধর্মে নানা ত্রুটি আবিষ্কার করেছেন। পুরো আরবজগতে আমাদেরকে অপমানিত ও

লাঞ্ছিত করেছেন। গোটা আরবে ছড়িয়ে পড়েছে—কুরাইশদের মধ্যে একজন ভয়াবহ যাদুকর ও জ্যোতিষী জন্মগ্রহণ করেছে। এই জ্যোতিষী চারদিকে ধ্বংস ছড়িয়ে দিয়েছে। মক্কায় শীঘ্রই তরবারি কোষমুক্ত হয়ে পড়বে। পরস্পরে যুদ্ধ বাধবে। এই যুদ্ধ পুরো জাতিকে ধ্বংস করে ছাড়বে। আপনার কোনো প্রয়োজন থাকলে কিংবা আপনার অন্তরে সুপ্ত কোনো স্বপ্ন থাকলে পরিষ্কার ভাষায় বলুন। আমরা সকলে মিলে আপনার স্বপ্ন পূরণ করে দেব। আপনার যত সম্পদ প্রয়োজন, কিংবা কোনো সুন্দরী নারীকে যদি বিয়ে করতে চান—একজন নয়, আমরা দশজন নারী এনে দেব। তারপরও আপনি আপনার এই কাজ বন্ধ করুন।

এতটুকু শোনার পর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরবতা ভাঙলেন। উকবাকে বললেন—কথা শেষ হয়েছে? যা বলার ইচ্ছে ছিল, সবটা বলা হয়েছে? উকবা বলল—হ্যাঁ, আমি যা বলতে চেয়েছি, তা বলে শেষ করেছি।

এরপর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করতে শুরু করলেন—

حٰمٓ ۝١ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢ كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝٣

তেলাওয়াত করতে করতে—

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ.

পর্যন্ত এসে সমাপ্ত করলেন। উকবা বলে উঠল—ব্যস, ব্যস!

তারপর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর কিছু বললেন না। উকবা সেখান থেকে উঠে সোজা কুরাইশদের মজলিসে চলে গেল। সেখানে তারা পূর্ব থেকেই উকবার জন্যে অপেক্ষমাণ ছিল। তাই তাকে দেখামাত্র উপস্থিত সকলেই—কী হয়েছে কী হয়েছে—জানবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল। উকবা বলল, দ্যাখো, তোমরা যা কিছু বলতে পারো, তার সবগুলোই আমি তাকে বলেছি।

তিনি কি কোনো জবাব দিয়েছেন?

জবাব দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহর কসম, তার প্রদত্ত জবাবের মৌলিক কথাগুলো আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। তবে এইটুকু বুঝেছি, তিনি তোমাদেরকে সতর্ক করেছেন। বলেছেন—তোমরা যদি তোমাদের এই অবাধ্যতা অব্যাহত রাখো এবং তোমাদের চলতি আচার-আচরণ থেকে বিরত না হও, তা হলে আদ ও সামুদের মতো তোমাদের ওপর বিদ্যুৎপাত হবে। তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।

সকলেই তাজ্জব! কী আশ্চর্য, আরবী ভাষায় কথাবার্তা হলো আর আপনি তার বক্তব্যের বুনিয়াদি কথাগুলোই বুঝতে পারলেন না? আমরা তো আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

উকবা পুনরায় বলল—খোদার কসম, আমি সত্যি করে বলছি। আমি তার বক্তব্যে শুধু বিদ্যুৎপাতের হুঁশিয়ারি ছাড়া আর কিছুই বুঝিনি।

আসল কথা কী—উকবা হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীরবতা ও তেলাওয়াতে এতটাই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল—তার তখন কোনো হুঁশই ছিল না। তার অন্তরে ভয় এতটাই প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সে ভেবে অস্থির হচ্ছিল—মুহাম্মাদের [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কণ্ঠে উচ্চারিত বিদ্যুৎ এখনই তার ওপর ঠাটা হয়ে বর্ষিত হয় কিনা! চলতি পথে আমাকেও সে ঠাটা এসে আদ ও সামুদের মতো উড়িয়ে দেয় কিনা! এই ভয় তাকে এতটাই চেপে ধরেছিল—ক্রমে সে নির্জনবাসী হয়ে পড়ে। মানুষের সঙ্গে মেলামেশা ছেড়ে দেয়। কুরাইশ-মুশরিকদল তার এই আচার-আচরণে সন্দেহ ও সংশয়ে পড়ে যায়।

এর দুই-তিনদিন পর আবু জেহেল কুরাইশদের মজলিসে গিয়ে হাজির হয়। তারপর বলে, খোদার কসম, আমার ভয় হচ্ছে, উকবা আবার বেদীন হয়ে গেল কিনা! মনে হচ্ছে, মুহাম্মাদের [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যাদু তাকে ধরেছে। তাই উকবার মস্তিষ্ক ধোলাই হওয়া খুবই জরুরি। আপনারা সকলে উকবার ঘরে চলুন। আমরা পরিষ্কার ভাষায় তার সঙ্গে আলোচনা করব।

তারা দলবেঁধে ছুটে গেল উকবার ঘরে। কথা বলা শুরু করল আবু জেহেল। শুরুতেই বলল, উকবা, আমরা তোমার কাছে এজন্যেই

এসেছি—আমাদের ধারণা—তুমি বেদীন হয়ে গেছ। তুমি যদি কোনো রকমের ঠেকায় পড়ে থাকো, তা হলে আমাদেরকে বলো, আমরা সকলে মিলে তোমাকে এই পরিমাণ সম্পদ জোগাড় করে দেব—তোমার সকল প্রয়োজন মিটে যাবে। এই প্রস্তাব শোনামাত্র উকবা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে খোদার কসম করে বলে, আজকের পর আমি আর কোনো দিন মুহাম্মাদের [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সঙ্গে কোনো কথা বলব না। আর কোনো সম্পদেরও আমার প্রয়োজন নেই। তবে এ কথাও তার জায়গায় সত্য, যে কালাম তিনি আমাকে পাঠ করে শুনিয়েছেন, তা কোনো কবিতা নয়, কোনো গণক কিংবা জ্যোতিষের বাণীও নয়। এ কথা আমি সর্বাবস্থায় স্বীকার করব।[১]

চূড়ান্ত নিচুতা

আবু জেহেল, আবু সুফিয়ান, আখনাস ইবনে শরিক—এই তিনজন ছিল মুসলমান এবং হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রুতায় সকলের শীর্ষে। তারা বরাবর শুনতে পেত, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কালাম শুনিয়ে মানুষকে যাদুগ্রস্ত করে ফেলে। কিন্তু তারা তিনজন কখনো নিজ কানে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরআন তেলাওয়াত শোনেনি। তারা ভাবল—চারদিকে যখন এই কালাম তেলাওয়াতের খ্যাতি। তখন একবার আমাদেরও শুনে দেখা দরকার। আসলে এর রহস্যটা কী? কী এর প্রভাব? আর এর মধ্যে এমন কী আকর্ষণ ও যাদু লুকিয়ে আছে? মানুষ কেন এই বাণী শোনামাত্র তাদের চেতন ও অনুভূতি হারিয়ে বসে? আসলে কোনো শাব্দিক বাচালতামাত্র নয় তো? এমনও তো হতে পারে—ঘটনা মূলত তেমন কিছুই নয়, কিন্তু মানুষ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করছে। প্রত্যেকেই নিজের মতো করে সিদ্ধান্ত নেয়। সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে মুহাম্মাদের [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কণ্ঠে কুরআনের তেলাওয়াত শুনতে হবে। সিদ্ধান্তটা তাদের প্রত্যেকের নিজের। মনের সিদ্ধান্ত মনেই লুকিয়ে রেখেছে। কেউ কাউকে বলেনি। কেউ কাউকে আঁচ করতে দেয়নি।

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৬৩।

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় ঘরে তাহাজ্জুদ পড়তেন। নামাযে দীর্ঘ সময় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করতেন। এই তিন নেতা নবীজির ঘরের বাইরে তিন কোণে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে ফজর পর্যন্ত নববী কণ্ঠে পবিত্র কালামের তেলাওয়াত শুনেছে। কারও সঙ্গে কারও যোগাযোগ নেই। কেউ জানে না কারও কথা। কিন্তু ফেরার পথে যখন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আঙিনা ছেড়ে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ঘরমুখি হয়, তখন পরস্পর সাক্ষাৎ হয়ে যায়। প্রত্যেকেই বুঝতে পারে—আমরা তিনজন একই উদ্দেশ্যে একই জায়গায় গিয়েছিলাম। বিষয়টি এভাবে জানাজানি হয়ে যাওয়ায় প্রত্যেকেই মনে মনে লজ্জিত হয়।

পরের দিন আখনাস ইবনে শরিক আবু সুফিয়ানের ঘরে যায়। আবু সুফিয়ানকে প্রশ্ন করে, রাতে তুমি কুরআন তেলাওয়াত শুনেছ—এ বিষয়ে তোমার অভিমত কী? আবু সুফিয়ান বলল, দ্যাখো, আমি এমন সব কথা শুনেছি, যেগুলো আমি জানি এবং এর উদ্দেশ্যও আমি বুঝি। আখনাস বলল, আমার অনুভূতিও তা-ই। কোনো সন্দেহ নেই, মুহাম্মাদ যা বলেন, তা সত্য। দুইজন একমত হবার পর আখনাস বলল, চলো, আমরা আবু জেহেলের কাছে যাই। তার মতটা জানা দরকার। আবু জেহেলের ঘরে গিয়ে আখনাস বলল, আবুল হিকাম, মুহাম্মাদের [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কণ্ঠে যা শুনেছ, সে বিষয়ে তোমার মত কী? আবু জেহেল অনুমান করতে পারে—এরা দুইজনই কুরআন শুনে বেশ প্রভাবিত। সুতরাং এদের মগজ ধোলাই আশু প্রয়োজন, নইলে এরাও হাত থেকে বেরিয়ে যাবে। তাই আবু জেহেল বলল—দ্যাখো, আসল কথা কী, আমাদের মধ্যে এবং বনু আব্দে মানাফের মধ্যে জীবনভর—পদ ক্ষমতা ইজ্জত সম্মান নেতৃত্ব খ্যাতি—সব বিষয়েই একটা প্রতিযোগিতা আছে। প্রত্যেকেই অপর পক্ষকে ছোট করতে চায়। অপর পক্ষকে পরাজিত করতে চায়। আমি এই পরাজয়কে মেনে নিতে প্রস্তুত নই। তারা কোন বিষয়ে আমাদের চেয়ে বড়? হাজীদের আপ্যায়ন, পানি পান করানো, দারুন নাদওয়ার দায়-দায়িত্ব এবং নেতৃত্ব আমাদের হাতে। তারা যদি মানুষকে খানাপিনা করিয়ে থাকে, তা হলে আমরাও করিয়েছি। তারা যদি মানুষকে দান-দাক্ষিণ্য করে থাকে, তা হলে আমরাও করেছি। তারা কোন দিক থেকে আমাদের উপরে? হ্যাঁ, তারা

যদি দাবি করে বসে আমাদের মধ্যে একজন নবী ও রাসূল আছেন, তা হলে আমাদের কাছে এর কোনো জবাব নেই। এখন এই একক মান সম্মান ও গৌরবতিলকটি তারা তুলে নিতে চাচ্ছে। আমি আমার জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত এর বিরোধিতা করে যাব। আমি কোনোদিন মুহাম্মাদের [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নবুওয়তকে মেনে নেব না।[১]

মজলুম মুসলমানদের দেশত্যাগ

মুসলমান হওয়া, আল্লাহর একত্ববাদকে স্বীকার করা, প্রাণহীন পাথরের তৈরি মূর্তির শক্তিকে অস্বীকার করা এবং বিবেক ও শুদ্ধ স্বভাবের দাবিকে মেনে নেওয়াই ছিল মক্কার জমিনে সবচেয়ে বড় অপরাধ। যারা আল্লাহর নাম নেবে, নবীজির রেসালাতকে স্বীকার করবে, তাদের জন্যে হেরেমের পবিত্র মাটি তপ্ত তাওয়া হয়ে উঠেছিল। মেহনত-মজদুরি এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করে যারা জীবনযাপন করত, যারা ছিল মক্কার সম্মানিত ব্যক্তি—আখলাক ও চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত—কুফর ও গোমরাহির অন্ধকার থেকে ঈমানের আলোয় বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তারা হয়ে পড়েন ক্ষমার অযোগ্য অপরাধী। এরচেয়ে বড় আশ্চর্যের বিষয় আর কী হতে পারে, মক্কার মুশরিক-সম্প্রদায় প্রমাণ করে দেখিয়েছে—তাদের জেদ ক্ষোভ শত্রুতা এবং রক্তলোলুপতার কাছে হিংস্র বাঘ হায়েনাও তুচ্ছ। তাদের মুখে লেপ্টে ছিল মানবতার রক্ত। রক্ত ছাড়া তাদের তৃষ্ণা নিবারিত হতো না। মক্কার অসহায় গরিব দুর্বল মুসলমানগণ কুরাইশ-নেতাদের এমন কী ক্ষতি করেছিল?—অথচ তারা এই অসহায় দুর্বলদের ধরে এনে আগুনঢালা রোদে বসিয়ে রাখত, জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর চিৎ করে শুইয়ে দিত, গলায় রশি বেঁধে জন্তু-জানোয়ারের মতো হেঁচড়াত;—অথচ তারাও ছিল মানুষ। মক্কার পাষাণহৃদয়, পাথরদিল মুশরিক-সম্প্রদায় জুলুমে জুলুমে মুসলমানদের জীবনকে বিষিয়ে তুলেছিল। নিজেদের ঘরে অবস্থান করা তাদের জন্যে হয়ে উঠেছিল দুঃসাধ্য। আপন জন্মভূমিতে চলাফেরা করা হয়ে উঠেছিল কঠিন। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রিয় সঙ্গীদের এই দুর্বিষহ অবস্থা নিজ চোখে দেখতেন। হৃদয়ে পাথর চেপে ধরে তাদের যন্ত্রণার

---

১ ইবনে সায়্যিদুন নাস, *উয়ুনুল আসার*, ১:২০৪; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩:৬৪

কাহিনী শুনতেন। অশ্রুসিক্ত হতেন। কিন্তু তাদেরকে জুলুমের হাত থেকে বাঁচাবার কোনো উপায় তাঁর হাতে ছিল না। অবস্থা যখন চূড়ান্তরূপে ধৈর্যের বাইরে চলে যায়, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মজলুম ও অসহায় মুসলমানদের বলেন, তোমরা তোমাদের স্বদেশ মক্কা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাও। আল্লাহর আদেশের অপেক্ষা করো। আমি এই অগ্নিদগ্ধ ভাটায় বসে আগুন নেভাবার চেষ্টা করব। আমাদের কাছেই আবিসিনিয়া নামে একটি দেশ আছে। সেখানকার শাসক ভদ্র এবং নীতিপরায়ণ। সেখানে চলে যাও। সেখানে অন্তত মক্কার মতো রোজ রোজ নির্যাতনের শিকার হবে না।

মক্কায় মুসলমানদের প্রতি নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। জন্মভূমি হয়ে উঠেছিল জ্বলন্ত কারাগার। যে শহরে তারা জন্মগ্রহণ করেছেন, যেখানকার পথ ও গলিতে মিশে আছে জীবনের হাজারও স্মৃতি, যেখানকার প্রতিটি বালুকণার সঙ্গে মিশে আছে আবেগের শক্ত বাঁধন—সেই মাতৃভূমি ছেড়ে যাওয়া মোটেও সহজ ছিল না। কিন্তু কী করার আছে, এটাই এখন তাদের ভাগ্যলিখন। এছাড়া তাদের সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই।

নবুওয়ত লাভের পর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন বছর পর্যন্ত একান্ত গোপনে তাবলীগ করেছেন। তখন যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, মুশরিক-সম্প্রদায় তাদের সম্পর্কে তেমন একটা জানবার সুযোগ পায়নি। এমনকি সে সময়ে যারা ইসলাম কবুল করেছেন, তারাও একে অপরকে খুব একটা ভালো করে জানতেন না। তাই মুশরিকদের ক্ষোভের আগুনও তখন ছিল চাপা পড়া। চতুর্থ বছর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়তের ঘোষণা দিলেন। খোলামেলা ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন। এক বছরের মধ্যে কিছু লোক ইসলাম কবুল করল আর অমনি জ্বলতে শুরু করল মুশরিকদের ক্ষোভের আগুন। কোনোক্রমে এক বছর যেতে না যেতেই কুরাইশ-সম্প্রদায় মুসলমানদের জীবন সংকীর্ণ করে তুলল। বাধ্য করল জন্মভূমি ছেড়ে চলে যেতে। নবুওয়তের চতুর্থ সাল ছিল মুসলমানদের জন্যে চরম পরীক্ষার বছর। এ বছরই হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মাতৃভূমি

ছেড়ে চলে যেতে আদেশ করেন। কারণ, তখন মক্কায় থাকবার কোনো উপায় ছিল না।

আবিসিনিয়ায় হিজরত

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আবিসিনিয়ায় হিজরতের আদেশ করলেন তখন জানা গেল ঈমানের পূর্ণতার একটি স্তর হলো—আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্যে স্বীয় মাতৃভূমি ত্যাগ করা। আল্লাহর পথে সর্বপ্রথম যারা মাতৃভূমি বিসর্জনের সিদ্ধান্ত নেন তাদের সংখ্যা ছিল পনেরোজন। এগারোজন পুরুষ। চারজন নারী। হিজরতকারী এই প্রথম কাফেলায় যারা ছিলেন, তারা সামাজিকভাবে দুর্বল কিংবা নিম্নমর্যাদার অধিকারী লোক ছিলেন না—সমাজ যাদেরকে দাস-দাসী বলে জানে; বরং তারা ছিলেন মক্কার সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ—গর্বিত কুরাইশ খান্দানের বিত্তবান ও অভিজাত বলে বিবেচিত হতেন তারা। অথচ অবস্থার প্রেক্ষিতে আজ তারা অসহায়, আশ্রয়হীন। দুর্বল অপারগদের মতো পরদেশযাত্রী, অথচ কালই এরা সমকালীন পরাশক্তি কায়সার ও কিসরার প্রতিদ্বন্দ্বী, কায়সার ও কিসরার রাজমুকুট পদদলিত করবেন এরাই। এরাই সচেতনতা, দক্ষতা ও রাজনৈতিক প্রাজ্ঞতায় শাসন করবেন পুরো পৃথিবী। এই কাফেলায় আছেন হযরত উসমান গনী, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা রুকাইয়া, হযরত আবু হুজাইফা, হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম, হযরত মুসআব ইবনে উমাইর, হযরত উসমান ইবনে মাযউন, হযরত আবু সালামাহ, হযরত উম্মে সালামাহ, হযরত আমের ইবনে রাবীআ, হযরত লায়লা বিনতে আবু হাসনা, আবু সাবুরা ইবনে আবু রাহাম, হাতেব ইবনে আমর, সুহাইল ইবনে বায়যা, সাহলা বিনতে সুহাইল রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন।

মহান এই সাহাবীগণের নাম ইসলামী ইতিহাসে সোনার হরফে লেখা আছে। এদের মহান অবদানে ইতিহাসের পাতা আজও উজ্জ্বল। তাদের পদচিহ্নে আজও পৃথিবীর কোটি কোটি মুসলমান পরম বিশ্বাসে সমর্পিত। অথচ এদেরই জীবনে একদা এমন ভয়াবহ বিপদ ও অগ্নিপরীক্ষা নেমে

এসেছিল—তারা তাদের জন্মভূমিকে বিদায় জানাতে বাধ্য হয়েছিলেন, বাধ্য হয়েছিলেন নির্বাসিত যাযাবরের জীবন বেছে নিতে। তাদের কারোরই তখন জানা ছিল না কখন পোহাবে কঠিন পরীক্ষার এই রাত।[১]

হিজরতের পথে দ্বিতীয় কাফেলা

আবিসিনিয়ায় যাত্রা ছিল একান্ত গোপনে। কারণ, ভয় ছিল কুরাইশ-সম্প্রদায় জানতে পারলে আবার পথের মাঝে বাধার পাহাড় দাঁড় করাতে পারে। মক্কায় অবস্থানরত মুসলমানগণ ভালো করেই বুঝেছিলেন—এটা আমাদের পরীক্ষার সময়। আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশে কতটা বিসর্জন দিতে পারি, সেটা দেখার সময় এখন। তাই এই পরীক্ষার জন্যে আমাদেরকে সদা প্রস্তুত থাকতে হবে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতিতে জুলুমের চাকায় নিষ্পেষিত অনেক মুসলমানই সফরের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন। আবিসিনিয়ার যাত্রী এই দ্বিতীয় কাফেলায় যাত্রী ছিলেন আটষট্টি জন।[২]

আবিসিনিয়ায় ঘটিত একটি বিশেষ ঘটনার কারণে এই কাফেলায় একটি বিখ্যাত নাম হয়ে উঠে জাফর ইবনে আবু তালেব। উভয় কাফেলা মিলে মোট মুসলমানের সংখ্যা ছিল তিরাশিজন। তারা আবিসিনিয়ায় সাময়িকভাবে বসবাস করতে শুরু করেন।

শয়তানের দীর্ঘ হাত

এত বড় একটা সংখ্যা মক্কা থেকে বেরিয়ে যাবে আর তা গোপন থাকবে—ভাবা যায় না। যথাসময় বিষয়টি মক্কার মুশরিক-সম্প্রদায় জানতে পারে। নতুন এই পরিস্থিতিতে তাদের কর্মপদ্ধতি কী হবে, তা নিয়ে রীতিমতো ভাবতে থাকে। কারণ, তারা যে কোনো মূল্যে ইসলামকে রুখে দাঁড়াতে দৃঢ়সংকল্প। যে করেই হোক, তাদেরকে তাদের নেতৃত্ব রক্ষা করতে হবে। পবিত্র কাবা ঘরের কারণে মক্কা ছিল কেন্দ্রীয় মর্যাদার অধিকারী।

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ১ : ৩৪৪-৩৪৫; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৬৬-৬৭; *তাবাকাতে ইবনে সাদ*, ১ : ২০৪; ইবনে সায়্যিদুন নাস, *উয়ুনুল আসার*, ১ : ২০৯; ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, ১ : ৪৯৬।

২ ইবনে সায়্যিদুন নাস, *উয়ুনুল আসার*, ১ : ২১০-২১১।

কুরাইশ ছিল তার মুতাওয়াল্লী ও তত্ত্বাবধায়ক। আর এ কারণেই সমগ্র আরবজাতি তাদেরকে পরম শ্রদ্ধা ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখত। তাই তারা ভাবত—যেদিন ইসলাম জয়লাভ করবে, সেদিনই হবে আমাদের সম্মান ও মর্যাদার শেষ সন্ধ্যা। ফলে তাদের লড়াই ছিল জীবন মৃত্যুর। তাই যে কোনো বিসর্জনের বিনিময়ে তারা ইসলাম ও মুসলমানকে রুখে দাঁড়াতে ছিল অঙ্গীকারাবদ্ধ। এখন যদি মুসলমানগণ মক্কা থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্যত্র নিবাস পাতেন এবং সেখানে গিয়ে শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ পান, তা হলে এটা তাদের জন্যে অনেক বড় ভয়ের কথা। সুতরাং এই সুযোগ তারা কোনোভাবেই দিতে প্রস্তুত ছিল না।

হিজরতের বিষয়টি কানে আসতেই তারা জরুরি বৈঠক ডাকে। পরামর্শ সভায় মুসলমানদের শক্তি ভেঙে দেওয়ার কলাকৌশল নিয়ে কথা হয়। তারা শঙ্কার সঙ্গে আলোচনা করে—মুসলমানগণ যদি আবিসিনিয়ায় গিয়ে স্বস্তিতে জীবনযাপনের সুযোগ পায়, তা হলে তাদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। হয়তো একদিন তারা এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠবে—আমাদের হাত থেকে কাবার চাবি ছিনিয়ে নেবে। আমরা সেদিন হয়তো তাদের প্রতিরোধ করার সাহসও করব না। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়—আমাদের দুইজন প্রতিনিধিকে আবিসিনিয়ার বাদশাহর কাছে প্রেরণ করা হোক। তারা গিয়ে বাদশাহকে অনুরোধ জানাবে, তিনি যেন মুসলমানদেরকে আবিসিনিয়া থেকে বের করে দেন। এই প্রস্তাবে তিনি যদি রাজি হন, তা হলে মুসলমানগণ মক্কায় ফিরে আসতে বাধ্য হবে। আমরা তখন তাদের শক্তি ও সাহসটা দেখে নেব। সব শেষে সফরের খরচপাতি, বাদশাহ এবং মন্ত্রীবর্গের জন্যে উপহার উপঢৌকন বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থকড়ির কীভাবে ব্যবস্থা হবে, তাও সিদ্ধান্ত হয়।[১]

কুরাইশ-প্রতিনিধি আবিসিনিয়ায়

কুরাইশ-সম্প্রদায় মিলে আমর ইবনুল আস ও আবদুল্লাহ ইবনে রাবীআকে[২] প্রতিনিধি করে আবিসিনিয়ায় পাঠায়। তাদের সঙ্গে বাদশাহ

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ১ : ৩৫৬।

২ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়ার* ৩:৬৯ পৃষ্ঠাতে উমারা ইবনুল অলীদের নাম লেখা আছে। কিন্তু *ইবনে হিশামের* ১ : ৩৫৭ পৃষ্ঠাতে লেখা আছে আবদুল্লাহ ইবনে রাবীআ—আর এটাই ঠিক।

এবং মন্ত্রীবর্গের জন্যে উপহার-উপঢৌকনও পাঠায়। তারা আবিসিনিয়ায় পৌঁছার পর দরবারে গুরুত্ব পাওয়ার আশায় বাদশাহর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তাদেরকে উপহার-উপঢৌকন দিয়ে কাছে টানবার চেষ্টা করে। তারপর বাদশাহর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি প্রর্থনা করে। অনুমতি পাওয়ার পর দরবারে হাজির হয়। দরবারে গিয়েই বাদশাহকে সেজদা করে, শ্রদ্ধা জানায়। তারপর উঠে গিয়ে উপঢৌকন পেশ করে। এবার বাদশাহকে সম্বোধন করে বলে, আমরা আরবের মক্কা শহর থেকে এসেছি। ওই শহরের অধিবাসীগণ আমাদেরকে আপনার দরবারে প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছে।

আবিসিনিয়ার অধিপতিকে সেকালে নাজ্জাশী বলা হতো। নাজ্জাশী তখন তাদের আগমনের কারণ জানতে চান। আমর ইবনুল আস তখন বলেন— আমাদের শহরের আমাদেরই কিছু আপনজন আপনার দেশে চলে এসেছে। তারা আমাদের পিতৃধর্ম পরিত্যাগ করেছে। আমাদের মতবিরোধের কারণে আপনার দেশে এসে আশ্রিত হয়েছে। আমাদের অনুরোধ, আপনি তাদেরকে আপনার দেশ থেকে তাড়িয়ে দিন। বাদশাহ তখন তার উপদেষ্টাদের কাছে জানতে চাইলেন, আগত ওই বিদেশিরা এখন কোথায়? তাদেরকে দরবারে ডাকা হোক। রাজদরবারের কর্মকর্তাগণ তখন ছুটে গেল মুসলমানদের আশ্রয়কেন্দ্রে। সেখানে গিয়ে তারা মুসলমানদেরকে বাদশাহর আদেশের কথা জানাল। খুব স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানগণ এই সংবাদে কিছুটা বিচলিত হলেন। অনুমান করলেন নিশ্চয় কোনো সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। তারপরও তাদের মাঝে আস্থা ছিল। দৃঢ়তা ও সাহস ছিল। তারা পূর্ব থেকেই যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন। সংবাদ পাওয়ামাত্র জাফর ইবনে আবু তালেব মুসলমানদেরকে বললেন— দরবারে গিয়ে আপনারা সকলে খামোশ থাকবেন। কেউ কোনো কথা বলবেন না। আপনাদের সকলের প্রতিনিধি হিসেবে আমিই কথা বলব। এ বিষয়ে সকলেই একমত হলেন। সকলে রওনা হলেন দরবারের উদ্দেশে। মুসলমানদের বিশাল কাফেলা। সবার আগে হযরত জাফর রাযিয়াল্লাহু আনহু।

দরবারে পৌঁছে তারা বাদশাহকে সালাম করলেন। তারপর বসে পড়লেন। সমকালীন শাহি দরবারের রেওয়াজমাফিক বাদশাহর সামনে সেজদা করার প্রথা ছিল। মুসলমানগণ তা করেননি। কুরাইশ-প্রতিনিধি আমর ইবনুল আস এমন সুযোগ হাত ছাড়া করবে কেন? সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, মহামান্য বাদশাহ, এদের বেয়াদবি লক্ষ করুন। এরা আপনাকে সেজদা পর্যন্ত করেনি। বাদশাহ সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইলেন— তোমরা সেজদা করলে না কেন? সঙ্গে সঙ্গে হযরত জাফর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন—

نحن لا نسجد الا الله عز وجل.

আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সেজদা করি না।

কেন?—বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন।

হযরত জাফর বললেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছে একজন নবী পাঠিয়েছেন। এই নবী আমাদেরকে আদেশ করেছেন, আমরা যেন আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সেজদা না করি। তা ছাড়া তিনি আমাদেরকে নামায পড়তে আদেশ করেছেন। বাদশাহ এই উত্তর শুনে সন্তুষ্ট। আমর ইবনুল আস দেখল প্রথম তিরই ব্যর্থ হলো। তারপর সে একটি স্পর্শকাতর দিক তুলে আনল। বাদশাহর সমীপে আরজ করল, এরা হযরত ঈসা সম্পর্কে বেয়াদবিমূলক কথাবার্তা বলে। নাজ্জাশী ছিলেন খ্রিস্টান। ফলে বিষয়টি ছিল খুবই স্পর্শকাতর। সামান্য ভুলের কারণে মুসলমানগণ অনেক বড় বিপদে পড়ে যেতে পারতেন। আর এ কথা চিন্তা করেই আমর ইবনুল আস নাজুক ও আশঙ্কাপূর্ণ এ বিষয়টি উত্থাপন করেছে। কিন্তু প্রতিপক্ষ তো আল্লাহর নবীর সাহাবী। তাদের কাছে মিথ্যা কিংবা ফাঁকিবাজির কোনো স্থান নেই। তারা তো ঈমান বাঁচাবার জন্যে স্বীয় জন্মভূমি ছেড়ে এসেছেন। তাই তারা ঈমানের বাইরে গিয়ে নিজেদের দীন-ধর্মের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতে পারবেন না। হযরত জাফর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন কুরআনের আলোকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে তাদের বিশ্বাসের কথা তুলে ধরেন।

নাজ্জাশী জানতে চান—তোমরা হযরত ঈসা ইবনে মারয়াম সম্পর্কে কী বলো?

হযরত জাফর বললেন—হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কালিমাতুল্লাহ্ এবং রুহুল্লাহ। আল্লাহ্ তাআলা হযরত মারয়ামের মাধ্যমে তাঁকে সৃষ্টি করেছেন। অথচ মারয়াম তখন ছিলেন কুমারী এবং তাকে কোনো মানুষ স্পর্শও করেনি। এ কথা শোনার পর বাদশাহ নাজ্জাশী ফরশ থেকে একটি বালুকণা তুলে নিয়ে বললেন—হে আবিসিনিয়ার অধিবাসীগণ, পাদ্রীগণ এবং ধর্মযাজকগণ, শুনে নাও, এরা যা কিছু বলেছে, তাতে এই কণা পরিমাণও বাড়াবার সুযোগ নেই। তারা যা বলেছে, তা-ই সত্য এবং বাস্তব। হযরত ঈসা খোদা নন, খোদার পুত্রও নন। তারপর তিনি মুসলমানদেরকে লক্ষ করে বললেন, আমি তোমাদেরকে খোশ আমদেদ জানাচ্ছি। তাঁকেও মোবারকবাদ জানাচ্ছি, যাঁর কাছ থেকে তোমরা এসেছ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি সত্যিই আল্লাহর রাসূল। আমরা আমাদের ইনজিল গ্রন্থে এই মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর আলোচনা পেয়েছি। তাঁর আগমন সম্পর্কে আমাদেরকে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। এবার তোমরা যাও। যেখানে খুশি, বসবাস করো। আল্লাহর কসম, যদি আমার ওপর রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব না থাকত, তা হলে আমি মক্কায় যেতাম এবং তাঁর জুতা মোবারক হাতে নেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতাম।[১]

তারপর নাজ্জাশী বললেন, আচ্ছা, আমাদের দেশে তোমাদের কোনো কষ্ট হচ্ছে না তো? যদি কখনো কোনো সমস্যা হয় সঙ্গে সঙ্গে জানাবে, ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তারপর বাদশাহ নাজ্জাশী মুসলমানদের খানাপিনার সমস্যা যেন না হয়, সে বিষয়ে শাহি আদেশ জারি করলেন। আর মক্কা থেকে আগত প্রতিনিধি আমর ইবনুল আস এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবু রাবীআ যে সকল উপহার সামগ্রী দিয়েছিল, সেগুলো ফেরত দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশ ছেড়ে চলে যেতে আদেশ করেন।

---

১ ইবনুল আসীর, *আল-কামিল ফিত তারীখ*, ১ : ৪৯৮-৫০১; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৬৯; *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ১ : ৩৫৭-৩৬৪; ইবনে সায়্যিদুন নাস, *উয়ুনুল আসার*, ১ :২১২-২১৩।

চরম লজ্জিত বদনে

যে আবেগ উচ্ছ্বাস ও আত্মতৃপ্তিসহ কুরাইশ তাদের প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিল, ভেবেছিল—তাদের প্রতিনিধি দুইজনই কথার রাজা, তারা তাদের কথার যাদুতে বাদশাহর দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হবে, বাদশাহ আশ্রিত মুসলমানগণকে আবিসিনিয়া থেকে তাড়িয়ে দেবে; কিন্তু তাদের সকল স্বপ্ন ধুলোয় মিশে গেল, বাতাসে হারিয়ে গেল আশার সকল পায়রা। প্রদত্ত উপহার-উপঢৌকন শুধু তারা প্রত্যাখ্যানই করেননি বরং তৎক্ষণাৎ আবিসিনিয়া থেকে বেরিয়ে যেতে আদেশ করেছেন। এর বিপরীতে মুসলমানগণ আগের তুলনায় অধিক সম্মান ও যত্নে নিবাসিত হয়েছেন তাদের রাজ্যে। বাদশাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্যে নানা সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কুরাইশদের দুই প্রতিনিধি চরম ব্যর্থতায় লজ্জিত বদনে ফিরে এসেছে মক্কায়।

এই প্রতিনিধিদল মক্কায় এসে দেখে এখানে এরই মধ্যে সংঘটিত হয়ে গেছে বিশাল বিপ্লব। কুরাইশদের অন্যতম বীর সন্তান উমর ইবনুল খাত্তাব ইসলাম কবুল করেছেন। মুসলমানদের সাহস এতটাই উঁচু হয়েছে, তারা খোলামেলা কাবায় এসে নামায আদায় করেন। তাদেরকে সরাসরি বাধা দেওয়ার সাহস খুঁজে পায় না কুরাইশ-নেতৃবৃন্দ।

উমর ইবনুল খাত্তাব

সমাজ যাকে অত্যন্ত কঠোর মনে করে—তার অন্তরের কোনো একটি কোণেও একটি নরম আসন থাকে। কখনো কখনো তার প্রকাশও ঘটে। এর সুন্দর উপমা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু। ইসলামপূর্বকালের ঘটনাবলিতে আমরা দেখি—একদিকে যেমন তিনি কঠোরস্বভাব ও পাষাণহৃদয় বলে বিখ্যাত, অন্যদিকে তারই জীবনের বাঁকে বাঁকে কোমলতার নরম কিশলয়।

আমের ইবনে রাবীআর স্ত্রী লায়লা বিনতে আবু হাসামাহ বলেছেন, আমরা তখন হাবশায় হিজরতের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এই প্রস্তুতি উপলক্ষেই কী কাজে যেন আমার স্বামী আমের ঘরের বাইরে গেছেন। আমি ঘরেই ছিলাম। এরই মধ্যে উমর উপস্থিত। তখনো তিনি মুশরিক। আমার সামনে

এসে দাঁড়ালেন। আমরা স্বামী-স্ত্রী মুসলমান হয়েছি বলে বরাবর নির্যাতিত হতাম উমরের হাতে। তার হাতে আমরা নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছি। তার স্বভাব ছিল এমনিতেই কঠোর। তার এই পাষাণস্বভাব ও রুদ্রমূর্তির বারবার মুখোমুখি হয়েছি আমরা। সেদিন উমর এসে দেখলেন আমরা সফরের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছি। দেখেই প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি দেশত্যাগের কথা ভাবছ? বললাম, হ্যাঁ, আমরা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে যাচ্ছি। আল্লাহর দুনিয়া অনেক বড়। নিশ্চয় তিনি আমাদেরকে মাথা গুঁজবার ঠাঁই করে দেবেন। আপনারা আমাদেরকে অনেক কষ্ট দিয়েছেন। জুলুমে জুলুমে আমাদের জীবনকে বিষিয়ে তুলেছেন। এখন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আপনাদের নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচার পথ করে দিয়েছেন। আমরা আপনাদের জালেমপাঞ্জা থেকে অনেক দূরে চলে যাব। আমার পরিষ্কার কথা শুনে উমর বললেন, আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে থাকুন। আমি লক্ষ করলাম, আমাদের দেশত্যাগের কথা শুনে উমরকে বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছে। এর আগে কখনো উমরকে এভাবে কোমল হতে দেখিনি। আমি সত্যি তাজ্জব হয়েছি। কিছুক্ষণ পর আমার স্বামী আমের ফিরে আসেন। আমি তাকে বললাম, আপনি যদি উপস্থিত থাকতেন, তা হলে সত্যিই দেখতে পেতেন—আমাদের দেশত্যাগের কথা শুনে উমরকে কতটা চিন্তিত ও আহত দেখাচ্ছিল। আমার স্বামী আমের তখন বললেন, তুমি কি চাও উমর মুসলমান হয়ে যাক? আমি বললাম, কেন চাইব না? তিনি বললেন, উমর তো খাত্তাবের পুত্র। খাত্তাবের গাধাটিও যদি মুসলমান হয়ে যায়, তবুও উমর মুসলমান হবে না।[১]

অসম্ভব হলো সম্ভব

নবুওয়তের ষষ্ঠ বছর শুরু হতে যাচ্ছে। মুসলমানদের এক বিরাট কাফেলা স্বদেশ ছেড়ে আবিসিনিয়ায় চলে গেছে। যারা এখনো মক্কায় রয়ে গেছেন বরাবর মক্কার মুশরিকদের জুলুম ও অবিচারের মুখোমুখি হচ্ছেন। উমর ইবনুল খাত্তাবও ছিলেন মক্কার মুশরিকদের চিন্তা ও বিশ্বাসে সহযাত্রী। তিনি বরং তাদের মধ্যেও ছিলেন দু'কদম এগিয়ে। তবে তিনি যখন

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৭৯।

সজোরে পা উত্তোলন করছিলেন, তখন তার পায়ে আরোপিত হচ্ছিল অদৃশ্য জিঞ্জির। বলা যায় ওড়ার আগেই পাখি পিঞ্জিরাবদ্ধ হয়ে পড়ে। উমর ইবনুল খাত্তাবের অনেক আগেই তার বোন ফাতেমা বিনতুল খাত্তাব এবং তার স্বামী সাঈদ ইবনে যায়েদ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তবে তা ছিল গোপন। এই খবর উমরেরও জানা ছিল না, অথচ এরই মধ্যে এই ঈমানদার যুগলের আকিদা-বিশ্বাস পূর্ণ শক্ত হয়ে উঠেছে। বনু আদির আরেক সদস্য নাঈম ইবনে আবদুল্লাহ নাহহামও ইসলাম কবুল করেছিলেন। এ ঘটনাও ছিল তাদের অজানা। একজন মজলুম মুসলমান—খাব্বাব ইবনুল আরাত—কুরআন শেখাবার জন্যে ফাতেমা বিনতুল খাত্তাব এবং সাঈদ ইবনে যায়েদের ঘরে যেতেন।

একদিনের ঘটনা। একটি ভয়ানক সিদ্ধান্ত নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছেন। কাঁধে তরবারি। চলছেন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিবাসকে লক্ষ্য করে। তখন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পর্বতের কোলে তাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে অবস্থান করছিলেন। আবিসিনিয়ায় হিজরতের পর যে সকল মুসলমান মক্কায় থেকে গিয়েছিলেন, তারা তখন সেখানেই অবস্থান করতেন। তাদের সংখ্যা ছিল ঊনচল্লিশ জন। তাদের মধ্যে নারীও ছিল, পুরুষও ছিল। সবিশেষ তাদের মধ্যে ছিলেন নবীজির চাচা হযরত হামযা, হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

মক্কায় অবস্থানরত অন্য মুসলমানদের মধ্যে নাঈম ইবনে আবদুল্লাহও ছিলেন। কিন্তু মক্কার লোকেরা জানত না তিনি মুসলমান। তাই তিনি যেখানে খুশি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারতেন। বিষয়টা হযরত উমরেরও জানা ছিল না। পথে তার সঙ্গেই সাক্ষাৎ হয় হযরত উমরের। দেখেই নাঈম ইবনে আবদুল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, উমর কোথায় যাচ্ছ? উমর তপ্ত তীক্ষ্ণ ভাষায় উত্তর দিলেন—সেই ব্যক্তির সন্ধানে যাচ্ছি, যিনি কুরাইশ-বংশের মান-সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন। আমাদের যুবকদেরকে বোকা বানিয়ে ফেলেছেন। আমাদের ধর্মের ত্রুটি বলে বেড়াচ্ছেন। আমাদের মাবুদদের সমালোচনা করছেন। আজ আমি তাকে হত্যা করে এখানেই ঘটনার ইতি টানতে চাই। নাঈম ইবনে আবদুল্লাহ লক্ষ করলেন, বিষয়টি

খুবই ভয়ানক। উমরকে তার প্রতিজ্ঞা থেকে সরিয়ে আনা সহজ কথা নয়। নাঈম ভাবলেন, যে করেই হোক, তার মনোভাব অন্যদিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। তাই বললেন, উমর, তুমি মুহাম্মাদকে হত্যা করতে চাচ্ছ? এর পরিণাম কি কিছু ভেবেছ? বনু আব্দে মানাফ তোমাকে এরপর কতটুকু সময় বেঁচে থাকার সুযোগ দেবে? তোমার মন তোমাকে ভুল পরামর্শ দিয়েছে। তোমার উচিত বাড়িতে গিয়ে নিজের ঘর সামলানো। আগে নিজের ঘর সামলাও তারপর অন্যের কথা ভাবো।

উমর প্রশ্ন করলেন—আমার পরিবারের কেউ কি বেদীন হয়েছে? নাঈম ইবনে আবদুল্লাহ বললেন, হ্যাঁ হয়েছে। তোমার বোন ফাতেমা এবং তার স্বামী সাঈদ। আল্লাহর কসম, তারা ইসলাম কবুল করেছে। প্রথমে তুমি তাদেরকে সামলাও। উমর সেখান থেকেই ফিরে দাঁড়ান। সোজা গিয়ে ওঠেন বোন ফাতেমার ঘরে। হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন ফাতেমা এবং সাঈদকে পবিত্র কুরআনের একটি সূরা পড়াচ্ছিলেন। ঘরের বাইরে উমরের পায়ের আওয়াজ শুনতেই বোন ফাতেমা টের পান উমর চলে এসেছেন। হযরত খাব্বাবকে সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতরের কুঠুরিতে পাঠিয়ে দেন। হাতের সামনে খোলা কুরআনের পাতাগুলো দ্রুত লুকিয়ে ফেলেন। এদিকে উমর যখন ঘরের কাছাকাছি পৌছান কুরআন তেলাওয়াতের ধ্বনি তার কানকেও স্পর্শ করে। তাই ঢুকেই জিজ্ঞেস করেন—তোমরা কী পড়ছিলে? আমাকে দেখাও। আমি শুনেছি। তারা বললেন, আপনি কিছুই শোনেননি। উমর জ্বলে উঠলেন। বললেন, হ্যাঁ, আমি শুনেছি। আমি এও জেনেছি তোমরা বেদীন হয়ে গেছ। তোমরা দুইজনই নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছ। এ কথা বলেই ভগ্নিপতি সাঈদকে মুঠোয় ভরে ফেলেন। ফাতেমা এগিয়ে যান। ভাইয়ের পাঞ্জা থেকে স্বামীকে ছাড়িয়ে আনেন। উমর এবার সাঈদকে ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন বোনের ওপর। আঘাতে আঘাতে তাকে রক্তাক্ত করে ফেলেন। ঘটনা যখন চরমে পৌছে যায়, তখন ফাতেমা এবং সাঈদও পরিণতির পরোয়া না করে শক্ত হয়ে দাঁড়ান। পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেন—শুনুন, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমরা আমাদের ঈমানের ওপর অটল আছি। এখন আপনার যা খুশি করুন। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন তাদের এই দৃঢ় সত্য বাণী শুনলেন, চোখ তুলে তাকালেন বোনের মুখের দিকে। তখন তার

রক্তাক্ত চেহারা উমরের ক্ষোভের আগুনকে মুহূর্তে শীতল করে দিলো। উমর মনে মনে লজ্জিত হলেন। কী যেন খানিকটা ভেবে বললেন—তোমরা কী যেন পড়ছিলে, বের করো। আমাকে একটু দেখাও। মুহাম্মাদ কী দিয়েছেন তোমাদেরকে?

উমর ছিলেন একজন শিক্ষিত মানুষ। তিনি যখন তার বোনের কাছে কুরআনের কপিটি চাইলেন, তখন তার বোন ফাতেমা স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলো, আমরা আপনার ওপর ভরসা রাখতে পারছি না। আপনি তো হাতে নিয়ে ওটা ছিঁড়েও ফেলতে পারেন। তা ছাড়া যদি ফেরত না দেন। সুতরাং আপনাকে ওটা দেওয়া যাবে না। উমর তখন লাত-উয্যার কসম খেয়ে বললেন, তোমরা ভয় কোরো না। আমি পড়ে আবার ফেরত দেব। আমার কথা বিশ্বাস করো। আমার ওপর ভরসা রাখো। ফাতেমার মনে তখন পরম আকুতি—আহা, আমার ভাইটি যদি মুসলমান হতেন! মনের এই আবেগ ও আকুতি সত্ত্বেও তিনি সোজা বলে দিলেন, আপনি তো অপবিত্র। এই কালাম কোনো অপবিত্র ব্যক্তি স্পর্শ করতে পারে না। আমরা আপনার হাতে এটা কীভাবে দিই।

উমর ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। কাছেই কোথাও গিয়ে গোসল করেন। দ্রুত ফিরে আসেন বোনের ঘরে। হযরত ফাতেমা তখন পবিত্র কুরআনের কপিটি তার হাতে তুলে দেন।

ক্ষুদ্র ওই কপিটিতে কয়েকটি সূরা লিখিত ছিল। তন্মধ্যে সূরা তহাও ছিল। উমর পূর্ণ মনোযোগসহ সূরাটি তেলাওয়াত করলেন। তারপর বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন—

ما احسن الكلام!

কী চমৎকার বাণী!

এতক্ষণ পর্যন্ত হযরত খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু কুঠুরিতে লুকিয়ে ছিলেন। উমরের কণ্ঠে এই মধুর উচ্ছ্বাস উচ্চারিত হতেই নির্দ্বিধায় বেরিয়ে এলেন খাব্বাব। এসেই বললেন, উমর, কালই হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে আপনার জন্যে দুআ করেছেন। আমি

আমার কানে শুনেছি। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করছিলেন—

اللهم ايد الاسلام بابي الحكم او بعمر بن الخطاب.

হে আল্লাহ, তুমি আবুল হিকাম কিংবা উমর ইবনুল খাত্তাবকে দিয়ে ইসলামকে শক্তিশালী করো।

উমর আপনার ভাগ্যেই এই সৌভাগ্য লেখা ছিল। উমর তখন হযরত খাব্বাবকে বললেন—জনাব, আমাকে হযরতের কাছে নিয়ে চলুন। আমি এখনই ইসলাম কবুল করব।

খাব্বাব বললেন—আমি পথ বলে দিচ্ছি। আপনি সোজা চলে যান। সাফা পর্বতের কোলে যে বাড়িটি, এখন সেখানেই তিনি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে অবস্থান করছেন।

আল্লাহু আকবারের স্লোগান

ঠিকানা জানামাত্রই উমর উঠে দাঁড়ান। তরবারিটি কাঁধে তুলে নেন। তারপর সোজা হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিবাসের দিকে হাঁটতে শুরু করেন। দরজার সামনে গিয়ে আওয়াজ দেন। কপাট ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। উমরের কণ্ঠ শোনামাত্র সাহাবায়ে কেরাম উঠে দাঁড়ান। দরজার ফাঁক গলিয়ে দেখেন উমর দাঁড়িয়ে আছেন। তার কাঁধে তরবারি ঝুলছে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু বলবেন তার আগেই হামযা বলে উঠলেন—দরজা খুলে দাও। যদি সৎ উদ্দেশ্যে এসে থাকে, তা হলে স্বাগতম জানাব। আর যদি কোনো দুষ্ট উদ্দেশ্যে এসে থাকে, তা হলে তার তরবারি দ্বারাই তার গর্দান উড়িয়ে দেব। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—দরজা খুলে দাও এবং ভেতরে আসার অনুমতি দাও।

খুলে গেল দরজা। ছোট ছোট পা ফেলে ধীরে ধীরে প্রবেশ করলেন উমর। তাকে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এগিয়ে গিয়ে বুকের মধ্যে শক্ত করে চেঁপে ধরলেন। তারপর ছেড়ে দিয়ে বললেন—উমর কেন এসেছ?

উমর অত্যন্ত নরম ভাষায় বললেন, শুধু এই জন্যে এসেছি—আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং তিনি যে দীন নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি ঈমান আনতে চাই। এ কথা শুনে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিৎকার করে বলে উঠলেন—আল্লাহু আকবার।

নবীজির কণ্ঠে এই তাকবীরধ্বনি শুনে সেখানে অবস্থানরত সাহাবায়ে কেরাম বুঝতে পারেন হযরত উমর ইসলাম কবুল করেছেন।[১]

কুরাইশ-সম্প্রদায়, শোনো!

আবুল আরকামের ঘরে অবস্থানরত মুসলমানগণ যখন দেখতে পেলেন কুরাইশদের বাঘ ইসলাম কবুল করেছেন, তখন তাদের সকলের মুখে মুখে সেই একই কথা। মুসলমানগণ তখন উপলব্ধি করেন কুরাইশদের দুইজন বীরসন্তান হযরত হামযা এবং উমর ঈমান লাভে ধন্য হয়েছেন। এখন মুসলমানদের দিন বদলে যাবে। আমাদের নির্যাতনের দিন ফুরিয়ে এসেছে। মহান এই দুই বীর এখন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শক্তিমান বাহু হয়ে দাঁড়াবেন। তার পক্ষ হয়ে প্রতিরোধ-প্রতিবাদ করবেন। হযরত উমর ছিলেন বিখ্যাত দুঃসাহসী বীর পুরুষ। তাই মুসলমানদের এই সুধারণা অমূলক ছিল না। হযরত উমরের বলেই একদা তারা কাবায় গিয়ে সকলের সামনে নামায পড়তে পেরেছেন।

হযরত উমর ছিলেন স্বভাবজাত দুঃসাহসী। তাই তিনি অস্থির ছিলেন কীভাবে তার ইসলাম গ্রহণের কথাটি সকলকে খোলামেলা জানাবেন। তিনি ভাবতে লাগলেন কুরাইশদের মধ্যে কথা চালাচালিতে সবচেয়ে উস্তাদ ব্যক্তি কে? খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলেন, জামিল ইবনে মুআম্মার জামহী একজন প্রচণ্ড চোগলখোর। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সকালে ঘুম থেকে উঠে তার বাড়িতে চলে যান। তাকে বাড়ি থেকে বাইরে ডেকে এনে বলেন—জামিল, খবর রাখো কিছু! আমি তো মুসলমান হয়ে গেছি। আমি মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীন কবুল করেছি। এ কথা শোনামাত্র জামিল আর অন্য কিছু জিজ্ঞেস না করে সোজা কুরাইশদের

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৮০-৮১; ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, ১ : ৫০২-৫০৩; *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ১ : ৩৬৪; ইবনে সায়্যিদুন নাস, *উয়ুনুল আসার*, ১ : ২১৬-২১৮।

মজলিসের দিকে হাঁটা দেয়। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-ও তার পিছে পিছে হাঁটতে থাকেন। হেরেম শরীফের দরজায় গিয়ে দেখে কুরাইশ-নেতাগণ মাহফিল সাজিয়ে বসে আছে। জামিল দরজা থেকেই চেঁচিয়ে বলতে থাকে—কুরাইশ-সম্প্রদায়, শুনেছ! উমর বেদীন হয়ে গেছে। ততক্ষণে হযরত উমরও সেখানে উপস্থিত। তিনি যখন শুনলেন জামিল চেঁচিয়ে বলছে উমর বেদীন হয়ে গেছে—তখন তিনি আরও উঁচু কণ্ঠে চিৎকার করে বললেন—হে কুরাইশ-সম্প্রদায়, জামিল মিথ্যাবাদী। আমি বেদীন হইনি। আমি মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর দীন কবুল করেছি—

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله.

এদিকে হযরত উমরের ছেলে আবদুল্লাহও বাবার পেছনে পেছনে হাঁটছিল। হযরত উমর যখন তার ঈমানের ঘোষণা দিচ্ছিলেন পুত্র আবদুল্লাহ তখন পেছনে দাঁড়িয়ে। আবদুল্লাহর কথা—আমার পিতার এই ঘোষণা শোনামাত্র সেখানে উপস্থিত কুরাইশ-নেতৃবৃন্দ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যতটা সম্ভব তাকে মারধর করে। তাদের রাগ প্রশমিত হওয়া পর্যন্ত আমার বাবার ওপর নির্যাতন চলতে থাকে। দীর্ঘসময় ধরে চলে এই মারধর। সূর্য অনেক উপরে উঠে যায়। হযরত উমরও পূর্ণ শক্তিতে প্রতিরোধ করতে থাকেন। একসময় মারতে মারতে তারা সকলেই ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে। হযরত উমর বসে আছেন। আঘাতে আঘাতে চরম আহত। তাকে ঘিরে রেখেছে কুরাইশ-নেতৃবৃন্দ। উমর তখন তাদেরকে লক্ষ্য করে বলতে থাকেন—যা খুশি করো। আজ আমাদের হাতে যদি তিনশো জন মুসলমানও থাকত, তোমাদের সঙ্গে চূড়ান্ত লড়াই হতো। এই লড়াইয়ে হয়তো তোমাদের অস্তিত্ব ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিতাম কিংবা আমরা এ পথে আমাদের জীবন বিলিয়ে দিতাম।

এমন সময় সেখানে এক ব্যক্তি এসে হাজির। তার গায়ে মূল্যবান পোশাক। এসেই তাজ্জবের সুরে বলতে থাকেন—কুরাইশ-সম্প্রদায়, এ তোমরা কী করছ! তারা সকলে একসঙ্গে বলে উঠল—উমর বেদীন হয়ে গেছে। আমরা তার চিকিৎসা করছি। লোকটি ধমক দিয়ে বলে, একে ছেড়ে

দাও। সে যা ভালো মনে করেছে, তা-ই করেছে। এতে তোমাদের কী? তোমরা কি ভেবেছ আদী ইবনে কাব গোত্র তোমাদের হাতে তাদের এক সন্তানকে ছেড়ে দেবে আর তোমরা তার সঙ্গে যা খুশি করবে? এ কথা শোনামাত্র প্রত্যেকেই নিজ নিজ ঘরে চলে যায়। এই মাঝখানে পড়ে কথা বলেছে যে লোকটি, সে হলো হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিখ্যাত শত্রু আস ইবনে ওয়াইল। এই লোক হযরত উমরের খান্দান সম্পর্কে জানত। জানত তাদের শক্তির কথা। তার জানা ছিল—আদী ইবনে কাব গোত্র যদি উমরের সাহায্যে এসে দাঁড়ায়, তা হলে তাদের মোকাবেলা করা সহজ নয়। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি সহমর্মিতা কিংবা দরদের কারণে নয়, বরং নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থের কথা ভেবেই সে মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে।[১]

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল আবু জেহেল

হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ভালো করেই জানতেন নবীজির শত্রুদের মধ্যে সবচেয়ে কঠোর ও আপসহীন তার মামা আবু জেহেল। তাই তিনি ভাবলেন—আমার ইসলাম গ্রহণের কথাটি আবু জেহেলকে জানানো দরকার। পুরোনো ও বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মোতাবেক ইসলাম কবুল করার পর হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন রাতে বিছানায় যান, তখন ভাবতে থাকেন—হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে কঠোর শত্রু কারা? আমি তাদের কাছে যাব। তাদেরকে গিয়ে বলব, আমি ইসলাম কবুল করেছি। এর প্রভাবটা কী হয়, আমি দেখব। ভেবে দেখলাম, নবীজির সবচেয়ে বড় দুশমন আবু জেহেল। ভোর হতেই তার ঘরে ছুটে গেলাম। কড়া নাড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে আবু জেহেল বেরিয়ে এল। বলল, স্বাগতম ভাগ্নে। এই সকালবেলা কী উদ্দেশ্যে এসেছ? হযরত উমর বললেন, আমি আপনাকে শুধু এই সংবাদটুকু দিতে এসেছি—আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। তিনি যে সকল বাণী নিয়ে এসেছেন, সেগুলো মেনে নিয়েছি। আমার এই কথা

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ১ : ৩৭০-৩৭৪।

শোনামাত্র আবু জেহেল সজোরে দরজা বন্ধ করে দেয় এবং এই বলে গালি দেয়—

قبحك الله وقبح ما جئت به.

আল্লাহ তোমাকে কলঙ্কিত করুন। কলঙ্কিত করুন তোমার আনীত ধর্মকে।

মুসলমান হলো নাজরানের খ্রিস্টান-কাফেলা

আমর ইবনুল আস এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবু রাবীআর ব্যর্থ আবিসিনিয়া ভ্রমণ, হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ইসলাম গ্রহণসহ ঘটিত অন্যান্য ঘটনা কুরাইশের মুশরিকদের অন্তরকে চিন্তিত ও ক্ষুব্ধ করে তোলে। তারা ভেবে অস্থির হয়ে পড়ে—আমাদের কোনো কৌশলই কাজ করছে না! ক্রমাগত ইসলাম শক্তি সঞ্চয় করছে। দুই-চারদিন যদি নিরিবিলি কেটে যায়, তারপরই শোনা যায় মক্কার বড় কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এভাবে ধীরে ধীরে আমাদের শক্তি ক্ষয়ে যাচ্ছে। সম্প্রসারিত হচ্ছে ইসলামের বলয়। মক্কার বাইরেও তার হাত পা ছড়িয়ে দিয়েছে। তারা লক্ষ করেছে, দূর-দূরান্ত থেকে আগত বিভিন্ন গোত্রের লোকজন ইসলাম কবুল করছে। এরই মধ্যে যখন তারা নাজরান থেকে একটি খ্রিস্টান কাফেলা আসতে দেখল, তখন তো তাদের অন্তর জুড়ে যেন বিষাক্ত সাপ ছুটোছুটি করতে লাগল। আশ্চর্য, এসেই কাফেলা ইসলাম কবুল করে নিয়েছে।

কথায় আছে না, অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশ উত্তম পরিণতি ডেকে আনে। অনেক সময় দেখা যায়, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ প্রতিকূল, অথচ সেই প্রতিকূল পরিবেশেই লুকিয়ে থাকে বিজয়ের বাণী। কুরাইশ-সম্প্রদায় মুসলমানদের প্রতি এমন অবিচার করেছে—মক্কায় থাকাই ছিল তাদের জন্যে দায়। একদা বাধ্য হয়ে তাদেরকে চোখের জলে বিদায় জানাতে হয়েছে প্রিয় মাতৃভূমিকে। জন্মভূমি ছেড়ে নির্বাসনে যেতে হয়েছে। দৃশ্যত এই বেদনার ভেতরই লুকিয়ে ছিল কল্যাণের মহান বাণী। বিশাল সংখ্যক সাহাবী আবিসিনিয়ায় নির্বাসিত হয়েছেন। ফলে কথাটি চারদিকে ছড়িয়ে

পড়ে। মানুষ বলাবলি শুরু করে—মক্কায় একজন নবীর আগমন হয়েছে। কিছু লোক এই নবীর ধর্ম গ্রহণ করেছেন। মক্কার মুশরিক-সম্প্রদায় তাদেরকে তাদের মাতৃভূমি থেকে বের করে দিয়েছে। তারা নির্বাসিত হয়েছেন আবিসিনিয়ায়। কথাটি এ কান ও কান হয়ে নাজরানেও পৌঁছে যায়। নাজরান ছিল খ্রিস্টান-অঞ্চল। সেখানকার শিক্ষিত সম্প্রদায় ইনজিল গ্রন্থে একজন নবী আগমনের শুভবার্তা পূর্বেই পাঠ করেছিল। তাই তারা জানত—শীঘ্রই একজন নবী আসবেন। তার নাম হবে আহমদ। আবিসিনিয়ার ঘটনাটি শোনামাত্র বিষয়টি যাচাই করে দেখার জন্যে বিশ সদস্যের একটি টিম মক্কায় ছুটে আসে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তারা বায়তুল্লাহর কাছে পায়। তিনি তখন ইবাদতে মশগুল। সামান্য দূরে মক্কার মুশরিক-সম্প্রদায় আড্ডা দিচ্ছে। খ্রিস্টান প্রতিনিধিদল সেখানেই হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তারা তাঁকে নবুওয়ত ও রেসালাতের সত্যতা জানবার জন্যে বেশ কিছু প্রশ্ন করে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেন। নবীজির উত্তরে তারা পূর্ণ আশ্বস্ত। অবশেষে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেন এবং কুরআন তেলাওয়াত করে শোনান। নবীজির তেলাওয়াত তাদের অন্তর ছুঁয়ে যায়। গলে যায় হৃদয়। চোখ বেয়ে নেমে আসে তৃপ্তির অশ্রুধারা। তারা ইসলাম কবুল করে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বায়আত গ্রহণ করে। তারা নিঃশঙ্কভাবে বুঝতে পারে—আমাদের কিতাবে সর্বশেষ নবী সম্পর্কিত যত নিদর্শন আছে, সবই তাঁর মধ্যে উপস্থিত। সুতরাং নিঃসন্দেহে তিনি সত্য নবী।

বাইয়াত গ্রহণের পর যখন তারা বিদায়ের উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ায় এবং হাঁটতে শুরু করে—তখন দূরে বসে সেই দৃশ্য দেখতে থাকে মক্কার মুশরিক-সম্প্রদায়। কয়েকজন মজলিস ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। দলের একেবারে সম্মুখভাগে আবু জেহেল। এসেই তারা বিদেশি প্রতিনিধিদলের সামনে দাঁড়িয়ে যায় এবং আবোলতাবোল বকতে শুরু করে। আবু জেহেল তাদের লক্ষ্য করে বলে—তোমরা খুবই খারাপ মানুষ। তোমাদের অঞ্চলের

লোকজন তোমাদেরকে সত্যসন্ধানের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছে। আর মক্কায় এসে তোমরা একজনমাত্র ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করে চলে যাচ্ছ। তোমরা ভেবে দেখেছ, তোমরা কতটা বোকা ও আহম্মক? এক ব্যক্তির পাশে তোমরা কয়েক মিনিট বসেছ আর এরই মধ্যে নিজেদের দীন ও ধর্ম ছেড়ে দিয়েছ। সে যা বলেছে, চোখ বন্ধ করে মেনে নিয়েছ। আমরা আজ পর্যন্ত তোমাদের মতো এমন বিবেক-বুদ্ধিহীন লোক দেখিনি। প্রতিনিধিদল এদের হাবভাব দেখে কথা দীর্ঘ করাকে সমীচীন মনে করল না। শুধু এইটুকু বলে আপন গন্তব্যে পা বাড়াল—

لانجاهلكم سلام عليكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم.

আমরা তোমাদের বোকা বলব না। তোমাদেরকে সালাম। আমাদের আমল আমাদের কাছে আর তোমাদের কাছে তোমাদের আমল।[১]

আবিসিনিয়া থেকে ফিরে এলেন কয়েকজন

কয়েকদিন পর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হলো সূরাতুন নাজম। সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি চলে যান বায়তুল্লায়। সেখানে গিয়ে পুরো সূরাটি তেলাওয়াত করেন। তেলাওয়াত শেষ হওয়ার পর সেজদা করেন। সেখানে উপস্থিত কুরাইশদের বিশাল একটি দল তখন নিশ্ছিদ্র মনোযোগে শুনতে থাকে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তেলাওয়াত। আত্মহারা এই শ্রোতামণ্ডলি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তেলাওয়াতে হারিয়ে ফেলে নিজেদেরকে। পাক কুরআনের অলৌকিক ভাষাব্যঞ্জনা হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুম্বককণ্ঠ এবং কুরআনের বাণীমাধুর্য পূর্ণরূপে দখল করে নেয় তাদের মানস অস্তিত্ব। তেলাওয়াত করতে করতে সূরাটির শেষপ্রান্তে যখন নবীজি সমর্পিত হন সেজদায়, তখন আত্মহারা এই অবিশ্বাসী শ্রোতাজনও লুটিয়ে পড়ে সেজদায়। তাদের মধ্যে কেবল ওলীদ ইবনে মুগীরা সেজদা করেনি। সেও এক মুঠ মাটি তুলে কপালে চেপে ধরে। মানুষ যখন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মক্কার মুশরিক-শ্রেণিকে

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৮২; ইবনে সায়্যিদুন নাস, *উয়ুনুল আসার*, ১ : ২২৬।

সেজদা করতে দেখে তখন বিস্ময়ে অবাক হয়। কারণ, এরা সকলেই হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রক্তপিপাসু শত্রু। আর তারাই এখন তাঁর সঙ্গে সেজদাবনত। দর্শক সকলেই অনুমান করল— মক্কার মুশরিক-সম্প্রদায় বুঝি নবীজির সঙ্গে শত্রুতা ত্যাগ করেছে। তাঁর প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। কীভাবে যেন আবিসিনিয়ায় অবস্থানরত মুহাজিরদের পর্যন্ত এই কথাটা চলে যায়। তারা জানতে পারে মক্কার মুশরিক এবং কুরাইশ-নেতৃবৃন্দের সঙ্গে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমঝোতা হয়েছে। তাদের পরস্পরে আপস-রফা হয়ে গেছে। মুহাজিরদের মধ্যে কেউ কেউ সত্যি সত্যি কথাটি বিশ্বাস করে নেয়। এই ঘটনা শোনার পর তাদের অন্তরে মাতৃভূমির স্মৃতি জেগে উঠে। তেত্রিশ জন মুহাজির তখন আবিসিনিয়া ছেড়ে মক্কার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে। অবশিষ্ট পঞ্চাশ জন নবীজির আদেশের অপেক্ষায় আবিসিনিয়ায় থেকে যায়।[১]

আবিসিনিয়া থেকে প্রত্যাগমনকারীগণ মক্কায় এসে দেখেন তাদের আগমনের পূর্বেই এখানে এক বিশাল বিপ্লব হয়ে গেছে। কুরাইশ-সম্প্রদায় বনু হাশেম এবং বনু আবদুল মুত্তালিবের সঙ্গে কঠিন বয়কট করেছে। আবু তালেব তখন বাধ্য হয়ে তার পুরো সম্প্রদায়সহ পাহাড়ের ঘাঁটিতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। তারা সকলে মিলে এক ধরনের কয়েদির জিন্দেগি যাপন করছেন। অন্যদের জন্যে তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎও কঠিন হয়ে পড়েছে।

এই ছিল অবস্থা। এই অবস্থায় আবিসিনিয়া থেকে তেত্রিশ জন মুহাজির এসে উঠেছেন। মক্কায় পা দেওয়ামাত্র তারা বুঝতে পারেন, যে সংবাদটি তারা আবিসিনিয়ায় বসে পেয়েছেন, তা ভুল ছিল। ভুল ধারণা থেকে প্রচারিত একটি সংবাদকে তারা যথার্থ বলে বিশ্বাস করেছিলেন। তাদের

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ১ : ৩৮৮; ইবনে সায়্যিদুন নাস, *উয়ুনুল আসার*, ১ : ৪১৩; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৯০-৯—এইখানে *তাবাকাতে ইবনে সাদের* ১ : ২০৫-২০৬ ও ইবনুল আসীরের *আল-কামিলের* ১ : ৪৯৭-৪৯৮ পৃষ্ঠায় আবিসিনিয়া থেকে মুহাজিরগণের প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে 'তিলকাল গারানীকুল উলা' সম্পর্কিত বর্ণনাটি পত্রস্থ হয়েছে। এটা আসলে ধর্মত্যাগীদের মনগড়া ও মিথ্যা বর্ণনা। আল্লামা ইবনে কাসীর র. *বুখারী শরীফের* বিভিন্ন বর্ণনার আলোকে উক্ত বর্ণনাটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। এই লেখকও তার *তাফসীরোঁ মে ইসরাইলী রেওয়ায়াত* গ্রন্থে বিভিন্ন দলিল-প্রমাণের আলোকে এই বর্ণনাটি যে মিথ্যা, তা সবিস্তারে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। বিষয়টি সেখানে পড়া যেতে পারে।-আসীর আদরবী

মধ্যে কেউ কেউ এই ভুলের কারণে মনে মনে আহত হন। সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় আবিসিনিয়া চলে যান। অবশিষ্টগণ মক্কায়ই থেকে যান। আর তখন তাদের প্রতি নেমে আসতে শুরু করে পূর্ববৎ জুলুম নির্যাতন।

আবার সেই ভয়াবহ জীবন

আবিসিনিয়া থেকে যারা ফিরে এসেছিলেন, তাদের মধ্যে উসমান ইবনে মাযউন রাযিয়াল্লাহু আনহু-ও ছিলেন। এখানে এসে যখন দেখলেন অবস্থা আগের চেয়েও ভয়াবহ, তখন তিনি ওলীদ ইবনে মুগীরার কাছে আশ্রয় চাইলেন। ওলীদ সঙ্গে সঙ্গে তাকে আপন আশ্রয়ে গ্রহণ করল। কুরাইশদের মধ্যে কথাটি ঘোষণাও করে দিলো। ফলে তাৎক্ষণিকভাবে হযরত উসমান মুশরিকদের জুলুম-নির্যাতনের হাত থেকে বেঁচে যান। কিন্তু তার মনের মধ্যে বরাবর একটি যন্ত্রণা দাপাদাপি করতে থাকে—হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের পাশবিক পাঞ্জায় নানা জুলুম নির্যাতনের শিকার। আর আমি কিনা একজন মুশরিকের আশ্রয়ে নিরাপদ আছি। তার ঈমানী চেতনা বিষয়টি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিল না। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন—না, আমি ওলীদের আশ্রয়কে ফিরিয়ে দেব। তার আশ্রয়ে নিরাপদে বসবাস করা আমার জন্যে সমীচীন নয়। এই সিদ্ধান্ত করে তিনি সোজা ওলীদ ইবনে মুগীরার কাছে যান। তাকে গিয়ে বলেন, আপনি আপনার আশ্রয় ও নিরাপত্তা তুলে নিন। ওলীদ প্রশ্ন করল, কেউ কি আপনাকে কষ্ট দিয়েছে? কেউ কিছু বলেছে আপনাকে? কারও কোনো আচরণ আপনাকে আহত করেছে? এমন কিছু হয়ে থাকলে আমাকে বলুন। হযরত উসমান ইবনে মাযউন রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এমন কিছুই ঘটেনি। আমি আল্লাহর আশ্রয়ে থাকতে চাই। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারও আশ্রয়ে থাকতে চাই না। ওলীদ ইবনে মুগীরা তখন বলল, আমি আপনাকে ঘোষিতভাবে আশ্রয় দিয়েছিলাম। যদি সেটা তুলে নিতে হয়, তা হলে ঘোষিতভাবেই তুলে নেওয়া উচিত। আপনি আমার সঙ্গে বায়তুল্লায় চলুন। তারা দুইজন বায়তুল্লায় গেলেন। কুরাইশের লোকজন আগেই সমবেত ছিল সেখানে। ওলীদ ইবনে মুগীরা তাদেরকে লক্ষ্য করে বলল, ইনি হচ্ছেন উসমান। আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম। তিনি আমার আশ্রয়কে ফিরিয়ে দিতে চাচ্ছেন। হযরত উসমান বললেন,

ওলীদের কথা সত্য। তা ছাড়া ওলীদ আমার সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছিল, তা যথাযথ পূর্ণ করেছে। কিন্তু এখন আমি আল্লাহ ছাড়া আর কারও আশ্রয়ে থাকতে চাচ্ছি না। তাই আমি স্বেচ্ছায় তার দেওয়া আশ্রয়কে ফিরিয়ে দিচ্ছি।[১]

এ কথা বলার পর হযরত উসমান ইবনে মাযউন রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং ওলীদ ইবনে মুগীরা যার যার মতো সেই মজলিসে আসন গ্রহণ করেন। সেখানে পূর্ব থেকেই কবিতা আবৃত্তি হচ্ছিল। বিখ্যাত কবি লাবীদ তার কাসীদা আবৃত্তি করছিল। লাবীদ যখন তার কাসীদার এই পঙতিটি আবৃত্তি করল—

الا كل شيئ ما خلا الله باطل.

শোনো, আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই অলীক।

হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু তার এই পঙ্‌ক্তির প্রশংসা করে বললেন—একেবারে সত্য কথা। কিন্তু যেই লাবীদ আবৃত্তি করল—

وكل نعيم لا محالة زائل.

আর সকল নেয়ামতই নিঃসন্দেহে হারিয়ে যাবে।

এই পঙ্‌ক্তিটি শোনামাত্র হযরত উসমান বলে উঠলেন—একেবারে ভুল কথা। আল্লাহ তাআলা বেহেশতে যে নেয়ামত সাজিয়ে রেখেছেন, তা চিরন্তন। কোনো দিন হারাবে না। উসমানের মুখে এই আপত্তি শোনামাত্র ফুঁসে উঠল লাবীদ। চেঁচিয়ে উঠল, হে কুরাইশসম্প্রদায়, তোমাদের মজলিসে এইমাত্র যে ব্যক্তিটি এসেছে, তার আচরণ আমাকে কষ্ট দিয়েছে। এ কথা বলামাত্র আবেগপাগল এক কুরাইশী উঠে চেঁচিয়ে বলল, লাবীদ, এ হচ্ছে একজন বড় আহমক। এরা আমাদের ধর্ম ত্যাগ করেছে। তার কথায় আপনি কষ্ট নেবেন না। হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আহমক বলায় তিনিও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। ফলে উভয় তরফেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এমন সময় তৃতীয় এক ব্যক্তি উঠে হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৯২।

আনহু-এর মুখে সজোরে ঘুষি মেরে বসে। এতে তার একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়।[১]

ওলীদ ইবনে মুগীরা তখনো সেখানেই উপস্থিত। এই পুরো হাঙ্গামা তার সামনেই হচ্ছে। তখন ওলীদ হযরত উসমানের কাছে এসে বলল, ভাতিজা, তুমি যদি আমার আশ্রয় ফিরিয়ে না দিতে, তা হলে এখন তোমার চোখটি নষ্ট হতো না। হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, চোখ গেছে এর জন্যে আমি মোটেও ব্যথিত নই। আল্লাহর পথে যদি আমার অপর চোখটিও চলে যায়, তবুও আমি আহত হব না। তারপরও আমি কোনো মুশরিকের আশ্রয়ে থাকতে চাই না। ওলীদ আবারও বলল, ভাতিজা, আমার আশ্রয়ে চলে আসো। নিরাপদে থাকতে পারবে। হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, কোনোভাবেই সম্ভব নয়।[২]

নির্যাতনের মুখে হযরত আবু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহু

আবিসিনিয়া থেকে ফিরে আসা কাফেলায় হযরত আবু সালামা ইবনে আবদুল আসাদও ছিলেন। মক্কার পরিস্থিতি চরম প্রতিকূল দেখে তিনি আবু তালেবের কাছে আশ্রয় চান। আবু তালেব তাকে আশ্রয় দেন। বনু মাখযুমের কিছু লোক তখন আবু তালেবকে গিয়ে বলে, আপনি আবু সালামাকে আশ্রয় দিয়েছেন কেন? আপনি তাকে আমাদের হাতে ছেড়ে দিন। সে আমাদের লোক। আমরা তাকে দেখব। তার সঙ্গে আমরা যা খুশি করব। আমাদের লোককে ধরে রাখার আপনি কে? আবু তালেব বললেন, সে আমার কাছে আশ্রয় চেয়েছে। আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি। তা ছাড়া সে আমার ভাগিনা। আমি যেভাবে আমার ভাতিজাকে আশ্রয় দিয়েছি একইভাবে আমার ভাগিনাকেও আশ্রয় দিয়েছি।

সেখানে আবু লাহাব উপস্থিত ছিল। বনু মাখযুমকে তখন বলল, তোমরা এই মুরুব্বিকে অনেক বেশি ছাড় দিয়ে ফেলেছ। তার আশ্রয়েই আজ আমাদের বাপ-দাদার ধর্ম বিনাশ হতে চলেছে। নিন্দা করা হচ্ছে আমাদের

---

১ ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, ১ : ৪৯৬।

২ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৯৩।

ভগবানদের। তোমরা যদি এই সৌজন্যতার পথ পরিহার না করো আর এই বড় মুরুব্বিকে এভাবে ছাড় দিতে থাকো—তা হলে আমি কিন্তু তোমাদেরকে ছেড়ে আবু তালেবের দলে চলে যাব। তার সকল কাজকর্মে তার সঙ্গে থাকব। একেবারে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন পর্যন্ত আমি তার সঙ্গ ছাড়ব না। বনু মাখযুম তখন এ মর্মে আবু লাহাবকে আশ্বস্ত করল—আপনার আবেগ আর আমাদের আবেগ এক ও অভিন্ন। আমাদের প্রতি আপনি কোনো খারাপ ধারণা করবেন না। আমরা ইসলামকে এখানে প্রতিষ্ঠালাভ করতে দেব না।[১]

বেড়ে গেল কুরাইশের অস্থিরতা

ধীরে ধীরে পরিস্থিতি মক্কার মুশরিকদের জন্যে অসহ্য হয়ে উঠল। সব ধরনের বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও ক্রমাগত ইসলামের শক্তি বেড়েই চলল। মুসলমানদেরকে সর্বশেষ বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়ার জন্যে আবিসিনিয়া পর্যন্ত প্রতিনিধি পাঠানো হলো। প্রতিনিধিদল সফলতা নিয়ে ঘরে ফেরা তো দূরের কথা—উল্টো মুসলমানগণ লাভ করল রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা। তারা নাজ্জাশীর নানা খাতির ও আশ্বাস লাভে শক্তিশালী হলো। পরদেশে স্বস্তির সঙ্গে জীবনযাপনের সুযোগ পেল। অধিকন্তু আবিসিনিয়ার বাদশাহ হলেন মুসলমান। এদিকে মক্কায় হযরত হামযা এবং হযরত উমরের মতো মানুষ ইসলাম কবুল করেছেন। ফলে মক্কার শত্রুপক্ষ অনুমান করতে পারে—কোনো বড় ধরনের পদক্ষেপ ছাড়া ইসলামের এই অবারিত স্রোতকে ঠেকানো সম্ভব নয়। মক্কার পরামর্শকেন্দ্র দারুন নাদওয়ায় সভা ডাকা হলো। সভায় সকলের সামনে এই সংকট উত্থাপিত হলো—আমরা ইসলামকে রুখে দাঁড়াবার জন্যে এ পর্যন্ত যত চেষ্টা করেছি, সবই ব্যর্থ হয়েছে। এখন আমাদেরকে এমন শক্ত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, যাতে এই নতুন ধর্মের সব ধরনের প্রচার ও প্রসার থেমে যায়। আজ আপনারা এই সভা থেকে একটি শক্তিশালী এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে উঠবেন।

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৯৩; *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ১ : ৩৯৩।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে সামাজিক বয়কট

আহূত নেতৃবর্গ খুবই চিন্তিত। মাথার সঙ্গে মাথা মিলিয়ে বসেছে। দীর্ঘ চিন্তা-ভাবনা ও শলাপরামর্শের পর সিদ্ধান্ত নিয়েছে—আমরা বনু হাশেম এবং বনু আবদুল মুত্তালিবের সঙ্গে সামাজিক বয়কট করব। এই বয়কট হবে ব্যাপক। এখানে কে মুসলমান আর কে তার বাপ-দাদার ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তা আমরা দেখব না। এই দুই বংশের সকলের সঙ্গে পরিপূর্ণ বয়কট হবে। কারও সঙ্গে কোনো ধরনের ছাড় ও খাতিরের অবকাশ থাকবে না। আত্মীয়তা কিংবা বন্ধুত্বসুলভ কোনো সৌজন্যতারও সুযোগ থাকবে না। বনু হাশেম এবং বনু আবদুল মুত্তালিবের কারও কাছে আমরা মেয়ে বিয়ে দেব না এবং ছেলেও বিয়ে করাব না। তাদের সঙ্গে কোনো ধরনের নতুন আত্মীয়তা হবে না। তাদের সঙ্গে কোনো ধরনের বেচাকেনা কিংবা অন্য কোনো ধরনের লেনদেনও হবে না। এমনকি কথাবার্তা এবং সালাম-কালামও পরিপূর্ণরূপে বন্ধ। বন্ধ তাদের প্রতি সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা।[১]

লেখা হলো অঙ্গীকারনামা

বিষয়টিতে যখন সকলে একমত হলো, তখন এই সিদ্ধান্তটাকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার জন্যে ফয়সালা হলো—এই মজলিসেই একটি অঙ্গীকারনামা লিখিত হবে। সেই অঙ্গীকারনামায় নেতৃবৃন্দ সই করবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক মনসুর ইবনে ইকরিমা ইবনে আমের ইবনে হাশেম ইবনে আব্দে মানাফ অঙ্গীকারনামা লেখে। নেতৃবৃন্দ তাতে সই করে। পূর্ণ হয় অঙ্গীকারনামা। তারপর সেটা এই উদ্দেশ্যে কাবা শরীফে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, যেন সকল বাসিন্দা ওটা মানতে বাধ্য হয়। তা ছাড়া অঙ্গীকারনামায় উল্লেখিত কথাগুলোও যেন সকলের মনে থাকে। অবশেষে কাবা শরীফে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় এই অঙ্গীকারনামা। আর তাকে মেনে চলতে বাধ্য হয় মক্কার সকল বাসিন্দা।[২]

---

১ *তাবাকাতে ইবনে সাদ* ১:৩০৯

২ *সীরাতে ইবনে হিশাম* ১:৩৭২; *তাবাকাতে ইবনে সাদ* ১:৩০৯

পামর চলে পামরের দলে

বনু হাশেম এবং বনু আবদুল মুত্তালিব যখন এই অঙ্গীকারনামার কথা জানতে পারে, তখন তারা সকলে মিলে আবু তালেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তারপর সকলে মিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে—আমরা সবাই কোনো ঘাঁটিতে একসঙ্গে বসবাস করব। একে অপরের সুখ-দুঃখে শরিক থাকব। ইতিহাসের পরিভাষায় তাদের এই অস্থায়ী নিবাসকে শিআবে আবু তালেব বলা হয়। আবু লাহাবও এই বংশেরই একজন। কিন্তু সে ছিল হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কঠিন শত্রু। বনু হাশেম এবং বনু আবদুল মুত্তালিব যখন আবু তালেবের কাছে সমবেত হয় এবং একসঙ্গে পাহাড়ের ঘাঁটিতে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেয়, তখন আবু লাহাব সকলের সঙ্গে থাকতে অস্বীকার করে। সে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রুদের দলে চলে যায়। তার এই নিকৃষ্ট আচরণের জন্যে ধন্যবাদ পাওয়ার আশায় গিয়ে সাক্ষাৎ করে উতবা ইবনে রাবীআর কন্যা হিন্দের সঙ্গে। তাকে গিয়ে বলে—হে উতবা কন্যা হিন্দ, আমি কি লাত ও উয্যাকে সাহায্য করিনি? হিন্দ তখন বলে—তুমি অবশ্যই লাত ও উয্যাকে সাহায্য করেছ। যারা লাত ও উয্যাকে ছেড়ে গেছে, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি ভালো করেছ। লাত-উয্যা তোমাকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুক![১]

কষ্ট ও বিপদের দুঃসহকাল

মক্কার মুশরিকদের এই বয়কট এতটাই নিশ্ছিদ্র ও কঠোর ছিল—মক্কার কোনো বাসিন্দা তা লঙ্ঘন করতে পারছিল না। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খান্দান পাষাণবিপদে নিপতিত হয়। মুসলমানগণ কোথাও থেকে কোনো খাদ্যদ্রব্য পেত না। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রীও তাদের জন্যে পাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে উঠে। কয়েক বেলা উপবাসের পর সামান্য খাদ্য জুটত। যারা বয়স্ক, তারা কোনোক্রমে ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেনে নিত। কিন্তু ছোট ছোট শিশুরা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়ত। কাঁদত, চিৎকার করত। ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত শিশুদের কান্নায় মা-বাবাদের কলিজা ফেটে পড়ার উপক্রম হতো। তারা নিজেদের ক্ষুধা ও তৃষ্ণাকে

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ১ : ৩৭২।

হয়তো ভুলে থাকবার চেষ্টা করত। কিন্তু শিশুসন্তানদের কাতর চাহনিকে তারা কোনোভাবেই বরদাশত করতে পারত না। ক্ষুধার্ত মা নানাভাবে সন্তানকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করত। কিন্তু তাদের কাতর কান্নায় ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ত। চোখ অশ্রুসজল হতো। প্রতিটি তাঁবু থেকে ভেসে আসত শিশুদের ভয়াবহ চিৎকার। তাদের সেই কান্না তাঁবুর বাইরে অনেক দূর পর্যন্ত শোনা যেত। কিন্তু এই ক্ষুধার প্রতিকার করবার ক্ষমতা না বাবার আছে, না মায়ের। অভাব দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বের এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য সকলের অন্তরাত্মা দীর্ণ করে যেত। বনু হাশেম এবং বনু আবদুল মুত্তালিবের কিছু কিছু আত্মীয় ছিল মুশরিক। পাহাড়ের ঘাঁটির বাইরে থেকেও তারা ক্ষুধার্ত শিশুদের কান্না শুনতে পেত। ব্যথায় চূর্ণ হতো তাদেরও অন্তর। কিন্তু মুশরিক-সম্প্রদায় সবখানে ছড়িয়ে রেখেছিল গোয়েন্দা। কড়া নজরদারি করা হতো সর্বক্ষণ। ফলে খানাপিনার কোনো সামগ্রী যে কেউ ঘাঁটিতে পৌঁছে দেবে, তা মোটেও সহজ ছিল না। জল্লাদস্বভাব মুশরিক-সম্প্রদায় পাথরের দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে যেত যে কোনো সময়।

সাহায্যের চেষ্টা এবং তার পরিণতি

উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার ভাতিজা। নাম হাকীম ইবনে হিযাম। খাদ্যসামগ্রী দিয়ে একটি উট বোঝাই করলেন। তারপর সঙ্গে তার গোলামকে নিয়ে রওনা হলেন শিআবে আবু তালেবের উদ্দেশে। ফুপু হযরত খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে খাবার পৌঁছে দেওয়াই তার লক্ষ। ঘাঁটির কাছাকাছি আসতেই আবু জেহেল তাকে দেখে ফেলে। ছুটে এসে উটের লাগাম ধরে ফেলে। খুবই গরম ভাষায় হাকীম ইবনে হিযামকে বলে—সকলে যখন কৃত অঙ্গীকারনামা মেনে চলতে বাধ্য, তখন তুমি কী করে বনু হাশেমকে খাবার পৌঁছে দিচ্ছ! আমি কসম করে বলছি, তোমার উট এবং এই খাদ্যসামগ্রী এখান থেকে যেতে পারবে না। আর আমি তোমাকে পুরো মক্কায় অপমানিত করে ছাড়ব। আবু জেহেল এবং হাকীম ইবনে হিযামের মধ্যে উত্তপ্ত তর্ক ও বচসা চলছিল। দুইজনের মাঝে লড়াই বাধবার উপক্রম। এমন সময় সেখানে এসে উপস্থিত হয় আবুল বুখতারী ইবনে হিশাম। সেও নবীজির দুশমন ছিল। তবে তার মধ্যে

সামান্য মানবতা ও মানবিকতা ছিল। আবুল বুখতারী উভয়ের মাঝখানে গিয়ে বলল, আবু জেহেল, তুমি হাকীমের সঙ্গে লড়াই করছ কেন? কী হয়েছে, শুনি। আবু জেহেল বলল, হাকীম বনু হাশিমকে খাদ্য সরবরাহ করছে। আবুল বুখতারী বলল, দ্যাখো, তার ফুপুর কাছে খানাপিনার কোনো ব্যবস্থা নেই। এজন্যে সে তার কাছে খাবার নিয়ে যাচ্ছে। তুমি তাকে বাধা দিচ্ছ কেন? এটা তো তার মানবিক কর্তব্য। তুমি সরে দাঁড়াও। তাকে খাবার নিয়ে যেতে দাও। আবু জেহেল বলল, যে কোনো মূল্যেই হোক, আমি তাকে বাধা দেব। এজন্যে যা হওয়ার হবে। আবু জেহেল আবুল বুখতারীর সঙ্গেও ঝগড়ায় নেমে পড়ে। জেদ চেপে বসে আবুল বুখতারীর মনেও। আবুল বুখতারী বলে উঠে—তোমার এত বড় সাহস! কাছে কোথাও একটা উটের হাড় পড়া ছিল। হাড়টি তুলে এনে আবু জেহেলের মাথায় আঘাত করে। মাথা ফেটে যায়। রক্ত গড়িয়ে পড়তে শুরু করে।[১]

তারপর তাকে মাটিতে ফেলে ইচ্ছেমতো পদদলিত করে। আবুল বুখতারী আবু জেহেলকে মেরে তার শরীরের সকল ধমনী ঢিলে করে ফেলে। ঘাঁটির উপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হযরত হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহু এই দুই ষাঁড়ের লড়াই অবলোকন করেন। অথচ তারা দুইজনই চাচ্ছিল তাদের ঝগড়ার সংবাদটা যেন ঘাঁটির লোকজন জানতে না পারে।[২]

এই ছিল হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার খান্দান বনু হাশেম ও বনু আবদুল মুত্তালিবের দশা। এটা কোনো কয়েক সপ্তাহ কিংবা কয়েক মাসের ব্যাপার ছিল না। বরং বছরের পর বছর তাদেরকে এই দুঃসহ বিপদের মধ্যে কাটাতে হয়েছে।

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হিজরতের ভাবনা

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খান্দানের বিরুদ্ধে এই বয়কট ছিল দুই বছরের বেশি কাল। এই সময় মক্কায় যে সকল মুসলমান অবস্থান করছিলেন, তাদের অধিকাংশেরই ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি মুশরিকদের কাছে ছিল অজানা। তাই তারা মোটামুটি নিরাপদেই ছিল।

---

১ ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, ১ : ৫০৫; ইবনে সায়্যিদুন নাস, *উয়ুনুল আসার*, ১ : ২২৫।

২ *সীরতে ইবনে হিশাম*, ১ : ৩৭৬।

কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ইসলাম তো আর গোপন ছিল না। পুরো মক্কাবাসী জানত—আবু বকর মুসলমান। ফলে মুশরিক-সম্প্রদায় তাকে নানাভাবে কষ্ট দিত। নামায পড়তে দিত না। কুরআন তেলাওয়াত করতে দিত না। সামাজিকভাবেও নানা রকমের দুষ্ট আচরণে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল তাকে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎও দুষ্কর হয়ে পড়েছিল। পলে পলে নজরদারি। ক্রমে মক্কা থেকেই তাঁর মন উঠে যায়। চিন্তা করেন—কিছু দিনের জন্যে হলেও মক্কা ছেড়ে কোথাও চলে যাবেন। কিন্তু তিনি হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে পরামর্শ এবং তার অনুমতি ছাড়া কোথাও এক পা ফেলতেন না। তাই একবার হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আবেদন জানালেন—সমীচীন মনে হচ্ছে, আমি কিছু দিনের জন্যে মক্কার বাইরে চলে যাই। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিলেন। বললেন, যদি ভালো হয়, তা-ই করো। আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করুন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। যথাসময়ে মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়েন। মক্কা থেকে বেরিয়ে কিছু দূর যাওয়ার পর পথে সায়্যিদুল আহাবীশ ইবনুদ দাগানার সঙ্গে দেখা হয়। ইবনুদ দাগানা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ব্যক্তিত্ব ভদ্রতা নেতাসুলভ চরিত্র এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে তার বিস্তার—সবই জানতেন। তাই আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে, আবু বকর, কোথায় যাচ্ছ? আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমার সম্প্রদায় আমাকে বের করে দিয়েছে। আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। আমার জীবন বিষিয়ে তুলেছে। আমি মক্কা ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছি। মক্কায় একমুহূর্ত থাকা এখন আমার জন্যে কঠিন হয়ে পড়েছে।

ইবনুদ দাগানা বলল, এটা কখনো হতে পারে না। তোমার মতো ভদ্র লোক অসহায় ও বিপদগ্রস্তদের আশ্রয়। মাজলুমদের সাহায্যকারী এবং সকল মানুষের কল্যাণকামী—নিজের দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হবে—এটা হতে পারে না। এটা খুবই বেদনার কথা। আমার মানবিকতা এবং আত্মমর্যাদাবোধ এটা মানতে পারছে না। মক্কায় ফিরে চলো। কে তোমাকে কষ্ট দেয় আমি দেখব। তোমাকে দেখাশোনার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব

আমার। আমার সঙ্গে নিশ্চিন্তমনে মক্কায় ফিরে চলো। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সঙ্গে মক্কায় ফিরে আসেন। মক্কায় ফিরে আসামাত্র ইবনুদ দাগানা ওয়াদামাফিক কুরাইশ-নেতাদের সামনে গিয়ে ঘোষণা করে দেয়—আবু কুহাফার পুত্র আবু বকরকে আমি আশ্রয় দিয়েছি। কেউ তার সঙ্গে কোনো অসদাচরণ করবে না। কেউ যদি তার সঙ্গে কোনো মন্দ ব্যবহার করে, তা হলে তাকেই তার দায় নিতে হবে। তার এই ঘোষণা ছিল একটা বড় চ্যালেঞ্জ। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে কেউ কোনো দুষ্ট আচরণ করলে ইবনুদ দাগানা তাকে ছাড় দেবে না—তার এই চ্যালেঞ্জ কোনো সহজ কথা ছিল না। কারণ, তাদের বাড়ি-ঘরের সামনে দিয়েই কুরাইশদের ব্যবসায়ী কাফেলাকে যাতায়াত করতে হতো। তাই তার কথা লঙ্ঘন করলে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হবার আশঙ্কা ছিল। কুরাইশ-সম্প্রদায় এ কথা শুনবার পর তাদের আচরণ বদলে ফেলে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জ্বালাতন করা ছেড়ে দেয়। আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু ঘরের দরজার সামনে একটি চত্বর বানিয়ে নিয়েছিলেন। সেখানেই নামায পড়তেন। কুরআন তেলাওয়াত করতেন। তিনি ছিলেন খুবই কোমল হৃদয়ের। তার কণ্ঠ ছিল মর্মস্পর্শী। তার সুরে বেদনা উত্তাপ যন্ত্রণা এবং মথিত আবেগ দ্রবীভূত হয়ে শ্রোতার মন স্পর্শ করত। যখন তেলাওয়াত করতেন, নিশ্ছিদ্র মনোযোগ ও আবেগমথিত হয়ে পড়তেন। তার চোখ অশ্রুসজল হতো। পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় কেউ তার তেলাওয়াত শোনামাত্র দাঁড়িয়ে যেত। পথিকও চোখের পানি ধরে রাখতে পারত না। ফলে যখনই তিনি কুরআন তেলাওয়াত করতেন যুবক নারী কিশোর—সকল পথিক দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে তার তেলাওয়াত শুনত। মনে গভীর তোলপাড় অনুভব করত।

বিষয়টি মক্কার মুশরিকদের ভাবিয়ে তোলে। তারা চিন্তা করতে থাকে, মানুষ যদি এভাবে আবু বকরের তেলাওয়াত শুনতে থাকে, তা হলে তাদের অন্তরে ইসলাম ঠাঁই করে নেবে। তখন তাদেরকে ফেরানো আমাদের জন্যে কঠিন হয়ে পড়বে। বিপদ হলো, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কুরআন তেলাওয়াতে বাধাও দেওয়া যাচ্ছে না। তখন তারা গোপনে তাদেরই এক ব্যক্তিকে ইবনুদ দাগানার কাছে পাঠায়। সে গিয়ে

বলে, আপনি আবু বকরকে আশ্রয় দিয়েছেন। আবু বকর তো এখন আমাদেরকে নিয়মিত জ্বালিয়ে মারছে। যখনই নামাযে দাঁড়ায়, দীর্ঘ সময় কুরআন তেলাওয়াত করে। কুরআন তেলাওয়াতে দ্রবীভূত হতে থাকে আবু বকর। নামাযে কাঁদতে থাকে। ফলে যে কোনো পথিক সেখানে দাঁড়িয়ে যায়। তেলাওয়াত শুনতে থাকে। তাদের মনের মধ্যেও উত্তাপ ও আলোড়ন ছড়িয়ে পড়ে। আমরা আমাদের নারী শিশু এবং দুর্বলমনা লোকদেরকে নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেছি। তারা যদি এভাবে আবু বকরের তেলাওয়াত শুনতে থাকে, তা হলে আমাদের হাত থেকে বেরিয়ে পড়বে। বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে দেবে। নতুন ধর্ম কবুল করবে। আপনি একটু মক্কায় গিয়ে বলে আসুন—আবু বকর যেন ঘরের বাইরে আঙিনায় নামায না পড়ে এবং তেলাওয়াতও না করে। তার যা কিছু করার ঘরেই যেন করে। এতে আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে না।

আমার কারও আশ্রয়ের প্রয়োজন নেই

ইবনুদ দাগানা মক্কায় ছুটে আসে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলে, আমি তোমাকে এজন্যে আশ্রয় দিইনি—তুমি তোমার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে যন্ত্রণা দেবে। তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার জন্যে আমি তোমার ভার গ্রহণ করিনি। তুমি ঘরের বাইরে নামায পড়া এবং তেলাওয়াত করা ছেড়ে দাও। যা কিছু করার ঘরেই করবে। এতে কেউ তোমাকে বাধা দেবে না। অন্যথায় আমি আমার আশ্রয় ফিরিয়ে নেব। আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আশ্রয় ফিরিয়ে নেবে, এটা তোমার ব্যাপার। ফিরিয়ে নিতে হয়, ফিরিয়ে নাও। আমার কারও আশ্রয়ের প্রয়োজন নেই। আমার আল্লাহর আশ্রয়ই আমার জন্যে যথেষ্ট। ইবনুদ দাগানা বলল, ঠিক আছে, আমি তা-ই করছি। এ কথা বলে সেখান থেকে উঠে কুরাইশদের মজলিসে গিয়ে ঘোষণা করে—আমি আবু বকরকে যে আশ্রয় দিয়েছিলাম, আজ তা প্রত্যাহার করছি। এখন থেকে তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তার সঙ্গে তোমাদের কোনো বিষয়ে আমি আর হাত দেব না।[১]

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ১ : ৩৯৬; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৯৪।

ইবনুদ দাগানা এই ঘোষণা দিয়ে চলে যায়। এর পরের ঘটনা। একদিন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু বায়তুল্লাহর দিকে যাচ্ছেন। পথে এক অন্তরপাপীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। সে একমুঠ মাটি তুলে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মাথায় রেখে দেয়। অথচ এই সেই আবু বকর, একদা যার সামনে কুরাইশ-সম্প্রদায় পরম শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়ে দিত। আর আজ সমাজের একজন নিকৃষ্ট ইতর তার সঙ্গে মশকরা করছে। তার সঙ্গে পাগলের মতো আচরণ করছে। পথে চলাফেরা করা তার জন্যে দুষ্কর হয়ে পড়েছে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন খুবই ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ। সদা ধৈর্যশীল। খুব সহজে উত্তেজিত হতেন না। আজ এই ধৃষ্টতায় তিনি চরমভাবে আহত হন। পথে ওলীদ ইবনে মুগীরা কিংবা আস ইবনে ওয়ায়েলের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন দুঃখ করে বলেন—দেখেছ, আজ আমার প্রতি এই ধরনের ধৃষ্টতা দেখানো হয়! এ কথা বলার পর সে চরম নির্লজ্জের মতো বলে—এ তো আপনার কর্মফল। এখনই অভিযোগ করছেন! সামনে দেখুন কী হয়।[১]

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু পরম ধৈর্যের সঙ্গে হেঁটে চলে যান। কোনো সমাজ যখন ভদ্রতা ও মানবতা হারিয়ে ফেলে, তখন তার অধিবাসীরা যে কোনো ইতর-আচরণ করতে কুণ্ঠিত হয় না। সমাজে তখন মানবতার বন্ধু যারা, তাদের কোনো মূল্য থাকে না। মক্কার সামাজিক অবস্থা তখন এতটাই নিচে নেমে এসেছিল—পুরো পৃথিবী তাদের দুষ্ট আচরণ এবং নোংরা ব্যবহারে তাদের প্রতি ঘৃণায় থুতু ফেলতে বাধ্য হয়েছিল। চরম অপমান ও লাঞ্ছনার এক কাল চলছিল সেখানে। মানবতা ছিল সমাধিস্থ। কোথাও ভদ্রতার কোনো চিহ্ন ছিল না। মানবিকতার মাতম শোনা যেত চারদিকে। মানুষ নেমে এসেছিল পশুর কাতারে।

উইপোকা খেয়ে ফেলে অঙ্গীকারনামা

বনু হাশেম এবং বনু আবদুল মুত্তালিবকে সঙ্গে করে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্রয় নিয়েছেন পাহাড়ের ঘাঁটিতে। ক্ষুধা

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৯৫।

তৃষ্ণার সঙ্গে চলছে অবিরাম যুদ্ধ। শিশুদের কান্নায় ভারী হয়ে পড়েছে বাতাস। চোখের পানিতে বুক ভাসছে মায়েদের। এভাবে পেটে পাথর বেঁধে বৃদ্ধ ও নওজোয়ান চরম নিরাশ্রয় ও জুলুমের ভেতর আড়াই বছরের বেশি সময় কাটিয়ে দেয়। জল্লাদস্বভাব কুরাইশ-নেতাদের আচরণে সামান্য হেরফের হয় না। তাদের আত্মায় এক মুহূর্তের জন্যেও মানবতা উঁকি দেয় না। বরং মুসলমানদের এই দুর্দশার কাহিনী শুনে তারা আনন্দে আত্মহারা। তারা একেবারে ভুলেই বসে এই জগতের মহান সৃষ্টিকর্তা প্রভু অতি শক্তিমান কোনো সম্প্রদায়কেও দীর্ঘ দিন মুক্তপ্রাণে অপরাধ-অবিচার করতে দেন না। বরং তিনি কল্পনাতীতভাবে মজলুমদের সাহায্য করেন। মাঝেমধ্যে তো ফেরাউনের কোলেই লালিত-পালিত করেন তার আগামী দিনের শক্তিমান প্রতিপক্ষকে। মক্কার মুশরিকদের অঙ্গীকারনামা বাতিল হয়ে যাওয়ার বিষয়টি অনেকটা এমনই ছিল।

ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে, কুরাইশদের এই অবিচারী অঙ্গীকারনামা রহিত করার ক্ষেত্রে যারা বিশেষভাবে অবদান রেখেছিল, তারা হলো—নাজআহ ইবনে হাশেম, ইবনে আব্দে মানাফের ভাতিজা হিশাম ইবনে আমর, ইবনে রাবীআ, ইবনে হারেস। বনু হাশেমের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল বরাবর আন্তরিক। আপন সম্প্রদায়েও ছিল সর্বজনমানিত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। হিশাম শিআবে আবু তালেবে বন্দি বনু হাশেম এবং বনু আবদুল মুত্তালিবের প্রতি সবসময় আন্তরিক ছিল। যতটা সম্ভব নানাভাবে তাদেরকে সযোগিতা করত। সুযোগের ফাঁক-ফোকর গলিয়ে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দিত। তার নিয়ম ছিল খাদ্য বোঝাই উট নিয়ে ঘাঁটির কাছে চলে যেত। ঘাঁটির মুখে গিয়ে লাগাম ছেড়ে দিয়ে ভেতরে হাঁকিয়ে দিত। ঘাঁটির বাসিন্দাগণ খাদ্যসামগ্রী নামিয়ে রেখে উটটি বাইরে তাড়িয়ে দিত। এভাবে হিশাম বরাবর প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করত।

আল্লামা ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে—হিশাম ভাবল, কে জানে কত দিন চলবে এই বয়কট! কিন্তু এভাবে তো চলতে পারে না। ভাবা দরকার, কীভাবে এই বয়কট ভেঙে দেওয়া যায়! হিশাম ভাবতে লাগল, বনু হাশেম এবং বনু আবদুল মুত্তালিবের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন কারা! অনেক চিন্তা-ভাবনার পর তার প্রথম দৃষ্টি পড়ল যুহায়ের ইবনে আবু উমাইয়ার ওপর।

তার মা আতেকাহ আবদুল মুত্তালিবের কন্যা ছিল। তাই বনু আবদুল মুত্তালিব তার নানার গোত্র। সে ওই গোত্রের নাতি এবং ভাগ্নে। খুব স্বাভাবিকভাবেই মাতুল বংশের প্রতি তার একটা আন্তরিক টান থাকবে। এই চিন্তা থেকে হিশাম ইবনে আমর সর্বপ্রথম যুহায়েরের কাছে যায়। গিয়ে বলে, যুহায়ের, তুমি কি এতে খুশি, তুমি তো আরামে খানাপিনা করছ, বিয়ে-শাদি করছ, শান্তিতে জীবনযাপন করছ আর তোমার মাতুল বংশের লোকেরা না কিছু কিনতে পারছে, না কিছু বেচতে পারছে? তাদের খানাপিনার ব্যবস্থা নেই। তুমি চাইলেও তাদের ঘরে না কোনো কন্যা বিয়ে দিতে পারছ, না তাদের কোনো কন্যাকে বৌ করে আনতে পারছ। এটা কত জঘন্য অমানবিকতা। বিষয়টা তুমিই একবার ভেবে দ্যাখো—যদি আবু জেহেলের মামারা আজ এই কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতো আর কেউ যদি তাকে তার মামাদের পক্ষে আমন্ত্রণ জানাত, তা হলে নির্ঘাত সে মামাদের সাহায্যে ছুটে যেত, অথচ তুমি নিশ্চুপ বসে আছ।

যুহায়ের বলল, হিশাম, তুমিই বলো আমি একা কী করতে পারি? আমার সঙ্গে যদি অন্তত এক-দুইজন মানুষও পেতাম, তা হলে আমার মামাদেরকে এই বিপদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে সবার আগে ছুটে যেতাম। হিশাম বলল, তুমি একজন তো পেয়েছ। যুহায়ের বলল, সে কে? হিশাম বলল, আমি। যুহায়ের বলল, তা হলে তৃতীয় একজন খুঁজে বের করো।

এবার হিশাম মুতঈম ইবনে আদীর কাছে গেল। তাকে বলল, মুতঈম, আব্দে মানাফের দুই খান্দান। তুমি সেই খান্দানেরই এক সদস্য। কুরাইশ চাচ্ছে এই দুই খান্দানকে ধ্বংস করে ফেলতে। কী আশ্চর্য, তোমার চোখের সামনে তোমার খান্দান ধ্বংস হয়ে যাবে আর তুমি তা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে! তোমার মধ্যে কি সামান্য আত্মমর্যাদাবোধ নেই? মুতঈম বলল, আমি একা কী করতে পারি, বলো? হিশাম বলল, আরেকজন তো সঙ্গী পেয়েছ। মুতঈম বলল, সে কে? হিশাম বলল, কেন আমি। মুতঈম বলল, তা হলে তৃতীয় আরেকজন খুঁজে দ্যাখো। হিশাম বলল, তৃতীয় ব্যক্তিও আমি খুঁজে বের করে রেখেছি। মুতঈম জানতে চাইল—সে কে? হিশাম বলল, যুহায়ের। তারপর হিশাম একে একে আবুল বুখতারী এবং যামআহ ইবনুল আসাদের সঙ্গেও কথা বলল। কথাবার্তা বলে তাদেরকেও সমমনা

পেল। যখন একই চিন্তায় এবং একই মনের পাঁচজন হয়ে গেল, তখন রাতে মক্কার বাইরে এক জায়গায় তারা সমবেত হলো। সেখানে বসে কর্মপদ্ধতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করল। পরস্পর শপথ নিল—যে কোনো মূল্যেই হোক, আমরা এই অঙ্গীকারনামা ভাঙব। এই অঙ্গীকারনামা ভাঙার জন্যে যা যা করতে হয়, করব। পরামর্শক্রমে যুহায়ের বলল, বিষয়টি আমি সর্বপ্রথম কুরাইশের সামনে উত্থাপন করব। তারপর তোমরা সকলে আমার মতকে সমর্থন করবে। তারা সকলে এ বিষয়ে একমত হলো।

মক্কার বাইরে আজীমুল হাযুম নামক স্থানে তাদের এই পরামর্শ হয়। পরামর্শ শেষে সকলেই নিজ নিজ ঘরে ফিরে যায়। পরের দিন সকালবেলা পূর্ণ পোশাক পরিধান করে যুহায়ের কাবা শরীফ তাওয়াফ করে। তাওয়াফের সাত চক্কর পূর্ণ করার পর কুরাইশ-নেতৃবৃন্দের বৈঠকে গিয়ে উপস্থিত হয়। তারপর তাদেরকে লক্ষ্য করে বলতে শুরু করে—মক্কাবাসী, শোনো, আমরা খাব, কাপড় পরিধান করব, সুখে শান্তিতে বসবাস করব আর আমাদের চোখের সামনে হাশেমের সন্তানরা ধ্বংস হয়ে যাবে, খেতে পাবে না, পরতে পাবে না, তাদের সঙ্গে কেউ কোনো লেনদেন করবে না—এটা কত বড় জুলুম। আমি এই জুলুম মানতে পারব না। এই অঙ্গীকারনামা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো না করা পর্যন্ত আমি শান্ত হব না।

খানিকটা দূরে মসজিদের এক কোণে বসা ছিল আবু জেহেল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে এবং খুব উত্তপ্ত ভাষায় চেঁচিয়ে বলে—কার এত বড় সাহস, আমাদের অঙ্গীকারনামা ছিঁড়ে ফেলে? কে এই অঙ্গীকারনামা ছিঁড়ে ফেলে আমি দেখে নেব। তখন যামআহ ইবনে আবুল আসওয়াদ বলে উঠে—আবু জেহেল, তুমি মিথ্যাবাদী। এই অঙ্গীকারনামার প্রতি আমরা কখনো রাজি ছিলাম না। এটাকে ছিঁড়ে ফেলতেই হবে। এর সমর্থনে আওয়াজ তোলে আবুল বুখতারী। সে বলে, যামআ তো ঠিকই বলেছে। আমরা এই অঙ্গীকারনামা মানতে বাধ্য নই। এখনই এটা ছিঁড়ে ফেলে দিতে হবে। এমন সময় মুতঈম ইবনে আদী বলল, তোমরা ঠিক বলেছ। আবু জেহেল এবং তার সঙ্গীরা মিথ্যাবাদী। এই অঙ্গীকারনামা ছিঁড়ে ফেলা হবে। এখনই ছিঁড়ে ফেলা হবে। আমরা এই অভিশপ্ত অঙ্গীকারনামা থেকে পানাহ চাই। সবশেষে এই পরিকল্পনার প্রাণপুরুষ হিশাম ইবনে উরওয়া

চিৎকার করে উঠে—এখনই এই অঙ্গীকারনামা নামিয়ে আনা হবে এবং ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে।

আবু জেহেল যখন চারদিক থেকে মক্কার বিশিষ্ট এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে একই রকমের সুর শুনতে পায়, তখন এই বলে চেঁচিয়ে ওঠে—এটা ষড়যন্ত্র। নিশ্চয় বাইরে কোথাও এই ষড়যন্ত্র আঁটা হয়েছে। পরিবেশে লাভা ছড়াতে থাকে। সবার কথাই তপ্ত থেকে উত্তপ্ততর হতে থাকে। অনুভূত হতে থাকে—এখনই হাতাহাতি শুরু হবে। প্রত্যেকেই হামলা করার জন্যে হাত পা গুটাতে থাকে। ঠিক এমন সময় সেখানে আবু তালেব এসে হাজির হন!

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংবাদ

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু তালেবকে বললেন, চাচাজান, আল্লাহ তাআলা কুরাইশদের অঙ্গীকারনামার ওপর উঁইপোকা চাপিয়ে দিয়েছেন। উঁইপোকা অঙ্গীকারনামার সকল অক্ষর ও শব্দ খেয়ে ফেলেছে। এখন এই অঙ্গীকারনামায় শুধু 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা' ছাড়া আর কোনো লেখা অবশিষ্ট নেই। সুতরাং এই অঙ্গীকারনামা শেষ হয়ে গেছে। আবু তালেব তখন বললেন, ভাতিজা, এ কথা কি তোমাকে তোমার প্রতিপালক জানিয়েছেন? হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হ্যাঁ, এ কথা আমাকে আমার প্রতিপালক জানিয়েছেন।[১]

তখন আবু তালেব বললেন, তা হলে আল্লাহর কসম, এখন আর কেউ তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। আবু তালেব সঙ্গে সঙ্গে ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে এসে বিষয়টি কুরাইশদের মজলিসে অবহিত করেন।

ঘটনাক্রমে আবু তালেব ঠিক তখন এসে উপস্থিত হন, যখন হিশাম ঘুহায়ের আবুল বুখতারী যামআহ এবং মুতঈম ইবনে আদী আবু জেহেলের সঙ্গে লড়াই করছে। কাবার দেয়াল থেকে এই অভিশপ্ত অঙ্গীকারনামা নামিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে চাচ্ছে আর আবু জেহেল একা প্রতিবাদ করে যাচ্ছে।

---

১ ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, ১ : ৫০৬।

আবু তালেব এসে মাঝখানে পড়ে দুই পক্ষকেই খামোশ করে দেন। তারপর বলেন, আমার ভাতিজা মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছে, অঙ্গীকারনামা উঁইপোকা খেয়ে ফেলেছে। আল্লাহর নাম ছাড়া অঙ্গীকারনামায় আর কোনো লেখা অবশিষ্ট নেই। সুতরাং চলো অঙ্গীকারনামাটি দেয়াল থেকে নামিয়ে দেখা যাক। আমার ভাতিজা যা বলেছে, যদি ভুল হয়, তাকে তোমাদের হাতে তুলে দেব। তোমরা তার সঙ্গে যা খুশি করবে, আমি বাধা দেব না। আর যদি তার কথা সত্য হয়, তা হলে এই অঙ্গীকারনামা বাতিল বলে বিবেচিত হবে—যে কথা হিশাম যুহায়ের আবুল বুখতারী প্রমুখ বলছে। তাদের কথামতো এটা ছিঁড়ে ডাস্টবিনে ছুঁড়ে মারা হবে। এ কথায় আবু জেহেলও রাজি হয়। সকলের সম্মতিক্রমে অঙ্গীকারনামা নামিয়ে দেখা যায় হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, তা-ই ঠিক। একমাত্র আল্লাহ তাআলার নাম ছাড়া সেখানে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। ইতিহাসের ভাষায়—

فوجد الارضة قد اكلتها الا باسمك اللهم.

সকলের চোখে দেখা এই বাস্তবতার পর আর কী বলার থাকে। অঙ্গীকারনামা টুকরো টুকরো করে ছুঁড়ে ফেলা হয়। বনু হাশেম এবং বনু আবদুল মুত্তালিবের সঙ্গে কুরাইশদের সামাজিক বয়কটের ইতি ঘটে। অবসান হয় আড়াই বছরের এক অমানবিক ভয়ঙ্কর ইতিহাসের।[১]

বয়কট অবসানের পর

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু হাশেম এবং বনু আবদুল মুত্তালিবের সঙ্গে শিআবে আবু তালেবে দুই-আড়াই বছর ভয়াবহ কষ্টের জীবন কাটিয়ে ঘরে ফিরে আসেন। এটা ছিল নবুওয়তের দশম সাল। এর মধ্যে ইসলামের দাওয়াতের ভেতর দিয়ে দশ বছর পার হয়ে গেছে। যদিও পদে পদে তাঁকে মুখোমুখি হতে হয়েছে নানা বিপদের নানা পরীক্ষার। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে তাকে মোকাবেলা করতে হয়েছে শারীরিক

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ১ : ৩৯৭-৩৯৯; ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, ১ : ৫০৬; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৯৬-৯৭; ইবনে সায়্যিদুন নাস, *উয়ুনুল আসার*, ১ : ২২৪-২২৫; *তাবাকাতে ইবনে সাদ*, ১ : ২১০।

মানসিক নানা নির্যাতন ও প্রতিকূলতার। তার অনুসারীদের জন্যে মক্কা হয়ে উঠে ছিল উত্তপ্ত তাওয়া। তারপরও ক্রমাগত ইসলাম প্রসার লাভ করেছে। খুবই ধীরগতিতে হলেও ইসলামের খ্যাতি ও আলো মক্কা ও মক্কার বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে।

তোফায়েল ইবনে আমর আদ-দুসীর ইসলাম গ্রহণ

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিআবে আবু তালেব থেকে বেরিয়ে আসার পর মুশরিক-সম্প্রদায় তাদের মিথ্যা প্রোপাগান্ডা আবার ছড়িয়ে দিতে শুরু করে। ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগকে ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে তাদের এই মিথ্যা প্রচারণার মিশনকে আরও গতিশীল করে তোলে। আরবের বিভিন্ন কবিলা, হজ ও উমরা উপলক্ষে আগত বিভিন্ন লোকজনকে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে ভুল ধারণা দিতে তাদের সাধনার কোনো অন্ত ছিল না। বরং কেউ যেন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যেতে না পারে, স্বস্তির সঙ্গে তাঁর কোনো কথা শুনতে না পারে, এটাই ছিল তাদের রাত-দিনকার ভাবনা। তারা সদা সতর্কতায় সচেষ্ট ছিল—মক্কার বাইরে থেকে আগত কোনো ব্যক্তি যেন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে না পারে। ইসলামবিরোধী সকলে মিলে এই এক মিশনে আকণ্ঠ ডুবে ছিল। কখন কে মক্কায় ঢুকল, বাজদৃষ্টিতে তাকে তারা পাহারা দিয়ে ফিরত।

এই পরিস্থিতিতেই মক্কায় আসেন দুস কবিলার নেতা তাদের সম্মানিত ব্যক্তি তোফায়েল ইবনে আমর। আসামাত্র তার আগমনবার্তা মক্কায় ছড়িয়ে পড়ে। তাকে ঘিরে ধরে মক্কার কুরাইশ-নেতৃবৃন্দ। শুরু হয় আলোচনা। এই আলোচনায় তারা হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসঙ্গ টেনে যত্নের সঙ্গে জানিয়ে দেয়—এই লোক থেকে আপনি সর্বদা দূরে থাকবেন। কখনো তার সঙ্গে মিশতে যাবেন না। তার কথা শুনলে আপনার দীন-ধর্ম আশঙ্কায় পড়ে যাবে। তোফায়েল দুসী নিজেই বলেছেন, কুরাইশ-নেতৃবৃন্দ আমাকে এতটাই সতর্ক করে ছিল—অবশেষে আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি—আমি এই ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করব না। তাঁর কোনো কথা শুনব

না। আমি নিজেও তার সঙ্গে কথা বলব না। চূড়ান্ত সতর্কতা হিসেবে বায়তুল্লায় যাওয়ার সময় কানে তুলা ঢুকিয়ে নিতাম। উদ্দেশ্য, ভুলেও যাতে তার মুখনিঃসৃত কোনো কথা আমার কানে না পড়ে।

একবার আমি বায়তুল্লায় গিয়ে দেখি হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ছেন। তার থেকে সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে আমি দাঁড়ালাম। কীভাবে যেন তার আওয়াজ আমার কানে এসে পড়ল। তিনি তখন কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন। তার তেলাওয়াত কানে পড়ামাত্র আমার মন বলে উঠল—কী চমৎকার বাণী! কী উচ্চতর কালাম! শোনামাত্র আমি বিস্ময়ে আবিষ্ট। মনে মনে ভাবতে লাগলাম—আমি নিজেও তো একজন কবি। শুধু কবিই নই, কবি ও কবিতার সমালোচক। ভাষার সুন্দর অসুন্দর আমি খুব ভালো করেই বুঝি। সুতরাং আমার কল্পনার অনেক উঁচুতে প্রতিষ্ঠিত এমন মহান ও শ্রেষ্ঠতর বাণী আমি শুনব না—এ কেমন বোকামি? অনর্থক কুরাইশের লোকেরা আমাকে ধোঁকা দিয়েছে। আমাকে তো তার কালাম শুনতেই হবে। তা ছাড়া আমি তো কুরাইশদের কথা মানতে বাধ্য কেউ নই। আমি তাঁর কথা শুনব। যা ভালো লাগে কবুল করব। কিছু অপছন্দ হলে প্রত্যাখ্যান করব। এইসব ভেবে আমি সেখানে দাঁড়িয়ে গেলাম। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নামায শেষ করে বাড়িতে চলে গেলেন। আমিও বায়তুল্লাহ থেকে বেরিয়ে সোজা তার কাছে গিয়ে হাজির হলাম। বললাম—আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা আপনার সম্পর্কে আমাকে নানা রকমের কথা বলেছে। তাদের সীমাহীন পীড়াপীড়িতে তাদের কথা মানতে আমি বাধ্য হয়ে পড়েছিলাম। তারা আমাকে ভয় দেখিয়ে বলেছিল, তুমি যদি এর কথা শোনো, তা হলে পথহারা হবে। তাই আমি আমার কানে তুলা ঢুকিয়ে রেখেছিলাম, যেন আপনার কথা না শুনতে হয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছিল, আমি আপনার কথা শোনার সুযোগ লাভ করব। আমি আপনার কালাম শুনেছি। খুবই উচ্চতর এবং শ্রেষ্ঠতর বাণী। এবার আপনি মানুষকে যে বিষয়ের দাওয়াত দিয়ে থাকেন, সে বিষয়ে আমাকেও কিছু বলুন। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করে শোনালেন। তোফায়েল দুসী বলেন, আমি

কসম করে বলছি, জীবনে কখনো এমন চমৎকার কথা আমি শুনিনি। তিনি আমাকে ঈমান ও ইসলাম ব্যাখ্যা করে বোঝালেন। আমার কাছে মনে হলো, এরচেয়ে সরল ও সত্য আর কোনো পথ নেই। আমি সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান হলাম।[১]

জ্বলে উঠল অলৌকিক প্রদীপ

তোফায়েল ইবনে আমর আদ দুসী বলেন, ইসলাম কবুল করার পর আমি হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরজ করলাম—আমি আমার গোত্রের প্রধান। গোত্রের সকলেই আমার অনুগত। আমার যে কোনো সিদ্ধান্ত তারা বিনা তর্কে মেনে নেয়। আমার কোনো আদেশই তাদের কেউ কখনো প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। সন্তুষ্টচিত্তেই তারা আমার কথা মেনে চলে। আমি চাই দেশে ফিরে ইসলামের দাওয়াত দেব। আমার পূর্ণ গোত্র যেন মুসলমান হতে পারে, সেই চেষ্টা আমি করব। আপনি আমাকে এমন কোনো নিদর্শন দান করুন, যেন আমার সম্প্রদায় আমাকে সত্যবাদী বলে গ্রহণ করে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে দুআ করলেন—

اللهم اجعل له اية.

হে আল্লাহ, তোফায়েলকে তুমি কোনো নিদর্শন দান করো।

এরপর আমি হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবার ছেড়ে উঠে আসি। সোজা আমার গোত্রের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। আমার কবিলায় যেতে শুরুতেই একটি পাহাড়ের মতো পড়ে। এই পাহাড়টি পার করে নামতে গেলেই আমার গোত্রের বিশাল জনবসতি। আমি যথারীতি সেই টিলাটিতে গিয়ে উঠি। টিলাটি পার করে যখন নামতে যাই, তখন লক্ষ করি—আমার হাতের ছড়িটিতে একটি চমৎকার আলো জ্বলছে। আলোটা এতই উজ্জ্বল ও পরিচ্ছন্ন মনে হয়, যেন আমার সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রদীপ জ্বলছে। এটা ছিল হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুআর

---

১ ইবনে সায়্যিদুন নাস, *উয়ুনুল আসার*, ১ : ২৪০; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৯৯; *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ১ : ৪০৭-৪০৯।

ফসল। আমি টিলার ওপর থেকে নামছি আর আমার কবিলার লোকজন সেই আলোর দিকে তাকিয়ে আছে।

পরের দিন আমি সর্বপ্রথম আমার বাবাকে ইসলামের দাওয়াত দিই। তিনি আমার দাওয়াত কবুল করেন। তারপর আমি আমার স্ত্রীকে ইসলামের কথা বলি। সেও নির্দ্বিধায় মেনে নেয় আমার কথা। আমার গোত্রের কিছু লোকও ইসলাম কবুল করে। তবে তাদের অধিকাংশ ইসলামবঞ্চিত থেকে যায়। আমি অবশ্য তাদের প্রতি কোনোরূপ কঠোরতা করিনি। আমি আবার মক্কায় যাই। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তার কাছে আমার কবিলার অবস্থা তুলে ধরে দুআ চাই—যেন আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে হেদায়েত দান করেন। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে দুআ করেন—

اللهم اهد دوسا.

হে আল্লাহ, দুস কবিলাকে তুমি হেদায়েত দাও।

তারপর মক্কা থেকে ফিরে পুরোপুরি নিমগ্ন হই দাওয়াত ও তাবলীগে। আল্লাহ তাআলা আমার পুরো গোত্রকে হেদায়েত দান করেন। তারা সকলে ইসলাম কবুল করে। খায়বার যুদ্ধের সময় আমরা হিজরত করে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হই।[১]

মুসলমান হলো বিখ্যাত পালোয়ান রোকানা

অবশেষে মক্কাবাসীকে এই বিস্ময়কর সংবাদ শুনতে হয়েছে—কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিমান পালোয়ান ইসলাম কবুল করেছে। ঘটনাটি ছিল এই—একবার হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার কোনো একটি পাহাড়ি ঘাঁটির দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন। পথেই দেখা হয়ে যায় বিখ্যাত আরব-পালোয়ান রোকানার সঙ্গে। দেখা হতেই হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, রোকানা, তোমার মধ্যে কি আল্লাহর ভয় নেই? তুমি কি আমার দাওয়াত কবুল করবে না?

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ১ : ৯৯; *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ১ : ৪০৭-৪০৯; ইবনে সায়্যিদুন নাস, *উয়ুনুল আসার*, ১ :২৪০।

রোকানা তখন বলল, আপনি যদি আমাকে কুস্তিতে হারিয়ে দিতে পারেন, তা হলে আমি একশোটি ছাগল দেব। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এসো, তা-ই হবে। সঙ্গে সঙ্গে কুস্তি শুরু হলো। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েক মিনিটের মধ্যে এই লৌহমানবটিকে চিৎ করে মাটিতে শুইয়ে দিলেন। রোকানা মাটি থেকে উঠে বালু ঝারতে ঝারতে বলল, আপনি যদি আমাকে আরেকবার হারাতে পারেন, তা হলে আরও একশো ছাগল দেব। আবার কুস্তি হলো। রোকানাকে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার চিৎ করে মাটিতে ফেলে দিলেন। পরপর তিনবার লড়াই হলো। প্রতিবারই হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পিঠ মাটিতে লাগিয়ে দিলেন। তার ঘাড়ে তিনশো ছাগলের বোঝা চেপে বসল। তৃতীয়বার হেরে যাওয়ার পর সে বলল—খোদার কসম, আপনার আগে আজ পর্যন্ত কেউ আমার পিঠ মাটিতে লাগাতে পারেনি। আপনার সঙ্গে আমার শত্রুতা ছিল। কিন্তু আজ আমি আপনার হাতে ঈমান আনছি—

اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك لرسول الله.

আমি এ সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। এও সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসূল।

রোকানা ইসলাম কবুল করার পর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ওয়াদা করা তিনশো ছাগল তাকেই দান করে দেন।[১]

পরাক্রমশালীর প্রতিশোধ

একজন ভদ্র এবং আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তির জন্যে সবচেয়ে কষ্টের বিষয় হলো উপহাস ও হাসি-ঠাট্টা। মানুষের হাসি-ঠাট্টা ও উপহাস তাকে চরমভাবে পীড়া দেয়। তার অন্তর ও মন-মস্তিষ্ক আহত হয়। আর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যারা এই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে, তারা কোনো মামুলি মানুষ ছিল না। তারা ছিল কুরাইশ-সম্প্রদায়ের প্রথম সারির নেতা। তাদের সকলেই ছিল বয়স্ক এবং

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ১০৪; *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ১ : ৪১৮।

বিশিষ্টজন। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঠাট্টা বিদ্রূপ ও তিরস্কারের তির চালাতে যারা সদা উৎসাহিত ছিল, তাদের মধ্যে—ওলীদ ইবনে মুগীরা, উমাইয়া ইবনে খালফ, আবু জেহেল ইবনে হিশাম, আসওয়াদ ইবনে আবদুল মুত্তালিব, আবু যামআ, আসওয়াদ ইবনে আব্দে ইয়াগুস, হারেস ইবনে গাইতাল ও আস ইবনে ওয়াইল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ঠাট্টা বিদ্রূপ ছিল একতরফা। এর কোনো জবাব ছিল না। জবাব দিতে গেলে তা সহজেই গড়িয়ে যাবে হাতাহাতিতে। অথচ মক্কার পুরো সময়টাতেই হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লড়াই ও প্রতিরোধ থেকে বিরত রাখা হয়েছে। তাই তাঁর পক্ষ থেকে কোনো ধরনের উত্তর দেওয়া হতো না। তবে কখনো কখনো যখন অন্তরে প্রচণ্ড আঘাত লাগত, মুখ থেকে বদদোয়ার বাণী বেরিয়ে আসত। বিদ্রূপকারীদের ক্ষেত্রে এই বদদোয়ার ফলও প্রকাশ পেত খুব দ্রুত। ইসলামের ইতিহাসে স্পষ্টভাবে লেখা আছে—হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদদোয়ায় এই দুর্ভাগাদের কী পরিণতি হয়েছে। কয়েকটি উপমা উল্লেখ করছি—

আসওয়াদ ইবনে আব্দে ইয়াগুসের ঘা সৃষ্টি হয়। সেই ঘা জুড়ে পোকা হাঁটাহাঁটি করতে থাকে। ভয়াবহ এই রোগেই কয়েকদিনের মধ্যে তার মৃত্যু হয়। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদদোয়া পড়ামাত্র আসওয়াদ ইবনে আবদুল মুত্তালিব অন্ধ হয়ে যায়। সে একদিন তার লোকজনের সঙ্গে কোথাও অবস্থান করছিল। হঠাৎ করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তার ছেলেদেরকে ডাকতে থাকে। ছেলেরা ডাক শুনে ছুটে আসলে সে ভীত কণ্ঠে বলতে থাকে—দ্যাখো, আমার চোখে কাঁটা বিদ্ধ হচ্ছে। জলদি বের করো। ছেলেরা চোখে খোঁজাখুঁজি করে বলে, আমরা তো চোখে কোনো কাঁটা দেখছি না। কিন্তু আসওয়াদের একই কথা—আমার চোখে কাঁটা ফুটানো হচ্ছে। এভাবে চেঁচাতে চেঁচাতে সে অন্ধ হয়ে পড়ে। হারেস ইবনে হাইতালের পেটে পুঁজ ও পায়খানা জমে উঠে। পেট ফুলে যায়। ময়লা তার মুখ দিয়ে বেরোতে থাকে। এই ঘৃণ্যরোগে ভুগে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সে মারা যায়। আস ইবনে ওয়াইলের মাথার মস্তিষ্কের ভেতর কী যেন ঢুকে

পড়ে। সে সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদদোয়ায় বিভিন্ন সময় এইসব ঘটনা সংঘটিত হয়।[১]

মেরাজ

শিআবে আবু তালেব থেকে মুক্তি লাভ করেন নবুওয়াতের দশম বছর। এ বছর আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়। এর মধ্যে মেরাজের ঘটনাটি অন্যতম। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মত এটাই।[২]

এক রাতে জাগ্রত অবস্থায় হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদে হারাম থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে সপ্তাকাশ এবং বেহেশত দোজখ পরিভ্রমণ করানো হয়। মেরাজের এই রাতেই ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রোকন পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়। এর পূর্বে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সঙ্গীগণ একা একা দুই রাকাত করে নামায পড়তেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার পর নামাযের রাকাত ও সময় সবিস্তারে জানিয়ে দেওয়া হয়। রহিত হয় পূর্বেকার বিধান। মেরাজের ঘটনা নানা বিচারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিস্ময়কর। যুক্তি ও বুদ্ধিপূজারিদের কাছে বিস্ময়কর এই ঘটনাটি মনে হতে থাকে পাগলের প্রলাপ এবং এক অপ্রকৃতিস্থ মানুষের স্বপ্নমাত্র। পরের দিন যখন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার মুশরিকদের সামনে ঘটনাটি বর্ণনা করেন, তখন পুরো মক্কায় হাসি তামাশার ঝড় বয়ে যায়।

একে বলে বিশ্বাস!

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপবিষ্ট আছেন বায়তুল্লাহর পাশে। আবু জেহেল সর্বদা এমন কোনো নতুন ছিদ্র খুঁজে ফেরে, যার কথা বলে মানুষকে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ১০৫-১০৬।

২ হাফেজ ইবনে কাসীর র. বলেছেন, ইবনে আসাকির র. ইসরা সম্পর্কিত হাদীসগুলো নবুওয়তের প্রারম্ভিক আলোচনায় উল্লেখ করেছেন। ইবনে ইসহাক র. ইসরা ও মেরাজের ঘটনা উল্লেখ করেছেন নবুওয়তের আনুমানিক দশ বছর পর। ইমাম বায়হাকী র. বলেছেন, ইসরা ও মেরাজ সংঘটিত হয়েছে নবীজির হিজরতের এক বছর আগে। দেখুন—*আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ১০৮।

ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা যায়। সে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উপবিষ্ট দেখে কাছে এসে জিজ্ঞেস করল—কোনো নতুন কথা আছে?

: হ্যাঁ আছে।—নবীজি বললেন।

: কী খবর?

: আজ রাতে আমাকে বায়তুল মুকাদ্দাস নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

: কোন বায়তুল মুকাদ্দাস? বায়তুল মুকাদ্দাস তো এখান থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে।

: হ্যাঁ, সেই বায়তুল মুকাদ্দাস।

এবার তো আবু জেহেল বলবার মতো কথা পেয়ে গেছে। একেবারে আনন্দে লাফিয়ে উঠল। বলল, আমি এখনই কুরাইশের সকল লোক ডেকে আনছি। আপনি তাদের সকলের সামনে এ কথা বলতে পারবেন?

: কেন পারব না? অবশ্যই বলব।

আবু জেহেল সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল। অল্প সময়ের মধ্যে বিশাল এক মজমা এনে হাজির করল। মক্কার মুশরিক-সম্প্রদায় সর্বদা সুযোগের সন্ধানে ঘুরে ফিরত। বলে বেড়াবার মতো কোনো ঘটনা হাতে পেলে তাদের আনন্দের কোনো সীমা থাকত না। যখন অনেক লোক সমবেত হলো, তখন আবু জেহেল বলল, লোকজন চলে এসেছে। এবার আপনি বলুন।

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মেরাজের পুরো ঘটনা তাদের সামনে তুলে ধরেন। এই সফরে যা যা প্রত্যক্ষ করেছেন, তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা তুলে ধরেন। বলেন—আমি বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়েছি এবং সেখানে নামাযও পড়েছি। হাজার হাজার মাইল একই রাতে পার করে যাওয়া, আবার সেই রাতেই ফিরে আসা—সেকালের বিচারে ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার। তাই চারদিকে মিথ্যা মিথ্যা বলে স্লোগান উঠে। কিছু হতভাগা তালি বাজাতে থাকে। কেউবা শিস দিতে থাকে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তারা তামাশার পাত্র বানিয়ে ফেলে। এই ঘটনা তাদের পক্ষে বিশ্বাস করা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। তারা বরং

ইসলাম কবুলকারীদের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডার এক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে এই ঘটনাকে।

তাদের মধ্যে কয়েকজন সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যায় হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে। তাকে গিয়ে বলে, শুনেছ, আবু বকর, তোমার বন্ধু বলছেন, তিনি নাকি আজ রাতে বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়েছিলেন। সেখানে নামায পড়ে আবার রাতেই ফিরে এসেছেন। হযরত আবু বকর বললেন, তোমরা আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে অপবাদ রটাচ্ছ। তিনি কি এমন কথা বলেছেন? তারা সকলে কসম খেয়ে বলল—তিনি এইমাত্র বলেছেন। সকলের সামনে বলেছেন। এই আমার সঙ্গে যারা আছেন সকলেই সাক্ষী। সকলে এক বাক্যে বলল—আমরা নিজের কানে শুনেছি। আমরা মোটেও মিথ্যা বলছি না। তাদের এ কথা শোনার পর হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যা বলেছিলেন, তা আস্থা ও বিশ্বাসের ইতিহাসে সোনার হরফে লিখে রাখার মতো কথা। সেদিন সিদ্দীকে আকবর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন—তোমরা যদি সত্যি সত্যি বলে থাকো হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কথা বলেছেন, তা হলে নিশ্চয় তিনি সত্য বলেছেন। অবশ্যই তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়েছেন এবং সেখানে নামায পড়ে ফিরে এসেছেন। এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। আমার বিশ্বাস, তিনি যা বলেছেন, সত্য বলেছেন।[১]

পরীক্ষা

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে কখনো বায়তুল মুকাদ্দাস দেখেননি। এ কথা মক্কার মুশরিকদেরও জানা ছিল। আর তারা ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে বরাবর সিরিয়া যেত। ফলে তাদের অনেকেই বায়তুল মুকাদ্দাস দেখেছে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বললেন, আমি বায়তুল মুকাদ্দাস দেখে এসেছি, তখন তারা নবীজির পরীক্ষা নিতে চাইল। সেখানে ভিড় জমে উঠল। যারা এর অগে বায়তুল মুকাদ্দাস দেখে এসেছে, তারা নবীজির প্রতি নানা প্রশ্নের তির ছুঁড়তে থাকল। যেমন : বায়তুল মুকাদ্দাসের দরজা কতটি? কোন দরজা কোন

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ২ : ৫।

দিকে? কতটি জানালা আছে? জানালাগুলো কতটা উঁচুতে? মসজিদের ছাদ কেমন? মেঝে কেমন?

কোনো ব্যক্তি যদি বিশেষ কোনো প্রয়োজনে কোথাও সফরে যায়, তা হলে তার এই জাতীয় বিষয়আশয় মনে থাকবার কথা না। কারণ, তার সামনে তো তার টার্গেট থাকে। ভবনের সৌন্দর্য অসৌন্দর্যের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? অথচ তাদের প্রশ্নগুলো সব এই প্রকৃতির। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—তাদের এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যখন আমার জন্যে কঠিন হয়ে পড়ে, তখন আল্লাহ তাআলা পুরো বায়তুল মুকাদ্দাস আমার সামনে তুলে ধরেন—যেন একটি জীবন্ত ছবি। তারা আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোনো বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করছে আর আমি বায়তুল মুকাদ্দাস দেখে দেখে তার উত্তর দিচ্ছি। ফলে, তাদের অস্বীকারের আর কোনো পথ রইল না।[১]

নামাযের বিধান ও তার সময়

মেরাজের রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়। নামাযের রাকাত কীভাবে আদায় করা হবে, কোন নামায কখন পড়া হবে—এসব বিষয়ে তালীম দেওয়ার জন্যে আল্লাহ তাআলা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করেন। তিনি পরপর দুই দিন এসে নামায পড়িয়ে দেখান। প্রথম দিন প্রত্যেক নামায সময়ের একেবারে শুরুতে পড়ান। পরের দিন পড়ান সময়ের একেবারে শেষ ভাগে। দুইদিন নামায পড়াবার পর বলে যান—এই দুই সময়ের মাঝামাঝি সময়টাই নামাযের উপযুক্ত সময়।[২]

টুকরো হলো চাঁদ

এই বছরই চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মোজেযা প্রকাশ পায়—আজকের বিজ্ঞানমনস্ক পৃথিবী সেটা মানুক আর না মানুক। যুক্তিপূজারি মানুষ সেটা বিশ্বাস করুক আর না করুক—এ এক অকাট্য ঘটনা। আমরা এটাকে

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ১১৩।

২ *সুনানে আবু দাউদ*, ১ : ৫৬।

মোজেযা বলি। আমরা বিশ্বাস করি এই ঘটনা সত্য। তা ছাড়া আমরা তো এরচেয়ে বিস্ময়কর ও দৃশ্যত অসম্ভব আরও অনেক কিছুর প্রতিই বিশ্বাস রাখি। আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধি প্রতিদিন ওহী নিয়ে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসত। যুক্তিপূজারিদের প্ররোচনায় প্রভাবিত হয়ে আমরা কখনো ওহীর সত্যতাকে অস্বীকার করি না। করতে পারি না। তা ছাড়া একসময়কার অসংখ্য অসম্ভব বিষয় এখন বাস্তব হয়ে আমাদের সামনে ঘোরাফেরা করছে। মোজেযাকে অস্বীকার করা যুক্তির সীমাবদ্ধতা ছাড়া আর কিছুই না। চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া সম্পর্কে বিপুল পরিমাণে হাদীস রয়েছে। এই সব হাদীসের আলোকে আমরা যারা হাদীসের সত্যতায় বিশ্বাসী, অকাট্যভাবে বলতে পারি—এটা সত্য। অবশ্য বিস্ময়কর।

এ সম্পর্কে হযরত আনাস ইবনে মালেক, জুবাইর ইবনে মুতঈম, হুযাইফা, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহুমের সূত্রে বর্ণিত বিশুদ্ধতম অনেক হাদীস রয়েছে। এসব বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি—মক্কাবাসী একবার হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পীড়াপীড়ি করে বলতে থাকে, আপনি আমাদেরকে এমন একটি মোজেযা দেখান, যেন আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনতে পারি। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করলেন। হযরত জিবরাঈল আগমন করলেন। বললেন, চাঁদের চৌদ্দতম রাতে আপনি মক্কার মুশরিকদেরকে ডেকে সমবেত করবেন। তারপর আঙুল দ্বারা চাঁদকে ইশারা করবেন। কথামতো কুরাইশদেরকে ডেকে এক বিশাল দলের সামনে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাঁদকে আঙুলে ইশারা করেন। সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ দু'টুকরো হয়ে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়। দ্বিখণ্ডিত চাঁদের মাঝখানটায় দূরের হেরাপর্বত দেখা যেতে থাকে।

মুশরিকদের মতলব কিন্তু ভালো ছিল না। তারা খাঁটি মনে মোজেযা দেখার দাবি করেনি। তারা বারবার চোখ কচলাতে থাকে। আশ্চর্য হয়ে দেখতে থাকে সত্যি সত্যি চাঁদ দ্বিখণ্ডিত। তখন তাদের অন্তরের ক্লেদ মুখে এসে উচ্চারিত হতে থাকে। একসঙ্গে চেঁচাতে থাকে—

মুহাম্মাদ আমাদেরকে যাদু করেছে।

খোলামেলা নিজ চোখে দেখার পরও তাদের অন্তর মেনে নিতে পারেনি। এই ঘটনার পর কয়েকদিন পর্যন্ত মক্কার বাইরে থেকে যেই আসত, মক্কার মুশরিক-সম্প্রদায় তাকে গিয়ে প্রশ্ন করত—তোমরা কী তোমাদের কবিলায় একদিন চাঁদকে দু'টুকরো হতে দেখেছ? মুশরিক-সম্প্রদায় তাদের কারও মুখেই নিজেদের মনের মতো উত্তর পেত না। সকলেই বলত, হ্যাঁ, আমরা চাঁদকে দু'টুকরো দেখেছি। কিন্তু অন্তর যাদের তালাবদ্ধ, তাদের কি ঈমান আনার পথ আছে? তারা ঈমান আনতে পারেনি। অথচ এ এক ঐতিহাসিক বিস্ময়কর সত্য কথা। চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা ভারতের মতো দূর দেশ থেকে দেখা গেছে বলেও প্রমাণিত আছে। এখানকার অধিবাসীগণ এই ঘটনা দেখে এর সূত্র খুঁজতে গিয়ে জানতে পেরেছে—আরবে একজন নবীর আবির্ভাব হয়েছে। সেই নবী এই মোজেযা দেখিয়েছেন।[১]

আবু তালেবের মৃত্যু

এ বছরই নবীজির চাচা আবু তালেব মৃত্যুবরণ করেন। পার্থিব বিচারে আবু তালেব ছিলেন নবীজির জন্যে একটি শক্ত ঢালস্বরূপ। তার জীবদ্দশায় অনেক শক্তিমান অবাধ্য কোনো কুরাইশও হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি হাত তুলতে সাহস পেত না। কুরাইশ-নেতৃবৃন্দ বারবার দল বেঁধে আবু তালেবের কাছে এসেছে। তিনি যেন তার ভাতিজাকে ইসলামের দাওয়াত থেকে বিরত রাখেন কিংবা তাদের হাতে তুলে দেন—সেই মর্মে আবেদন করেছে। কিন্তু পুরো কুরাইশের মোকাবেলায় আবু তালেব একা বুকটান করে দাঁড়িয়েছেন। তাদের সকল যুদ্ধ ও কৌশলকে আবু তালেব একাই পরাজিত করেছেন। আড়াই বছরকাল শুধু হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করার আবেগে সীমাহীন কষ্ট ও নির্যাতনের জীবনযাপন করেছেন। ক্ষুধা তৃষ্ণার চূড়ান্ত কষ্ট বরদাশত করেছেন। কিন্তু হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গায়ে

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ১১৮-১২০।

কখনো আঁচড় লাগতে দেননি। এমন সহমর্মী করুণাপ্রবণ বীর ও প্রভাবশালী চাচা আজ তাঁকে ছেড়ে চলে গেছেন। আবু তালেবের মৃত্যুতে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রচণ্ডভাবে আহত হন। যদিও আবু তালেব শেষ পর্যন্ত তার বাপ-দাদার ধর্মেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি তার পুরোনো ধর্ম ছাড়তে পারেননি। এর মধ্যেও হয়তো আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো রহস্য ছিল। কারণ, নবীজির অন্য চাচা হযরত হামযা কিংবা আব্বাস ইসলাম কবুল করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তারাও মজলুম মুসলমানদের সারিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। আবু তালেব তার বাপ-দাদার ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলে সমাজে তার প্রভাব ছিল অক্ষুণ্ন। ফলে, প্রতিটি প্রদক্ষেপেই তিনি হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহায্যে এসে পাশে দাঁড়াতে পারতেন।

এটা নিশ্চিত করেই বলা যায়—আবু তালেব জীবনের শেষ প্রান্তে এসে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন—এর কোনো ভিত্তি নেই। এই দাবি বিশুদ্ধ বর্ণনা পরিপন্থী। শিয়া এবং রাফেজী সম্প্রদায় এসব কথা ছড়িয়েছে। যে বর্ণনার ভিত্তিতে তারা এই দাবি করে, সে বর্ণনাটি নানা কারণে ত্রুটিযুক্ত ও দুর্বল। জমহুরের এটাই মত—আবু তালেব শেষ পর্যন্ত মুসলমান হননি। নির্ভরযোগ্য বিভিন্ন বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে এ কথার উল্লেখ আছে।[১]

হযরত খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার ইন্তেকাল

এই বছরেরই আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার ইন্তেকাল। আবু তালেব এবং হযরত খাদিজা এক মাস আগে পরে ইন্তেকাল করেন। দুটো ঘটনাই ছিল হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে হৃদয়বিদারক। স্বাভাবিকভাবেই এই দু'টি আঘাতে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই ভেঙে পড়েন। হযরত খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার গুরুত্ব আমরা এই ঘটনা থেকে অনুমান করতে পারি—যখন সর্বপ্রথম হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়, তখন তিনি ভীত হন, কম্পিত হন। ভীত কম্পিত হয়ে ঘরে ফিরে আসেন। হযরত খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ১২৩।

কাছে এসেই নিজের জীবনের আশঙ্কার কথা বলেন এবং তাঁকে চাদর জড়িয়ে দিতে বলেন। প্রচণ্ড ভয় ও অস্থিরতার মুহূর্তে হযরত খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা পাহাড়সম বিশ্বাস ও আস্থার সঙ্গে অল্প কয়টি কথা বলেন। কথা কয়টিতে এতটাই শক্তি ছিল—সঙ্গে সঙ্গে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অস্থির অন্তর স্বস্তিতে ভরে উঠে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—খাদিজার ওই কয়েকটি কথা আমার চরম অস্থিরতার মুহূর্তে অন্তরে যে শান্তি ও স্বস্তি এনে দিয়েছিল, তা আজও মনে পড়ে। তারপর জীবনের পদে পদে হযরত খাদিজার ত্যাগ বিসর্জন, নবীজির সামান্য স্বস্তি ও নিরাপত্তার জন্যে তার উদার আবেগ, তার ব্যবসা-বাণিজ্য পারিবারিক জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে তাঁকে নির্ভার করে রাখা—সবই অবিস্মরণীয়। তা ছাড়া হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল হযরত খাদিজার ঘরেই। এইসব কারণে হযরত খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার প্রতি হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা ছিল ভাষাতীত। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, খাদিজার প্রতি আমি যতটা ঈর্ষাবোধ করি আর কারও প্রতি ততটা ঈর্ষাবোধ করি না। কারণ, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বরাবর তার কথা বলেন। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এ কথাও বলেছেন, ঘরে কোনো ছাগল জবাই হলে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খাদিজার জীবিত সখীদের ঘরে অবশ্যই গোশত পাঠাতেন। এই ঈর্ষার আবেগেই একবার হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলেন—আপনি হযরত খাদিজাকে এত বেশি স্মরণ করেন—অথচ আল্লাহ তাআলা আপনাকে তার চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করেছেন। আচ্ছা, তার মধ্যে এমন কী সৌন্দর্য ছিল? হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংক্ষেপে বলেছিলেন, খাদিজা যেমন হওয়ার তেমনই ছিল, তুমি তার কী বুঝবে? এ ধরনের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে হযরত খাদিজার প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গভীর সম্পর্কের আভাস পাওয়া যায়। তাই হযরত খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার ইন্তেকাল ছিল হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে এক কঠিন বেদনাদায়ক ঘটনা। তার উজ্জ্বল মুখয়াবয়বে বেদনার ছাপ সর্বদা

নজরে পড়ত। পরপর এই দু'টি বেদনাদায়ক ঘটনা হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এতটাই আহত করেছিল ইসলামের ইতিহাসে এই বছরটিকে বলা হয় 'আমুল হুযন'—বেদনার বছর।

হযরত আয়েশা ও হযরত সাওদা নবীজির ঘরে

এই দু'টি আঘাতে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতটাই ভেঙে পড়েন—ঘরের বাইরে যাওয়া কমিয়ে দেন। সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম কীভাবে নবীজির এই কষ্টকে লাঘব করা যায় ভাবতে লাগলেন। কারও কারও মনে হলো হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নতুন করে বিয়ে-শাদির অনুরোধ করা যায়। হযরত উসমান ইবনে মাযউন রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর স্ত্রী ছিলেন মুসলমান। কুরাইশ-সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোর সঙ্গে তার ভালো সম্পর্ক ছিল। তার নাম ছিল খাওলা বিনতে হাকীম। তিনি এগিয়ে এলেন। আবেদন করলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি বিয়ে করে নিন। নবীজি বললেন, কাকে বিয়ে করব? খাওলা বললেন, আপনি কুমারী মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলে আমরা সেভাবেই পাত্রী খুঁজব। আর বিধবা বিয়ে করতে চাইলে তাও খুঁজে দেখা যাবে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পাত্রী সন্ধানের অনুমতি দিলেন। হযরত খাওলা রাযিয়াল্লাহু আনহা সর্বপ্রথম হযরত অবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘরে গেলেন। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে হযরত আয়েশাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। এটা তাদের কোনো চিন্তা-ভাবনার বিষয় ছিল না। তারা এককথায় রাজি। তারপর গেলেন হযরত সাওদার ঘরে। তার স্বামী চারজন সন্তান রেখে ইন্তেকাল করেছে। তাকে প্রস্তাব দেওয়ার পর সেও রাজি। উভয় পরিবারের সম্মতিতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু উভয় বিয়েই পড়ান। হযরত সাওদা রাযিয়াল্লাহু আনহা সঙ্গে সঙ্গে নবীজির ঘরে চলে আসেন। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বয়স তখন খুবই কম। তাকে তুলে দেওয়া হয় হিজরতের পর। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা পরবর্তী সময়ে তার যোগ্যতা প্রতিভা মেধা বুদ্ধি জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের কারণে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ও প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনীর আসন দখল করে নেন। পরবর্তী সময়ে হযরত আয়েশা

রাযিয়াল্লাহু আনহা পুরো মুসলিম উম্মাহর জন্যে প্রতিষ্ঠিত হন মহান আশীর্বাদরূপে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী কর্ম ও ইসলামী শরীয়তের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় বিশ্লেষণে তিনি ছিলেন তুলনাহীন। মর্যাদাশীল প্রথম সারির সাহাবাগণ পর্যন্ত বলতেন—আমরা নবীজির গোলামরা যখন কোনো বিষয় বুঝতে ব্যর্থ হই, তখন সোজা হাজির হই হযরত আয়েশার খেদমতে। যাবতীয় বিষয় থাকত তার নখদর্পণে। আমাদের সমস্যার জটিল গ্রন্থি তিনি মুহূর্তে খুলে দিতেন। তার সূত্রে দুই হাজারেরও বেশি হাদীস বর্ণিত আছে।

আবু তালেবের মৃত্যুর পর

নবুওয়তের প্রথম দশ বছর আবু তালেবের ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবের কারণে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরাইশ-সম্প্রদায় সরাসরি কোনো কষ্ট দিতে পারত না। তিনি তাদের আক্রমণাত্মক ও হত্যামূলক কঠোর ষড়যন্ত্র থেকে এই দশ বছর নিরাপদ ছিলেন। আবু তালেবের উপস্থিতির কারণে তারা যে সাহস করত না, তার অবর্তমানে তারা সেই ধরনের সাহস দেখাতেও কুণ্ঠিত হতো না। আবু তালেবের ওফাতের পরে দৃশ্যত তিনি শক্তিমান এক আশ্রয়কে হারিয়ে বসেন। ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়েন। ঘর থেকেও খুব একটা বের হতেন না। একদিন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহ শরীফে যাচ্ছিলেন। পথে এক হতভাগা ইতর ব্যক্তি তাঁর মাথায় কাদা ঢেলে দেয়। নবীজি সেখান থেকেই ঘরে ফিরে আসেন। নবীজির এক কন্যা এই অবস্থা দেখে ছুটে আসেন। কাছে এসে মাথা পরিষ্কার করতে থাকেন। কাঁদতে থাকেন এবং বলতে থাকেন—এই হতভাগারা এতটা ধৃষ্টতা দেখাতে পারছে? হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন কন্যাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, মা ভয় কোরো না। আল্লাহ তাআলাই তোমার বাবাকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করবেন। আমার চাচা নেই বলে আজ কুরাইশরা এতটা দুঃসাহস দেখাচ্ছে। তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন তারা ছিল ভীরু।[১]

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ১৩৪।

আবু লাহাব আবু লাহাবই রয়ে গেল

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এমন দুর্ব্যবহার করা হয়েছে শুনে আবু লাহাব ছুটে আসে। এসে বলে, মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], তুমি যা করতে চাও এবং আবু তালেবের জীবদ্দশায় যা করতে, যেভাবে করতে, নিশ্চিন্তে সেভাবে করে যাও। আবু তালেব তোমাকে যেভাবে নিরাপত্তা দিতেন, আমিও তোমাকে সেভাবে নিরাপত্তা দিয়ে যাব। লাত ও উয্যার কসম করে বলছি—আমি যতদিন বেঁচে থাকব, তোমার দিকে কেউ আঙুল উঠাতে পারবে না। আবু লাহাব এ কথা মুখে বলেছে এবং কর্মেও বাস্তব করে দেখিয়েছে।

এই কথাবার্তার কয়েক দিন পর ইবনুল গাইতালাহ নামক এক ব্যক্তি হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে নিন্দাবাদ ছড়ালে আবু লাহাব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। তাকে শায়েস্তা করার জন্যে এগিয়ে যায়। অমনি সে দৌড়ে কুরাইশদের মজলিসে গিয়ে হাজির হয়। সেখানে গিয়ে চেঁচাতে থাকে—আবু উতবা ধর্মত্যাগী হয়ে পড়েছে। কথাটা ছিল খুবই আশ্চর্য রকমের। কুরাইশের লোকজন সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যায় আবু লাহাবের কাছে। তার কাছে গিয়ে আসল ঘটনাটি জানতে চায়। আবু লাহাব বলে, আমি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম ছাড়িনি। মুহাম্মাদের ধর্মও কবুল করিনি। তবে আমি আমার ভাতিজাকে নিরাপত্তা দিতে চাই। কেউ আমার ভাতিজাকে কষ্ট দেবে আমি তার সুযোগ দেব না। মুহাম্মাদ যা করতে চায়, স্বাধীনভাবে করবে। আর আমি আমার ধর্মের ওপরই আছি। কুরাইশের লোকজন তখন বলল, এটা তো ভালো কথা। তুমি তোমার খান্দানকে রক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছ—এটা ভালো করেছ। এ বিষয়ে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। প্রত্যেক ব্যক্তিরই অধিকার আছে—সে তার খান্দানের যে কোনো ব্যক্তিকে জুলুম ও অবিচারের হাত থেকে রক্ষা করবে। আবু লাহাবের সঙ্গে কথা বলে তারা নিশ্চিন্ত মনে ফিরে আসে। আবু লাহাবও হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসা-যাওয়া করে। কুরাইশ-সম্প্রদায় এ নিয়ে কোনো আপত্তিও তোলেনি। অবশ্য মনে মনে ভয় পেত—আবু লাহাবের এই সাহায্য-সহযোগিতা ভবিষ্যতে কোনো ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনে কিনা! তাই আবু লাহাবকে এই

সহযোগিতার জায়গা থেকে ফিরিয়ে আনার জন্যে কুরাইশ-নেতৃবৃন্দ বরাবর ভাবতে থাকে।

একদিন উকবা ইবনে আবু মুইত ও আবু জেহেল আবু লাহাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তাকে বলে, তুমি মুহাম্মাদকে জিজ্ঞেস করো—তোমার বাপ-দাদাদের কী পরিণতি হয়েছে? তুমি এখনই গিয়ে জিজ্ঞেস করে এসো। আবু লাহাব ছুটে যায়। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে জানতে চায়,

اين مدخل عبد المطلب.

আবদুল মুত্তালিবের ঠিকানা কোথায় হয়েছে?

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

مع قومه.

যেখানে তার সম্প্রদায় আছে।

ফিরে এসে এই উত্তর শোনানোর পর আবু জেহেল এবং উকবা ভাবল—কাজ তো হলো না। অন্তরে ধাক্কা লাগার মতো উত্তর নয় এটা। তাই আবু জেহেল বলল, আবার গিয়ে জিজ্ঞেস করো—আবদুল মুত্তালিব এবং তার সম্প্রদায় কি দোজখে আছে?

আবু লাহাব পুনরায় গিয়ে জিজ্ঞেস করল—

امدخل عبد المطلب النار؟

আবদুল মুত্তালিব কি জাহান্নামে?

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

من مات علي ما مات عبد المطلب دخل النار.

আবদুল মুত্তালিব যে ধর্ম অনুসরণ করে মৃত্যুবরণ করেছে, সেই ধর্মের ওপর যেই মৃত্যুবরণ করবে, দোজখে যাবে।

এই স্পষ্ট উত্তর শোনার পর আবু লাহাবের মাথা ঘুরে যায়। ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। ক্রোধের সঙ্গে বলে—আজ থেকে মরণ পর্যন্ত আমি তোমার শক্ত দুশমন হিসেবেই থাকব।[১]

অন্তহীন মুসিবত

আবু লাহাব সামান্য মানবতা দেখাতে চেয়েছিল। কিন্তু লৌকিক ভদ্রতা আর কতক্ষণ থাকে! অন্তরে লালিত ক্লেদ ও পঙ্কিলতা ভাষা হয়ে ফুটে উঠে। তারপর মরণ পর্যন্ত সে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রুদের নেতৃত্ব দিয়ে ফেরে। আবু লাহাব ছাড়াও হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রুদের তালিকায় ছিল—হাকাম ইবনে আবুল আস, উতবা ইবনে আবু মুইত, আদী ইবনুল হামরা এবং ইবনুল আসদার আল হুজালী। এরা সকলেই ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিবেশী। নবীজির ঘরের সঙ্গেই ছিল এদের প্রত্যেকের নিবাস। ফলে নবীজি তার ঘরেও নিরাপদ ছিলেন না। এই ঘোর দুশমনশ্রেণি বরাবর তাকে আত্মিক ও মানসিকভাবে কষ্ট দিত। এদের মধ্যে হাকাম ইবনে আবুল আস ছাড়া আর কেউ শেষ পর্যন্ত মুসলমান হয়নি। সকলেই মুশরিক অবস্থায় মারা গেছে। যেহেতু তাদের বাড়ি ঘর ছিল আশপাশে। তাই হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়ি থেকে বের হতেই তারা কোনো না কোনোভাবে কষ্ট দিত। ইতর-আচরণে তাঁকে আহত করত। কারও ঘরে কোনো ছাগল জবাই হলে তার নাড়িভুড়ি রেখে দিত। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন যেতে দেখত এই ময়লা-আবর্জনা তার ওপর ছুঁড়ে মারত। কখনোবা আপন ঘরে নামাযরত অবস্থায়ও তার পবিত্র শরীরের ওপর এসব ময়লা-আবর্জনা ঢেলে দিত। অবশেষে বাধ্য হয়ে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পাথর বসিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি তার আড়ালে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন। তারা যখন এসব ময়লা-আবর্জনা ঘরে ফেলে চলে যেত হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলো তুলে নিয়ে বাইরে ফেলে দিতেন।[২]

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ১ : ৩৪।

২ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ২ : ২৫।

তায়েফের পথে

আবু তালেবের মৃত্যুর পর যখন কুরাইশদের নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তির কোনো পথ দেখছিলেন না, তখন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য গোত্রে সাহায্য লাভের চেষ্টা করেছেন। এ সুবাদেই তিনি তায়েফ যান। তায়েফের সাকীফ গোত্র ছিল খুবই শক্তিশালী। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিন্তা করলেন—সাকীফ গোত্র যদি আমাকে আশ্রয় দেয়, তা হলে ইসলাম প্রচারের পথে যেসব প্রতিকূলতা দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তা অনেকটাই সরে যাবে। এ কথা ভেবে তিনি একাকী তায়েফ যান। সাকীফ গোত্রের নেতাদের ঘরে গিয়ে ওঠেন। তারা ছিল তিন ভাই—আব্দে ইয়ালীল, মাসউদ এবং হাবীব। তারা সকলেই আমর ইবনে উমায়ের ইবনে আউফ ইবনে উকদা ইবনে গাইরাহ ইবনে আউফ ইবনে সাকীফের সন্তান। তারা তিন ভাই। একজনের স্ত্রী কুরাইশ-কন্যা। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তারপর ইসলাম প্রচারে এই বলে তাদের কাছে সাহায্য কামনা করেন—তোমরা আমাকে আশ্রয় দান করো। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শেষ হওয়ার পর তাদের এক ভাই বলে ওঠে, আপনাকেই কি আল্লাহ তাআলা রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন? দ্বিতীয় ভাই আক্রমণ করে বলে, আল্লাহ তাআলা কি রাসূলকে পাঠাবার জন্যে আপনাকে ছাড়া আর কাউকে খুঁজে পেলেন না? তৃতীয়জন বলল, খোদার কসম, আমি আপনার সঙ্গে কথা বলব না। কারণ, যদি আপনি সত্যি সত্যি আল্লাহর রাসূল হয়ে থাকেন, তা হলে আপনার সঙ্গে তর্ক করা ভয়ের ব্যাপার। আর আপনি যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকেন, তা হলে আপনার সঙ্গে কথা বলা অর্থহীন।[১]

তাদের তিন ভাইয়ের কথাই বিষমিশ্রিত খঞ্জরের আঘাতের চেয়ে মোটেও কম ছিল না। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরাশ হয়ে উঠে দাঁড়ান। শুধু এইটুকু বলেন—তোমরা যদি আমাকে সাহায্য করতে না পারো, তা হলে অন্তত এই কথাগুলো নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* ৩:১৩৫

রেখো। প্রচার করে বেড়িয়ো না। কারণ, এই কথাগুলো ছড়িয়ে পড়লে কুরাইশদের শত্রুতার আগুন আরও লাভা ছড়াবে। কিন্তু তাদের মধ্যে মানবতা ও ভদ্রতার কোনো ছোঁয়া ছিল না। তারা হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে এলাকার ছেলেদের লেলিয়ে দেয়। গোলাম ও চাকর-বাকরদের ইশারা করে দেয়। তারা সকলে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে লেগে পড়ে। মশকরা করতে থাকে। মুখে যা খুশি বলতে থাকে। হৈ চৈ করতে থাকে। তালি বাজাতে থাকে। তাদের এই হৈ চৈ দেখে তায়েফের বদমাশরাও ছুটে আসে। তাদের কেউ কেউ হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি পাথর ছুঁড়তে থাকে। তার শরীর রক্তাক্ত হয়ে পড়ে। সামান্য দূরেই একটি বাগান ছিল। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ভেতর ঢুকে পড়লে এই বদমাশের দল সেখান থেকে ফিরে আসে। এই ঘটনাটি আমাদের ইতিহাসের পাতায় এভাবে লিখিত হয়েছে—

قال موسي ابن عقبة: قعدوا له صفين علي طريقه، فلما مر رسول الله صلي الله عليه وسلم بين صفيهم جعل لا يرفع رجليه ولا يضعهما الا وضخوهما بالحجارة حتي ادموا رجليه. زاد سليمان التيمي: انه صلي الله عليه وسلم كان اذا اذلقته الحجارة قعد الي الارض فيأخذون بعضديه فيقيمونه، فاذا مشي رجموه وهم يضحكون.

মূসা ইবনে উকবা বর্ণনা করেন, তারা হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথের দুই ধারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যায়। যখন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুই সারির মাঝখান দিয়ে পথ চলতে শুরু করেন, তখন তারা দুই দিক থেকে এমনভাবে পাথর বর্ষণ করে—তাঁর উভয় পা রক্তে ভিজে যায়। তিনি যখন পাথরের আঘাতে মাটিতে পড়ে যান, তখন ওই পাষাণ পামরের দল এসে তাকে দুই হাত ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে দেয়। তিনি হাঁটতে শুরু করলে তারা আবার পাথর ছুঁড়তে শুরু করে এবং অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে।[১]

---

১ ইবনে সায়্যিদুন নাস, উয়ুনুল আসার ১:২৩২

এই বাগান ছিল উকবা ইবনে রাবীআ এবং শায়বা ইবনে রাবীআর। তারা দুই ভাই তখন বাগানেই ছিল। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাগানে ঢুকে একটি মাচার নিচে বসেন। মাচাটিতে আঙ্গুরের থোকা ঝুলে ছিল। তারা দুই ভাই যখন দেখতে পায় একজন ব্যক্তি বাগানে ঢুকে আঙ্গুরের থোকার ছায়ায় বসে আছে—যাকে তায়েফের বদমাশ ধরনের লোকেরা নির্যাতন করেছে, তখন তাদের অন্তর গলে যায়। তাদের মধ্যে মানবতাবোধ জেগে উঠে। তাদের একজন চাকর ছিল খ্রিস্টান। নাম উদাস। চাকরকে ডেকে বলল, আঙ্গুরের একটি থোকা ছিঁড়ে থালায় করে ওই ব্যক্তির সামনে নিয়ে রাখো এবং তাকে খেতে বলো। হুকুম তামিল করল উদাস। আঙ্গুরের থোকা ছিঁড়ে থালায় করে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে নিয়ে রাখল। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে খেতে শুরু করলেন। উদাস খুব মনোযোগসহ নবীজির চেহারাটা দেখল। তারপর মনে মনে বলল, নিশ্চয় এই লোক তায়েফবাসীর কাছে প্রচলিত নয় এমন কোনো কথা বলেছেন। সাহস করে সে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কথাটা বলল। তখন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার বাড়ি কোথায়? আর তোমার ধর্ম কী? উদাস বলল, আমি একজন খ্রিস্টান এবং নিনাওয়ার অধিবাসী। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি আল্লাহর সৎ বান্দা ইউনুস ইবনে মাত্তার এলাকার লোক? উদাস বলল, আপনি ইউনুস ইবনে মাত্তাকে কীভাবে চেনেন? হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—তিনি আল্লাহর নবী এবং আমার ভাই। কারণ, আমিও আল্লাহর নবী। এ কথা শোনামাত্র উদাস উঠে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথা মোবারক এবং হাতে পায়ে চুমু খায়। উকবা এবং শায়বা সআসনে বসে দূর থেকে এই দৃশ্য দেখতে থাকে। পরস্পর বলতে থাকে এই ব্যক্তি তো এর মাথা নষ্ট করে ফেলেছে। দ্যাখো, কীভাবে হাতে পায়ে চুমু খাচ্ছে। উদাস যখন সেখান থেকে উঠে তার মালিকদের কাছে আসে, তখন তারা জিজ্ঞেস করে—তুমি ওই লোকটির হাতে পায়ে চুমু খেলে কেন? উদাস বলল, তিনি এমন কথা বলেছেন, যা কোনো নবী এবং রাসূল ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না।

তখন তারা বলল, দ্যাখো, ওই লোক যেন আবার তোমাকে তোমার ধর্ম থেকে বিচ্যুত না করে ফেলে। তোমার ধর্ম তার ধর্মের চেয়ে উত্তম।[১]

এক চাক্ষুষ সাক্ষীর বর্ণনা

তায়েফ সফরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একা ছিলেন। তায়েফে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যে অমানবিক আচরণ করা হয়েছিল, তার বর্ণনা দিয়েছেন সাকীফ গোত্রেরই এক ব্যক্তি—যিনি পরে মুসলমান হয়েছেন।

ইসলাম কবুল করার পর তিনি বলেছেন—আমি তায়েফে তখন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি। তিনি আগমন করেছিলেন পূর্ব তায়েফে। তাঁর হাতে একটি ধনুক ছিল। সাকীফ গোত্র থেকে সহযোগিতা পাওয়ার আশায় তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। তখন তিনি সেখানে পূর্ণ সূরা তারিক তেলাওয়াত করেছিলেন। সূরাটি আমি সেখানেই হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কণ্ঠে শুনে মুখস্থ করে নিই, অথচ তখনো আমি মুশরিক। যখন মুসলমান হলাম, তখন সকলকে সেই সূরাটি তেলাওয়াত করে শোনালাম। বনু সাকীফের লোকেরা তখন আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল—তুমি এ ব্যক্তির কাছে কী শুনেছ? আমি তাদেরকে পুরো সূরাটি শুনিয়ে দিই। তখন সেখানে কুরাইশের কিছু লোকও বসা ছিল। তারা আমার তেলাওয়াত শুনে বলল, আমরা আমাদের লোককে ভালো করে চিনি এবং জানি। তিনি যা বলছেন, তা যদি আমরা সত্য মনে করতাম, তা হলে আমরা অনেক আগেই তাঁর অনুসরণ করতাম।

তায়েফের সফরে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মিক ও মানসিক কষ্টের শিকার হয়েছিলেন। শিকার হয়েছিলেন শারীরিক কষ্টেরও। এই যন্ত্রণার কথা তিনি আমরণ ভুলতে পারেননি। কারণ, তিনি সেদিনকার ঘটনায় অন্তরে শক্ত রকমের আঘাত পেয়েছিলেন। উহুদ যুদ্ধেও হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আক্রান্ত হয়েছিলেন। তিনি

---

১ বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন—ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ১৩৬; *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ২ :২৮-২৯; ইবনে সায়্যিদুন নাস, *উয়ুনুল আসার*, ১ : ২৩১-২৩৪; ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, ১ : ৫০৭-৫০৮; *তাবাকাতে ইবনে সাদ*, ১ : ২১০-২১১।

শহীদ হয়েছেন বলে সংবাদও ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সময়ে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহা প্রশ্ন করেছিলেন—আপনি কি উহুদের চেয়েও বড় কোনো আঘাত কখনো পেয়েছেন? উত্তরে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, আয়েশা, তায়েফ-সফরে তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাকে যে কষ্ট দিয়েছিল, সেটা উহুদের কষ্টের চেয়েও অনেক কঠিন ছিল। আমি সেদিনকার কষ্টের কথা আজও ভুলতে পারিনি। সাকীফ গোত্রের সরদার আব্দে ইয়ালার কাছে আমি আশ্রয় চেয়েছিলাম। সে মুখের ওপর না করে দিয়েছিল। আমি প্রচণ্ড কষ্ট ও হতাশা নিয়ে সেখান থেকে ফিরেছিলাম। আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত দুশ্চিন্তায় অবশ হয়ে পড়েছিল। কারনুস সাআলিব পর্যন্ত আমি কীভাবে এসেছি—বলতে পারব না। ওখানে পৌঁছার পর লক্ষ করলাম—এক খণ্ড মেঘ আমার মাথার ওপর ছায়া দিয়ে ফিরছে। তারপর হযরত জিবরাঈলকে দেখতে পেলাম। তিনি আমাকে ডেকে বলেন, আল্লাহ তাআলা আপনার সব কথা শুনেছেন। আপনার সম্প্রদায় আপনার সঙ্গে যে আচরণ করেছে তাও দেখেছেন। আপনার কাছে পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত 'মালাকুল জিবাল'কে পাঠিয়েছেন। এমন সময় আমাকে 'মালাকুল জিবাল' সালাম করে বলল, আল্লাহ তাআলা আমাকে পাঠিয়েছেন। আদেশ করেছেন, আমি যেন আপনার হুকুম তামিল করি। আপনি যদি হুকুম করেন, তা হলে আমি এই পাহাড় দু'টি তুলে নিয়ে সাকীফ গোত্রের ওপর ছেড়ে দেব এবং তাদেরকে পিষে ফেলব। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি চাই, তারা বেঁচে থাকুক। আমি আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি, তাদের ঔরসে এমন সন্তান দান করুন—যারা আল্লাহর ইবাদত করবে। আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না।[১]

ভেঙে পড়ল বিপদের পাহাড়

কুরাইশ এবং মুশরিকদের অন্যায় অবিচার ও নির্যাতন অবিরাম চলতে থাকল। জুলুমের ধারা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকল। আঘাতে আঘাতে বাধ্য হয়ে বড় কোনো গোত্রের সাহায্য ও আশ্রয়ের কথা ভাবতে থাকেন

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ১৩৭।

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই লক্ষ্যেই তিনি তায়েফ গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানকার পাষাণ ও হতাশাজনক পরিস্থিতি তাঁকে ফিরিয়ে দেয়—আশেপাশে এখন আর কোনো আশ্রয়ের জায়গা নেই। এই বিশাল পৃথিবী তাঁর জন্যে সংকুচিত হয়ে পড়েছে।

মক্কার পরিস্থিতি এতটাই বিপদজনক হয়ে উঠেছিল—কারও সাহায্য ছাড়া আপন ঘরে অবস্থান করাও দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছিল। তায়েফের সন্ধানেই হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপলব্ধি করতে পারেন—এখন মক্কায় প্রবেশ করাটা কোনোভাবেই নিরাপদ নয়। যেখানেই সামান্য আশ্রয়ের চেষ্টা করছিলেন সেখানেই পাচ্ছিলেন পাষাণ-আঘাত। মন ও মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ হারাবার উপক্রম হয়ে পড়েছিল।

তারপরও তিনি অবিরাম আশ্রয়ের কথা ভাবছিলেন। তায়েফ থেকে ফিরে এসে সর্বপ্রথম উরায়কিতের আখনাস ইবনে শারীকের কাছে আশ্রয় চেয়ে বার্তা পাঠান। বার্তা পাওয়ার পর আখনাস এই বলে উত্তর পাঠায়—যে ব্যক্তি নিজেই কুরাইশদের বিরোধী সে আবার কুরাইশদের শত্রুকে কীভাবে আশ্রয় দেবে? আমি কোনোভাবেই আশ্রয় দিতে প্রস্তুত নই। আখনাসের পক্ষ থেকে এই পরিষ্কার উত্তর পাবার পর তিনি সুহাইল ইবনে আমরের কাছে একই উদ্দেশ্যে বার্তা পাঠান। সুহাইল উত্তরে বলে পাঠায়—আমের ইবনে লুওয়াইর সন্তানরা কাব ইবনে লুওয়াইর বিরুদ্ধে কাউকে আশ্রয় দিতে পারে না। এখান থেকেও মনভাঙা জবাব পেলেন। তারপর তিনি মুতঈম ইবনে আদীর কাছে আশ্রয় চেয়ে দূত পাঠালেন। মুতঈম দূতকে বলে পাঠাল—যাও, এখানে আসতে বলো। আমি তাকে আশ্রয় দেব। সংবাদ শোনার পর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুতঈম ইবনে আদীর কাছে যান। তার ঘরেই রাত কাটান। সকাল হওয়ার পর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘর থেকে বের হন মুতঈম ইবনে আদী তার সাত পুত্রকে সঙ্গে করে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করেন। তাদের সকলের হাতে তরবারি। তাদের সঙ্গে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বায়তুল্লায় প্রবেশ করেন। মুতঈম হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলে—আপনি তাওয়াফ করুন। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম তাওয়াফ করছেন। মুতঈমের সাত পুত্র অস্ত্রসজ্জিত হয়ে ছায়ার মতো ঘুরছে নবীজির সঙ্গে। অবাক চোখে এই দৃশ্য আবু সুফিয়ান দেখতে থাকে। তারপর মুতঈম ইবনে আদীর কাছে এসে জিজ্ঞেস করে—তুমি কি তাঁকে আশ্রয় দিয়েছ, না তাঁর ধর্ম কবুল করেছ। মুতঈম বলল, আমি তাঁকে আশ্রয় দিয়েছি। তখন আবু সুফিয়ান বলল, তা হলে এর বিরোধিতা করা হবে না। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফ শেষ করে যখন বাড়ির দিকে পা বাড়ান, মুতঈমও তখন তার পুত্রদের নিয়ে ঘরমুখি হয়।[১]

বিভিন্ন আরবগোত্রে আশ্রয়ের চেষ্টা

হিজরতের পূর্বে যাপিত এই তিনটি বছর ছিল বিপদজনক এবং শ্বাসরুদ্ধকর। কদমে কদমে আক্রমণের ভয় লেগে থাকত। তা ছাড়া মক্কায় কুরাইশ-সম্প্রদায় দাওয়াত ও তাবলীগের পথ পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছিল। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কেউ দেখা করবে, কথা বলবে—এর কোনো অবকাশই ছিল না। কুরাইশদের নির্মমতা চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছে গিয়েছিল। দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব সম্পাদনের জন্যে শক্তিমান কোনো সম্প্রদায়ের আশ্রয় গ্রহণ হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। তাই হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শক্তিমান এমন কোনো জনবসতি খুঁজে ফিরছিলেন—মক্কা ছেড়ে যেখানে তিনি আশ্রিত হবেন। সেখানে থেকেই চালিয়ে যাবেন আল্লাহর দীনের প্রচার। বাইরের গোত্রগুলোর সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ হতো কেবল হজের মওসুমে। নবীজি কথা বলেও যাচ্ছিলেন। কিন্তু সফলতা ধরা দিচ্ছিল না। হজের মওসুমে তিনি বিভিন্ন গোত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। কিন্তু কুরাইশ বাধা সৃষ্টি করে তার প্রতিটি প্রচেষ্টাকেই ভণ্ডুল করে দিত।

রাবীআ ইবনে আব্বাদের বর্ণনা। আমি হজের মওসুমে আমার বাবার সঙ্গে মক্কা গিয়েছিলাম। তখন আমি টগবগে যুবক। আমরা যখন মিনায়

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ১৩৭-১৩৮; ইবনে সায়্যিদুন নাস, *উয়ুনুল আসার*, ১ : ২৩৪।

অবস্থান করছিলাম তখন লক্ষ করলাম—হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবগোত্রগুলোর কাছে পালাক্রমে ছুটে যাচ্ছেন। তাদেরকে গিয়ে বলছেন, শোনো, আমি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল। তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করো। আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক কোরো না। প্রাণহীন এই মূর্তিদের পূজা কোরো না। আল্লাহর কোনো শরিক নেই। আমার প্রতি ঈমান আনো। আমার কথাকে মেনে নাও। আর আমাকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করো—যেন আমি মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিতে পারি।

নবীজি প্রতিটি গোত্রের তাঁবুতে গিয়ে তাদের সর্দারদের সঙ্গে দেখা করতেন। কথা বলতেন। কিন্তু আমি লক্ষ করলাম—তিনি যেখানেই যাচ্ছেন, তার পেছনে পেছনে গোঁয়ার ট্যারাচোখ লম্বাচুল এক ব্যক্তি ছায়ার মতো ছুটছে। তার গায়ে আদনি পোশাক। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শেষ হতে না হতেই সে বলতে শুরু করত—অ্যাই শোনো, তোমরা এর ফাঁদে পোড়ো না। তোমরা যদি এর কথার পাকে পড়ো, তা হলে লাত ও উয্যাকে ছাড়তে হবে। এই লোক নতুন নতুন সব কথা বলে। এ হচ্ছে তোমাদের বাপ-দাদার ধর্মের শত্রু। তোমরা এর কথা শুনো না। মেনো না। অন্যথায় ধোঁকার শিকার হবে। লোকটি হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাগুলোকে এভাবে বাতাসে উড়িয়ে দিত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল চেষ্টা-সাধনা জলে যেত। রাবীআ ইবনে আব্বাদ বলেন, আমি আমার বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম—পেছনে পেছনে যাচ্ছে এবং তার সবগুলো কথাকে এভাবে উড়িয়ে দিচ্ছে—লোকটা কে? আমার বাবা বললেন, এ হচ্ছে তার চাচা আবদুল উয্যা ইবনে আবদুল মুত্তালিব। মানুষ তাকে আবু লাহাব বলে।

আশআস ইবনে সুলাইম কিনানা এক ব্যক্তির কথা বর্ণনা করেছেন। লোকটি বলেছে, আমি যুলমাজায বাজারে দেখেছি হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন—হে লোকসকল, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। তোমরা যদি আমার এই কথা বিশ্বাস করো এবং এর প্রতি ঈমান আনো, তা হলে সফল হবে। লক্ষ করলাম, তার পেছন পেছন এক ব্যক্তি ছুটে এল। এসেই এক মুঠ মাটি তুলে নবীজির ওপর ছুঁড়ে দিলো।

লোকটি ছিল আবু জেহেল। সে উপস্থিত লোকদের বলে যাচ্ছিল—সাবধান, এ যেন তোমাদেরকে ধোঁকা দিয়ে ধর্মহারা না করে। এ চায় তোমরা যেন তোমাদের মাবুদ লাত ও উয্যার পূজাপাট ছেড়ে দাও।[১]

বিভিন্ন বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নানা গোত্রের কাছে গিয়েছেন। গোত্রপ্রধানদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাদের আশ্রয় ও সহমর্মিতা লাভের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কেউ তাকে ইতিবাচক জবাব দেয়নি। বনু কিলাবের একটি গোত্র বনু আবদুল্লাহ। নবীজি তাদের কাছেও গিয়েছেন। ঈমানের দাওয়াত দিয়েছেন। আশ্রয়দানের আহ্বান জানিয়েছেন। তারাও নেতিবাচক জবাব দিয়েছে। নবীজিকে হেফাজতের ভার গ্রহণ করতে রাজি হয়নি।

আবদুল্লাহ ইবনে মালেক ইবনে কাব বলেন, একবার হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু হানীফার তাঁবুর কাছে গেলেন। তাদেরকে ঈমান ও তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। তাদেরকে আশ্রয়দানের প্রস্তাব করলেন। বললেন, আমি তোমাদের গোত্রে থাকতে চাই। তোমরা কি আমাকে আশ্রয় দেবে? তারা সেদিন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিকৃষ্ট ধরনের উত্তর দিয়েছিল। কঠোর এবং অভদ্রোচিত।

তিনি আরেকবার ছুটে যান আমের ইবনে সাসায়া গোত্রের কাছে। তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াত দেন। সঙ্গে আশ্রয়দানের প্রস্তাব করেন। অনুরোধ করে বলেন—আমি তোমাদের আশ্রয়ে থাকতে চাই। এই গোত্রে এক লোক ছিল। নাম তার বুহায়রা ইবনে ফিরাস। সে তার নিজস্ব বিবেক ও চিন্তার বিচারে তার গোত্রের লোকদেরকে বলল, যদি আমি এই লোককে পাই, তা হলে পুরো আরবকে আমার অধিকারে নিয়ে আসতে পারব। পুরো আরব জাতিকে আমি তখন শাসন করতে পারব। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাদের কাছে যান, তখন এই বুহায়রা তাঁকে বলে—আচ্ছা, বলুন তো, আমরা যদি আপনার কথা মেনে নিই এবং আপনার অনুসারী হই—অতঃপর আল্লাহ তাআলা যদি আপনাকে বিজয় দান করেন, তা হলে কি আপনি আমাদেরকে শাসন-

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ১৩৯।

ক্ষমতায় অংশীদার করবেন? শাসন-ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ কি তখন আমাদের হাতে দেবেন? হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—এটা তো সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে খুশি ক্ষমতা দান করেন। এটা আমার এখতিয়ারের বিষয় না। এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে খুবই অভদ্রোচিতভাবে বলে ওঠে, ভারী মজা তো! আপনার কথায় আমরা আরবদের তির-বর্শার সামনে বুক পেতে দেব আর যখন বিজয় আসবে, তখন শাসন করবে অন্য লোকেরা! এটা তো কখনো হতে পারে না। আমরা কোনোভাবেই আপনার দায়-দায়িত্ব নিতে পারি না।

বনু আমের সম্প্রদায় হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তখন খুবই শক্ত কথা বলে ফিরিয়ে দেয়। তারা যখন হজ শেষে স্বীয় গোত্রে ফিরে যায়—সেখানে গিয়ে কথা হয় গোত্রের এক বয়োজেষ্ঠ্য ব্যক্তির সঙ্গে। এই ব্যক্তি বার্ধক্যের কারণে হজে আসতে পারেনি। হজ থেকে আগত লোকদের কাছে তাই জানতে চায়—এবারের হজের মওসুমে নতুন কিছু ঘটে থাকলে আমাকে বলো। আগত লোকজনের মুখে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন, কথাবার্তা ও বুহায়রার বক্তব্য সবিস্তারে শুনে মাথায় হাত দিয়ে বলল—বনু আমের, আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, এই ব্যক্তি নিশ্চয় ইসমাঈল ইবনে ইবরাহিমের বংশের সন্তান। তিনি যা বলেছেন, পরিপূর্ণ সত্য বলেছেন। তাঁর কথা প্রত্যাখ্যান করে তোমরা অনেক বড় ভুল করেছ।[১]

শুধু ব্যর্থতা আর ব্যর্থতা

এভাবে অনেক গোত্রের কাছে তিনি একের পর এক গিয়েছেন। ঈমান ও তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন। শক্তিমান এবং উল্লেখযোগ্য প্রতিটি গোত্রের কাছেই আবদার করেছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় আবদার করেছেন সামান্য আশ্রয়ের। এও বলেছেন—আমাকে আশ্রয় দিলে গোত্রের সকলকে যে এখনই আমার ধর্ম মেনে নিতে হবে, এমনটা আবশ্যক নয়। কারণ, ধর্ম কবুলে কোনো জবরদস্তি নেই। যে আমার কথায় আশ্বস্ত হতে পারবে, সে ঈমান আনবে। কারও অন্তর যদি আশ্বস্ত না হয়, তাকে এখনই ঈমান

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ১৩৯-১৪০।

আনতে হবে, জরুরি নয়। আমি চাই তোমরা আমাকে একটু আশ্রয় দাও। যারা আমাকে হত্যা করতে চাচ্ছে, তারা যেন তাদের উদ্দেশ্যে সফল হতে না পারে। আমি যেন আমার প্রভুর বাণী স্বাধীনভাবে সকলের কাছে পৌঁছে দিতে পারি। নিশ্চিন্তভাবে যেন আমি আমার দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারি। এভাবে পরিষ্কার করে বলার পরও তাঁর ডাকে কেউ সাড়া দেয়নি।

হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কথা

নবীজির চাচা হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন—এখন আপনার এবং আপনার সন্তানদের নিরাপত্তা আমার জন্যে যথেষ্ট নয়। আগামীকাল আপনি আমাকে বাজারে নিয়ে চলুন। সেখানে অবস্থানরত বহিরাগত গোত্রগুলোর সঙ্গে আমি আলোচনা করতে চাই। কথামতো আমি তাঁকে নিয়ে বাজারে যাই। তিনি কয়েকটি গোত্রের সঙ্গে সাক্ষাতের এবং কথা বলার সুযোগ পান। বিভিন্ন গোত্রের নেতৃবৃন্দের কাছে আমি তাঁকে নিয়ে যাই। পরিচয় করিয়ে দিই। আগত লোকদের সম্পর্কেও এভাবে ধারণা দিই—দেখুন, এরা হচ্ছে ইয়েমেন থেকে আগত লোক। আর এরা হচ্ছে সেখানকার অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত শ্রেণির মানুষ। আর এরা হচ্ছে বকর ইবনে ওয়াইল গোত্রের মানুষ। আর এই দিকে যাদেরকে দেখছেন—এরা হচ্ছে বনু আমের গোত্রের বাসিন্দা। আপনি সরাসরি এদের সঙ্গে কথা বলুন। তিনি প্রত্যেক গোত্রের লোকজনের সঙ্গে পালাক্রমে কথা বলেন। তাদের অধিকাংশজনই তিক্ত ভাষায় জবাব দেয়। তিনি নিরাশ হয়ে ফিরে আসেন।

একবার তো তাঁকে ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়। তিনি বনু আমের গোত্রে কথা বলছিলেন। এমন সময় বুহায়রা হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বেয়াদবি করে বসে। অত্যন্ত অমার্জিত ভাষায় বলে ওঠে—আপনি এখনই আপনার গোত্রে চলে যান। আপনি যদি আমার গোত্রের কাছে না হতেন, তা হলে আমি আপনার গর্দান উড়িয়ে দিতাম। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়েন। সোজা তার উটের ওপর উঠে যান। তারপরও বুহায়রা হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে অভদ্রোচিত আচরণ করতে থাকে।

এমন সময় সেখানে বনু আমের গোত্রেরই এক কন্যা এসে উপস্থিত। সে মক্কার বধূ। তার খান্দানের লোকেরা হজ করতে এসেছে জেনে ভাইদের সঙ্গে এখানে সাক্ষাৎ করতে এসেছে। তার নাম দবাআ বিনতে আমের। মক্কায় থাকাকালেই সে ইসলামও কবুল করেছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বুহায়রাকে বেয়াদবি করতে দেখে বনু আমেরকে ক্ষেপিয়ে তোলে। সে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তার গোত্রকে এই বলে তিরস্কার করে—তোমাদের সামনে আল্লাহর রাসূলকে অপমান করা হচ্ছে আর তোমরা বসে তামাশা দেখছ—তোমাদের লজ্জা করছে না? তোমাদের কারও মধ্যেই কি আত্মমর্যাদাবোধ নেই? আল্লাহর নবীকে এই অসভ্যের হাত থেকে রক্ষা করার মতো কোনো ভদ্রলোক তোমাদের মধ্যে নেই? তার এই চিৎকার বনু আমেরের আত্মমর্যাদাবোধে সত্যিই আগুন ধরিয়ে দেয়। গোতায়েফ ইবনে সুহায়েল, গিতফান ইবনে সুহায়েল এবং উরওয়া ইবনে আবদুল্লাহ উঠে দাঁড়ায়। তারা বুহায়রাকে টেনে এনে মাটিতে ফেলে দেয়। তারপর তার বুকের ওপর বসে তার মুখে সমানে কিল ঘুষি চালাতে থাকে। তার চেহারা একেবারে বিগড়ে ফেলে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাদেরকে এই বলে দুআ দেন—

اللهم بارك هؤلاء والعن هؤلاء.

হে আল্লাহ, তুমি এদেরকে বরকতমণ্ডিত করো। আর ওদেরকে করো অভিসম্পাতিত।

পরবর্তী সময়ে এই তিনজনই ইসলাম গ্রহণে ধন্য হয়েছিলেন।[১]

আশার আলো

এভাবে পুরো একটি বছর চরম নির্যাতন, অসহায়ত্ব এবং নানা রকমের বিপদাপদে অতিবাহিত হয়। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নানাভাবে নানা গোত্রের কাছে আশ্রয় লাভের চেষ্টা করেন। কিন্তু পদে পদে

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ১৪৪; অবশ্য এই বর্ণনা সম্পর্কে আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বলেছেন—هذا اثر غريب كتبناه لغرابته والله اعلم—কিন্তু আমি অন্য কোথাও এই বর্ণনাটি পাইনি। এই বর্ণনায় কালবীর মতো বদনাম রাবীও রয়েছে।-আসীর আদরাবী

তাঁকে হতাশা নিয়েই ঘরে ফিরতে হয়। তাঁর প্রতি সহযোগিতার একটি হাতও প্রসারিত হয়নি।

হজ্জের মওসুম ছাড়াও বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ বরাবর উমরা করতে আসত। কষ্ট ও হতাশার এই দুর্দিনে মদীনার আনসারদের আওস কবিলার সম্মানিত ব্যক্তিগণও বিভিন্ন সময় এসেছেন, কথা হয়েছে। প্রথমে সুওয়াইদ ইবনে সামেত আসেন। অভিজ্ঞ এবং বয়োজ্যেষ্ঠ। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি বলেছিলেন—আমার কাছেও অনেক ভালো ভালো কথা আছে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বলুন! তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনেক কথা শোনালেন। সব শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, খুবই চমৎকার কথা। তবে আমার কাছে যা আছে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত এবং তোমার কথার চেয়ে অনেক উন্নত। এরপর নবীজি কুরআন তেলাওয়াত করে শোনান। সুওয়াইদ খুবই প্রভাবিত হন। ইসলাম কবুল করেন। কিন্তু তিনি মদীনায় ফিরে যাওয়ার অল্প কিছু দিন পর খাযরাজ গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে ফেলে।

এর অল্প কিছু দিন পর তার গোত্রেরই আরেক ব্যক্তি ইয়াস ইবনে মুআয আরও ক'জনকে সঙ্গে করে মক্কায় আসে। তারা এসেছিল মূলত খাযরাজ গোত্রের বিরুদ্ধে কুরাইশদের সঙ্গে কোনো ধরনের চুক্তি করার উদ্দেশ্যে। মদীনায় আওস এবং খাযরাজ এই দুই কবিলার মধ্যে বরাবর বিরোধ ছিল। তারা ছিল পরস্পর-রক্তপিপাসু। এই তো কিছু দিন পূর্বে তাদের মধ্যে একটি ভয়াবহ যুদ্ধ হয়ে গেছে—ইতিহাসে যাকে বুগাস যুদ্ধ বলে। এই যুদ্ধে উভয় গোত্রেরই নেতা এবং উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ মারা যায়। এই যুদ্ধে দুটো গোত্রই ধ্বংসের দুয়ারে এসে বসে। তারপরও তারা একে অপরকে ভয় করত। কারণ, কোনো চুক্তি হয়ে তাদের লড়াই বন্ধ হয়নি বরং সাময়িকভাবে যুদ্ধবিরতি হয়েছিল। আসল কথা কী—দুই গোত্রের কোনো গোত্রেরই যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার মতো শক্তি ছিল না তখন। এই সময়েই কয়েকজন ব্যক্তিকে সঙ্গে করে ইয়াস ইবনে মুআয কুরাইশদের সঙ্গে সাহায্যমূলক কোনো ধরনের চুক্তি করা যায় কিনা—সেই লক্ষ্যে মক্কায় আসে। বিষয়টি হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে

পারেন। মক্কার বাইরে গিয়ে তিনি তাদের সঙ্গে দেখা করেন। ইসলামের দাওয়াত দেন। কুরআন তেলাওয়াত করে শোনান। ইয়াস ইবনে মুআয ছিল হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্বোধনের পাত্র। নবীজির কথায় এবং তেলাওয়াতে সে গলে যায়। সঙ্গীদেরকে বলে—আমরা যে উদ্দেশ্যে এসেছি তার চেয়ে এটাই ভালো। আমরা তাঁর কথা মেনে নেই। ইয়াস ইবনে মুআয ছিল এই প্রতিনিধি দলের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে ছোট। তাই প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যরা তার কথা এই বলে উড়িয়ে দেয়—আমরা যে উদ্দেশ্যে এসেছি, সেই উদ্দেশ্যে কীভাবে সফল হতে পারি, সেটাই আগে চেষ্টা করে দেখা উচিত। অন্য কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তা করার সময় এখন আমাদের হাতে নেই। এরপরও ইয়াস ইবনে মুআয ইসলাম কবুল করেন। এই প্রতিনিধিদল মদীনায় ফিরে যাওয়ার পর ইয়াস ইবনে মুআযও সাম্প্রদায়িকতার শিকার হন। অল্প কয়েকদিন পরেই ইন্তেকাল করেন। এভাবে মদীনার দুই ব্যক্তি মুসলমান হলেও তারা তেমন হায়াত পাননি।

মদীনার আনসারদের ইসলাম গ্রহণ

এর এক বছর পর। হজের দ্বিতীয় মওসুম সমাগত। গত বছর হজের মওসুমে ব্যর্থতা আর নিরাশা ছাড়া আর কিছুই মেলেনি। সঙ্গে ছিল আত্মিক ও মানসিক নানা যন্ত্রণার উপস্থিতি। এ বছরও হজের মওসুমকে উপলক্ষ করে বিভিন্ন গোত্রের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার প্রস্তুতি নিলেন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ভাবলেন, মক্কার ভেতরে থেকে কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলা ভারি মুশকিল। পদে পদে বাধা হয়ে দাঁড়াবার আশঙ্কা রয়েছে কুরাইশদের। এইসব ভেবে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার বাইরে গিয়ে আগত গোত্রগুলোর সঙ্গে কথা বলাই সঙ্গত মনে করলেন। এজন্যে বিখ্যাত উল্লেখযোগ্য গোত্র ও গোত্রপতির সন্ধানে মক্কার বাইরে পাহাড়ের কোনো ঘাঁটিতে গিয়ে অবস্থান করলেন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। উদ্দেশ্য—শহরের ভেতরে ঢোকার পূর্বেই তাদের সঙ্গে কথা বলবেন। একদিন মদীনার আনসারদের একটি কাফেলা এসে উপস্থিত হলো। তারা ছিল খাযরাজ গোত্রের লোক। হযরত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগিয়ে গেলেন। তাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। জানতে চাইলেন—আপনারা কারা?

: আমরা খাযরাজ গোত্রের লোক।

: ইহুদিদের সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ আছে কি?

: হ্যাঁ, তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে।

পরিচয়পর্ব শেষ হওয়ার পর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আপনারা একটু আরাম করে বসুন। আমি আপনাদের সঙ্গে আরও কিছু কথা বলতে চাই। তারা সকলেই পূর্ণ স্বস্তির সঙ্গে আসন গ্রহণ করে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাদের উদ্দেশ্যে বলেন—আল্লাহ তাআলা আমাকে নবী করে পাঠিয়েছেন। আমাকে আদেশ করেছেন—আমি যেন মানুষকে মূর্তিপূজা ছেড়ে এক আল্লাহর ইবাদত করতে বলি। তারপর তিনি কুরআনে কারীমের কয়েকটি সূরা তেলাওয়াত করে শোনান।

খাযরাজ গোত্রের লোকদের বসবাস ছিল মদীনার ইহুদিদের সঙ্গে। ইহুদি-সম্প্রদায় ছিল আহলে কিতাব। তারা শিক্ষিত ছিল। ধর্ম বিষয়ে তাদের ভালো জানাশোনা ছিল। পক্ষান্তরে খাযরাজের লোকজন ছিল মূর্তিপূজারি এবং মুশরিক। ফলে তাদের মধ্যে কখনো কখনো লড়াই বাঁধত। যুদ্ধে ইহুদিরা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ত, তখন বলত—তোমরা আর ক'টা দিন অপেক্ষা করো। শীঘ্রই সর্বশেষ নবীর আবির্ভাব হবে। শেষ নবীর আগমনকাল একেবারে ঘনিয়ে এসেছে। সেই নবী যখন আসবেন, আমরা তার পতাকার নিচে সমবেত হব। তার পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেব।

ইহুদিদের এইসব কথাবার্তা শুনে খাযরাজ গোত্র অনুমান করতে পারে, ইহুদিরা কোনো একজন নবীর অপেক্ষা করছে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নবুওয়ত বিষয়ে আলোচনা করলেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে ইহুদিদের কথাগুলো সকলের মস্তিষ্কে তাজা হয়ে উঠল। তারা ভাবতে লাগল, ইহুদিরা হয়তো এই নবীরই অপেক্ষা করছে। তারপর তারা পরস্পরে শলাপরামর্শ করল। একে অপরকে বলল, ইহুদিরা এই নবীর কথা

বলেই আমাদেরকে ভয় দেখাত। এই নবীকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ করে আমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার কথা বলত। সুতরাং ভালো হয় ইহুদিদের পূর্বে আমরাই এই নবীর হাতে শপথ গ্রহণ করি। তার পতাকার নিচে সমবেত হই। তা হলে আমরা এই নবীর সঙ্গে থেকে ইহুদিদের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারব। কথাটি সকলের মনেই ধরে। তারপর তারা সম্মিলিতভাবে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত কবুল করে এবং ঈমান আনয়ন করে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করান। ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি শিক্ষা দেন।

ইসলাম কবুল করার পর তারা আবেদন করে—এই মুহূর্তে আমাদের অঞ্চলে ভয়াবহ যুদ্ধের পরিবেশ বিরাজ করছে। রাত-দিন আমরা এই অস্থিরতায় জ্বলছি। আমাদের এখানকার দুটো গোত্র আওস এবং খাযরাজ বরাবর একে অপরের প্রতিপক্ষ। আমরা আশাবাদী—আল্লাহ তাআলা আপনার বরকতে হয়তো এই যুদ্ধ শেষ করে দেবেন। আপনি আমাদের এখানে চলুন। ওদেরকেও ইসলামের দাওয়াত দিন। আপনার উসিলায় হয়তো আমাদের দুই গোত্রের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে। ইসলাম কবুল করার পর এই কাফেলা সেখান থেকেই মদীনায় চলে আসে। এই কাফেলায় যারা ছিলেন তারা হলেন—

১. আবু উমামা আসআদ ইবনে যুরারা আন নাজ্জারী
২. নাফে ইবনে মালেক ইবনে আজরান আয যুরাকী
৩. আওফ ইবনুল হারেস ইবনে রিফাআ নাজ্জারী
৪. তারইয়্যাহ ইবনে আমের ইবনে হাদীদা ইবনে আমর আস সুলামী
৫. উকবা ইবনে আমের সুলামী
৬. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ সুলামী রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

মদীনার আনসারদের মধ্যে এই ছয়জন সর্বপ্রথম ইসলাম লাভে ধন্য হন—যাদের মাধ্যমে ইসলাম মদীনায় পরিচিতি লাভ করেছে। এই কাফেলাটি ছিল খুবই ভাগ্যবান। এদের উসিলায় ইসলাম মদীনাতে শক্তভাবে শেকড় ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে যায়। ইসলাম কবুল করার পর তারা

মদীনায় এসে চুপচাপ বসে থাকেননি। তারা তাদের কবিলায় ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন। মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা আলোচনা করেন এবং ইসলামের দাওয়াত দেন। তাদেরই চেষ্টা সাধনার ফলশ্রুতিতে অল্প কিছু দিনের মধ্যে মদীনার ঘরে ঘরে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় আলোচনা সুবাস ছড়াতে থাকে। মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করে—আল্লাহ তাআলা মক্কায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন। আনসারদের মধ্যে আবেগ ও আশা ঢেউ খেলতে থাকে। তারপর যখন হজের মওসুম এসে দাঁড়ায়—প্রথমে যারা ইসলাম কবুল করেছিলেন, তারা আবার হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হন। সঙ্গে করে নিয়ে আসেন আরও ছয়জন। সেই ভাগ্যবান ছয়জন হলেন—

১. যাকওয়ান ইবনে আব্দে কায়স যুরাকী
২. উবাদা ইবনে সামেত খাযরাজী
৩. আবু আবদুর রহমান ইয়াজিদ ইবনে সালাবা বালাবী
৪. আব্বাদ ইবনে উবাদাহ ইবনে ফযলাহ আজলানী
৫. ওয়াইস ইবনে সায়েদা
৬. আবুল হাইসাম ইবনুত তাইহান।

এই বারো জন একসঙ্গে এসে হাজির হন নবীজির দরবারে। এদের মধ্যে চারজন ছিলেন খাযরাজ গোত্রের, দুইজন আওস গোত্রের। এদের আসার উদ্দেশ্য ছিল হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য অর্জন এবং ইসলাম গ্রহণ। এবারের হজের মওসুমেও হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার বাইরে পাহাড়ের ঘাঁটিতে অবস্থান করছিলেন। সেখানেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তাদের। তারা সেখানে গিয়ে ইসলাম কবুল করেন। নবীজির হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। ইসলামের ইতিহাসে একেই আকাবার প্রথম বাইয়াত বলা হয়।[১]

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ২ : ৩৮-৩৯; *তাবাকাতে ইবনে সাদ*, ১ : ২১৯-২২০; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ১৪৮-১৫০; ইবনে সায়্যিদুন নাস, *উয়ুনুল আসার*, ১ : ২৬২-২৬৩; ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, ১ : ৫১০-৫১১।

মদীনায় ইসলাম

এই বারো জন ইসলাম কবুল করার পর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আবেদন করেন—আমাদের সঙ্গে একজন শিক্ষক দিন। আমরা তাকে মদীনায় নিয়ে যাব। তিনি সেখানে গিয়ে আমাদেরকে কুরআন শরীফ, দীনি মাসায়েল এবং ইসলামের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি শিক্ষা দেবেন। তাদের এই প্রস্তাব হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই পছন্দ করেন। স্বীয় খান্দানের অত্যন্ত মেধাবী ব্যক্তি মুসআব ইবনে উমায়ের ইবনে হাশেম ইবনে আব্দে মানাফকে তাদের সঙ্গে শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করেন। বিদায়ের সময় বলে দেন—তুমি এদেরকে কুরআন শিখাবে এবং ইসলামের তালীম দেবে।

আদেশমাফিক হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু মদীনায় চলে যান। সেখানে গিয়ে হযরত আসআদ ইবনে যুরারা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘরে ওঠেন। যারা ইসলাম কবুল করেছেন, তিনি তাদেরকে কুরআন পড়াতেন। আর এ কারণেই মদীনায় তাকে 'মুকরী' বলা হতো। তিনিই নামায পড়াতেন। কারণ নবদীক্ষিত এই মুসলমানদের মধ্যে আওস খাযরাজ উভয় গোত্রের লোক রয়েছে। তাদের মধ্যে দীর্ঘ দিন যাবৎ চলে-আসা যুদ্ধের বিরোধ এখনো পরিপূর্ণরূপে মুছে যায়নি। তাই তাদের জন্যে একে অপরের পেছনে নামায পড়া কিছুটা অস্বস্তির কারণ হতে পারত। এ কারণেই হযরত মুসআব রাযিয়াল্লাহু আনহু বরাবর নামায পড়াতেন।

প্রশস্ত হলো ঈমানের আলোকবৃত্ত

হযরত আসআদ ইবনে যুরারা রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন অত্যন্ত আবেগদীপ্ত নিষ্ঠাবান মুসলমান। ইসলামের প্রচার প্রসার ছিল তার অনুক্ষণ ভাবনার বিষয়। তিনি ভাবতেন—ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগে যেন কোনো ধরনের অবহেলা না হয়। এ বিষয় নিয়ে তিনি সদা ভাবতেন। একবার তার মাথায় একটি কথা এল। বিষয়টি তিনি হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহুকেও জানালেন। বললেন, চলুন আমরা আবদুল আশহাল গোত্রে যাই। ওই গোত্রের সর্দার সাদ ইবনে মুআয আমার খালাতো ভাই। তিনি যদি মুসলমান হন, তা হলে তার পুরো গোত্র

ইসলামের ছায়ায় সমবেত হবে। মুসআব ইবনে উমায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু আসআদ ইবনে যুরারা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে হযরত সাদ ইবনে মুআযের বাগানে চলে গেলেন। হযরত সাদ তার বাগানেই থাকতেন। বাগানে একটি কূপ ছিল। কূপের পাড়েই তারা বসে পড়লেন। দেখাদেখি সেখানে আরও কয়েকজন মুসলমান এসে সমবেত হলেন। তৎকালে আবদুল আশহাল গোত্রের মূল নেতা ছিলেন দুই জন—সাদ ইবনে মুআয এবং উসাইদ ইবনে হুযায়ের। তারা দুইজনই বাপ-দাদার ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সাদ ইবনে মুআয যখন জানতে পারলেন—আসআদ ইবনে যুরারা তার বাগানে এসেছেন, তখন তিনি উসাইদ ইবনে হুযায়েরকে এই বলে বাগানে পাঠালেন—দ্যাখো তো, দুইজন মানুষ আমাদের বাগানে এসেছেন, ওখানে তারা মানুষকে কী শিখাচ্ছে? তাদেরকে সতর্ক করে দাও। এদের মধ্যে আমার খালাতো ভাই আসআদ ইবনে যুরারা আছেন। এই কারণেই আমি যাচ্ছি না, নইলে আমি নিজে যেতাম।

উসাইদ ইবনে হুযায়ের বর্শাটি তুলে নিলেন। তারপর সোজা বাগানের কূপটির দিকে হাঁটা দিলেন। আসআদ ইবনে যুরারা রাযিয়াল্লাহু আনহু উসাইদ ইবনে হুযায়েরকে আসতে দেখে হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন—ওই যে লোকটিকে আসতে দেখছেন, ইনি হলেন এই গোত্রের সর্দার। আগমনের পর তাকে ইসলামের দাওয়াত দিন।

উসাইদ ইবনে হুযায়ের রাগে গজগজ করতে করতে তাদের সামনে এসে দাঁড়ান। এসেই আগুনঝরা ভাষায় বলতে শুরু করেন—তোমরা এখানে এসে মানুষকে বোকা বানাচ্ছ। তোমাদের যদি কোনো কিছুর প্রয়োজন থাকে, তা হলে আমাকে বলো। আমি তোমাদের প্রয়োজন পূরণ করব। হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু বিনয়ের সঙ্গে বললেন, আপনি আসন গ্রহণ করলে আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে পারি। ভালো মনে হলে গ্রহণ করবেন, অপছন্দ হলে উড়িয়ে দেবেন, আমরা কোনো আপত্তি করব না। উসাইদ ইবনে হুযায়ের বললেন—হ্যাঁ, অবশ্যই এটা ইনসাফের কথা। তারপর তিনি বর্শাটি এক পাশে গেড়ে রেখে আসন গ্রহণ করলেন। হযরত মুসআব রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তারপর কুরআনে কারীম থেকে একটি সূরা তেলাওয়াত

করে শোনান। তিনি তেলাওয়াত করছিলেন আর বদলে যাচ্ছিল উসাইদ ইবনে হুযায়ের-এর মুখ ও মুখের রূপ। বদলে যাচ্ছিল তার হৃদয় ও বিশ্বাস। তেলাওয়াত শেষ করামাত্র বললেন, কী চমৎকার কালাম! কী উচ্চতর তার বর্ণনাভঙ্গি! তারপর বললেন, আচ্ছা, আমাকে বলুন তো, আপনাদের ধর্মে কেউ প্রবেশ করতে চাইলে তাকে কী করতে হয়? হযরত মুসআব রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন—গোসল করে পবিত্র কাপড় পরে এই কালেমা পড়তে হয়—

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله.

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি হযরত মুহাম্মাদ তার বান্দা ও রাসূল।

তারপর দুই রাকাত নামায পড়তে হয়। এভাবেই আমাদের ধর্মে যে কেউ প্রবেশ করতে পারে। উসাইদ ইবনে হুযায়ের উঠে দাঁড়ান। ঘরে গিয়ে গোসল করে পবিত্র কাপড় পরিধান করে এসে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করেন। তারপর দুই রাকাত নামায পড়েন।

ঈমানের আলোয় অন্তর আলোকিত হওয়ার পর সেই আলো ছড়িয়ে পড়ে মস্তিষ্কেও। তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব করেন—আমার সঙ্গে আরেক ব্যক্তি আছেন, তিনি যদি ইসলাম কবুল করেন, তা হলে আবদুল আশহাল গোত্রের আর কেউ ইসলামের বাইরে থাকবে না। এতটুকু বলে তিনি বর্শাটি হাতে নিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দেন। যাওয়ার সময় বলে যান—আমি এখনই তাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর তার নাম হলো সাদ ইবনে মুআয।[১]

উসাইদ যখন সাদ ইবনে মুআযের কাছে পৌঁছান, সাদ তখন মজলিস জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছিল। উপস্থিত লোকজন গল্প করছিল। এরই মধ্যে সাদের নজর পড়ে উসাইদ ইবনে হুযায়েরের ওপর। লক্ষ করেন—উসাইদ তার দিকেই আসছেন। তাকে দেখামাত্র মজলিসের সবাইকে লক্ষ করে সাদ বলেছিলেন—দ্যাখো, উসাইদের চেহারাটা কেমন যেন ভিন্নরকম মনে

---

১. ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, ১ : ৫২২; ইবনে সায়্যিদুননাস, *উয়ুনুল আসার*, ১ : ২৬৮।

হচ্ছে। একে তো আগের উসাইদ মনে হচ্ছে না। মজলিসের কাছাকাছি আসতেই সাদ ইবনে মুআয চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কী, কী হয়েছে? উসাইদ বললেন, আমি তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। সন্দেহজনক কোনো কিছু আমার নজরে পড়েনি। আমার কাছে মনে হয়েছে—তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ মানুষ। আমি যখন তাদেরকে বাধা দিয়েছি, তখন তারা বলেছে, আপনারা অপছন্দ করবেন, এমন কোনো কাজ আমরা করব না। তবে ফেরার পথে আমি জানতে পারলাম—বনু হারেসার লোকজন আসআদ ইবনে যুরারার সন্ধানে আছে। বাগান থেকে বের হলেই তারা হয়তো আসআদকে হত্যা করে ফেলবে। তারা জানে—আসআদ আপনার খালাতো ভাই। আসআদকে খুন করে তারা মূলত আপনাকে অপমান করতে চায়। এ কথা শোনামাত্র সাদ ইবনে মুআযের শরীরে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে পড়ে। বর্শা হাতে ক্ষুব্ধ মনে বাগানের দিকে ছুটতে থাকে। বনু হারেসা আবার তার পৌঁছার আগেই বিপদ ঘটিয়ে ফেলে—এই আশঙ্কায় তিরের বেগে হাঁটতে থাকেন সাদ ইবনে মুআয।

সাদ ইবনে মুআয যখন বাগানের ভেতর পৌঁছান তখন লক্ষ করেন—আসআদ ইবনে যুরারা এবং মুসআব ইবনে উমায়ের নিশ্চিন্ত মনে বসে আছেন। তাদের চেহারায় ভয় কিংবা আশঙ্কার কোনো ছাপ নেই। তাদের এই শান্ত স্থির মুখ দেখার পর সাদ ইবনে মুআয ধরতে পারেন—কৌশলে উসাইদ ইবনে হুযায়ের তাকে এখানে পাঠিয়েছে। বনু হারেসার আক্রমণের গল্পটি বাহানামাত্র। এমনিতেই অস্থির ও ক্ষুব্ধ অবস্থায় ছুটে এসেছেন সাদ। এসেই অত্যন্ত গরম ভাষায় বলতে থাকেন—আসআদ, তোমার সঙ্গে যদি আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকত, তা হলে আমি কোনো দিন এখানে আসতাম না। তোমরা আমাদের ঘরে এসে আমাদের অপছন্দনীয় কাজ করো—এটা কেমন কথা! মুসআব ইবনে উমায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আপনি সামান্য সময়ের জন্যে আসন গ্রহণ করুন। আমরা আপনার সঙ্গে কয়েকটি কথা বলতে চাই। যদি ভালো লাগে, কবুল করবেন। অপছন্দ হলে উড়িয়ে দেবেন—এজন্যে আমরা আহত কিংবা দুঃখিত হব না। সাদ বললেন, হ্যাঁ, এটা ইনসাফের কথা। তারপর তিনি হাতের বর্শাটি এক পাশে পুঁতে রেখে আসন গ্রহণ করলেন। মুসআব ইবনে

উমায়ের তার সামনে ইসলামের মর্যাদার কথা তুলে ধরলেন। দাওয়াত দিলেন। তারপর কুরআন শরীফের একটি সূরার তেলাওয়াত শোনার পর তার হৃদয়জগত মুহূর্তে বদলে যেতে থাকে। তার চোখে মুখে পরিবর্তনের আভা ছড়াতে থাকে। তার হৃদয় মস্তিষ্ক এতটাই বদলে যায়—সঙ্গে সঙ্গে জানতে চান—কীভাবে মুসলমান হওয়া যায়? তারপর ঘরে ছুটে যান। গোসল করে পবিত্র কাপড় পরিধান করে ফিরে আসেন মজলিসে। কালেমায়ে শাহাদাত পড়ে সঙ্গে সঙ্গে দুই রাকাত নামায আদায় করেন। ঠাঁই করে নেন ইসলামের পবিত্র আঙিনায়।[১]

সেখান থেকে উঠে সোজা তার মজলিসে চলে যান। তখনো লোকজন সেখানেই উপবিষ্ট ছিল। তাকে আসতে দেখে তাদের যেন বিস্ময়ের অবধি নেই। হৃদয়ের পরিবর্তন তার মুখের আয়নায় ছিল সমুজ্জ্বল। দেখেই মনে হচ্ছিল—এখান থেকে যে সাদ উঠে গেছেন, এটা সে সাদ নয়। এ এক নতুন সাদ। সকলেই অপলক তাকিয়ে আছে এক-আকাশ বিস্ময় নিয়ে। দৃঢ়পদে হেঁটে আসছেন সাদ। এসেই উপবেশন করলেন আপন আসনে। তারপর সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, হে বনু আবদুল আশহাল, বলো তো, তোমরা আমাকে কেমন মনে করো? সকলে একবাক্যে বলে উঠলেন, আপনি আমাদের সর্দার। আমাদের দৃষ্টিতে আপনি একজন বিচক্ষণ ও সম্মানিত ব্যক্তি। আপনার অনুসরণকে আমরা গর্বের বিষয় মনে করি। উত্তর শোনার পর সাদ ইবনে মুআয বললেন, তোমাদের এই কথা যদি সত্য হয়, তা হলে শোনো—আবদুল আশহাল গোত্রের সকলে ইসলাম কবুল না করা পর্যন্ত তাদের কোনো নারী কিংবা পুরুষের সঙ্গে আমি কথা বলব না।

সাদ ইবনে মুআয যাদের সঙ্গে বসে কথা বলছিলেন, তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ বলয়ে অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং সম্মানিত ব্যক্তি। তাদের সকলেই নিজ নিজ অঙ্গনে অনুসরণীয় ও মানিত। তারা সেখান থেকে উঠে নিজ নিজ বাড়িতে চলে যায়। তারপর নিজ নিজ পরিবার ও খান্দানের লোকদেরকে সাদ ইবনে মুআযের পয়গাম পৌঁছে দেয়। তারপর মাত্র একদিনের ভেতর আবদুল আশহাল গোত্রের সকলেই ইসলাম কবুল করে।

---

১. ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, ১ : ৫১২; ইবনে সায়্যিদুননাস, *উয়ুনুল আসার*, ১ : ২৬৮।

সাদ ইবনে মুআযের অবিরাম চেষ্টা

তারপর হযরত সাদ ইবনে মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর অন্তরে দাওয়াতের এমন আবেগ সৃষ্টি হয়—তিনি বাগানের বাড়ি ছেড়ে মুসআব ইবনে উমায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে আসআদ ইবনে যুরারার ঘরে এসে ওঠেন। সেখানেই নিয়মিত অবস্থান করতে থাকেন আর মদীনার বিভিন্ন খান্দান ও কবিলায় গিয়ে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। তার এই প্রচেষ্টায় মদীনার অধিকাংশ বংশ ও গোত্রে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে। শুধু বনুল হারেস গোত্র ইসলামের এই মহান আলো থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। কারণ, সাদ ইবনে মুআযের সঙ্গে তাদের পুরোনো বিরোধ ছিল। তারা অনেক পরে ইসলাম কবুল করে। সেটা ওহুদ যুদ্ধের পরের ঘটনা। অবশ্য বনুল হারেস গোত্র ইসলাম থেকে বঞ্চিত থাকার আরও একটি কারণ ছিল। এই খান্দানেই এক ব্যক্তি ছিল, নাম আবু কায়েস ইবনুল আসলাত। সে ছিল কবি। বরাবর সে তার গোত্রকে ইসলামধর্ম সম্পর্কে বিদ্বিষ্ট করে রেখেছিল। মক্কার কুরাইশদের সঙ্গে ছিল তার গভীর সম্পর্ক। তার স্ত্রী আরতাব বিনতে আসাদ ইবনে আবদুল উয্যা ছিল কুরাইশদের মেয়ে। আবু কায়েস তার স্ত্রীর সঙ্গে বেশিরভাগ সময় কুরাইশদের সঙ্গেই কাটাত। কুরাইশদের সঙ্গে আত্মীয়তা এবং বন্ধুত্বের টানে সে ছিল তাদের সমচিন্তা ও সমআদর্শের লোক। তাই সাদ ইবনে মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর দাওয়াত ও চেষ্টা সত্ত্বেও এই আবু কায়েস তাদেরকে মুসলমান হতে দেয়নি। অনেক পরে এসে তারা যখন মুসলমান হয়, তখন রহস্যের আরও একটি দ্বার উন্মোচিত হয়। তারা জানায়—আমাদের সম্পর্ক ছিল বিখ্যাত মোনাফেক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলের সঙ্গে। সে ছিল মূলত ইহুদি। সে-ই আমাদেরকে ইসলাম গ্রহণের পথে বরাবর বাধা দিয়ে রেখেছে।[১]

হজের দ্বিতীয় মওসুম

এখানে মুসআব ইবনে উমায়ের এবং আসআদ ইবনে যুরারা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর চেষ্টা সাধনা চোখে পড়ার মতো আলো ছড়িয়েছে। তাদের

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ১৫৩; ইবনে সায়্যিদুন নাস, *উয়ুনুল আসার*, ১ : ২৬৯-২৭০; *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ২ : ৪৬।

দাওয়াতের ভিত্তি সবদিকে দৃশ্যমান। আওস এবং খাযরাজের অনেক খান্দানই এখন ইসলাম সম্পর্কে জানে। ইসলামের প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়ছে। আবদুল আশহাল গোত্র পরিপূর্ণরূপে হযরত সাদ ইবনে মুআযের উসিলায় ইসলামের শামিয়ানার নিচে ঠাঁই নিয়েছে। কিন্তু তারপরও মদীনার এক বড় অংশ এখনো ইসলাম থেকে বঞ্চিত। ইসলামের আলো এখনো তাদের ঘরে পৌঁছায়নি। এরই মধ্যে দাওয়াত ও সাধনার এক বছর পার হয়ে গেছে। হজের দ্বিতীয় মওসুম সমুপস্থিত। এবার মদীনা থেকে সত্তর জন হজের উদ্দেশ্যে মক্কায় এসেছেন। তারা হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাতও করেছেন।

এদিকে কুরাইশদের শত্রুতার মাত্রা এখন পূর্ণ যৌবনে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যারাই দেখা-সাক্ষাৎ করছে, কুরাইশ তাদেরকে চোখে চোখে রাখছে। তাই মদীনা থেকে আগত লোকজন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার বাইরে একটি ঘাঁটিতে অবস্থান করছিলেন—যেখানে তারা আগের বছর সাক্ষাৎ করে গেছেন—তারা সেখান থেকে সামান্য দূরে অবস্থান করেন। তারপর পালাক্রমে এক-দুইজন করে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে যেতেন। এভাবে এক-দুইজন করে করে সকলে গিয়ে খেদমতে হাজির হন। সকলে একসঙ্গে হয়ে জানতে চান—ইয়া রাসূলাল্লাহ, কোন কথার ওপর আমরা আপনার হাতে শপথ নেব? হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر وعلى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وان تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لائم وعلى ان تنصروني فتمنعوني إذا قدمت اليكم مما تمنعون منه انفسكموازواجكم وابناءكم ولكم الجنة.

তোমরা এই মর্মে শপথ গ্রহণ করবে—তোমাদের মন চাক আর না চাক, সর্বাবস্থায় পরিপূর্ণরূপে আমার আদেশ মেনে চলবে। অভাবে সচ্ছলতায় সব সময় আল্লাহর রাহে খরচ করবে। সৎকর্মের আদেশ করবে।

অসৎকর্মে বাধা দান করবে। সত্য কথা বলবে। আল্লাহর বিষয়ে কোনো ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনাকে পরোয়া করবে না। আমি যখন তোমাদের কাছে চলে আসব, তখন তোমরা আমাকে সাহায্য করবে এবং নিজেদের জীবন ও পরিবার-পরিজনের মতো আমাকে হেফাজত করবে। তোমরা যদি এ কাজগুলো করতে পারো, তা হলে তোমাদের জন্যে রয়েছে বেহেশত।[১]

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কণ্ঠে শপথের এই বাণী উচ্চারিত হওয়ামাত্র আসআদ ইবনে যুরারা রাযিয়াল্লাহু আনহু উঠে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত চেপে ধরলেন এবং বললেন—আমি এইসব কথার ওপর শপথ গ্রহণ করছি। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে ইয়াসরিববাসী, তোমরা খুব ভেবে-চিন্তে শপথ নাও। আমি এখনই তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি না। তবে যে দিন আমি মক্কা ছেড়ে তোমাদের কাছে চলে আসব, পুরো আরব তোমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। চারদিকে তোমাদের বিরুদ্ধে তরবারি কোষমুক্ত হয়ে উঠবে। তোমরা যদি এই সকল প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবেলা করতে পারো, তা হলে তোমাদের জন্যে রয়েছে মহান পুরস্কার।[২]

এই কাফেলায় সদস্যসংখ্যা ছিল সত্তর জন।[৩] চল্লিশজন বয়স্ক আর ত্রিশজন যুবক। তাদের মধ্যে সবচেয়ে কমবয়স্ক ছিলেন আবু মাসউদ এবং জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুমা। এ বিষয়ে কাব ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে অত্যন্ত তথ্যবহুল একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, আমরা ঘাঁটিতে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপেক্ষায় ছিলাম। অবশেষে তিনি এলেন। তাঁর সঙ্গে এলেন তাঁর চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব। তখনো তিনি মুসলমান হননি। তবে আবু তালেবের ইন্তেকালের পর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ১৫৯।

২ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ১৫৯।

৩ *উয়ুনুল আসার* গ্রন্থে তিয়াত্তরজন পুরুষ এবং দুইজন নারীর কথা উল্লেখিত হয়েছে। এতে সংখ্যা দাঁড়ায় পচাত্তর। এই গ্রন্থের দুইশো সাতাত্তর থেকে দুইশো বিরাশি পর্যন্ত মহান এই ভাগ্যবানদের নামের তালিকাও পত্রস্থ হয়েছে।–আসীর আদরাবী

ওয়াসাল্লামের দেখাশোনা এবং নিরাপত্তার ভার তিনিই গ্রহণ করেছিলেন। তাই যে কোনো বিপদজনক ক্ষেত্রে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থাকতেন। ঘাঁটিতে এসে তিনিই প্রথম আলোচনার সূচনা করেন। বলেন, হে খাযরাজবাসী, তোমরা ভালো করে বুঝে নাও হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখন যে পরিস্থিতির শিকার, তা তোমাদের অজানা নয়। আমরা আমাদের প্রভাব প্রতিপত্তির জোরে তাঁর জন্যে ঢাল হয়ে আছি। যে কোনো মূল্যে আমরা তাঁকে হেফাজত করছি। তাঁকে রক্ষা করার জন্যে আমরা আমাদের খান্দানের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছি। আমাদের কড়া দৃষ্টি এবং নিশ্ছিদ্র পাহারাদারির কারণে তিনি নিরাপদ আছেন। তাঁর বিরুদ্ধে কেউ আঙুল তুলতে পারছে না। কিন্তু তিনি এখন তোমাদের কাছে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ইচ্ছে করেছেন তিনি তোমাদের সঙ্গে মিশে যাবেন। সুতরাং তোমরা চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নাও। তোমরা যদি তোমাদের অঙ্গীকারপালনে কৃতসংকল্প হও এবং তাকে তাঁর শত্রুদের হাত থেকে বাঁচাবার প্রশ্নে হও আপোষহীন, আর এ পথে জীবন বিলাতেও কুণ্ঠিত না হও—কেবল তখনই তিনি মক্কা ছেড়ে তোমাদের কাছে যেতে পারেন। অন্যথায় আমরা তাঁকে এখান থেকে যেতে দিতে পারি না। কারণ, এখানে তাকে হেফাজত করার শক্তি আমাদের আছে। আমরা তাঁকে তাঁর প্রতিপক্ষদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারছি। দ্যাখো, তোমরা যদি তোমাদের অন্তরে সামান্যতম দোদুল্যমানতা পাও কিংবা বিপদের মুহূর্তে আপসহীন দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না বলে শঙ্কাবোধ করো—তা হলে এখনই বলো। তাঁর দায়-দায়িত্ব তোমরা তোমাদের মাথায় তুলে নিয়ো না। আমরা এখানে যে কোনো পরিস্থিতিতে তাঁকে তাঁর শত্রুদের হাত থেকে বাঁচাবার শক্তি রাখি।

হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কণ্ঠে এই ভাষণ শোনার পর মদীনা থেকে আগত প্রতিনিধিদল প্রচণ্ড আবেগ ও বিশ্বাসে এবং পূর্ণ আস্থার সঙ্গে জানিয়ে দেন—আমরা এই সকল আশঙ্কার কথা বুঝে শুনে এবং সন্দেহাতীতভাবে মেনে নিয়েই হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে শপথ গ্রহণ করছি। আমরা যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্যে প্রস্তুত আছি। আমাদের থেকে শপথ গ্রহণ করুন। আমরা শপথ করার জন্যে প্রস্তুত আছি।

তারপর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন তেলাওয়াত করেন। সকলকে ঈমানের দাওয়াত দেন। ঈমানের বায়আতের সঙ্গে এ কথাও বলেন—

ابايعكم علي ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابناءكم.

তোমরা নিজেদের স্ত্রী-সন্তানদের মতোই আমাকে রক্ষা করবে এই মর্মে শপথ নিচ্ছি।

তারপর প্রতিনিধিদলের নেতা বারা ইবনে মারুর রাযিয়াল্লাহু আনহু এগিয়ে যান এবং বলেন—ওই আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন আমরা আমাদের জীবনকে যেভাবে হেফাজত করি, আপনাকে সেভাবে হেফাজত করব।[১]

পরিস্থিতি পর্যালোচনা

তারা সকলে ইসলাম কবুল করার পর যখন এই মর্মে শপথ করলেন—হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা ছেড়ে মদীনায় আগমন করবেন, আমরা তাঁকে আমাদের জীবনের চেয়েও অধিক নিরাপত্তা দেব—তখন তারা প্রসঙ্গক্রমে মদীনার পরিস্থিতিও তুলে ধরেন। তারা জানালেন, মদীনাতে ইহুদিরা আমাদের প্রতিবেশী। তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কও আছে। আপনার আগমনের পর সর্বপ্রথম আমাদেরকে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বর্জন করতে হবে। কারণ, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে আমরা যথাযথভাবে আপনার হেফাজত করতে পারব না। এজন্যে প্রথম সুযোগেই আমরা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বর্জন করব। এখন আমরা জানতে চাই—আল্লাহ তাআলা যদি আপনাকে সফলতা দান করেন, আপনি বিজয় লাভ করেন এবং মক্কার পরিস্থিতি পরিবেশও অনুকূল হয়ে উঠে, তা হলে কি আপনি আপনার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে আসবেন? তখন কি আপনি আমাদেরকে ছেড়ে দেবেন? এ কথা শুনে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন এবং স্পষ্ট ভাষায় বললেন—

---

১ ইবনে সায়্যিদুন নাস, *উয়ুনুল আসার*, ১ : ২৭৩।

بل الدم الدم والهدم الهدم انا منكم وانتم مني احاربكم من حاربتم واسالم من سالمتم.

এখন আমাদের এবং তোমাদের সম্পর্ক হলো রক্তের সঙ্গে রক্ত এবং ক্ষমার সঙ্গে ক্ষমা। আমি তোমাদের একজন আর তোমরাও আমারই অন্তর্গত। তোমরা যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, আমিও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। তোমরা যাদের সঙ্গে সন্ধি করবে, আমিও তাদের সঙ্গে সন্ধি করব। সুতরাং ফিরে যাওয়ার আবার সুযোগ কোথায়![১]

প্রতিনিধি নির্বাচন

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আস্থা ও স্থিরতার দৃশ্য অবলোকন করলেন। তাদের আন্তরিকতা ও উৎসর্গপ্রাণ প্রেরণাও উপলব্ধি করলেন। তারপর বললেন, আমাদের এই সম্পর্কের ভিত্তি আজই স্থাপিত হোক। এখান থেকেই তার বাস্তবিক কর্মসূচিও সূচনা হোক। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এরও যেমন বারো জন অনুগামী হাওয়ারী ছিলেন, তেমনি তোমরাও তোমাদের মধ্য থেকে বারোজন নকীব ও প্রতিনিধি নির্বাচন করে নাও। এই প্রতিনিধিগণই জাতীয় সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। আমাকে হেফাজতের প্রধান দায়িত্বও থাকবে এদের। আনসারগণ সেই মজলিসেই খাযরাজ কবিলা থেকে নয়জন আর আওস কবিলা থেকে তিনজন প্রতিনিধি নির্বাচন করে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে তার তালিকা পেশ করেন। নির্বাচিত সেই নকীবগণ হলেন—

১. আবু উমামা আসআদ ইবনে যুরারা খাযরাজী রাযিয়াল্লাহু আনহু
২. সাদ ইবনে রবী খাযরাজী রাযিয়াল্লাহু আনহু
৩. আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযিয়াল্লাহু আনহু
৪. রাফে ইবনে মালেক খাযরাজী রাযিয়াল্লাহু আনহু
৫. বারা ইবনে মারুর ইবনে সখর ইবনে খানসা ইবনে সিনান খাযরাজী রাযিয়াল্লাহু আনহু

---

১ ইবনে সায়্যিদুন নাস, *উয়ুনুল আসার*, ১ : ২৭৩।

৬. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হিযাম ইবনে সালাবাহ খাযরাজী রাযিয়াল্লাহু আনহু
৭. উবাদাহ ইবনে সামেত খাযরাজী রাযিয়াল্লাহু আনহু
৮. সাদ ইবনে উবাদাহ খাযরাজী রাযিয়াল্লাহু আনহু
৯. মুনযির ইবনে আমর ইবনে খুনাইস ইবনে হারেসাহ খাযরাজী রাযিয়াল্লাহু আনহু
১০. উসাইদ ইবনে হুযায়ের আল আওসী রাযিয়াল্লাহু আনহু
১১. সাদ ইবনে খায়সামাহ ইবনে হারিস আল আওসী রাযিয়াল্লাহু আনহু
১২. রিফাআ ইবনে আবদুল মুনযির আল আওসী রাযিয়াল্লাহু আনহু।[১]

কোনো কোনো ইতিহাসবিদ হযরত রিফাআহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর স্থলে আবুল হায়সাম ইবনুত তাইহান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নাম উল্লেখ করেছেন। নকীব নির্বাচনের পর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমেই তাদেরকে তাদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। তিনি বলেন, যারা নকীব নির্বাচিত হয়েছ, তাদের অবস্থান ঠিক ঈসা আলাইহিস সালাম-এর হাওয়ারীদের মতোই। তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের দায়িত্বশীল। আর আমিও আমার সম্প্রদায়ের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করছি। উপস্থিত নির্বাচিত প্রত্যেক নকীব আস্থা ও দৃঢ়তার সঙ্গে অর্পিত এই ভার ও দায়িত্ব কবুল করেন। সমর্পিতচিত্তে তা বরণ করে নেন।

বিসর্জনের অনুপম অঙ্গীকার

মদীনার আনসারগণ যখন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এই অঙ্গীকার করেন এবং অঙ্গীকারবাণী সম্পন্ন হয়, তখন আব্বাস ইবনে উবাদা ইবনে নাযলা আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু সকল আনসারকে লক্ষ্য করে বলেন—হে খাযরাজ সম্প্রদায়, তোমরা ভেবে দেখেছ, কী বিষয়ে শপথ গ্রহণ করছ? ভালো করে ভেবে নাও। চিন্তা-ভাবনা করে শপথ নাও। আনসারগণ বললেন, আমরা ভেবে-চিন্তেই শপথ নিয়েছি। এখন আর আমাদের ভাববার কিছু নেই।

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ২ : ৫১-৫৩।

আব্বাস ইবনে উবাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তোমরা কিন্তু পুরো বিশ্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ভার গ্রহণ করতে যাচ্ছ। সুতরাং তোমরা আগেই ভেবে নাও—যদি তোমাদের যাবতীয় সম্পদ শত্রুপক্ষ লুটে নেয়, তোমাদের নেতৃবৃন্দ এবং বিশিষ্টজনরা যদি যুদ্ধে নিহত হতে থাকে, তখন কি তোমরা তাঁকে শত্রুর হাতে তুলে দেবে? যদি এমন হয়, তা হলে এখনই এই দায়িত্বকে প্রত্যাখ্যান করো। আর যদি এ কথা বুঝে শপথ নিয়ে থাকো—আমরা আমাদের সকল সহায়-সম্পদ বিসর্জন দেব, প্রয়োজনে একজন-একজন করে জীবন দিয়ে দেব কিন্তু আল্লাহর রাসূলকে কোনো মূল্যেই ছেড়ে যাব না—তা হলে তোমরা শপথ নিতে পারো। তারপর পাহাড়ের মতো এই শপথে অবিচল থেকো।

হযরত আব্বাস ইবনে উবাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর এই বক্তৃতা শোনার পর আনসারগণ তাদের দৃঢ় অঙ্গীকারকে পুনর্ব্যক্ত করেন এবং বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এর বিনিময়ে আমরা কী পাব? এর উত্তরে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন—বেহেশত।

এরপর আনসারগণ হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাতে শপথ গ্রহণ করেন।[১]

নেমে এল পরীক্ষা

মিনা প্রাঙ্গণ থেকে মদীনার আনসারগণ ছড়িয়ে পড়েন। তারপর বেরিয়ে পড়েন মদীনার উদ্দেশে। এদিকে কোনো এক হতভাগা কুরাইশকে এ মর্মে অবহিত করে—মদীনা থেকে আগত কিছু লোক হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে শপথ নিয়েছে। তারা তার হেফাজতের যাবতীয় ভার গ্রহণ করেছে। সংবাদ পাওয়ামাত্র দল বেঁধে কুরাইশের লোকজন ছুটে আসে। সেখানে এসে এমন এক ব্যক্তির তারা সাক্ষাৎ পায়—যে ছিল এ বিষয়ে সম্পূর্ণ বেখবর। তার কথায় কুরাইশের লোকজন আশ্বস্ত হতে পারেনি। আনসারদের সন্ধানে চারদিকে বেশ কিছু লোক

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ১৬২; ইবনুল আসীর, *উসদুল গাবাহ*, বারা ইবনে মারুর দ্র.

পাঠিয়ে দেয়। ঘটনাক্রমে সাদ ইবনে উবাদাহ এবং মুনযির ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তারা আযাখির নামক স্থানে পেয়ে যায়। কুরাইশের লোকেরা তাদেরকে ঘিরে ফেলে। কিন্তু মুনযির ইবনে আমরকে ধরতে পারেনি। সাদ ইবনে উবাদা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তারা ধরে ফেলে। উটের রশি খুলে তাকে বেঁধে মক্কায় নিয়ে আসে। এখানে এনে তাকে নানাভাবে নির্যাতন করতে থাকে। তিনি মাটিতে পড়ে যান। তখন জালেম কুরাইশ-সম্প্রদায় তার দীর্ঘ চুল ধরে মাটিতে হেঁচড়াতে থাকে। তিনি যখন এভাবে নির্যাতিত ও অপমানিত হচ্ছেন, ঠিক এমন সময় লক্ষ করলেন—সাদাবর্ণ ব্যক্তিত্বপূর্ণ এক কুরাইশী এগিয়ে আসছে। হযরত সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু মনে মনে ভাবলেন—লোকটি হয়তো তাকে এই জালেমদের হাত থেকে বাঁচাবে। কিন্তু কাছে এসেই লোকটি তার গালে সজোরে একটি চড় বসিয়ে দিলো। তিনি বুঝতে পারলেন—তার ধারণা ভুল ছিল।

হযরত সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এরপর তার কাছে আর কী আশা করা যায়? আমি হতাশ হয়ে পড়লাম। লোকটি আমাকে ধরে এদিক-সেদিক হেঁচড়াতে থাকে। ঠিক এমন সময় এক ব্যক্তি আমাকে বলল, আরে বোকা, এই কুরাইশদের মধ্যে কি তোমার পরিচিত কেউ নেই? কুরাইশের কারও সঙ্গে তোমার পূর্ব কোনো চুক্তি কিংবা বন্ধুত্ব নেই? তখন আমি বললাম, থাকবে না কেন? জুবায়ের ইবনে মুতঈমকে আমি আশ্রয় দিয়েছি। তার ব্যবসায়িক সম্পদকে আমি হেফাজত করেছি। আমার শহরে আমি তাকে নিরাপত্তা দিয়েছি। আর হারেস ইবনে হারব ইবনে উমাইয়াকেও আশ্রয় দিয়েছি। কিন্তু এখানে তো তাদের কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। লোকটি বলল, তুমি চিৎকার করে তাদেরকে ডাকো। তোমার আওয়াজ শুনে তারা হয়তো ছুটে আসবে। এই কথা বলে লোকটি সেখান থেকে সোজা বায়তুল্লায় চলে যায়। জুবায়ের এবং হারেস তখন সেখানেই ছিল। সেখানে গিয়ে লোকটি জুবায়ের এবং হারেসকে বলল, খাযরাজ কবিলার এক ব্যক্তিকে আবতাহ উপত্যকায় মারধর করা হচ্ছে। লোকটি তোমাদের নাম নিয়ে চিৎকার করছে। তারা বলল, লোকটি কে? সে বলল, সাদ ইবনে উবাদাহ। নাম শুনেই তাদের মনে হলো—এ তো সেই ব্যক্তি, যিনি আমাদেরকে মদীনায় আশ্রয় দিয়েছেন। তার উসিলায় সেখানে আমরা

ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ পেয়েছি। আমরা তাকে আমাদের শহরে এভাবে অপমানিত হতে দিতে পারি না। তারা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে। জালেমদের হাত থেকে হযরত সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে উদ্ধার করে। তারপর তিনি মদীনায় চলে যান।[১]

আমর ইবনুল জামুহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ইসলাম গ্রহণ

সত্তর জন আনসারী সাহাবী যখন দ্বিতীয় আকাবায় শপথের পর মদীনায় ফিরে আসেন, তখন দ্রুত গতিতে ইসলাম প্রসারিত হতে থাকে। তারা যখন মদীনায় এসে পৌঁছান, তখনো পর্যন্ত সেখানকার মুরুব্বিগণ, বয়োজ্যেষ্ঠশ্রেণি, গোত্রপতি এবং অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ তাদের বাপ-দাদার ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তারা তখনো মূর্তিপূজারি ছিলেন। কোনো কোনো পরিবারে দেখা গেছে—যুবক সন্তানগণ ইসলাম কবুল করেছে কিন্তু তাদের বাবা-মা তখনো মুশরিক এবং মূর্তিপূজারি। আমর ইবনুল জামুহ ছিলেন বনু সালামা গোত্রের নেতা। সমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তার পুত্র মুআয ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলমান হয়েছেন আগেই। কিন্তু তার বাবা মুশরিক এবং মূর্তিপূজারি। তিনি মানাত নামে কাঠের তৈরি একটি মূর্তির পূজা করতেন। মূর্তিটি তৈরি করে তিনি তার ঘরে সেটি স্থাপন করেছিলেন। এদিকে তার পুত্র মুআয এবং আরেক প্রতিবেশী যুবক ইসলাম কবুল করেছে। তারা চাইত—যে কোনো মূল্যেই হোক এই মূর্তিপূজার সমাপ্তি ঘটাতে হবে। কিন্তু আমর ইবনুল জামুহের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সাহস পেত না তারা। তাই তারা উভয়ে মিলে একটি মনস্তাত্ত্বিক কৌশল আবিষ্কার করে। আমর ইবনুল জামুহ যখন রাতে ঘুমিয়ে পড়তেন, তখন তার পুত্র মুআয প্রতিবেশী মুসলমান যুবককে সঙ্গে নিয়ে কাঠের তৈরি মূর্তিটি উত্তোলনপূর্বক ঘরের বাইরে আবর্জনার স্তূপে নিয়ে ফেলে দিতেন। আমর সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখতেন ঘরে তার মূর্তিটি নেই। বের হতেন মূর্তির সন্ধানে। গিয়ে দেখতেন ভগবান আবর্জনার স্তূপে পড়ে আছে। তিনি আহত হতেন। সেখান থেকে তুলে এনে গোসল করাতেন। সুগন্ধি মাখাতেন। পূর্বের জায়গায় সসম্মানে স্থাপন করতেন।

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ২ : ৫৭-৫৯।

কিন্তু পরের রাতে উভয় যুবক মিলে সেই একই কাণ্ড করল। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে পিতা আমর ইবনুল জামুহ তার মূর্তি খুঁজে পাচ্ছেন না। কে করছে এই কাজ তারও সন্ধান পাচ্ছেন না। মনে মনে খুব ক্ষুব্ধ হন।

তৃতীয় রাতে তিনি তার তরবারিটি এই ভেবে মানাতের গলায় ঝুলিয়ে দেন—আমি যখন শত্রুর সন্ধান পাচ্ছি না, তখন আমার তরবারিটি তোমাকে দিচ্ছি। এই তরবারি দ্বারা তুমি শত্রুর কেচ্ছা খতম করে দিয়ো। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ঘুমিয়ে পড়েন আমর ইবনুল জামুহ। উভয় যুবক লক্ষ করল—আজ ভগবান রক্ষার তা হলে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারা তরবারিটি নামিয়ে রাখল। তারপর একটি মৃত কুকুরের সঙ্গে মানাতকে বেঁধে পানিশূন্য একটি কূপে নিয়ে ফেলে রাখল। আমর সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেন আজও তার ভগবান গায়েব। বের হলেন ভগবানের সন্ধানে। যেতে যেতে সেই কূপটির কাছে গেলেন, যেখানে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা ময়লা-আবর্জনা ফেলে থাকে। কাছে গিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন—ময়লা-আবর্জনার স্তূপে উপুড় হয়ে পড়ে আছে মানাত। আর তার সঙ্গে বাঁধা আছে একটি মৃত কুকুর। ভগবানের এই অসহায়ত্ব ও দুর্বলতা দেখে আমর বুঝতে পারলেন এমন নির্বোধ জিনিসের পূজা করা সত্যিই বোকামি। সেখান থেকে ফিরে এসে মুসলমানদের সঙ্গে কথা বললেন। তারা অত্যন্ত কোমল ভাষায় শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকে বোঝালেন। তিনি আনন্দচিত্তে ইসলাম কবুল করলেন। তারপর তিনি ইসলামের ব্যাপক খেদমত করেছেন।[১]

আশ্রয়ের এক নতুন ঠিকানা

মক্কায় মুসলমানগণ বরাবর নির্যাতিত হচ্ছিলেন। তাদের অসহায়ত্ব ছিল সীমাহীন। মক্কা এককথায় মুসলমানদের জন্যে একটি জ্বলন্ত তাওয়া হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে যারা একটি ভুল সংবাদের ভিত্তিতে আবিসিনিয়া থেকে ফিরে এসেছিলেন, তাদের প্রতি নির্যাতনের মাত্রাটা ছিল একটু বেশি। তাই তারা কীভাবে মক্কা থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায়, তা নিয়ে বরাবর ভাবতেন। প্রতিনিয়ত এবং পদে পদে জুলুম নির্যাতনের এই কারাগার থেকে কীভাবে রক্ষা পাওয়া যায়, এটাই ছিল তাদের সার্বক্ষণিক ভাবনা।

---

১ ইবনে সায়্যিদুন নাস, *উয়ুনুল আসার*, ১ : ২৭৬; *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ২ : ৬১।

আবিসিনিয়া থেকে যারা ফিরে এসেছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হযরত আবু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহু। মক্কায় ফিরে আসার পর একটি দিন কিংবা একটি রাতও স্বস্তির সঙ্গে পার করতে পারেননি। মুশরিক-সম্প্রদায়ের জুলুম নির্যাতনের নিয়মিত টার্গেটে পরিণত হয়েছিল তার জীবন। তিনি হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে আবার আবিসিনিয়ায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—আবিসিনিয়ায় নয়, তুমি বরং মদীনায় হিজরত করো। সেখানে আল্লাহ তাআলা তোমাদের অনেক ভাই প্রস্তুত করে রেখেছেন। আবু সালামা ছিলেন কুরাইশদের খুবই সম্মানিত খান্দান বনু মাখযুমের সন্তান। তার স্ত্রীও ছিলেন এই খান্দানেরই কন্যা।

হযরত উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাদের হিজরতের বেদনাদায়ক ইতিহাস বর্ণনা করেছেন এইভাবে—যখন আমার স্বামী আবু সালামা মদীনায় হিজরত করবেন বলে সংকল্পবদ্ধ হলেন, তখন তিনি একটি উট কিনে আনলেন। তারপর আমাকে ও তার পুত্র সালামাকে উটের ওপর বসালেন। আমাদের পুত্র সালামা তখন খুবই ছোট। সে আমার কোলে। তারপর আমার স্বামী উটের লাগাম ধরে হাঁটতে শুরু করলেন। আমার মা বনু মুগীরা গোত্রের মেয়ে। পথে এই গোত্রের কিছু লোকের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে যায়। আমাদেরকে দেখেই তারা পথ আগলে দাঁড়ায়। বলে, আবু সালামা, তোমার অধিকার আছে—যেখানে খুশি চলে যেতে পারো। কিন্তু উম্মে সালামা তো আমাদের খান্দানের মেয়ে। সে তোমার সঙ্গে যেতে পারে না। আর ছেলে যেহেতু খুব ছোট, তাই সে তার মায়ের সঙ্গেই থাকবে। এ কথা বলে তারা আবু সালামার হাত থেকে উটের লাগাম ছিনিয়ে নেয়। উটকে বসিয়ে আমাকে উটের পিঠ থেকে নামিয়ে নেয়। এই সময় আবু সালামার খান্দান বনু আবদুল আসাদের কিছু লোকও সেখানে চলে আসে। তারা এসে আবু সালামাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করে। বনু মুগীরার লোকেরা তখন কসম করে বসে—আমরা আমাদের খান্দানের মেয়েকে আবু সালামার সঙ্গে যেতে দেব না। আবু সালামার খান্দানের লোকেরা তখন আমার কোল থেকে আমার পুত্রকে ছিনিয়ে নেয় এবং বলে দেয়—তোমরা তোমাদের মেয়েকে নিয়ে যাও। এই সন্তান আমাদের খান্দানের।

আমরা আমাদের সন্তানকে তোমাদের মেয়ের সঙ্গে যেতে দেব না। বনু আবদুল আসাদ আমার পুত্রকে নিয়ে যায়। বনু মুগীরা নিয়ে যায় আমাকে। আবু সালামা একা রওনা হয়ে পড়েন মদীনার উদ্দেশে। হযরত উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি পুরো পৃথিবী তখন অন্ধকার দেখতে থাকি। আমার স্বামীও চলে গেলেন। কোল থেকে আমার পুত্রকে ছিনিয়ে নেওয়া হলো। কষ্ট ও দুশ্চিন্তার পাহাড় ভেঙে পড়ল আমার ওপর। আমি সারা রাত বসে বসে কাঁদতাম। কখনোবা ঢেকুর তুলে কাঁদতাম। কখনোবা কষ্টে পাথর হয়ে পড়ে থাকতাম। কিন্তু আমার প্রতি সামান্য সমবেদনা দেখাবে, এমন কাউকে দেখতাম না।

আমি প্রতিদিন সকালবেলা মদীনাগামী পথের ধারে গিয়ে বসে পড়তাম। লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত এভাবে কেঁদে-কেটেই আমার দিন পার হতো। প্রায় এক বছর এই দুর্বিষহ যন্ত্রণায় কেটে যায়। একদিন আমার এক চাচাতো ভাই এসে আমার এই যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা দেখতে পায়। তার মনে আমার প্রতি করুণা জাগে। আমার খান্দানের লোকদেরকে ডেকে বলে—এই অসহায় মেয়েটির প্রতি তোমাদের সামান্য দয়া হয় না? তার স্বামী থেকে তাকে ছাড়িয়ে নিয়েছ। তার সন্তানকে তার বুক থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। সে বিয়োগযন্ত্রণায় পুড়ে ছাই হচ্ছে, অবিরাম কেঁদে যাচ্ছে। তোমাদের সামান্য মায়া হয় না? আমার খান্দানের লোকেরা তখন বলে, তুমি যদি আবু সালামার কাছে যেতে চাও, তা হলে চলে যাও।

আমার বংশের লোকেরা যখন আমাকে মদীনায় চলে যাওয়ার অনুমতি দিলো, আবদুল আসাদ গোত্রের লোকেরা বিষয়টি জানতে পেরে নিজ থেকেই আমার সন্তানকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলো। আমি একটি উট সংগ্রহ করলাম। তারপর আমার শিশুপুত্রকে নিয়ে সেই উটের ওপর উঠে বসলাম। দীর্ঘ তিনশো মাইল পথ। আশঙ্কাপূর্ণ এই ভয়াবহ সফরে আমি একাই বেরিয়ে পড়লাম। এই দীর্ঘ পথে আল্লাহ ছাড়া আমার সঙ্গে আর কেউ ছিল না। নির্জন মরুপথ। আমি এক অসহায় নারী। সঙ্গে শিশুপুত্র। ভরসা কেবলই আল্লাহ। চলতে চলতে যখন তানঈম নামক স্থানে পৌঁছাই, উসমান ইবনে তালহা ইবনে আবু তালহার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তিনি আবদুদ দার গোত্রের লোক। মক্কায় যাচ্ছিলেন। আমাকে দেখেই বললেন,

আবু উমাইয়ার কন্যা, কোথায় যাচ্ছ তুমি? আমি বললাম, আমার স্বামী মদীনায় আছেন। আমি তার কাছে যাচ্ছি। তিনি বললেন, তোমার সঙ্গে আর কে আছে? আমি বললাম, আমার সঙ্গে আমার আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই কিংবা ধরুন এই শিশুপুত্রটি আছে। তখন তিনি আল্লাহর কসম করে বললেন, এই বিপদজনক সফরে আমি তোমাকে একা যেতে দিতে পারি না। আমি মক্কায় পরে যাব। আগে তোমাকে মদীনায় পৌঁছে দিয়ে আসি। তিনি আমার উটের লাগাম ধরে ফেললেন। তারপর আমাকে নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে চলতে শুরু করলেন। আল্লাহর কসম করে বলছি, তার মতো এমন ভদ্র মানুষ আমি কোথাও দেখিনি। তার ভদ্রতা ছিল এমন—যখন আমরা কোথাও যাত্রাবিরতি করতাম, তিনি উট বসিয়ে দিয়ে দূরে সরে যেতেন। আমি উট থেকে নেমে পড়তাম। তারপর ধীরে সুস্থে যখন এক পাশে গিয়ে বসতাম, তখন তিনি এসে উটটিকে তুলে নিয়ে কোনো একটি গাছের সঙ্গে বেঁধে নিতেন। তিনিও এক পাশে শুয়ে পড়তেন আর আমি অন্য পাশে আমার মতো বসে থাকতাম। তারপর যখন সফরের সময় হতো, তিনি উটের ওপর হাওদা বেঁধে সবকিছু ঠিকঠাক করে দূরে সরে যেতেন। উঁচু আওয়াজে আমাকে ডেকে বলতেন—মা, উটের ওপর উঠে বসো, সফরের সময় হয়েছে। আমি স্থির হয়ে বসার পর তিনি আসতেন। রশি ধরে উটকে দাঁড় করাতেন। তারপর উটের আগে আগে চলতে শুরু করতেন। পুরো পথ জুড়েই ছিল তার এই ভদ্রোচিত আচরণ। আমরা যখন মদীনার কাছাকাছি পৌঁছে যাই এবং কোবা আমাদের নজরে পড়ে, তখন তিনি বলেন, এই জনবসতিতেই তোমার স্বামী আবু সালামা থাকেন। আল্লাহর নামে এবার এই জনবসতিতে চলে যাও। তারপর সেখান থেকে তিনি মক্কার উদ্দেশে রওনা হয়ে যান।[১]

হযরত উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, ইসলাম গ্রহণ করার পথে আমার পরিবার যে কষ্টের মুখোমুখি হয়েছে, খুব কম পরিবারই এমন কষ্টের মুখোমুখি হয়েছে। আজ পর্যন্ত আমি উসমান ইবনে তালহার মতো

---

১. ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ১৬৯-৭০; *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ২ : ৭৭-৭৮; *উয়ুনুল আসার*, ১ : ২৮৬।

এমন ভদ্র লোক দেখিনি, অথচ তখনো তিনি মুসলমান হননি। তিনি মুসলমান হয়েছেন হুদায়বিয়ার সন্ধির পর।

মক্কার একটি মহল্লা বিরান হয়ে গেল

সর্বপ্রথম মদীনায় হিজরত করেছেন হযরত আবু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহু। এরপর যার নাম আসে, তিনি হলেন আবিসিনিয়া-ফেরত আমের ইবনে রাবীআ এবং তার স্ত্রী লায়লা বিনতে আবু হাসামা। তৃতীয় ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ। তিনি তার স্ত্রী ও ভাইকে নিয়ে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। ফলে তার পরিবারের কেউই আর অবশিষ্ট ছিল না। তার ঘরে তালা ঝুলতে থাকে। তার বাড়িটি ছিল মক্কার বাইরের অংশে।

একদিন উতবা ইবনে রাবীআ, আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব এবং আবু জেহেল কোনো কাজে এই মহল্লার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তারা লক্ষ করে, পুরো মহল্লাটি বিরান পড়ে আছে। কোথাও কোনো মানুষ নেই। কারণ, তারা সকলেই বাড়ি-ঘর ছেড়ে মদীনায় চলে গেছে। উতবা বলল, ইবনে জাহাশের পুরো পরিবারই চলে গেছে। তার বাড়িটা একেবারে বিরান হয়ে গেছে। আবু জেহেল বলল, কিন্তু এ নিয়ে কান্না করারও কেউ নেই। তারপর সে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে বলল, আর এইসব কিছু আপনার ভাতিজার অবদান। আপনার ভাতিজা আমাদের জামাতকে বিচূর্ণ করেছে। আমাদের শক্তি ও নেতৃত্বকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করে দিয়েছে।[১]

মুসলমানদের নতুন বসতি

বনু আমর ইবনে আওফের গ্রাম—কোবা ধীরে ধীরে মুসলমানদের নতুন বসতি হয়ে উঠে। মক্কার কোনো কোনো মহল্লা তো একেবারে উজাড় হয়ে যায়। আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পরিবার—যারা কিনা কয়েকটি বাড়িতে বসবাস করতেন—তাদের মহল্লাকে বনু গনম ইবনে দুদান বলা হতো। সেখানে বসবাস করতেন আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ, তার ভাই আবু আহমাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু। হযরত ওক্কাসা রাযিয়াল্লাহু আনহু,

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ১৬৯-১৭০।

সোজা ইবনে ওহাব রাযিয়াল্লাহু আনহু, উকবা ইবনে ওহাব, উরায়েদ ইবনে জুমায়রা, মুনকিয ইবনে নাবাতা, সাঈদ ইবনে রুকায়েশ, মিহরায ইবনে নাযলাহ, যায়েদ ইবনে রুকায়েশ, কায়েস ইবনে জাবের, আমের ইবনে মিহসান, মালেক ইবনে আমর, সাফওয়ান ইবনে আমর, সাকীফ ইবনে আমর, রাবীআ ইবনে আকসাম, যুবায়ের ইবনে উবায়দা, নামাম ইবনে উবায়দা, সানজারা ইবনে উবায়দা, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাযিয়াল্লাহু আনহুম—এই মহল্লা ছেড়ে মদীনায় চলে গেছেন। মেয়েদের মধ্যে যায়নাব বিনতে জাহাশ, হামনা বিনতে জাহাশ, উম্মে হাবীবা বিনতে জাহাশ, জুযামা বিনতে জানদাল, উম্মে কায়েস বিনতে মিহসান, উম্মে হাবীব বিনতে সুমামা, আমেনা বিনতে রুকায়েশ এবং সানজারা বিনতে তামীত রাযিয়াল্লাহু আনহুননার নাম হিজরতকারীদের মধ্যে পাওয়া যায়। মক্কার এই মহল্লায় বিশাল একটি এলাকা জুড়ে ছিল তাদের বসবাস। তারা সকলেই ইসলাম কবুল করেছিলেন। যিনি যখন সুযোগ পেয়েছেন, হিজরত করে কোবায় চলে গেছেন। এভাবে ধীরে ধীরে কোবা হয়ে উঠে এক নতুন ইসলামী জনবসতি।[১]

মুশরিকদের ধোঁকাবাজি

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি যখন হিজরতের ইচ্ছা করলাম, তখন আমার সঙ্গে আইয়াশ ইবনে আবু রাবীআ এবং হিশাম ইবনুল আসও হিজরত করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু আইয়াশই কেবল কোবায় পৌঁছতে পেরেছিল। এর কিছু দিন পর আবু জেহেল ইবনে হিশাম এবং হারেস ইবনে হিশাম কোবায় এসে উপস্থিত। তারা এসেছে আইয়াশকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যে। তারা তিনজন একই মায়ের সন্তান। তা ছাড়া আইয়াশ তাদের চাচাতো ভাইও বটে। তারা এসে আইয়াশের সঙ্গে একান্তে কথা বলল। তারা তাকে বোঝাল, তোমার মা কসম খেয়েছেন—আমি আইয়াশকে না দেখা পর্যন্ত মাথায় চিরুনি করব না এবং কোনো ছায়ায়ও বসব না। এ কথা শুনে আইয়াশের মন গলে গেল। সে ফিরে যাওয়ার জন্যে রাজি হয়ে পড়ল।

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ১৭১; *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ২ : ৮০-৮১।

হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আইয়াশকে বোঝালাম—এ সবই ধোঁকাবাজি। এরা তোমাকে অনেক বড় বিপদে ফাঁসিয়ে দেবে। তুমি কোনোভাবেই এদের সঙ্গে যেয়ো না। কিন্তু আইয়াশ বলল—না, আমি যাবই। আমাকে আমার মায়ের কসমের লাজ রক্ষা করতে হবে। তা ছাড়া মক্কায় আমার অনেক সম্পদ পড়ে আছে—সেগুলোর সংরক্ষণও জরুরি। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি তো তোমার চেয়েও ধনী। আমি তোমাকে আমার সম্পদের অর্ধেক দিয়ে দিচ্ছি। তবুও মক্কায় যেয়ো না। কিন্তু সে মানল না। অবশেষে কৌশল হিসেবে আমি তাকে বললাম, তুমি আমার উষ্ট্রীটি নিয়ে যাও। এটা খুবই দ্রুতগামী। তুমি যদি তাদের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের ষড়যন্ত্র অনুভব করো, তা হলে এর উসিলায় হয়তো বেঁচে যাবে। আইয়াশ আমার উষ্ট্রীটি নিয়ে তাদের সঙ্গে চলে গেল। পথে এক জায়গায় গিয়ে আবু জেহেল বলল, আইয়াশ, আমার উটটি ক্লান্তিতে দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমাকে তোমার উটের ওপর তুলে নাও। আইয়াশ বলল, চলে আসো। আইয়াশ উষ্ট্রীটি মাটিতে বসিয়ে দিলো—যেন আবু জেহেল উঠে বসতে পারে। উট মাটিতে বসামাত্র আবু জেহেল এবং হারেস আইয়াশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাকে চেপে ধরে শক্ত করে রশি দিয়ে বেঁধে নিল। তারপর এভাবেই তাকে মক্কায় নিয়ে যায়।[১]

হযরত উমরের হিজরতের কাফেলা

হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যেমন ছিলেন বীর ও সাহসী, তার হিজরতের ব্যাপারটিও ছিল ঠিক তেমন। সকলেই গোপনে গোপনে একা একা হিজরত করতেন। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হিজরত করেছেন বিশাল এক বহরসহ। তার সে কাফেলায় সদস্যসংখ্যা ছিল প্রায় বিশজন। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হিজরতের আগেই মদীনায় এক বিশাল বড় জামাত হিজরত করেছে। তাদের মধ্যে মুসআব ইবনে উমায়ের, আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম এবং হযরত বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-ও ছিলেন। তারপর হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বিশাল কাফেলাসহ

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ১৭২।

হিজরত করেন। তার সঙ্গে তার ভাই যায়েদ ইবনে খাত্তাব ছিলেন। আরও ছিলেন আমর ইবনে সুরাকা, আবদুল্লাহ ইবনে সুরাকা ইবনে মুতামির, খুনায়েস ইবনে হুযাফা সাহমী। হযরত খুনায়েস রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন সফিয়্যাহ বিনতে উমরের স্বামী এবং হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর চাচাতো ভাই। এই কাফেলায় হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ভগ্নিপতি সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফায়েল ছিলেন। আরও ছিলেন ওয়াতিদ ইবনে আবদুল্লাহ তামিমী, খাওলা ইবনে আবু খাওলা, মালেক ইবনে আবু খাওলা, ইয়াস ইবনে বুকায়ের, আমের ইবনে বুকায়ের প্রমুখ। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এই বিশাল কাফেলাসহ মদীনায় পৌছান। কোবায় গিয়ে রিফাআহ ইবনে আবদুল মুনযির ইবনে যুবায়েরের বাড়িতে ওঠেন[১]।

বাধাগ্রস্ত হলেন হযরত সুহায়েল রাযিয়াল্লাহু আনহু

হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কাফেলাসহ হিজরতের পর হিজরতের একটা ধুম পড়ে যায়। যে যখনই সুযোগ পেয়েছেন, তিনি তখনই মক্কা ছেড়ে চলে গেছেন। ফলে মক্কার কোনো কোনো মহল্লা একেবারে বিরান হয়ে পড়ে। সেখানে আর কোনো মানুষ অবশিষ্ট ছিল না। হযরত তালহা ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন হিজরত করেন, আসআদ ইবনে যুরারা এর বাড়িতে গিয়ে ওঠেন। সুহাইব ইবনে সিনান রাযিয়াল্লাহু আনহু হিজরত করার পর সুনহ্ নামক স্থানে হাবীব ইবনে আসান খাযরাজী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বাড়িতে ওঠেন। হযরত সুহাইব ইবনে সিনান রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন, বিষয়টি কীভাবে যেন কুরাইশসম্প্রদায় জেনে যায়। তারা তাকে ঘিরে ফেলে। তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে, তুমি যখন আমাদের এখানে এসেছিলে, তখন ছিলে অসহায়, নিঃস্ব। তোমার হাতে কোনো অর্থকড়ি ছিল না। আমাদের এখানে এসে বিত্তবান হয়েছ। আমরা জানতে পারলাম—তুমি এখন সমুদয় ধন-সম্পদ নিয়ে পালিয়ে যেতে চাচ্ছ। খোদার কসম, আমরা তোমাকে পালিয়ে যেতে দেব না।

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ২ : ১৮৪; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ১৭৩।

হযরত সুহাইব বলেন, এরপর কুরাইশের যুবকরা আমার পেছনে ছায়ার মতো লেগে রইল। তাদের এই নিশ্ছিদ্র পাহারার কারণে আমি রাতের বেলাও ঘুমোতে পারতাম না। এই শুয়ে আছি, তো এই বসে আছি। রাতের বেলা একা একা ঘরের বাইরে পায়চারি করতাম। আমাকে দেখে কুরাইশের লোকেরা বলত—তোমার মনে হয় শরীর খারাপ যাচ্ছে, অথচ আমি তখন পুরো সুস্থ ছিলাম। মূলত হিজরতের পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়েই আমি মনে-প্রাণে অস্থির হয়ে পড়ি। এভাবে রাতের পর রাত আমার নির্ঘুম কেটে যায়। এক রাতের কথা। আমি একা জেগে আছি অস্থির। লক্ষ করলাম, সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি আস্তে করে উঠে মদীনার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। এরই মধ্যে তাদের কয়েকজনের ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম থেকে উঠেই তারা আমার পিছু নেয়। আমাকে লুট করার জন্যে তারা অস্থির হয়ে পড়ে। আমি তখন বললাম, আমার কাছে স্বর্ণ আছে। আমি যদি তোমাদেরকে স্বর্ণগুলো দিয়ে দিই, তা হলে কি আমার পথ ছেড়ে দেবে? তারা এক বাক্যে রাজি হয়ে পড়ে। আমি তাদের সঙ্গে মক্কায় ফিরে আসি। মক্কায় এসে আমার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বলি, আমার ঘরের চৌকাঠের নিচে স্বর্ণ লুকিয়ে রেখেছি। মাটি খুঁড়ে এখনই তুলে নাও। অমুক ব্যক্তির কাছে দুই সেট কাপড় আছে, সেগুলোও নিয়ে নিয়ো। এ কথা বলেই আমি মদীনার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ি। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের অল্প কয়দিন পরের ঘটনা এটা। তখনো তিনি কোবাতেই অবস্থান করছিলেন। আমাকে দেখামাত্র বলে উঠলেন—

يا ابا يحيي ربح البيع

আবু ইয়াহইয়া, সফল ব্যবসা করে এসেছ।

হযরত সুহাইব বলেন, আমি খুবই তাজ্জব হলাম। এই ঘটনার পর আমার আগে তো কেউ মদীনায় আসেনি। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কে জানাল—আমি আমার সমস্ত সম্পদ মুশরিকদের হাতে তুলে দিয়ে হিজরত করেছি। মনে মনে বললাম, হযরত জিবরাঈল ছাড়া নবীজিকে এই কথা আর কে বলবে?[১]

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ২ : ৮৯; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ১৭৪।

মদীনায় মুহাজিরদের ঠিকানা

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব, যায়েদ ইবনে হারেসাহ, আবু মারসাদ কিনানাহ ইবনে হুসাইন, তার পুত্র মারসাদ দানাবী, আনিসা আবু কাবশাহ মাখতুম ইবনুল হাদাম—এরা সকলে কোবা এসে হযরত আমর ইবনে আউফের ভাইয়ের বাড়িতে ওঠেন। আবদুল্লাহ ইবনুল হারেস তার দুই ভাই তোফায়েল ইবনুল হারেস, হুসাইন ইবনুল হারেস এবং হযরত মিসতাহ ইবনে উসাসা, সুওয়াইবিত ইবনে সাদ, তুলাইদ ইবনে উমাইর, উতবা ইবনে গাযরানের আজাদকৃত দাস খাব্বাব—আবদুল্লাহ ইবনে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বাড়িতে গিয়ে ওঠেন। আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার কয়েকজন মুহাজির সঙ্গীসহ সাদ ইবনে রবীর বাড়িতে ওঠেন। যুবায়ের ইবনুল আওয়াম, আবু বুসরা ইবনে আবু রহম, হযরত মুনযির ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে উকবার বাড়িতে ওঠেন। মুসআব ইবনে উমায়ের ওঠেন বনু আবদুল আশহালের নেতা সাদ ইবনে মুআযের বাড়িতে। আবু হুযায়ফা ইবনে উতবা এবং সালেম ওঠেন সালামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বাড়িতে। উসমান ইবনে আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু আরস্ ইবনে সাবেত ইবনে মুনযিরের বাড়িতে বনু নাজ্জারে অবস্থান গ্রহণ করেন। অবিবাহিত মুহাজির সাহাবীগণ সকলে গিয়ে ওঠেন সাদ ইবনে খায়সামা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বাড়িতে। কারণ, তিনি নিজেও ছিলেন অবিবাহিত। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের আগ পর্যন্ত প্রথম সারির এই মহান সাহাবীগণের উপস্থিতিতে নামায পড়াতেন আবু হুযায়ফার আজাদকৃত গোলাম হযরত সালেম রাযিয়াল্লাহু আনহু। কারণ, কুরআনে কারীম সবচেয়ে বেশি মুখস্থ ছিল তার।[১]

ঘুম হারাম হয়ে পড়ে মুশরিকদের

দুইজন-চারজন করে মক্কার নির্যাতিত নিগৃহীত মুসলমানগণ প্রতিদিনই মদীনার উদ্দেশ্যে হিজরত করছিলেন। অমানবিক দীর্ঘ নির্যাতনের পর তারা এত দিনে নিরাপদ একটি আশ্রয়ের সন্ধান পেয়েছেন। তা ছাড়া

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ১৭৪; *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ২ : ৯২-৯৩।

মদীনাবাসীর সঙ্গে তাদের একটা সখ্যও ছিল। তাদের সামাজিক আচার-আচরণ আর মক্কাবাসীর সামাজিক আচার-আচরণ ছিল অভিন্ন। মদীনায় অনেকের আত্মীয়তাও ছিল। উভয় অঞ্চলের ভাষাও ছিল আরবী। পুরো আরবের জীবনযাপনের ধরনও ছিল একই রকম। ফলে মুসলমানগণ মক্কা থেকে মদীনায় গিয়ে মানসিক কোনো অস্থিরতার মুখোমুখি হতেন না। তবে যে বিষয়টি তাদেরকে সবচেয়ে বেশি টানত, তা হলো, এরই মধ্যে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রসার লাভ করেছে মদীনায়। ক্রমে পুরো মদীনা ইসলামের রঙে রেঙে উঠছিল। তাই যে যখন সুযোগ পেত, মদীনায় ছুটে যেত। মক্কার মুশরিক-সম্প্রদায় অসহায়ের মতো দেখছিল এই দৃশ্য। তা ছাড়া এরই মধ্যে তারাও জানতে পেরেছে—মদীনাবাসী হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিরাপত্তার পুরো দায়-দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে। শত্রুর হাত থেকে প্রতিরক্ষার অঙ্গীকারে তারা সকলে মুষ্ঠিবদ্ধ। তারা লক্ষ করছিল—হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখন জীবন-উৎসর্গকারী মরণশপথে বলীয়ান সঙ্গীদের নিরাপত্তায় পৌঁছে যাচ্ছেন। তা ছাড়া তারা এও বিশ্বাস করত—সাধারণ মুসলমানগণ মদীনায় পৌঁছে যাওয়ার পর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও যে কোনো সময় মদীনায় চলে যেতে পারেন। তারপর সেখানে একটি শক্তিশালী দল গঠন করে আবার আমাদের শক্তির ওপর হামলা করতে পারেন। এই দুশ্চিন্তায় তাদের ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছিল। রাত-দিন তারা এই দুশ্চিন্তায় ডুবে থাকত। মদীনায় হিজরতকারীদেরকে যথাসাধ্য বাধা দেওয়ার চেষ্টা করত। এ কারণেই মূলত সাহাবীগণ লুকিয়ে লুকিয়ে হিজরত করতেন। দিনের আলোয় কিংবা মুশরিকদের জানিয়ে তারা মদীনার উদ্দেশ্যে পা বাড়াতেন না। একমাত্র উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-ই ঘোষণা করে হিজরত করেছেন।

সাধারণ মুসলমানদের হিজরতের পর

অধিকাংশ মুসলমান মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়ার পর অবশেষে এমন কিছু মুসলমান মক্কায় থেকে যান—যারা ছিলেন মুশরিকদের পাঞ্জায় বন্দি। বের হওয়ার কোনো পথ ও কৌশল তাদের হাতে ছিল না। এদিকে হযরত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনো পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হিজরতের আদেশ পাননি। বিষয়টি অনেকবার হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খেদমতে আরজ করেছেন। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধৈর্যের উপদেশ দিয়ে বলেছেন—অপেক্ষা করো। তুমি হয়তো উত্তম কোনো সহযাত্রী সঙ্গে পাবে। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তত্ত্বাবধানেই লালিত-পালিত হতেন। তাকেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের অনুমতি দেননি। দৃশ্যত মুসলমানদের মধ্যে এই কয়জনই ছিলেন মক্কায়—যাদের সম্পর্কে কুরাইশ-সম্প্রদায় খুব ভালো করে জানত। তাঁদের প্রতি এরা সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখত। তাদের বিশ্বাস ছিল—আমরা যদি সামান্য অবহেলা কিংবা অলসতা করি, তা হলে সকাল-সন্ধ্যা যে কোনো সময় মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মক্কা থেকে চলে যাবেন। তারপর আমাদের ভবিষ্যত ডুবে যাবে গভীর অন্ধকারে।

দারুন নাদওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

এই প্রেক্ষিতে তারা গুরুত্বপূর্ণ সভা ডাকার সিদ্ধান্ত নিল। মক্কার সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও সম্ভ্রান্ত কুরাইশ-নেতৃবৃন্দকে রাতের বেলা দারুন নাদওয়ায় সমবেত হওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হলো। কুসাই ইবনে কিলাবের বাড়িকে দারুন নাদওয়া বলা হতো। অতি গুরুত্বপূর্ণ কোনো সংকট কিংবা সিদ্ধান্তের জন্যেই কেবল এই বাড়িতে পরামর্শ-সভা বসত। আজ সভা ডাকা হয়েছে মক্কার সর্বশেষ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে। আজকের এই সভায় মক্কার যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেছে সবিশেষ তাদের মধ্যে ছিল—

উতবা
শায়বা
আবু সুফিয়ান ইবনে হারব
তুআইমা ইবনে আদী
জুবাইর ইবনে মুতঈম ইবনে আদী

হারেস ইবনে আমের ইবনে নাওফাল
নজর ইবনুল হারেস
আবুল বুখতারী ইবনুল হিশাম
যামআ ইবনুল আসওয়াদ
হাকীম ইবনে হিযাম
আবু জেহেল ইবনে হিশাম
নাবীহ ইবনুল হাজ্জাজ
মুনীহ ইবনুল হাজ্জাজ
এবং উমাইয়াহ ইবনে খালফ।

এদের বাইরেও কুরাইশের আরও অনেক লোক সেখানে উপস্থিত ছিল।[১]

এই মিটিং ছিল চরম উত্তেজনাপূর্ণ। পুরো মক্কাবাসী অসামান্য অস্থিরতা নিয়ে এই সভার দিকে তাকিয়ে আছে। চরম অস্থিরতার সঙ্গে তারা অপেক্ষায় আছে, মক্কার বিজ্ঞ-বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গ মিলে আজ তাদের কী সিদ্ধান্ত দেবে? এই তল্লাটের গুরুত্বপূর্ণ সকল ব্যক্তি দারুন নাদওয়ায় সমবেত। একজন উঠে দাঁড়াল—আজকের এই পরামর্শসভার গুরুত্ব এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোকপাত করে বলল—

আপনারা সকলে আবগত আছেন, মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আমাদের উন্নতি, শাসন ও ক্ষমতার জন্যে এক ভয়াবহ আশঙ্কার জন্ম দিয়েছে। সেই আশঙ্কা এখন এক ভয়াবহ বাঁকে এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা যদি পূর্ণ শক্তির সঙ্গে এখন একে রুখে না দাঁড়াই, তা হলে বিষয়টি আমাদের সাধ্যের বাইরে চলে যাবে। তখন ইচ্ছে করলেও আমরা কিছুই করতে পারব না। আমরা গভীর আশঙ্কার সঙ্গে লক্ষ করছি—তাঁকে যদি আর কয়েকদিন ছাড় দেওয়া হয়, তা হলে সে তার জানবাজ সঙ্গীদের নিয়ে উল্টো হয়তো আমাদের ওপরই হামলা করে বসবে। আমাদের অস্তিত্ব মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলবে। তাই আজকের এই মজলিসে আমাদেরকে শক্তিশালী এবং চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠতে হবে। এমন একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার জন্যেই আজকের এই সভা

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ২ : ৯৩; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ১০৫-১০৬; *উয়ুনুল আসার*, ১ : ২৯২।

ডাকা হয়েছে। আপনারা সকলে নিজ নিজ বিবেচনায় যা ভালো ও যথার্থ মনে করেন, তা এখানে উপস্থাপন করুন। আমরা সকলে মিলে যেন একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। অতঃপর সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে একটা চূড়ান্ত রূপরেখা নিয়ে উঠতে পারি। এখন আপনারা সকলেই নিজ নিজ মত পেশ করুন।

আবুল বুখতারী ইবনে হিশাম সর্বপ্রথম দাঁড়াল। বলল, আমি মনে করি—এখনই তাকে গ্রেফতার করে হাতকড়া এবং বেড়ি পরিয়ে কোনো একটি ঘরে তালা দিয়ে রাখা উচিত। তারপর দেখা যাবে, কী পরিণতি হয় তার। এর আগে বিখ্যাত কবি যুহায়ের এবং নাবেগাকে যেভাবে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। তারা যেমন অবরুদ্ধ অবস্থায় অসহায়ের মতো মৃত্যুবরণ করেছিল এই ব্যক্তির পরিণতিও তা-ই হবে।

মজলিস তার এই মতকে পছন্দ করল না। সকলে এই মতকে অসঙ্গত বলে উড়িয়ে দিলো। তারা তাদের আশঙ্কার কথা বলল—যদি তাকে আমরা তালা দিয়ে ফেলে রাখি, তা হলে এই খবর গোপন থাকবে না। পুরো আরবে ছড়িয়ে পড়বে। তার অনুসারীদের কানে পৌছাতেও খুব সময় লাগবে না। তারা তখন সর্বশক্তি নিয়ে আমাদের ওপর হামলে পড়বে। তারপর মরণপণ লড়াই করে আমাদের কয়েদখানা থেকে তাকে ছাড়িয়ে নেবে। এরপর তারা এর প্রতিশোধে হয়তো আমাদের ওপর সম্মিলিতভাবে এত বড় আক্রমণ করে বসবে—আমাদের অস্তিত্বই হয়তো তখন নিশ্চিহ্ন করে দেবে। সুতরাং এই মত মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। এর পরিণতি হবে খুবই ভয়াবহ। আপনারা চিন্তা-ভাবনা করে তারপর মত দিন।

এই মত প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর আরেক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল। বলল, আমার দৃষ্টিতে এই সংকটের সমাধান হলো—একে তোমরা মক্কা থেকে বের করে দাও। যেখানে খুশি চলে যাবে। যেখানে খুশি সেখানে থাকবে এবং যা খুশি করে বেড়াবে। আমরা রাত-দিন এই অস্থিরতার হাত থেকে রেহাই পাব। তাকে নিয়ে আমাদের তখন আর কোনো অস্থিরতা থাকবে না। তার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্কও থাকবে না। এই ফেতনা থেকেও তখন আমাদের মক্কা শহর নিরাপদ থাকবে।

উপস্থিত সভা এই মতকেও গ্রহণ করল না। আপত্তি উঠল—এটা

কারোরই অজানা নয়—তাঁর কথা কত মধুময়। তাঁর বাণী যেমন কোমল, তেমনি মোহনীয়। কারও সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা হওয়ার পরই সে তার দেওয়ানা হয়ে পড়ে। আমরা যদি তাকে মক্কা থেকে বের করে দিই, তা হলে সে বিভিন্ন কবিলায় ছুটে যাবে। তার মধুময় কথার যাদুতে সকলকে তার আনুগত করে ফেলবে। দেখা যাবে, বিভিন্ন গোত্র ও শক্তিমান কবিলা তাঁর সহমত হয়ে উঠেছে। তারপর ধীরে ধীরে সে অবধ্য, শক্তিমান ও দৃঢ়চেতা এক দলের দলপতি হয়ে উঠবে। তখন সেই অপরাজেয় দলকে সঙ্গে নিয়ে তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে মক্কার ওপর হামলা করে বসবে। তখন হয়তো তার মোকাবেলার শক্তিও তোমাদের থাকবে না। সে মক্কা জয় করে শাসন-ক্ষমতার বাগডোর কব্জা করে নেবে। তখন তোমাদের সঙ্গে যা খুশি, তা-ই করবে। তোমরা হবে তখন মক্কার এক পরাজিত অসহায় নিরীহ জনগোষ্ঠী। তখন তোমাদের কোনো কৌশলই সফল হবে না। সুতরাং তাকে মক্কা থেকে বের করে নির্বাসনে পাঠানোর মতো ভুল কখনো করবে না। এর পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। সুতরাং যারা তাকে নির্বাসনের পরামর্শ দিয়েছে তাদের উচিত তাদের মতকে প্রত্যাহার করে নেওয়া। এই মতকে প্রত্যাহার করে নতুন কোনো পরামর্শ দিন।

সিদ্ধান্ত হলো হত্যার

সবশেষে আবু জেহেল ইবনে হিশাম উঠে দাঁড়াল। বলল, এ বিষয়ে আমার একটাই মত। আমি জানি না, আমার এই মত আপনাদের পছন্দ হবে কি না। আপনারা আমার মত গ্রহণ করবেন না প্রত্যাখ্যান করবেন—তাও আমি জানি না। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে এটা একমাত্র বিকল্প পথ। আমার মতে, আর কোনোভাবে এই সংকটকে রুখে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। উপস্থিত সকলেই গভীর মনোযোগে নিবিষ্ট হলো আবু জেহেলের প্রতি। একসঙ্গে বলে উঠল—আবুল হিকাম, আপনার মতটি কী? আপনি বলুন। আবু জেহেল তখন বলল, আমার মত হলো—প্রত্যেক কবিলা থেকে একজন-একজন শক্তিমান এবং বীর যুবক নির্বাচন করা হবে। তারপর তাদের সকলকে তার বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই যুবকদের আদেশ করা হবে, তাকে দেখামাত্র সকলে একসঙ্গে হামলা করবে। তারপর তাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলবে। এভাবে চিরদিনের জন্যে এই সংকট

মারা পড়বে। আমরা এই বিপদ থেকে রেহাই পাব। আর বনু আব্দে মানাফের এতটা শক্তি নেই—তারা আরবের সকল কবিলা থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। তারা বেশির চেয়ে বেশি হয়তো রক্তমূল্য দাবি করবে। আমরা খুব সহজেই সেটা চুকিয়ে দেব।

এই রায় উচ্চারিত হওয়ার পর চারদিকে উত্তেজনার বিদ্যুৎ ছড়িয়ে পড়ল। উষ্ণ উত্তেজনায় সমর্থন ব্যক্ত হতে লাগল। সকলেই উচ্চ কণ্ঠে তার মতকে সমর্থন জানাল। ফলে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হলো।[১]

এককথায় আবু জেহেলের এই মতের বিরুদ্ধে কেউ কোনো কথা বলেনি। ফলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ামাত্র তা বাস্তবায়নে নেমে পড়ে সকলে। চারদিকে প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। আজ রাতই এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের রাত হয়ে উঠে।

হিজরতের প্রস্তুতি

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু এর আগে কয়েকবার হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হিজরত সম্পর্কে মতামত জানতে চেয়েছেন। প্রতিবারই তাকে অপেক্ষায় থাকতে বলেছেন। অবশ্য আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু ভালো করেই জানতেন—একদিন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করবেন। হয়তো সেদিনকার পরিস্থিতি হবে খুবই ভয়াবহ। এই ভয়ংকর সংকটের কথা ভেবে তিনি আগে থেকেই একটু একটু করে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। হিজরতের উদ্দেশ্যে তিনি দ্রুতগামী দু'টি উষ্ট্রী কিনে রেখেছিলেন। তারপর যথাযোগ্য সেবা-যত্নের মাধ্যমে উট দু'টিকে আরও তেজস্বী করে তুলছিলেন। উদ্দেশ্য, যেন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করামাত্র সবকিছু প্রস্তুত থাকে।

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যখন হিজরতের আদেশ এল, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করলেন।

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ২ : ৯৪-৯৫; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ১৭৬; ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, ১ : ৫১৬; ইবনে সায়্যিদুন নাস, *উয়ুনুল আসার*, ১ : ২৯৩; ইবনে সাদ, *তাবাকাতুল কুবরা*, ১ : ২২৭।

মক্কার মুশরিকদের এই উত্তেজনাপূর্ণ কর্মকাণ্ড সম্পর্কেও তিনি পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। তিনি জানতেন—তাকে হত্যা করবার জন্যে শত শত উন্মুক্ত তরবারি প্রস্তুত। মক্কার মুশরিক-সম্প্রদায় তাদের এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্যে আজকের এই রাতটি স্থির করে রেখেছে। এই দিনই দুপুরবেলা তিনি আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘরে গেলেন। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হিজরতের আদেশ এসেছে এই বার্তা জানাবার জন্যে গিয়েছেন তিনি। হৃদয়বিদারক এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে উম্মত-জননী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহার সামনে। সুতরাং ঘটনাটি তার মুখেই শোনা যাক। তিনি বলেছেন—হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম ছিল প্রতিদিন সকালে এবং সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে আসতেন। যেদিন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হিজরতের আদেশ পেলেন, সেদিন তিনি নিয়ম ভেঙে দুপুরে আমাদের বাড়িতে আগমন করলেন। আবু বকর তাকে আসতে দেখে খুবই বিস্মিত হলেন। তার বুক কাঁপতে লাগল—নিশ্চয় নতুন কোনো ঘটনা ঘটেছে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশ করার পর খাটিয়ার ওপর বসে বললেন, ঘর খালি করো। জরুরি কথা আছে। আবু বকর বললেন, আমার মা-বাবা আপনার জন্যে উৎসর্গ হোক। এরা দু'জন আমার কন্যা। এরা জানে-প্রাণে আপনার জন্যে উৎসর্গিত। এরা এখানে থাকাতে কোনো সমস্যা নেই। তখন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাকে মক্কা থেকে বেরিয়ে যেতে এবং হিজরত করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন—আমার কি সফরসঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য হবে? নবীজি বললেন, অবশ্যই। হযরত আয়েশা বলেন, আমার জানা ছিল না—মানুষ অনেক বেশি খুশি হলে অশ্রুসিক্ত হয়। সেদিনই প্রথম দেখলাম—হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বললেন—তুমি আমার সঙ্গে সফর করবে, তখন আনন্দে আবু বকরের চোখ ছলছল করে উঠল।

হন্তারকদের ভিড়ে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আজকের দিনের জন্যে দু'টি দ্রুতগামী উষ্ট্রী প্রস্তুত করে রেখেছি।

এছাড়াও হিজরতের প্রস্তুতি হিসেবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু আবদুল্লাহ ইবনে উরায়কিতকে পথ দেখিয়ে নেওয়ার জন্যে ভাড়া করে রেখেছিলেন। আবদুল্লাহ তখনো মুশরিক ছিল। তবে খুবই আস্থাভাজন। তার কাছেই রাখা ছিল সফরের দু'টি উষ্ট্রী। আবদুল্লাহই সেগুলোকে দানাপানি খাওয়াত, যত্ন নিত। এর বাইরেও সফরের অন্যান্য ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপাতির ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন হযরত আবু বকর।

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুকে হিজরতের ইচ্ছার কথা জানিয়ে এবং প্রস্তুতির যাবতীয় বিবরণ শোনার পর ঘরে ফিরে যান। সন্ধ্যায় হযরত আলী ইবনে আবু তালেবকে ডেকে বলেন—তুমি আজকে রাত কাটাবে আমার বিছানায়। আমার এই চাদরটি গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকবে। কারণ, বরাবর আমি এই চাদরটিই রাতে গায়ে জড়াই। ইনশাআল্লাহ তুমি নিরাপদ থাকবে। সকালে উঠে আমার কাছে রাখা আমানতগুলো মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেবে। তারপর মদীনায় চলে এসো।

সন্ধ্যার অন্ধকার ছড়িয়ে পড়তেই সশস্ত্র যুবক-সম্প্রদায় উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ঘিরে ফেলে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘর। সশস্ত্র এই যুব-সমাজকে নেতৃত্ব দিচ্ছিল আবু জেহেল। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরের ভেতর। তিনি যখন ঘর থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করলেন। এক মুঠ ধুলো তুলে নিলেন তারপর—

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ.

পড়ে মুশরিকদের দিকে উড়িয়ে দিলেন। তারপর তিনি ঘাতকদের ভিড় ভেদ করে বেরিয়ে পড়লেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘরে পৌঁছে গেলেন। আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুও ঘরের পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে সাওর পর্বতের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন।

শত্রু যখন শক্তিমান রক্ষাকর্তা তখন অধিকতর শক্তিমান

ঘাতক যুবকগোষ্ঠী চরম চঞ্চলতায় উন্মুক্ত তরবারি হাতে অপেক্ষমাণ

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের দুয়ারে। তারা অপেক্ষায় কম্পমান—শত্রু সামনে পাওয়ামাত্র একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ তরবারির ধার পরীক্ষা করে নেবে। কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তরবারির ধার পরীক্ষা করার সুযোগ তাদের এল না। এমন সময় বাইরে থেকে আসা এক ব্যক্তি তাদেরকে জিজ্ঞেস করল—তোমরা কার অপেক্ষায় এখানে বসে আছ? সকলে সমস্বরে বলল—মুহাম্মাদের। লোকটি বলল, আল্লাহ তোমাদেরকে ব্যর্থ করেছেন। এখন এখানে অপেক্ষা করা অর্থহীন। তিনি তো অনেক আগেই চলে গেছেন। আর দ্যাখো, তোমাদের মাথায় তিনি ধুলো ছিটিয়ে গেছেন। তখন অলক্ষেই সকলে নিজ নিজ মাথায় হাত রেখে দেখল—সত্যিই তো মাথায় ধুলো জমে আছে। ঘাতকদল এবার হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে ঢুকে তার খাটিয়ায় নিদ্রিত ব্যক্তিকে পরীক্ষা করার জন্যে যখন চাদর সরাল, দেখল—মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর জায়গায় আলী ইবনে আবু তালেব। যখন সকাল হলো, তখন আসল ঘটনা উন্মোচিত হলো। অপমানিত ও লাঞ্ছিত মনে অবনত মস্তকে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাড়ি থেকে তারা ভারী পায়ে নেতাদের বাড়ির উদ্দেশে হাঁটতে শুরু করল।[১]

হিজরতের পথে

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু মদীনায় যাওয়ার সাধারণ রাস্তা ছেড়ে একটি নতুন রাস্তা ধরেন। এই উদ্দেশ্যেই আবদুল্লাহ ইবনে উরায়কিতকে গাইড হিসেবে নিযুক্ত করে রেখেছিলেন আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু। কারণ, সে অপ্রচলিত রাস্তাগুলো খুব ভালো জানত। দ্রুতগামী উষ্ট্রী দু'টিতে উঠে অল্প সময়ে তারা সাওর পর্বতে পৌঁছে যান। এই পাহাড়ের চূড়ায় একটি গুহা ছিল, যার ভেতর দুইজন মানুষ আরামে লুকিয়ে বসে থাকতে পারেন। তারা এই গুহাটিতে পৌঁছে যান।

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ১৭৬-১৭৮; *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ২ : ৯৭-৯৮; ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, ১ : ৫১৬; ইবনে সাদ, *আত তাবাকাতুল কুবরা*, ১ : ২২৮।

আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু হিজরতের প্রস্তুতি হিসেবে এই ব্যবস্থাও করে রেখেছিলেন—মক্কার মুশরিকদের প্রতিমুহূর্তের সকল তৎপরতা যেন জানতে পারেন। এই দায়িত্বে তিনি তার পুত্র আবদুল্লাহকে নিযুক্ত করে রেখেছিলেন। বলে রেখেছিলেন আমরা চলে যাওয়ার পর তুমি সারাদিন পুরো মক্কায় ঘুরে বেড়াবে। যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করবে। কুরাইশদের কথাবার্তা মনোযোগসহ শুনবে। লক্ষ রাখবে, কী তাদের পরিকল্পনা। এই মুহূর্তে কী পদক্ষেপ তারা নিতে যাচ্ছে। সংগৃহীত এইসব তথ্য প্রতি রাতে সাওর গুহায় এসে আমাদেরকে জানিয়ে যাবে। আবদুল্লাহ নীরবে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সারা দিন তথ্য সংগ্রহ করে ফিরত। রাতে গিয়ে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তা সবিস্তারে জানিয়ে আসত।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু তার গোলাম আমের ইবনে ফুহায়রাকে আদেশ দিয়ে রেখেছিলেন—ছাগলগুলো সারা দিন মাঠে চড়াবে। সূর্য ডোবার সময় ছাগলগুলো নিয়ে সাওর গুহার কাছে চলে আসবে। উদ্দেশ্য, আমরা যেন প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় দুধ পেতে পারি। তারপর এখানেই অপেক্ষা করবে। তারপর আবদুল্লাহ যখন আমাদেরকে মক্কার তথ্যাবলি জানিয়ে ঘরে ফিরবে, তুমি তার পেছনে পেছনে ছাগলগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। আবদুল্লাহর পায়ের চিহ্নগুলো যেন মাটির সঙ্গে মিশে যায়। অন্যথায় আবদুল্লাহর পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে মক্কার লোকেরা আমাদের পর্যন্ত চলে আসবে।

আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু সাওর গুহায় অবস্থানকালীন সময়ে যেন যথারীতি খাবার পৌঁছানো যায়, তার ব্যবস্থাও করে রেখেছিলেন। বড় মেয়ে হযরত আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে দিয়েছিলেন এই দায়িত্ব। তিনি একা খাবার প্রস্তুত করে সাওর পর্বতে যেতেন। খাবার পৌঁছে দিয়ে আবার ফিরে আসতেন। একদিন খাবারের পুটুলি বাঁধার জন্যে কোথাও কিছু পাচ্ছিলেন না। তখন কোমরের বন্ধনী খুলে চিরে দুই টুকরো করে একটি দিয়ে পুটুলি বেঁধেছিলেন। এই ঘটনা শোনার পর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে 'যাতুন নিতাকাইন' উপাধি দিয়েছিলেন। এটা ছিল হযরত আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহার জন্যে গর্বের অনেক বড় প্রতীক।

হযরত আসমার দুঃসাহস

আবু বকর-কন্যা হযরত আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর সিদ্দীক মক্কা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরের দিন আবু জেহেল কয়েকজন কুরাইশ-নেতাসহ আমাদের বাড়িতে আসে। বাইরে থেকে হাঁক ছাড়লে আমি বেরিয়ে যাই। আমাকে জিজ্ঞেস করে, আবু বকরের কন্যা, তোমার বাবা কোথায়? আমি তখন বললাম, খোদার কসম, আমি কি জানি, আমার বাবা কোথায়? হযরত আসমা বলেন, আবু জেহেল তো এমনিতেই নিকৃষ্ট এবং বদজবান মানুষ ছিল। আমার এই উত্তর শোনার পর সে সজোরে আমাকে চপেটাঘাত করে। আমার কান ফেটে যায়। আমার কানের দুল ছুটে গিয়ে মাটিতে পড়ে যায়। তারপর তারা সকলে চলে যায়। আর কিছু জিজ্ঞেস করেনি।[১]

অর্থকড়ির ব্যবস্থা

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু ভালো করেই জানতেন—আমরা অন্য দেশে যাচ্ছি। জানা নেই, কখন কী অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়। সেখানে অর্থকড়িরও প্রয়োজন পড়তে পারে। এই উদ্দেশ্যে তিনি পাঁচ হাজার দেরহাম সঙ্গে নিয়েছিলেন। এই ঘটনা হযরত আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা এইভাবে বর্ণনা করেছেন—

আব্বাজান যখন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হন, তখন আমাদের ঘরে সর্বমোট পুঁজি ছিল পাঁচ হাজার দেরহাম। আমার বাবা তার সবটাই সঙ্গে নিয়ে যান। আমার বাবা চলে যাওয়ার পর একদিন আমাদের দাদা আবু কুহাফা আসেন। তিনি তখন অন্ধ হয়ে পড়েছেন। এসেই আমাকে জিজ্ঞেস করেন—আবু বকর কি ঘরের সব অর্থকড়ি সঙ্গে নিয়ে গেছে? তোমাদের জন্যে কিছু রেখে গেছে কি? আমি বললাম, দাদা, আমাদের জন্যে অনেক সম্পদ রেখে গেছেন। আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। তারপর আমি কিছু ছোট ছোট পাথর কুড়িয়ে এনে ঘরের কোনে জমিয়ে রাখলাম—যেখানে আমার বাবা তার

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ২ : ১০০।

অর্থকড়ি রাখতেন। তারপর সেগুলোর ওপর একটা কাপড় বিছিয়ে দিলাম। এবার আমার দাদার হাত ধরে সেখানে নিয়ে গেলাম। বললাম, আসুন আপনাকে অর্থকড়িগুলো দেখিয়ে দিই। হাত টেনে বললাম, এখানে হাত রাখুন। দেখুন, বাবা আমাদের জন্যে কত পয়সা রেখে গেছেন! তিনি কাপড়ের ওপর হাত রেখে বললেন, এতগুলো সম্পদ যখন রেখে গেছে, তখন আর কোনো অসুবিধা নেই। আমি তো ভেবেছিলাম—সব অর্থকড়ি সে সঙ্গে নিয়ে গেছে। তোমাদের জন্যে যখন এত পয়সা রেখে গেছে, তখন ভালোই করেছে। হযরত আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আসলে আমার বাবা আমাদের জন্যে কিছুই রেখে যাননি। কিন্তু আমাদের দাদাকে আশ্বস্ত করা খুবই জরুরি ছিল। তাই আমি এই কৌশলে তাকে আশ্বস্ত করেছি।[১]

শত উট পুরস্কার

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু এই সাওর গুহায় তিন রাত কাটান। আদেশমাফিক আবদুল্লাহ সারা দিনের সব সংবাদ রাতের বেলা সাওর গুহায় পৌঁছে দিত। আমের ইবনে ফুহায়রা প্রতিদিন সন্ধ্যায় ছাগল নিয়ে সাওর পর্বতের পাশে চলে আসত। তারপর গভীর রাতে আবদুল্লাহর প্রত্যাবর্তনের সময় তার পেছনে পেছনে ছাগল নিয়ে বাড়ি ফিরত। হযরত আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা প্রতিদিন খাবার প্রস্তুত করে সাওর গুহায় পৌঁছে দিত। এভাবে তিন দিন অতিক্রম হওয়ার পর গাইড আবদুল্লাহ ইবনে উরায়কিত উষ্ট্রী দু'টি নিয়ে সাওর গুহার কাছে চলে আসে। তারপর শুরু হয় হিজরতের যাত্রা।

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘর ঘেরাওকারী যুবক-সম্প্রদায় যখন ব্যর্থ হয়ে কুরাইশ-নেতৃবৃন্দের কাছে ছুটে আসে, তখন জরুরি মিটিং ডাকা হয়। তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে এই মর্মে ঘোষণা করা হয়—যে ব্যক্তি এই দুইজনকে জীবিত কিংবা মৃত ধরে আনতে পারবে, তাকে একশো উট পুরস্কার দেওয়া হবে। পুরস্কারের এই সংবাদটি দূর-দূরান্তের গোত্রগুলো পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হয়। বিশাল এই পুরস্কারের লোভে মুশরিকদের অনেকেই তরবারি এবং বর্শা হাতে বেরিয়ে পড়ে।

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ২ : ১০২।

আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন

পুরস্কারের উত্তেজনায় উন্মাদ একটি দল সাওর পর্বতের দিকে ছুটে যায়। দৌড়ে যায় পর্বতচূড়ার দিকে। তারা যখন সাওর গুহাটি অতিক্রম করে, আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের পায়ের আওয়াজ শুনতে পান এবং তাদের অতিক্রমণের ছায়াও দেখতে পান। অস্থির হয়ে পড়েন হযরত আবু বকর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ভয় ও আশঙ্কার কথা তুলে ধরেন। বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তারা যদি নিজেদের পায়ের দিকে তাকাত, তা হলেও তো আমাদের ওপর নজর পড়ত। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এই অস্থিরতা দেখে বলেছিলেন—

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا.

চিন্তা কোরো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। [তাওবা : ৪০]

সাওর গুহার একটি ঘটনা

সাওর পর্বতটি এমন একটি জায়গায় অবস্থিত ছিল—সাধারণত মানুষ যে দিকে আসা-যাওয়া করত না। এই জন্যে এই গুহাটিতে বিষাক্ত পোকামাকড় এবং সাপ বিচ্ছুর আশঙ্কা ছিল। তাই আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রথমে গুহার ভেতর ঢুকে পরিষ্কার করেন। কাপড় ছিঁড়ে যতগুলো ছিদ্র নজরে পড়ে, সবগুলো বন্ধ করে দেন। অবশেষে কাপড় ফুরিয়ে যায় কিন্তু একটি ছিদ্র উন্মুক্ত থেকে যায়। গুহায় প্রবেশের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করেন—আপনি একটু আরাম করুন। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকরের রানের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন পা ছড়িয়ে পায়ের আঙুল দ্বারা উন্মুক্ত গর্তটির মুখ বন্ধ করে রাখেন। এদিকে গর্তটির ভেতরে একটি সাপ ছিল। বের হতে গিয়ে যখন মুখ বন্ধ পেয়েছে, তখন আবু বকরের আঙুলে দংশন করেছে। সারা শরীরে বিষ ছড়িয়ে পড়েছে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় চোখ থেকে সামান্য অশ্রু হযরত রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখের ওপর গড়িয়ে পড়েছে। ঘুম ভেঙে যায় হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। জানতে চান—কী হয়েছে, আবু বকর? বললেন, বিষাক্ত কোনো সাপে কেটেছে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে দংশিত স্থানে সামান্য লালা লাগিয়ে দেন। আল্লাহ তাআলা সঙ্গে সঙ্গে সুস্থতা দান করেন। বিষের আর কোনো প্রভাবই অবশিষ্ট থাকেনি।[১]

পুরস্কারের নেশায় পাগল হয়ে উঠে মানুষ

আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু তার গাইডকে বলে রেখেছিলেন—তিন দিন পর যুতসই সময়ে উষ্ট্রী দু'টি নিয়ে চলে এসো। কথামতো তৃতীয় দিন আবদুল্লাহ ইবনে উরায়কিত উষ্ট্রী দু'টি নিয়ে সেখানে চলে যায়। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু গুহা থেকে নেমে আসেন। আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় ক্রীতদাস আমের ইবনে ফুহায়রাকেও সঙ্গে নিয়ে নেন। চার সদস্যের এই কাফেলা সমুদ্রের তীরবর্তী পথ ধরে মদীনার দিকে চলতে শুরু করে। গত তিন দিনে মুশরিক-সম্প্রদায় মদীনাগামী সব ক'টি পথ ছেঁকে ফেলেছে। কিন্তু কোথাও কোনো সন্ধান পায়নি। তাদের অধিকাংশ জন খুঁজে খুঁজে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ধরে নিয়েছে, এই কাফেলা নিশ্চয় মদীনা পৌঁছে গেছে। এখন এদের তালাশ করা অর্থহীন। অবশ্য এত বড় পুরস্কারের লোভ এত সহজে হারিয়ে যাওয়ার কথা নয়। কারও কারও মাথায় পাগলামিটা তখনো ছিল। তাই তাদের অনুসন্ধানও ছিল অব্যাহত। এত বড় একটা পুরস্কার কোনোভাবে জিততে পারলে রাতারাতি বিশাল ধনী বনে যাবে—ভাবা যায়!

সুরাকা ইবনে জাশাম

সুরাকা ইবনে জাশাম একমাত্র ব্যক্তি, যে কিনা হিজরতের সফরে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদীনার পথে পেয়েছিল। অবশিষ্ট মুশরিক যারা পুরস্কারের লোভে উন্মাদের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তাদের

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ১৮০।

কেউ হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছায়াও দেখতে পায়নি। সুরাকা মুসলমান হওয়ার পর এই ঘটনা নিজেই বর্ণনা করেছেন। আমরা এখানে তার ভাষাতেই ঘটনাটি তুলে ধরছি—

সুরাকা ইবনে জাশাম বনু মুদলিজ গোত্রের মানুষ। এই গোত্রটি বসবাস করত মক্কা শহর থেকে বেশ দূরে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ধরে আনতে পারলে যে পুরস্কারের ঘোষণা করা হয়েছিল, সেই ঘোষণার বাণী নিয়ে কুরাইশের লোকজন এই গোত্রেও গিয়েছিল। তাদের দুইজনকে যে কেউ হত্যা করতে পারবে কিংবা জীবিত ধরে এনে দিতে পারবে, তাকে একশো উট পুরস্কার দেওয়া হবে। সুরাকা বলেছেন, এই সংবাদটি আমিও শুনতে পাই। এরই মধ্যে একদিন আমি আমার কবিলার লোকদের সঙ্গে বসে আছি। হঠাৎ করে এক ব্যক্তি এসে আমাকেই লক্ষ্য করে বলল, সুরাকা, এইমাত্র আমি সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চল হয়ে এসেছি। সমুদ্রের তীর ঘেঁষে মদীনার দিকে যে রাস্তাটা চলে গেছে—অনেক দূরে আমি ছায়ার মতো লক্ষ করেছি। আমার কাছে মনে হয়েছে কয়েকজন মানুষ যাচ্ছে। আমার বিশ্বাস, মক্কাবাসী যাদেরকে ধরে আনতে পারলে পুরস্কার দেবে বলে ঘোষণা করেছে, এরা তারাই। আমি বললাম—তুমি নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারছ—এরা তারাই? আমার তো মনে হয়, এরা তারা নয়। আমাদের এ পথ দিয়ে হয়তো কিছু লোক ওই দিকে গেছে—তুমি তাদেরকে দেখেছ। এরা অন্য কোনো লোক হবে। আসলে আমি তার সংবাদটির গুরুত্ব কমাতে চাচ্ছিলাম। আমি চাচ্ছিলাম সেখানে উপবিষ্ট কেউ যেন খবরটি কানে না নেয়। তখন আমার মনের ভেতরে যে উত্তেজনা কাজ করছিল, তা হলো—আসলে আমার ভাগ্যটা পরীক্ষা করে দেখা উচিত। তাদের সামনে আমি কিছুটা ভাবান্তরহীনভাবে বসে থাকি। তারা যেন বুঝতে পারে—এই সংবাদটির আমার কাছে কোনো মূল্য নেই। কিছুক্ষণ পর আমি আস্তে করে উঠে ঘরে চলে যাই। ঘরে গিয়ে দাসীকে বলি, আমার ঘোড়াটি বের করে অমুক টিলার আড়ালে নিয়ে যাও। সেখানে গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করো। ঘরের দাসীটি আমার কথামতো ঘোড়াটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। আমিও আমার তির ও বর্শাটি সঙ্গে করে সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে ঘরের

পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ি। টিলাটির আড়ালে গিয়ে ঘোড়ার ওপর সওয়ার হই। তারপর বাতাসের মতো ঘোড়া দৌড়াতে থাকে। ছুটতে ছুটতে আমি হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাফেলার একেবারে কাছে চলে যাই। কিন্তু হঠাৎ করেই আমার ঘোড়াটি ধাক্কা খায়। আমি ঘোড়ার ওপর থেকে পড়ে যাই। ভাগ্য নির্ণয়ের জন্যে সঙ্গে সঙ্গে তূণীর থেকে তির বের করে আনি। লক্ষ করলাম, তিরটি আমার ইচ্ছার বিপরীত বেরিয়েছে। এই অশুভ ইঙ্গিতটিকে আমি পাত্তা দিলাম না। ঘোড়ার ওপর উঠে বসলাম। অনেকটা কাছে চলে গেলাম। লক্ষ করলাম—হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী যেন পড়ছেন। আমার দিকে তার কোনো লক্ষ নেই। কিন্তু আবু বকর আমার দিকে বারবার তাকাচ্ছেন। তারপর হঠাৎ করেই—

ساخت يدا فرسي في الارض حتي بلغت الركبتين.

আমার ঘোড়ার দুটো হাত মাটির ভেতর হাঁটু পর্যন্ত চলে গেল।

আমিও ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলাম। উঠে ঘোড়াকে চাবুক মারলাম। চেঁচালাম। কিন্তু ঘোড়ার পা মাটির ভেতর থেকে বের হচ্ছে না। অনেক কষ্টে যখন ঘোড়াটি তার পা বের করে আনল, তখন দেখলাম ওই গর্তের ভেতর থেকে ধোঁয়ার মতো ধুলো বের হচ্ছে।[১]

অমি তূণীর থেকে আবারও ভাগ্যনির্ণায়ক তির বের করলাম। এবারও লক্ষ করলাম—আমার ইচ্ছার বিপরীত তিরই বেরিয়েছে। আমি তখন আমার ইচ্ছাটাই বদলে ফেললাম। আমি তাদের কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করলাম। তারা দাঁড়ালেন। কাছে গেলাম। এ পর্যন্ত যা ঘটেছে, তার আলোকে আমি বুঝে ফেললাম—আল্লাহ তাদের সাহায্যকারী। তা ছাড়া সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন তারা বিজয় লাভ করবেন।

সুরাকার ভাষ্য হলো—আমি তাদেরকে পুরো কাহিনী শোনালাম। এও জানালাম, আপনার সম্প্রদায় আপনাদেরকে জীবিত কিংবা মৃত ধরে দিতে পারলে একশো উট পুরস্কার ঘোষণা করেছে। আপনার শত্রুদের অনেকেই

---

১ ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, ১ : ৫১৮।

পুরস্কারের নেশায় আপনাদের সন্ধানে বেরিয়েছে। তারপর আমি আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে সামান্য কিছু পথের সম্বল দিতে চাইলে তারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। আমাকে বলেন, তুমি ফিরে যাও। কেউ আমাদের পিছু নিতে চাইলে তাকে ফিরিয়ে রেখো। আমি তাদের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা দিই। সঙ্গে আবেদন করি—আপনি আমাকে একটি নিরাপত্তাপত্র লিখে দিন। আমের ইবনে ফুহায়রা তখন একটি চামড়ার পিঠে নিরাপত্তানামা লিখে আমাকে দেয়। আমি সেখান থেকে ফিরে আসি। আর নবীজির কাফেলা মদীনার উদ্দেশে চলতে থাকে।[১]

কথা রেখেছিল সুরাকা

নিরাপত্তানামা হাতে পাওয়ার পর সুরাকা ওয়াদা করেছিল—আমি আর কাউকে এ পথে আসতে দেব না। সে তার অঙ্গীকার পূর্ণ সততার সঙ্গে পূরণ করেছিল। ফিরে যাওয়ার পথে অনেককেই দেখতে পেয়েছে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্ধানে অস্থির হয়ে ঘুরছে। সুরাকা তাদের সঙ্গে দেখা করে বলেছে—এ পথে আমি অনেক দূর পর্যন্ত গিয়েছি। তারপর ফিরে এসেছি। এ পথে যাওয়া অর্থহীন। এখান থেকেই ফিরে যাও। মোটকথা, এ পথে যার সঙ্গেই দেখা হয়েছে, সুরাকা তাকেই ফেরত পাঠিয়েছে। তারপর পবিত্র এই কাফেলা নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে পথ পার হয়েছে। কথা কী, শত্রু যদি শক্তিমান হয়, রক্ষাকারী প্রভু তার চেয়ে অধিক শক্তিমান।

কুরাইশ ক্ষুব্ধ হলো সুরাকার প্রতি

পরে বিষয়টি নিয়ে সুরাকা একা ভাবতে থাকে। ধীরে ধীরে তার অন্তরে বিশ্বাস জন্মাতে থাকে—নিশ্চয় তিনি আল্লাহর রাসূল হবেন। অন্যথায় এমন বিস্ময়কর ঘটনা কীভাবে ঘটতে পারে? সে যে ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিল, কোনোভাবেই তা ভুলতে পারে না। যতই ভাবে, ততই বদলাতে থাকে তার মনের অবস্থা। কয়েকদিন পর যখন সুরাকা নিশ্চিত হয়—হযরত রাসূল

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ১৮৫; *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ২ : ১০২-১০৩; *উয়ুনুল আসার*, ১ : ৩০১; ইবনে সাদ, *আত তাবাকাতুল কুবরা*, ১ : ২৩২।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় পৌঁছে গেছেন, তখন তার কবিলার লোকদের সঙ্গে বসে বিষয়টি সবিস্তারে আলোচনা করে—কীভাবে তার ঘোড়া হাঁটু অবধি মাটির নিচে চলে গেল, সেই কাহিনী। সুরাকা ছিল তার গোত্রের নেতা। তার গোত্রের লোকেরা তার মুখে এই কথা শুনে পূর্ণ আস্থার সঙ্গে বিশ্বাস করে নেয়। বিশেষ করে ঘোড়ার পা মাটির ভেতর চলে যাওয়ার ঘটনাটি তারা তাজ্জবের সঙ্গে শোনে। তাদেরও মনে হতে থাকে—এটি নিশ্চয় সম্মানিত এক কাফেলা। এই কাফেলার সকলেই আল্লাহ তাআলার সম্মানিত বান্দা। তাদের অন্তরে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান ও শ্রদ্ধা জেঁকে বসে। তারপর থেকে এই কবিলার লোকেরা যেখানেই যায়, সেখানেই সুরাকার ঘটনাটি প্রচণ্ড গুরুত্ব ও বিশ্বাসের সঙ্গে বর্ণনা করে। অন্য কবিলার কেউ যদি তাদের কবিলায় বেড়াতে আসে, তাকেও পুরো ঘটনাটি এরা শুনিয়ে দেয়। ঘটনাটি যে শোনে, সে-ই প্রভাবিত হয়। ধীরে ধীরে সংবাদটি কুরাইশের নেতাদের কানেও পৌঁছয়। এই ঘটনাটি ছড়িয়ে পড়লে বিপদ ঘটতে পারে বলে শঙ্কিত হয়। তারা ভাবতে থাকে, এই ঘটনা যত ছড়াবে, ততই মানুষের মনে ইসলাম সত্য ধর্ম বলে অনুভূত হতে থাকবে। এমনকি অনেকে মুসলমানও হয়ে যেতে পারে। আবু জেহেল বিশেষ করে এই ঘটনা শুনে খুবই ক্ষুব্ধ হয়। সে তার ক্ষুব্ধতার কথা জানিয়ে কয়েকটা কবিতা লিখে সুরাকার কাছে পাঠিয়ে দেয়। তার সে কবিতায় এই পঙ্‌ক্তি দু'টিও ছিল—

بني مدلج اني اخاف سفيهكم — سراقة مستغو ينصر محمد.

عليكم به الا يفرق جمعكم— فيصبح شتي بعد عز وسود.

বনু মুদলাজ, আমি তোমাদের বোকা সুরাকাকে ভয় করছি।
এই বোকা সাহায্য করছে মুহাম্মাদকে।
তোমরা তাকে থামাও, যেন তোমাদের দল ভেঙে না দেয়।
তোমরা তখন হবে বিচ্ছিন্ন—সম্মান ও নেতৃত্বের পর।

আবু জেহেলের এই কবিতা হাতে পাওয়ার পর সুরাকা একটি দীর্ঘকবিতা রচনা করেন। এই কবিতা থেকে অনুমিত হয়—সুরাকার অন্তরে তখন ঈমান আলো ছড়াতে শুরু করেছে। সুরাকার এই দীর্ঘকবিতার

কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এমন—

أبا حكم والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه

عجيب ولم تشكك بأن محم رسول وبرهان فمن ذا يقاومه عليك

فكف القوم عنه فإنني اخال لنا يوما ستبد ومعالمه

بأمر تود النصر فيه فانهم وأن جميع الناس طرا مسالمه

আবুল হিকাম, খোদার শপথ, তুমি যদি থাকতে উপস্থিত
দেখতে আমার ঘোড়ার পা যখন চলে যাচ্ছিল মাটির গর্ভে
সে এক বিস্ময়কর কাণ্ড, তুমি তখন অবিশ্বাস করতে না—
মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তার প্রমাণ। কে আছে তাকে রুখবার?
তুমি যাও পুরো সম্প্রদায়কে তার বিরোধিতা থেকে ফিরিয়ে রাখো।
আমি বিশ্বাস করি, একদা তার সকল গুণাবলি বিকশিত হয়ে উঠবে,
সেদিন তুমিও চাইবে তাকে সাহায্য করতে।
একদা সকল মানুষ বাধ্য হবে তার সঙ্গে সন্ধি করতে।[১]

উম্মে মাবাদের তাঁবুতে

সাওর পর্বতে তিন দিন অবস্থান করার পর এখন পার করতে হবে বারো দিনের পথ। চারদিকে বিপদ আর বিপদ। নিশ্ছিদ্র সতর্কতার সঙ্গে পথ চলতে হচ্ছে। বরাবর চলতে চলতে শরীর জুড়ে নেমে আসে ক্লান্তি। ক্ষুধা তৃষ্ণারও যন্ত্রণা অনুভব হতে থাকে। তার ওপর আছে মরুভূমির প্রচণ্ড উত্তাপ। সকলের ভেতরই সামান্য ছায়া এবং কিছুটা বিশ্রামের আবদার। চারদিকে দৃষ্টি ফেলেও কোনো ছায়া কিংবা ঝরনা নজরে পড়ছে না। হঠাৎ অনেক দূরে একটি তাঁবুর মতো ছায়া দৃষ্টিগোচর হলো। সেখানে পৌঁছার পর দেখা গেল একটি তাঁবু। তাঁবুতে একজন বৃদ্ধা। সেখানে দ্বিতীয় কোনো মানুষ নেই। তার সঙ্গে কথা বলে জানা গেল—তার নাম উম্মে মাবাদ আতেকা। সে খুযায়া গোত্রের লোক। তার স্বামীকে মানুষ আবু মাবাদ বলে ডাকে। তারা উম্মে মাবাদকে বললেন, তোমার কাছে কি গোশত কিংবা দুধ

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ১৮৬।

আছে? আমরা কিনে নেব। কিন্তু তার কাছে গোশতও নেই দুধও নেই। উম্মে মাবাদ বলল, আমার কাছে যদি কিছু থাকত, তা হলে আবশ্যই আতিথেয়তার কর্তব্য পালন করতাম। কিন্তু কী করব? চারদিকে দুর্ভিক্ষ চলছে। এটা খুবই অভাবের কাল। আমরা খুবই পেরেশানির মধ্যে আছি। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লক্ষ করলেন—তাঁবুর কোণে একেবারে দুর্বল একটি ছাগল বাঁধা আছে। উম্মে মাবাদকে বললেন, তোমার ঘরে তো একটি ছাগল আছে। উম্মে মাবাদ বলল, ছাগলটি এতটাই দুর্বল ও কমজোর হয়ে পড়েছে—ছাগলের পালের সঙ্গে সে চলতে পারে না। তাই এখানে পড়ে আছে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর মধ্যে দুধ আছে? উম্মে মাবাদ বলল, সে এরচেয়েও দুর্বল। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি অনুমতি দিলে এর থেকে দুধ নেওয়া যায়। উম্মে মাবাদ বলল, যদি এর মধ্যে দুধ থাকে, তা হলে অবশ্যই নিতে পারেন। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাগলটি চেয়ে নিলেন। তার শরীরে হাত বুলিয়ে দিলেন। তার স্তন স্পর্শ করলেন। দুআ পড়লেন। তারপর বললেন, একটি পাত্র দাও। পাত্র দেওয়ার পর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধ দোহন করতে শুরু করলেন। পাত্র পূর্ণ হওয়ার পর উম্মে মাবাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন পান করার জন্যে। তারপর তিনি সফরসঙ্গীদের পান করালেন। সকলে পরিতৃপ্ত হওয়ার পর সব শেষে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পান করলেন এবং বললেন—

ساقي القوم اخرهم.

সাকীর পানের পালা সর্বশেষে।

যখন পাত্র খালি হলো হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার দোহন করলেন, বললেন—এইটুকু পরিবারে লোকদের জন্যে রেখে দাও। তারপর তারা আবার পথে নামলেন।

আবু মাবাদের বিস্ময়

উম্মে মাবাদের স্বামী আবু মাবাদ ঘরে ফিরে দুধভর্তি পাত্র দেখে তো অবাক! কারণ, তাঁবুতে বিশুষ্ক দুর্বল ওই ছাগলটা ছাড়া আর কোনো ছাগল

নেই। তা হলে দুধ এল কোত্থেকে। উম্মে মাবাদকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে সে সবিস্তারে পুরো কাহিনী শোনাল। ধীরে ধীরে পুরো কাফেলার বিবরণ দিলো। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূপ-সৌন্দর্য এবং গুণাবলির কথাও বলল। আবু মাবাদ প্রচণ্ড আক্ষেপ ও বেদনার সঙ্গে বলল, আহা এমন পবিত্র কাফেলার দর্শন থেকে আমি বঞ্চিত হলাম!

পরবর্তী ঘটনাবলি থেকে জানা যায়—তার অন্তরে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা আসন পেতে বসেছিল। তারপর একদা সেই দিনও এসেছে—আবু মাবাদ মদীনায় এসে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন লাভে ধন্য হয়েছেন। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দস্তে মোবারকে হাত রেখে ঈমানের শপথ গ্রহণ করেছেন।[১]

অভ্যর্থনার ধুম

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছেন—এই সংবাদ মদীনার মুসলমানগণ আগেই পেয়েছেন। তারা জানতে পেরেছেন—আজ-কালের মধ্যে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করবেন। চরম অস্থিরতায় তারা অপেক্ষা করতে থাকে। মদীনার মুসলমানগণ প্রতিদিন সকালবেলা শহরের বাইরে এসে মক্কার পথে বসে থাকে। সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানে বসে বসে অপেক্ষা করে। যখন রাতের অন্ধকার নেমে আসে, তখন সকলে ঘরে ফিরে যায়। এটা তাদের রোজকার রুটিন হয়ে দাঁড়ায়। পরের দিন ভোরবেলা আবার পৌঁছে যায় সেই জায়গায়। মক্কার পথে দৃষ্টি বিছিয়ে বসে থাকে। এভাবে কয়েকদিন কেটে যায়। প্রতিদিনই তার আগমনের অপেক্ষায় পথে গিয়ে বসে থাকে। আবার সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে আসে। একদিন অপেক্ষা করে করে মুসলমানগণ ঘরে ফিরে এসেছে। প্রত্যেকে নিজ নিজ ঘরে পৌঁছে গেছে। হঠাৎ করে এক ইহুদি বাড়ির ওপর তলায় দাঁড়িয়ে কী যেন দেখছিল। মক্কার পথে চোখ পড়তেই লক্ষ করল—কয়েকজন ব্যক্তি এদিকে

---

১ ইবনে সায়্যিদুন নাস, *উয়ুনুল আসার*, ১ : ৩০৪-৩০৬; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ১৯২।

আসছেন। সেও জানত—আজ-কালের মধ্যে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করবেন। মুসলমানগণ গভীর আগ্রহে তাঁর অপেক্ষা করছেন। প্রতিদিনই তারা মক্কার পথে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষায় পথের ধারে বসে থাকছে। এই আগন্তুকদের দেখে তার মনে হলো—এটাই হয়তো মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাফেলা। মনের অজান্তেই সে চিৎকার করে উঠে—কোথায় মুসলমানগণ? তোমরা যাঁর অপেক্ষায় ছিলে—দ্যাখো দ্যাখো—তিনি চলে এসেছেন। তার এই সংবাদ বনের আগুনের মতো মদীনার সকল মুসলমানের ঘরে পৌঁছে যায়। তারা সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দো-জাহানের বাদশাহকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে ছুটতে থাকে। সকলে জনবসতির বাইরে এসে দেখে—এই তো হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসছেন। আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু সফরসঙ্গী। তার উটের ওপর ক্রীতদাস আমের ইবনে ফুহায়রাও আছে। সবার সামনে পথের গাইড আবদুল্লাহ ইবনে উরায়কিত। এই দৃশ্য দেখে আনন্দে মুসলমানদের পাগল হওয়ার অবস্থা। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোবায় এসে বনু আমর ইবনে আউফ গোত্রে অবতরণ করেন।[১]

মুসলমানদের ভিড়

কোবায় পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের ঘরে ঘরে নবীজির আগমনবার্তা ছড়িয়ে পড়ে। সকলেই জানতে পারে—হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোবায় অবস্থান করছেন। ছুটে আসতে থাকে প্রত্যেক মুসলমান। সেই আনন্দের জোয়ারে তাদের সঙ্গে ভাসতে থাকে তাদের শিশুরাও। মদীনার অনেকেই এ পর্যন্ত হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেনি। তাদের অনেকে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মনে করছিল—এটাই মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যখন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সূর্যের তাপ পড়তে দেখেন, আবু বকর উঠে গিয়ে

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ১৯৬।

নবীজিকে ছায়া দেন। এবার সকলেই বুঝতে পারে—এটা আবু বকর সিদ্দীক। হিজরতের পর প্রথমে কয়েকদিন নবীজি কোবাতেই কাটান।[১]

মুসলমানদের হিজরী বর্ষ-গণনা এইদিন থেকেই শুরু হয়। যদিও হিজরতের সফর হয়েছিল রবিউল আউয়াল মাসে। তারপরও আরবদের প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক মহররম মাসকেই বছরের প্রথম মাস ধরা হয়।

মক্কায় নবুওয়তের তেরো বছর

কোন প্রেক্ষিতে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করেছিলেন, বিস্তারিত এই আলোচনা থেকে আমরা আশা করি কিছুটা বুঝতে পেরেছি। অবশ্য এই সফরের বিস্তারিত কাহিনী যদি আমরা ইতিহাসের বই-পত্রে পাঠ করি, তা হলে বুঝতে পারব—মাটির উপরে নয়, হিজরতের সফর হয়েছিল জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর। কুরাইশ আরবের সব ক'টি গোত্রে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে শত্রুতার এক ভয়াবহ আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। বিভিন্ন গোত্রের দলপতিদের সঙ্গে আলোচনা পর্যালোচনা করে তাদের কাছে অনুরোধ করা হয়েছিল—তারা যেন তাদের নির্ভীক বীর যুবকদের মক্কায় পাঠিয়ে দেয়। উদ্দেশ্য, এই যুবকরা মানব-ইতিহাসের সবচেয়ে মহান ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে ঘোষণা করে হত্যা করবে। বিভিন্ন গোত্র তাদের যুবকদের নির্বাচন করে এই হত্যার মিশনে অংশগ্রহণ করবার জন্যে মক্কায় পাঠিয়েও দিয়েছিল। যে রাতে শানিত তরবারি হাতে নির্ভীক হত্যার নেশায় উন্মাদ যুবকের দল হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরকে ঘেরাও করে রেখেছিল—একবার সেই দৃশ্য কল্পনার চোখে দেখুন। প্রতিটি যুবক কোষমুক্ত তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ ঘরের দিকে। চোখে পড়ামাত্র পবিত্র এই সত্তার ওপর—কয়েক ডজন তরবারি একসঙ্গে উপরে উঠে যাবে, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়বে একসঙ্গে। তাঁর পবিত্র শরীরকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বচক্ষে চেয়ে চেয়ে দেখছেন রক্তের নেশায় উন্মাদ এই ভয়াবহ দৃশ্য। তিপ্পান্ন বছর বয়স্ক একজন কোমলপ্রাণ মানুষ রক্তলোলুপ নেকড়ের ভিড়ে

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ১৯৬।

বেষ্টিত। তাঁকে ঘিরে রেখেছে রক্তের নেশায় উন্মাদ একদল উন্মত্ত যুবক। তাঁর আশেপাশে এমন কেউ নেই, যে তাঁকে এই ভিড় ভেঙে বের করে আনবে। এই কঠিন পরিস্থিতিতে খুনিদের প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে আসা, তারপর তাঁরই সমবয়স্ক আরেকজন ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে রাতের অন্ধকারে মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়া এবং এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে পথ চলা—যেখানে পদধ্বনি সামান্য উঁচু হলেই জীবনের আশঙ্কা রয়েছে—ভাবা যায়! তারপর সাওর পর্বতের গুহায় সীমাহীন ভয় শঙ্কার ভেতর দিন-রাত অবস্থান। প্রাণের শত্রুদের সেই গুহার কাছে পৌঁছে যাওয়া, সেখানে বসে তাদের পদধ্বনি শুনতে পাওয়া—এ তো মৃত্যুর সাক্ষাতেরই নামান্তর। এমন ভয়াবহতার কল্পনা করাও কি কারও পক্ষে সম্ভব?

মক্কার সীমানা থেকে বেরিয়ে পড়ার পর শত্রুপক্ষের এই ঘোষণা—জীবিত বা মৃত, যে-ই তাদেরকে ধরে আনতে পারবে, তাকে দেওয়া হবে একশো উটের পুরস্কার। এই ঘোষণা মক্কা থেকে মদীনা পর্যন্ত তিনশো মাইলের পথে যেন জ্বলন্ত অঙ্গার বিছিয়ে দিয়েছিল। শুধু এই পথে অবস্থিত গোত্রগুলোকেই নয়—যেন এই পথের প্রতিটি বালুকণাকে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রক্তপিপাসু করে তুলেছিল। লোভী প্রতিটি মানুষকে করে তুলেছিল রক্তপিপাসু নেকড়ে। বালুকাময় প্রান্তরের এই সফরে মাইলের পর মাইল পর্যন্ত কোথাও কোনো বৃক্ষ নেই, বাড়ি-ঘর নেই। লুকোবার কোনো আড়ালও নেই। মাইলের পর মাইল থেকে তাদেরকে দেখা যাওয়া সম্ভব—এমন সমান সমতল উন্মুক্ত পথে রক্তলোলুপ এই শত্রুদের বেষ্টনী ভেদ করে সফর করা—কতটা আশঙ্কাজনক হতে পারে, আমরা কি কল্পনা করতে পারি? এ কারণেই হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু চরম অস্থিরতায় কখনো সামনে চলে যাচ্ছেন, আবার কখনো পড়ে থাকছেন বেশ পেছনে। নবীজি জানতে চাচ্ছেন—আবু বকর কী ব্যাপার? এতটা অস্থির কেন? আবু বকর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি সামনে চলে যাই—অনেক দূর পর্যন্ত কোনো শত্রু দেখা যায় কিনা! আবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়, পেছনে কোনো ঘাতক নাঙা তরবারি নিয়ে আপনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে না তো?—সঙ্গে সঙ্গে পেছনে ছুটে যাই। এই ভয়ে আমি কখনো সামনে যাচ্ছি, কখনো পেছনে আসছি।

অবশেষে একদিন দীর্ঘ বর্শা হাতে সাক্ষাৎ হয়ে যায় সুরাকা ইবনে জাশামের সঙ্গে। তাকে দেখে ঘাবড়ে যান আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু। নবীজিকে দেখিয়ে দেন—মৃত্যু সামনের দিক থেকে আসছে। কিন্তু ধৈর্য ও দৃঢ়তার পাহাড় হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখের সামনে মৃত্যুকে নৃত্যময় দেখেও পূর্ণ অচঞ্চল। স্থির চিত্তে হযরত আবু বকরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন—চিন্তা কোরো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। এ ছিল মক্কার দীর্ঘ তেরো বছর নববী জিন্দেগির বিদগ্ধ অতীতের উচ্চ অর্জন। এই তেরো বছরের ফেলে আসা প্রতিটি রাত, প্রতিটি দিন, সাদা-কালো প্রতিটি প্রাঙ্গণে যাপিত ব্যথা-বেদনা, সীমাহীন অস্থিরতা, শঙ্কাভরা দুঃসংবাদ—কতভাবে লেপ্টে আছে। অতীতের ভাঁজে ভাঁজে বিছানো সেইসব যন্ত্রণা যদি খুলে দেওয়া হয় এবং প্রত্যক্ষ করা হয়, তা হলে হয়তো মানুষের ধৈর্যের বুক ফেটে যাবে। সাহস ভেঙে যাবে। অথচ হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্বলন্ত এই তাওয়ার ওপরই কাটিয়ে এসেছেন সুদীর্ঘ তেরো বছর। তেরোটি বছর এমনভাবে কাটিয়েছেন—ঘরেও শান্তিতে বসতে পারেননি। আপন মাতৃভূমিতে কোনো আশ্রয়ও পাননি। পথের প্রতিটি বাঁকে তির ধনুক হাতে সজ্জিত শত্রু। পথে পথে হাসি-ঠাট্টায় অন্তরকে রক্তাক্ত করার নেশায় উদগ্রীব দুশমন-দল। মন ও আত্মাকে আঘাতে আঘাতে বিচূর্ণ করার শপথে অবাধ্য মানুষরূপী শয়তান। কোথাও ভদ্রতা কিংবা মানবতার লেশমাত্র নেই। আল্লাহ তাআলার নির্বাচিত বান্দা, মানবতার জন্যে রহমত হিসেবে প্রেরিত পুরুষ নির্দয় খুনি পাষাণহৃদয় শত্রুদের বলয়ে আবদ্ধ। শত্রুপক্ষ উন্মুক্ত তরবারি হাতে সদা সুযোগের অপেক্ষায় অতন্দ্র। সুযোগ পাওয়ামাত্র তারা তাঁকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চায়। তাঁকে হত্যা করবার জন্যে ঘরে ঘরে তরবারিতে শান দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি কবিলায় বর্শার মুখ বিষে চুবানো হচ্ছে। এই সবকিছু করা হচ্ছে এমন একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে—যাঁর চেয়ে অধিক হিতাকাঙ্ক্ষী মানুষ আর কেউ নেই।

মক্কায় মুসলমানদের সংখ্যাই বা কী ছিল! আর যারা ইসলাম কবুল করেছিল, তাদের প্রত্যেকেই ছিল ভয়াবহ এমন এক পরিস্থিতির শিকার—নিজেদের জীবনই আশঙ্কার মুখে। একটি বড় সংখ্যা মক্কা ছেড়ে

আবিসিনিয়ায় আশ্রয় নিয়েছে। মক্কার সম্ভ্রান্তজন হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে যাযাবরের জীবনযাপন করতে হচ্ছে। যে কয়জন দুঃসাহসী বীর মুসলমান হয়েছিলেন, তাদের নিজেদের জীবনই এই ভয়ানক বিপদের কয়েদখানায় আবদ্ধ। তারা যদি নিজেদের শক্তি দেখাতে যান, তা হলে লোহার আঘাতে রক্তাক্ত হওয়া ছাড়া কোনো পথ নেই। তারা এতটাই অসহায় হয়ে পড়েছিলেন—অন্য মুসলমানদের কী সাহায্য করবেন, নিজেদেরকে রক্ষা করাই হয়ে পড়েছিল কঠিন। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান সত্তা এক সংকীর্ণ বৃত্তে এসে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। কেবল হযরত আবু বকর সিদ্দীকের ঘর ছিল কাছে। তার সঙ্গেই সামান্য শলাপরামর্শ হতে পারত।

রাত-দিনের প্রতিটি মুহূর্ত কতটা আতঙ্ক ও আশঙ্কার মধ্যে কাটত, তা এখন যথাযথভাবে কল্পনা করাও অসম্ভব। অসহায়ত্ব ও দুর্বলতা ছিল সীমার অতীত। মুসলমান হওয়াটা এত বড় অপরাধ ছিল—যে কোনো ইতর লম্পটও তার জান মাল আব্রু ইজ্জতে আঘাত করতে পারত। রশিতে বেঁধে তাকে হেঁচড়াতে পারত। সুঁইয়ের আঘাতে তার শরীরে রক্ত বহাতে পারত। তার গলায় রশি বেঁধে শ্বাস চেপে ধরতে পারত। ময়লা-আবর্জনা তার শরীরে ঢেলে দিয়ে অট্টহাসিতে চারপাশ প্রকম্পিত করতে পারত। চারদিকে ঘটিত এমন হৃদয়বিদারক ঘটনা ও নির্মম পরিস্থিতি হজম করবার শক্তি কার অন্তরে আছে! এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ নয়, এক মাস দুই মাস নয়—দীর্ঘ তেরো বছর নবীজি অবিরাম এইসব আঘাত সয়েছেন। এইসব বিপদাপদ মাথায় নিয়ে জীবন পার করেছেন মুসলমানগণ। কারও মোকাবেলা করেননি। কারও ওপর আক্রমণ করেননি। গালির জবাবে গালি দেননি। সত্যি কথা হলো, সেই অবস্থাও তাদের ছিল না। আঘাত খেয়েছেন, হজম করেছেন। অবশেষে ভয়াবহ এই অগ্নিপরিস্থিতি হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাতৃভূমি ছাড়তে বাধ্য করেছে। আর ইয়াসরিব লাভ করেছে 'মদীনাতুর রাসূল' হওয়ার সৌভাগ্য।

অবতীর্ণ হতো কুরআন

মক্কার এই তেরো বছর সময়ে কুরআন অবতরণের ধারা ছিল অব্যাহত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বরাবর ওহী আসত।

ইসলামের দাওয়াতের পথে সবচেয়ে প্রভাবশালী শক্তি ছিল এই ওহী। কঠিন থেকে কঠিনতর শত্রুর সামনেও যখন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনে কারীম তেলাওয়াত করেছেন, তার মন-মস্তিষ্কে পরিবর্তনের বিপ্লব বয়ে গেছে। ইসলাম কবুল না করলেও তাকে থমকে দাঁড়াতে হয়েছে। মাথা নত করে কেটে পড়তে বাধ্য হয়েছে। তারপর মুশরিকদের পক্ষ থেকে বিধর্মী হওয়ার অপবাদও শুনতে হয়েছে।

কুরআন শরীফে মোট একশো চৌদ্দটি সূরা আছে। তন্মধ্যে ছিয়াশিটি সূরা মক্কার এই তেরো বছরের নববী জিন্দেগিতে অবতীর্ণ হয়েছে। অবশিষ্টগুলো অবতীর্ণ হয়েছে মদীনা মুনাওওয়ারায়।

ইয়াসরিব হলো মাদীনাতুর রাসূল

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুপুরবেলা কোবায় পৌঁছান। বনু আমর ইবনে আউফ গোত্রে গিয়ে ওঠেন। অধিকাংশ মুহাজির সাহাবী তখন সেখানেই অবস্থান করছিলেন। হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বয়স তখন নয় কী দশ বছর। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনায় আগমনের দৃশ্যকে চিত্রায়ণ করতে গিয়ে বলেছেন—শিশু-কিশোররা দলে দলে ছুটে যাচ্ছিল। তাদের সকলের কণ্ঠে একই আওয়াজ—রাসূলুল্লাহ চলে এসেছেন। এ কথা শোনামাত্র আমি দ্রুত বেগে ছুটতে লাগলাম। ছুটতে ছুটতে আমরা শিশু-কিশোর-দল মদীনার বাইরে প্রাচীন শহরের ভগ্নাবশেষের এমন জায়গায় এসে পৌঁছুলাম, যেখানে মুসলমানগণ অপেক্ষা করছিল। এক ব্যক্তি একজন যাযাবরকে এ কথা বলে শহরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—আনসারদেরকে গিয়ে বলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব কাছে চলে এসেছেন। যাযাবর এই আওয়াজ চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। তারপর সবদিক থেকে লোকজন বন্যার ঢলের মতো ছুটে আসতে থাকে। আনসারদের কাঁধে তরবারি। চলাফেরায় ভীষণ আবেগ ও উত্তেজনা। আর চেহারায় আনন্দের ঝিলিক। প্রায় পাঁচশো আনসার সাহাবী অভ্যর্থনার জন্যে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নবীজি আগমন করামাত্র তারা সকলেই আবেদন করলেন—এই গোলামদের হেফাজতে নির্ভয়ে শহরে প্রবেশ করুন!

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় প্রবেশ করেন, তখন সেখানকার নারী এবং সম্ভ্রান্ত নন্দিনীগণ নিজ নিজ ঘরের ছাদে উঠে এই শাহি নক্ষত্রদল প্রত্যক্ষ করতে থাকে। ফিসফিসিয়ে একে অপরকে প্রশ্ন করতে থাকে—অ্যাই, আল্লাহর রাসূল কোনটা? কারণ, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু নবীজির সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলেন। তাই তারা ঠিক করতে পারছিল না—কোনটা আল্লাহর রাসূল। হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি জীবনে সেদিনকার মতো এতটা আনন্দঘন প্রাণোচ্ছল ও আলোকোদ্ভাসিত দৃশ্য আর কখনো দেখিনি। হাফেযী শরীফের বর্ণনায় আছে—যখন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করেন, তখন শিশু-কিশোর-দল এই অভ্যর্থনাসঙ্গীত গায়—

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا ما دعا لله داع

আমাদের মাঝে উদিত হয়েছে আজ পূর্ণিমা—
সানিয়্যাতুল বিদায়!
আমাদের কর্তব্য—কৃতজ্ঞতা তাঁর, যত দিন
ধ্বনিত হবে দীনের আমন্ত্রণ।[১]

আলী ইবনে আবু তালেব মদীনায়

যখন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা ত্যাগ করেন, হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন শত্রুদের খোলা তরবারির ছায়ায় নবীজির সবুজ চাদর জড়িয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলে রেখেছিলেন—তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। ফলে তিনি সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিলেন। সকালবেলা উঠে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সংরক্ষিত মুশরিকদের আমানতগুলো যার যার হাতে পৌঁছে দিয়ে আর একমিনিটও মক্কায়

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ১৯৭।

থাকেননি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মদীনার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। নবীজি মদীনায় পৌছার তৃতীয় কি চতুর্থ দিন হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু মদীনায় এসে উপনীত হন—তখনো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোবায় অবস্থান করছিলেন।[১]

মূর্তিবিনাশী এক আনসারী

মক্কায় রাজত্ব ছিল মূর্তিপূজারিদের। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন মদীনায় এসে পৌছান, তখন সেখানে ইসলামের বিজয় সবখানে আলো ছড়াতে শুরু করেছে। তিনি এখানে এসে এক নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন। এখানকার আনসারীগণ শুধু মুসলমানই নন, তারা মূর্তিবিনাশীও। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু কোবায় এসে মাকসুম ইবনুল হাদামের ঘরে উঠেছিলেন। দ্বিতীয় কী তৃতীয় দিনের ঘটনা—হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ভাষায়—আমি যে ঘরটায় থাকতাম, তার ঠিক সামনের ঘরটায় থাকত একজন নারী। সেটা তার নিজের ঘর। তার স্বামী ছিল না। একাকী থাকত। তার ঘরের দরজা ছিল আমার থাকার ঘরটার ঠিক বরাবর। আমি কয়েকদিন লক্ষ করেছি—মধ্যরাতের কাছাকাছি এক ব্যক্তি এসে তার ঘরের কড়া নাড়ায়। খুব হালকাভাবে কড়া নাড়াবার শব্দ শোনামাত্র এই নারী ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। আগত লোকটি তার হাতে কী যেন তুলে দেয়। তারপর সে ভেতরে চলে যায়। বিষয়টি দেখে আমি মনে মনে তাজ্জব হই। একদিন ওই মহিলাকে বললাম, আল্লাহর বান্দি, মধ্যরাতে এক ব্যক্তি এসে নিয়মিত তোমার ঘরের কড়া নাড়ায়। তুমি ঘর থেকে বের হলে লোকটা কী যেন তোমার হাতে তুলে দেয়—এই লোকটা কে? আর সে তোমার কাছে কীইবা দিতে আসে? তুমি একজন মুসলমান মেয়ে। তোমার স্বামীও নেই। আমার এই প্রশ্ন শুনে সে হেসে বলল—লোকটি সুহাইল ইবনে হুনাইফ। তার জানা আছে—আমি আমার ঘরে একা থাকি। এটাও সে জানে—আমার ঘরে কারও যাতায়াত নেই। আজকাল তার কাজ হলো, সন্ধ্যা নামার পর সে মূর্তিশালায় চলে যায়। রাত যখন নীরব হয়, তখন মূর্তিশালার মূর্তিগুলো ভেঙে লুকিয়ে লুকিয়ে আমার

---

১ ইবনে সায়্যিদুন নাস, *উয়ুনুল আসার*, ১ : ৩১১।

হাতে পৌঁছে দেয়। বলে যায়, আমি যেন কোথাও ওগুলো মাটির নিচে লুকিয়ে রাখি। এভাবে সে আনসারদের অনেক মূর্তিশালা এরই মধ্যে বিরান করে ফেলেছে। আমি মূর্তিগুলো মাটির নিচে পুঁতে রেখে তার কাজে শরিক হই। আশা করি, এর বিনিময়ে আমিও হয়তো কিছু নেকি লাভ করব। ঈমানদীপ্ত এই কাহিনী শুনে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তো বিস্ময়ে অবাক।[১]

কোথায় মক্কার অবস্থা আর কোথায় মদীনার অবস্থা। মক্কায় তো লাত-উয্যার পূজারিগোষ্ঠী মুসলমানদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। সেখানকার কোনো বীর মুসলমানও তাদের কোথাও কোনো ধাক্কা দিতে পারেনি। আর এখানে একজন দুর্বল নারীও কী মর্যাদাপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে! হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু আজীবন এই স্মৃতি ভুলতে পারেননি। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন খলীফাতুল মুসলিমীন। কুফায় বসবাস করেন। সংবাদ পেলেন এই মূর্তিবিনাশী সাহাবী সুহাইল ইবনে হুনাইফ ইন্তেকাল করেছেন। তখন তিনি সকলের সামনে খুবই মজা নিয়ে এই ঘটনা বর্ণনা করেন।[২]

শহরে প্রবেশ

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় দুই সপ্তাহ কোবায় অবস্থান করেন। তাঁর এই অবস্থান ছিল সাময়িক। তিনি শহরে অবস্থান করবেন, এটাই কথা ছিল। একদিন তিনি তাঁর উষ্ট্রীর ওপর উঠে বসেন। আনসার ও মুহাজির সাহাবীগণ সারিবদ্ধভাবে হেঁটে চলেছেন তাঁর দুইপাশে। দিনটা ছিল শুক্রবার। পথেই নামাযের সময় হয়ে যায়। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালেম ইবনে আউফ গোত্রে পৌঁছে অবতরণ করেন। সেখানেই জুমার নামায আদায় করেন। মদীনায় আদায়কৃত এটাই ইসলামের প্রথম জুমা।[৩]

---

১ ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, ১ : ৫১৯; *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ১ : ১১১; ইবনে সায়্যিদুন নাস, *উয়ুনুল আসার*, ১ : ৩১১।

২ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ১৯৭।

৩ ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, ১ : ৫২০।

নামায শেষ করার পর যখন নবীজি উটের পিঠে আরোহণ করতে যাবেন, তখন বনু সালেম গোত্রের নেতা ইতবান ইবনে মালেক এবং আব্বাস ইবনে উবাদাসহ অনেকে এসে সামনে দাঁড়ায়। তারা সবিনয়ে আবেদন করেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি এখানেই অবস্থান করুন। আমরা সংখ্যায়ও বিপুল। সব দিক থেকে আমরা আপনাকে হেফাজত করতে পারব। শত্রুর আক্রমণ থেকেও রক্ষা করার ক্ষমতা আমাদের আছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, আমার এই উষ্ট্রী আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আদেশপ্রাপ্ত। যেখানে আল্লাহ তাআলার আদেশ হবে, সে সেখানেই থেমে যাবে। সুতরাং তোমরা এর পথ ছেড়ে দাও। বনু সালেম পেছনে রেখে যখন বনু বায়াজায় পৌছান, তখন সে সম্প্রদায়ের বিপুল লোকজনসহ যিয়াদ ইবনে লাবীদ এবং ফারওয়া ইবনে আমর নবীজির সামনে এসে দাঁড়ায়। তারাও নবীজিকে তাদের কবিলায় বসবাস করার জন্যে আবেদন করে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকেও একই উত্তর দেন। তারপর যখন বনু সায়েদাহ গোত্রের পাশে এসে পৌছান, ছুটে আসে সাদ ইবনে উবাদা এবং মুনযির ইবনে আমরসহ সে গোত্রের অনেকে। তারাও নবীজিকে তাদের জনবসতিতে অবস্থানের আবদার জানায়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকেও একই জবাব দিয়ে সামনে চলতে থাকেন। কাফেলা যখন বনুল হারেস ইবনে খাযরাজ অঞ্চলে এসে পৌছায়, তখন সাদ ইবনে রবী, খারেজা ইবনে যায়েদ এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা সামনে এসে নবীজিকে তাদের জনবসতিতে নিবাস পাতার অনুরোধ জানান। নবীজি তাদেরকেও একই উত্তর দিয়ে যাত্রা অব্যাহত রাখেন। আদী ইবনু নাজ্জারের অঞ্চল ছিল হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুরোনো আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি। এখানে পৌছার পর তারাও তাঁকে তাদের সঙ্গে বসবাসের আবেদন জানায়। নবীজি তাদের আবেদনও প্রত্যাখ্যান করেন। মালেক ইবনে নাজ্জার গোত্রের কাছেই ছিল একটি পতিত বিরান বাগান। একসময় সেখানে জন্তু-জানোয়ার রাখা হতো। সেখানে আসার পর নবীজির উষ্ট্রী বসে পড়ে। কিন্তু নবীজি তার পিঠেই বসে থাকেন। সামান্য পর উষ্ট্রী আবার উঠে দাঁড়ায়। সামান্য দূর যাওয়ার পর হযরত আবু আইয়ুব

আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর দরজার সামনে এসে বসে পড়ে। বসে মাটিতে মাথা বিছিয়ে দেয়। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উষ্ট্রীর পিঠ থেকে নেমে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে আবু আইয়ুব আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু ছুটে গিয়ে হাওদা নামিয়ে আনেন এবং তা ঘরে নিয়ে রেখে দেন।

یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا.

এই ধন লভেছে যে জন, অসীম ভাগ্যবান।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানেই অবস্থান করেন। আর ইনিই হচ্ছেন সেই আবু আইয়ুব আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু, আমাদের ইতিহাসে যিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেজবানের মতো পরম সম্মানিত উপাধিতে বরিত।[১]

মসজিদে নববীর স্থান

একবার আবু আইয়ুব আনসারীকে, নবীজির উট বসে পড়েছিল যে জায়গাটিতে, সে জায়গাটি সম্পর্কে জানতে চাইলেন। মজলিসে তখন মুআয ইবনে আফরা-ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এটা একটা পুরোনো বাগান। এর বর্তমান মালিক সুহাইল ইবনে আমর ও সাহাল ইবনে আমর নামক দুই এতিম শিশু। এদের তত্ত্বাবধায়ক আমি। মূলত হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের জন্যে এই জায়গাটি নির্বাচন করবেন বলে তার তথ্য নিতে চেয়েছিলেন। জানতে পারলেন—এটা একটা পতিত পশুশালা। এর মধ্যে মুশরিকদের কিছু কবর আছে। কিছু পুরোনো খেজুর গাছ আছে। আর জমিনটা বেশ অসমতল।[২] তবে জায়গাটির অবস্থান মসজিদের জন্যে খুবই উপযোগী। ফলে জায়গাটি নবীজির খুবই পছন্দ হয়েছে। জায়গাটির প্রকৃতি জানার পর সেটা তিনি

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ১৯৮; *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ২ : ১১২-১১১৩; ইবনে সায়্যিদুন নাস, *উয়ুনুল আসার*, ১ : ৩১৩-৩১৪; ইবনে সাদ, *আত তাবাকাতুল কুবরা*, ১ : ২৩৬-২৩৭।

২ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ২০২।

মনের মধ্যেই রেখে দেন। বিস্তারিত আলোচনা করেন দু'-একদিন পর। তিনি হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘরে প্রায় সাত মাস থেকেছেন। মসজিদ নির্মিত হওয়ার পর তার পূর্ব পাশে উম্মুল মুমিনীনের জন্যে ঘর নির্মিত হওয়ার পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে এসে ওঠেন।

মেজবানের অনুভূতি

আবু আইয়ুব আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আতিথেয়তার সৌভাগ্য অর্জন করেন, তখন তার বাড়ির নিচ তলায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থান করেন। ওপর তলায় হযরত আবু আইয়ুব আনসারী এবং তার স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে বসবাস করতে থাকেন। একদিন আবু আইয়ুব আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু গভীর আবেগ ও বিনয়ের সঙ্গে নবীজির কাছে এসে আবেদন করেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি ওপর তলায় থাকুন। আমি আমার সন্তানদেরকে নিয়ে নিচ তলায় থাকব। আমার মন এটা কোনোভাবেই মানতে পারছে না—আমি থাকব ওপরে আর আপনি থাকবেন নিচে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আবেগ ও আন্তরিকতাকে উড়িয়ে দিলেন না, বরং তাকে বুঝিয়ে বললেন, দ্যাখো, মদীনা এবং মদীনার বাইরে থেকে লোকজন বরাবর আমার কাছে আসতে থাকবে, আমি যদি নিচ তলায় অবস্থান করি, তা হলে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের জন্যে সহজ হবে। তুমি তোমার বাচ্চাদেরকে নিয়ে ওপরে থাকো—এটাই আমার পছন্দ। আবু আইয়ুব আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু পীড়াপীড়ি তো করতে পারেন না, তবে বিনয়ের সঙ্গে আবেদন করতে পারেন। তিনি মনের আবেগে সেটা করেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিচে অবস্থান করার সুবিধার কথা বললেন, তখন আর তিনি কথা বাড়ালেন না। আদবের দাবিও ছিল এটা। তারপরও তার মনের ভেতর সদাই একটা অস্থিরতা ওড়াউড়ি করত—আতিথেয়তার হক, নবীজির সম্মান ও তাঁর মর্যাদা যেন ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এটা কী করে হয়—আমি থাকব ওপর তলায় আর নবীজি থাকবে নিচ তলায়![১]

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ২ : ১১৬; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ২০১।

ভাবনায় আতিথেয়তার হক

নবীজির আদেশে তিনি ওপর তলাতেই থেকে যান। ঘরের প্রয়োজনীয় জিনিসপাতি ওপরেই থাকত। পানির মটকা, রান্না-বান্নার সামানপত্র সবকিছু। একদিন হলো কী, পানির কলস ভেঙে গেল। মেঝেতে ছড়িয়ে গড়ল পানি। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী শঙ্কিত হলেন—পানি নিচ তলায় আবার গড়িয়ে পড়ে কিনা! তা হলে তো আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কষ্ট হবে। তিনি ভীত হন। কিন্তু পানি ফেরাবার কোনো উপায়ও নেই। সময়টা ছিল শীতকাল। ঘরের এক পাশে একটি লেপ রাখা ছিল। তিনি দ্রুত লেপটি তুলে এনে পানির ওপর বিছিয়ে দেন। লেপ সবটুকু পানি শুষে নেয়। মেঝে শুকিয়ে যায়। কিন্তু ঘরে তখন ওই একটিমাত্র লেপই ছিল। শীতের রাত। লেপ পানিতে ভেজা। ফলে সারা রাত পরিবারের সকলকে বসে বসে কাটাতে হয়েছে। গায়ে দেওয়ার মতো অন্য কিছুও ছিল না। মেঝেতে শুতে গেলে শীত আরও বেশি লাগবে। তাই সন্তানদেরসহ পুরো রাত জেগে কাটিয়েছেন, তবুও এক ফোঁটা পানি নিচে পড়তে দেননি—পাছে নবীজির কোনো কষ্ট হয়।[১]

আতিথেয়তার হক

আবু আইয়ুব আনসারী যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন, তার ঘর থেকে খাবার তৈরি করে নবীজির খেদমতে পৌছাতে। এদিকে অন্য সকলেই চাইত, আমরাও সম্মানের এই আতিথেয়তায় অংশগ্রহণ করব। ফলে, কোনো কোনো দিন একাধিক ব্যক্তি খাবার নিয়ে উপস্থিত হতেন। আবু আইয়ুব আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সন্ধ্যায় আমরা খাবার তৈরি করে একটু বেশি পরিমাণেই নবীজির খেদমতে পাঠাতাম। যখন তা ফেরত আসত, তখন আমি এবং আমার স্ত্রী লক্ষ করতাম, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রের কোন দিক থেকে খেয়েছেন। তারপর আমরা উভয়ে নবীজির হাত যেখানে লেগেছে, সেখান থেকে খেতে শুরু করতাম। এটা আমরা আমাদের জন্যে বরকত এবং সৌভাগ্য মনে করতাম। একদিন

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ২ : ১১৬।

সন্ধ্যায় খাবার রান্না করে নবীজির খেদমতে পাঠিয়ে দিয়েছি। খাবারের পাত্র ফিরে আসার পর লক্ষ করলাম, তাতে নবীজির আঙুলের কোনো ছাপ দেখা যাচ্ছে না। আমি খেদমতে হাজির হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আজ আপনি খাবার খাননি?

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, খাবারে কাঁচা রসুন ছিল। এতে গন্ধ আছে। এ জন্যে আমি খাইনি। কাঁচা রসুন খাওয়ার ফলে মুখে গন্ধ সৃষ্টি হয়। আমার কাছে ফেরেশতা আসে। তাদের সঙ্গে কথা বলতে হয়। ফেরেশতাগণ এই ধরনের গন্ধ পছন্দ করেন না। আবু আইয়ুব আনসারী বললেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ, এটা কি হারাম? নবীজি বললেন, না। তোমরা খেয়ে নাও।[১]

উপহার উপঢৌকন

আবু আইয়ুব আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বাড়ির আশেপাশে যারা বসবাস করতেন, তারা এবং তাদের ঘরের মেয়েরা বরাবর নবীজির ঘরে কোনো না কোনো উপহার পাঠাবার কথা ভাবতেন। কোনো ভালো খাবার তৈরি করলে নবীজির খেদমতে দুআ পাওয়ার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিতেন। আসআদ ইবনে যুরারা রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন আনসারদের মধ্যে খুবই সম্মানিত ব্যক্তি। তিনি বলেছেন, আমি আমার ঘর থেকে সর্বপ্রথম নবীজির খেদমতে হাদিয়া নিয়ে আসি। আর সেটা ছিল দুধ ও ঘি মাখা রুটি। আমি এই হাদিয়া নবীজির খেদমতে পেশ করে বললাম, আমার মা আপনার জন্যে পাঠিয়েছেন। নবীজি বললেন, 'বারাকাল্লাহু ফীকা'—আল্লাহ বরকত দান করুন। তারপর উপস্থিত সাহাবীগণকে নিয়ে সেই খাবার গ্রহণ করলেন। সবাই একসঙ্গে খাচ্ছিলেন। ঠিক এমন সময় সাদ ইবনে উবাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু একটি পাত্রে করে গোশত এবং রুটি নিয়ে হাজির হলেন। এভাবে কোনো কোনো দিন তিন-চারজন পর্যন্ত খাবার নিয়ে হাজির হতেন।[২]

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ২০১; *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ২:১১৬।

২ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ২০২।

মক্কা থেকে স্বজনদের আগমন

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু আইয়ুব আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘরে দীর্ঘ সাত মাস থেকেছেন। এই সময়ে মক্কায় যারা রয়ে গিয়েছিলেন, তারা ক্রমাগত আসতে থাকেন। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আজাদকৃত গোলাম যায়েদ ইবনে হারেসাহ এবং আবু রাফে রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দু'টি উটসহ পাঁচশো দেরহাম রাহখরচ দিয়ে মক্কায় পাঠান। বলে দেন, মক্কায় গিয়ে—নবীজির দুই কন্যা—ফাতেমা এবং উম্মে কুলসুমকে নিয়ে এসো। তাদের সঙ্গে—উম্মত-জননী—সাওদা বিনতে যামআহ এবং উসামা ইবনে যায়েদকেও নিয়ে এসো। নবীজির ঘরে তখন এই দুই কন্যাই ছিলেন। হযরত যায়নাব ছিলেন তার স্বামী আবুল আস ইবনে রবীর সঙ্গে। আরেক কন্যা হযরত রুকাইয়া ছিলেন আবিসিনিয়ায় হযরত উসমান ইবনে আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে। তিনি হযরত উসমানের জীবন-সঙ্গিনী ছিলেন। এই কাফেলার সঙ্গে যায়েদ ইবনে হারেসার স্ত্রী উম্মে আয়মানও ছিলেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পুত্র আবদুল্লাহ তখনো মক্কায় ছিলেন। সাওর পর্বতে অবস্থানকালে মক্কার যাবতীয় সংবাদ পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি যখন যায়েদ ইবনে হারেসা এবং আবু রাফেকে দেখেন—তারা মদীনা থেকে মুসলমান মেয়েদেরকে নিতে এসেছে, তখন তিনিও তার দুই বোন হযরত আসমা, হযরত আয়েশা এবং তার মা উম্মে রুমানকে সঙ্গে নিয়ে মদীনায় চলে আসেন। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বিয়ে যদিও মক্কায়ই সম্পাদিত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তখনো তাকে স্বামীর ঘরে তুলে দেওয়া হয়নি। তাই হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহা মদীনায় এসে পিতা আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বাড়িতে ওঠেন। হযরত আবু বকরের বাড়ি ছিল তখন মদীনার সোন্‌হ এলাকায়।[১]

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৩০২

নবীজির মেজবানের সম্মান

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন দোজাহানের বাদশাহ হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেজবান। নবীজিকে আতিথেয়তাদানের এই মহান সৌভাগ্য ছিল আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ। আতিথেয়তার এই সম্মান ও গৌরব আমাদের ইসলামের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এ সুবাদে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে তাঁর সম্মান ছিল অসামান্য। পরবর্তীকালে সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে পরম শ্রদ্ধায় নিজেদের চোখের ওপর যেন আসন পেতে দিতেন। তার সামান্য সেবা ও সম্মান করতে পারাটা নিজের জন্যে অনেক বড় গৌরবের বিষয় মনে করতেন বড় বড় সাহাবী। এখানে আমি একটি উদাহরণ দিচ্ছি। তার প্রতি পরম শ্রদ্ধা ও সম্মানের এই উদাহরণ দিতে আমার অন্তর আমাকে বাধ্য করেছে। তখন হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদের খলীফা। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বসরার গভর্নর। এই সময় আবু আইয়ুব আনসারী কোনো এক কাজে বসরা গিয়েছেন। বসরা গিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু -এর বাড়িতে পৌছান। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস তখন ঘরেই ছিলেন। ঘরের ভেতরে যখন সংবাদ পেলেন, নবীজির মেজবান আবু আইয়ুব আনসারী এসেছেন সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যান বাড়ির বাইরে। তাকে 'আহলান ওয়া সাহলান ওয়া মারহাবান' বলে অভ্যর্থনা জানান। পূর্ণ আদব ও বিনয়ের সঙ্গে ঘরে নিয়ে যান। এবং আবেদন করেন—আপনি এই ঘরে থাকবেন। এই ঘর আপনার। এই ঘরের সকল সামান-পত্র আপনার। আপনি যেভাবে খুশি ব্যবহার করবেন। আপনি হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেভাবে আপনার ঘর ও যাবতীয় সামান-পত্র খেদমতে তুলে দিয়েছিলেন, আমিও আমার সবকিছু আপনার খেদমতে তুলে দিয়ে অপনাকে সেবা করার সৌভাগ্য অর্জন করতে চাই।

কয়েকদিন অবস্থান করার পর আবু আইয়ুব আনসারী যখন ঘরে ফেরার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন তার খেদমতে বিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা এবং চল্লিশজন গোলাম পেশ করেন।

যে ঘরে আবু আইয়ুব আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অতিথি হিসেবে বরণ করেছিলেন এবং নবীজি যে ঘরে দীর্ঘ সাত মাস অবস্থান করেছেন পরবর্তী সময়ে এই ঘরটাও মুসলমানদের কাছে সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। আবু আইয়ুব আনসারীর পর তার আজাদকৃত গোলাম আফলাহ ঘরটির মালিক হয়েছিল। হযরত মুগীরা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হারেস ইবনে হিশাম এক হাজার স্বর্ণমুদ্রায় এই ঘরটি কিনে নিয়েছিলেন। তিনি ঘরটি নতুনভাবে মেরামত করে মদীনার অসহায়, দরিদ্র মুসলমানদের নিবাস বানিয়েছিলেন। যাদের মাথা গোঁজার মতো কোনো ঠাঁই ছিল না, তারা এই ঘরে বসবাস করতেন। আবু আইয়ুব আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু জিহাদের উদ্দেশ্যে কনস্টান্টিনোপল চলে যান। সেখানেই ওফাত লাভ করেন। শহরের রক্ষাপ্রাচীরের কাছে ওসিয়তমাফিক তাকে দাফন করা হয়। মুসলমানরা কখনো কোনো বিপদে পড়লে এই কবরের কাছে এসে আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করত আল্লাহ তাআলা তাদের বিপদ দূর করে দিতেন।[১]

মুসলমানদের হিজরী সন

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছিলেন রবিউল আউওয়াল মাসে। হিজরতের এই বছরটিই ইসলামী তারিখের সূচনা হিসেবে বিবেচিত হয়। এর প্রচলন হয়েছিল হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নির্দেশে এবং তার খেলাফতকালে। তারিখ, মাস, বছর নির্দিষ্টকরণ—ইসলামী ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাহযিব তামাদ্দুন এবং পৃথিবীর উত্থান-পতনের ঘটনাবলিতে তারিখ একটি মৌলিক বিষয়। সরকারি কাগজপত্রে আদেশ জারির তারিখ উল্লেখ করা একটি জরুরি বিষয়। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ও ইতিহাস সুবিন্যস্তভাবে সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও তারিখের প্রয়োজন ছিল অনুপেক্ষ। তা ছাড়া ইসলামের অনেক বিধি-বিধানও তারিখের আগপর জানার ওপর নির্ভরশীল হয়। অথচ ইসলামের সূচনাকালে মুসলমানদের কাছে তারিখ গণনার সুনির্দিষ্ট কোনো সাল ছিল না।

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ২০২-২০৩।

হযরত উমরের শাসনামলে এসে একবার একটি স্বীকারোক্তিনামা আদালতে উত্থাপিত হলো। সেখানে উল্লেখ ছিল—শাবান মাসে এর সীমা শেষ হবে। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু দস্তাবেজ পেশকারীকে জিজ্ঞেস করলেন, এই স্বীকারোক্তিনামার মেয়াদ চলতি বছরের শাবান মাসে শেষ হচ্ছে, না গত বছরের শাবান মাসে শেষ হয়েছে? তখন ওই ব্যক্তি এর কোনো উত্তর দিতে পারেনি। তা ছাড়া স্বীকারোক্তিনামায় লিখিত বক্তব্য থেকেও তা নির্ধারণ করা যাচ্ছিল না। কারণ, আরবরা নিজেদের প্রয়োজনে মাস উল্লেখ করত। মাসের কথা তারা জানতও। কিন্তু বছর নির্ণয়ের জন্যে তাদের কাছে কোনো ধরনের প্রচলিত রীতি ছিল না। ফলে, যে কোনো দলিল-দস্তাবেজে তারা কেবল মাসের নাম উল্লেখ করত।

হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন মতদানে যোগ্য অভিজ্ঞ সাহাবায়ে কেরামকে ডেকে পাঠান। আলোচ্য বিষয়টি তাদের সামনে উত্থাপন করে বলেন, সন নির্ধারণ আমাদের জন্যে খুবই জরুরি একটা বিষয়। দলিল-দস্তাবেজ বাস্তবায়ন এবং নির্দিষ্ট সময়ে তা রহিতকরণের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ফয়সালা করা সাল নির্ধারণ ব্যতীত সম্ভব নয়। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম নানা রকমের মত পেশ করেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ওইসব মত উড়িয়ে দেন। সব শেষে এক ব্যক্তি অনেক চিন্তা-ভাবনা করে আরজ করেন, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম তারিখ থেকে সাল গণনা শুরু হবে। কেউবা আরজ করেন, নবীজির ওফাত থেকে সাল গণনা করা হবে। তখন এক ব্যক্তি বলেন, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতকে আমাদের সাল গণনার সূচনা ধরা হোক। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-সহ উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম সকলে সর্বশেষ মতটিতে এসে একমত হন। সিদ্ধান্ত হয়—বছর গণনার সূচনা ধরা হবে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরত। কিন্তু সমস্যা দেখা দিলো, নবীজি হিজরত করেছিলেন রবিউল আউওয়াল মাসে। হিজরতকে যদি সাল গণনার সূচনা মানা হয়, তা হলে রবিউল আউওয়ালকে সালের প্রথম মাস মানতে হয়। অথচ প্রাচীনকাল থেকে আরবরা মহররমকে প্রথম মাস হিসেবে শুমার করে এসেছে। তখন সকলে এ বিষয়ে একমত হন—আরবদের প্রাচীন রীতি মোতাবেক মহররমকেই বছরের প্রথম মাস ধরা

হবে। ইমাম মালেক রহ. বলতেন, ইসলামী বছরের সূচনা রবিউল আউওয়াল মাস থেকেই হওয়া উচিত। কেননা, এ মাসেই হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করেছিলেন। কিন্তু তার এই মত উম্মতের সামগ্রিক মতের পরিপন্থী। সাহাবায়ে কেরামদের পরামর্শসভায় অবিসংবাদিতভাবে মহররম মাসকেই বছরের প্রথম মাস মেনে নেওয়া হয়েছিল। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-ও ওটাকেই প্রয়োগ করেছিলেন।

একটি সূক্ষ্ম দর্শন

হাফেজ ইবনে কাসীর রহ. এখানে একটি চমৎকার দর্শনের কথা লিখেছেন। তার এই দর্শনের আলোকে হিজরী সালের সূচনা মহররম মাস থেকে হওয়াটাই চমৎকারভাবে প্রমাণিত হয়। তিনি লিখেছেন, মদীনার আনসারগণ দ্বিতীয় আকাবায় নবীজির হাতে শপথ গ্রহণ করেছিলেন বারো জিলহজ। তারপর তারা মদীনায় চলে যান। আনুমানিক দুই সপ্তাহের মধ্যে তারা মদীনায় পৌঁছে যান। এরপর মহররম মাসের শুরুতে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে মদীনায় হিজরত করার আদেশ দেন। মদীনার আনসারদের সঙ্গে নবীজির মদীনা গমনের বিষয়টিও আলোচিত হয়েছিল। নবীজির দেখাশোনার এবং নিরাপত্তাবিধানের জন্যে বারো জন নকীবও নির্বাচন করা হয়েছিল ওই বৈঠকে। ফলে, বলা যায়, মহররম মাসেই নবীজি মদীনায় হিজরত করবেন বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। মক্কা থেকে মুসলমানদেরকে মদীনায় পাঠিয়ে দেওয়াটা ছিল পূর্ব-ব্যবস্থাপনা কিংবা অগ্রদল হিসেবে। এ কারণেই দেখা গেছে, তখন যে কোনো সাহাবী মক্কার বাইরে চলে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মদীনায় যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন। ফলে, ওই সময়ে যারাই মক্কা ছেড়েছেন, সকলেই মদীনায় গিয়ে উঠেছেন। আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সঙ্গী বানাবেন বলে আটকে রেখেছিলেন। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মক্কায় রেখে দিয়েছিলেন মানুষের আমানত ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে। এর বাইরে যিনি যখন সুযোগ পেয়েছেন, মদীনার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছেন। পূর্বপরিকল্পনা মোতাবেক সব শেষে মক্কা ছেড়েছেন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । তাই ধরা

যায়, মহররম মাসেই হিজরতের সাধারণ সূচনা হয়ে গিয়েছিল। তাই বিস্তারিত এই প্রেক্ষাপটের আলোকে সাহাবায়ে কেরাম মহররম মাসকে হিজরী সালের প্রথম মাস নির্ধারণ করে উজ্জ্বল বিচক্ষণতার প্রমাণ দিয়েছেন। তারা উপযুক্ত এবং যথাযথ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।[১]

একজন বড় ইহুদি আলেমের ইসলাম গ্রহণ

সেকালে মদীনায় ইহুদিদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম হিসেবে বরিত ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম। তিনি তাওরাত গ্রন্থের পণ্ডিত ছিলেন। নবীজি মদীনায় আগমন করার পর যখন কোবায় ওঠেন, তখন তার চেহারা মোবারক দেখেই আবদুল্লাহ ইবনে সালাম মনে মনে বলেছিলেন—

انه ليس بوجه كذاب.

এটা কোনো মিথ্যাবাদীর চেহারা হতে পারে না।

নবীজির মর্যাদা, সম্মান ও ব্যক্তিত্ব তার অন্তরে শক্ত আসন পেতে বসেছিল। তারপরও অন্তরে অধিক স্বস্তি লাভের জন্যে তিনি নবীজিকে তিনটি প্রশ্ন করেছিলেন। এটা ছিল তখনকার কথা যখন নবীজি কোবা থেকে এসে আবু আইয়ুব আনসারীর বাড়িতে এসে উঠেছেন। নবীজি তাকে তার তিন প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেন। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তখন সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম কবুল করেন। চিন্তা করেন, যদি অন্য সব ইহুদিও ইসলাম কবুল করে নিত, তা হলে কত ভালো হতো। এই আবেগ থেকেই তিনি নবীজির খেদমতে আবেদন করেন, ইহুদিরা যখন আপনার খেদমতে আসবে, আপনি বলবেন না—আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ইসলাম কবুল করেছে। কারণ, ইহুদিরা খুবই ষড়যন্ত্রস্বভাবের মানুষ। তারা মিনিটে মিনিটে কথা বদলায়। আপনার দরবারে এলে প্রথমেই তাদেরকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। এই কথাবার্তার সামান্য পড়েই সেখানে কয়েকজন ইহুদি এসে হাজির হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ঘরের ভেতর চলে যান। নবীজি আগত ইহুদিদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম লোকটা কেমন? তখন তারা সকলে এক বাক্যে বলে উঠে—

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ২০৭-২০৮।

خيرنا وابن خيرنا، سيدنا وابن سيدنا.

আবদুল্লাহ আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো মানুষ এবং ভালো মানুষের পুত্র ভালো মানুষ। আমাদের নেতা এবং নেতার পুত্র নেতা।

নবীজি তখন বললেন, আচ্ছা, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম যদি ইসলাম কবুল করো, তা হলে কি তোমরা ইসলাম কবুল করবে? তখন তারা সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে—

اعاذنا الله من ذلك.

আল্লাহ আমাদের এ থেকে রক্ষা করুন।

এ কথা শোনামাত্র ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম। এসেই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন—

اشهد ان لا اله الاالله واشهد ان محمدا رسول الله.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালামের মুখে এই কালেমায়ে শাহাদাত শোনামাত্র তারা চেঁচিয়ে উঠে—আবদুল্লাহ আমাদের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি এবং নিকৃষ্ট ব্যক্তির সন্তান।

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম মুসলমান হওয়ার পর তার পরিবারের সকলে ইসলাম গ্রহণ করে। তাদের সঙ্গে তার ফুপুও ইসলাম গ্রহণ করে।[১]

নবীজির দরবারে হোয়াই ইবনে আখতাব

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ছিলেন সমাজে পরম সম্মানিত এবং বিখ্যাত ইহুদি আলেম। তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি পুরো ইহুদি-অঞ্চলে অস্থিরতা ছড়িয়ে দেয়। ইহুদিদের এই অস্থিরতা প্রশমনের জন্যে তাদের নেতা হোয়াই ইবনে আখতাব উদ্যোগী হয়। একদিন নবীজির দরবারে এসে হাজির হয়। চুপচাপ বসে নবীজির কথা শুনতে থাকে। কিছুক্ষণ পর উঠে চলে যায়। তার ঘরে তখন ইহুদিরা সমবেত হয়ে তার অপেক্ষা করছিল। সে ঘরে গিয়ে ইহুদিদের উদ্দেশ্যে বলে, আমি এখন এমন এক ব্যক্তির কাছ

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ২ : ১৩৮; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ২১০।

থেকে এসেছি—খোদার কসম, মরণ পর্যন্ত আমি তার বিরোধিতা করে যাব। কখনো আমি তার আনুগত্য করতে পারব না। তারপর তার শত্রুতা দিন দিন বাড়তে থাকে। নবীজির বিরুদ্ধে গৃহীত ও সম্পাদিত প্রায় প্রতিটি ষড়যন্ত্রেই ছিল তার সরব অংশগ্রহণ। সে প্রতিটি ষড়যন্ত্রকে সফল করার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বনু কুরায়জা জয় করেন, তখন এই হোয়াই ইবনে আখতাবকে হত্যা করা হয়।[১]

সালমান ফারসির ইসলাম গ্রহণ

সালমান ফারসি ছিলেন ইরানের একটি অগ্নিপূজক পরিবারের সন্তান। সত্যের সন্ধানে তিনি বাড়ি-ঘর ছেড়েছিলেন। তারপর সত্যের সন্ধানেই দীর্ঘ দিন বিভিন্ন গির্জা মঠ আশ্রম ও ধর্মশালায় কাটিয়েছেন। কিন্তু কোথাও তার অন্তর স্বস্তিতে থিতু হতে পারেনি। এই সত্যের সন্ধানেই তিনি তখন আরবে পৌঁছান, যখন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মক্কা থেকে মদীনায় এসে উঠেছেন। তখনো অবস্থান করছেন কোবায়। তিনি নবীজির সঙ্গে দেখা করবেন বলে স্থির করলেন। কিছু উপহার নিয়ে নবীজির খেদমতে হাজির হলেন। উপহারগুলো সামনে রেখে বললেন, এগুলো সদকা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে হাত দিলেন না। উপস্থিত লোকদের দিকে ঠেলে দিলেন। পরের দিন সালমান ফারসি আবারও কিছু হাদিয়া সংগ্রহ করলেন। নবীজির খেদমতে পেশ করে বললেন, এগুলো হাদিয়া। নবীজি তা কবুল করলেন। নিজে খেলেন। উপস্থিত সকলকে খাওয়ালেন। সালমান ফারসি রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর দৃষ্টিতে নবীকে চেনার একটা পদ্ধতি ছিল এটা। তাই তিনি আশ্বস্ত হন—এ আল্লাহর রাসূল। পরের দিন দরবারে এসে ইসলাম কবুল করেন।

মসজিদে নববী নির্মাণ

মদীনায় আগমনের পর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টিতে সর্বপ্রধান প্রয়োজন ছিল একটি মসজিদ নির্মাণ। মুসলমানগণ সকলে

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ২ : ১৭৫।

যেন জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করতে পারে। এ পর্যন্ত খেজুর গাছের ছায়ায় কিংবা বাড়ির আঙিনায় নামায আদায় করা হতো।

মদীনায় প্রবেশের সময় যে বিরান জায়গাটায় নবীজির উষ্ট্রী বসে পড়েছিল, তিনি তার তথ্য জানতে চেয়েছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম বলেছিলেন, জায়গাটা দু'জন এতিম শিশুর। শিশু দু'টির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন হযরত সাদ ইবনে যুরারা কিংবা মুআয ইবনে আফরা রাযিয়াল্লাহু আনহু। যাই হোক, নবীজি জায়গাটা মসজিদ নির্মাণের জন্যে পছন্দ করেন। তারপর দায়িত্বশীলদের ডেকে পাঠালেন। জায়গাটার মূল্য জানতে চাইলেন। আনসার সাহাবীগণ আরজ করলেন, জায়গাটা আমাদের পক্ষ থেকে দানস্বরূপ গ্রহণ করুন। আমরা এর কোনো মূল্য চাই না। আল্লাহর পথে আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশায় দান করতে চাই। নবীজি তাদের আবেদন কবুল করলেন না। এ বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকদের দিয়ে মূল্য নির্ধারণ করে তা পরিশোধ করে দিলেন। *বুখারী মুসলিম* ও *আবু দাউদের* বর্ণনামতে পতিত এই জায়গাটির অবস্থা ছিল—এতে কিছু পুরোনো ভগ্নাবশেষ, কোথাও কিছু পুরোনো খেজুর গাছ, মুশরিকদের পুরোনো কিছু কবর। কিছু জায়গা অবশ্য চাষবাসও হতো—পুরো জায়গাটি ছিল অসমতল—কোথাও কোথাও মাটির স্তুপ পড়ে আছে। কেনার পর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জায়গাটি সমান করতে এবং গাছগুলো কেটে ফেলতে আদেশ দিলেন। মুশরিকদের কবরগুলো খুঁড়ে হাড়গোড়গুলো বাইরে ফেলে দিতে এবং পুরো জায়গাটা সমান করতে আদেশ দিলেন। নবীজির নির্দেশে আনসার এবং মুহাজির সাহাবীগণ মসজিদ নির্মাণে নেমে পড়েন। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে নির্মাণকাজে অংশগ্রহণ করেন। মসজিদ নির্মাণের প্রাথমিক নকশা তৈরি করেছিলেন এভাবে—সবগুলো খেজুর গাছ কেটে কেবলার দিকে বরাবর করে পুঁতে দেওয়া হবে। ফলে, এই খেজুর গাছগুলোই হবে মসজিদের দেয়াল। তারপর ডান-বাম দুই দিকে ভাঁজ করে পাথরের ওপর পাথর বিছিয়ে দেয়াল নির্মাণ হবে। আর একটি দিক সম্পূর্ণ খালি রেখে দেওয়া হবে। মসজিদ নির্মাণের পর এই খালি দিকেই উম্মত-জননীগণের জন্যে বসবাসের ঘর তৈরি করা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রবল আবেগ ও উচ্ছ্বাসের সঙ্গে মসজিদ নির্মাণের কাজে অংশগ্রহণ

করেন। আপাদমস্তক ধুলোর মধ্যে তারা কাজ করছিলেন আর পরম উচ্ছ্বাসে কোরাস গাইছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাদের কোরাসকণ্ঠে তাল মেলাচ্ছিলেন এবং দুআ দিচ্ছিলেন। তাদের কোরাস ছিল—

لا عيش الا عيش الاخرة.

আখেরাতের জীবনই—প্রকৃত জীবন।

এর জবাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বলে দুআ দিচ্ছিলেন—

اللهم ارحم الانصار والمهاجرة.

হে আল্লাহ, দয়া করো আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি।

তিন দিকে দেয়াল নির্মিত হওয়ার পর মাঝখানে খেজুর গাছের খুঁটি স্থাপন করেন। তারপর খেজুরপাতার ছাউনি বানিয়ে সেই খুঁটির ওপর বসিয়ে দেন—এটাই ছিল মসজিদে নববীর ছাদ। বর্ষায় তা পানি ফেরাতে পারত না। মসজিদে নববীর মেঝেও ছিল কাঁচা। আর ছাদ যে অনেক উঁচু ছিল, তাও না। যে কেউ হাত উঁচু করে ছাদ ধরতে পারত। মসজিদের খালি দিকটায় ছোট ছোট ঘর তৈরি করা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ঘরের অন্য সদস্যদের থাকার জায়গা ছিল এই ঘরগুলো।

হাসান বসরী র. বলেছেন, নবীপরিবারের এই ঘরগুলো ছিল খুবই ছোট ছোট। ছাদও ছিল নিচু। আমি হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করতে পারতাম। এই ঘরগুলো ছিল নবীজির বসবাসের জন্যে। খেজুরের পাতা এবং শাখায় ছাউনি বানিয়ে চারদিকের দেয়ালের ওপর পেতে দেওয়া হয়েছিল। তারপর সেই ছাউনির ওপর মাটির ভারী প্রলেপ দেওয়া হয়েছিল। বাতাসে যেন উড়িয়ে নিয়ে না যায়—সেজন্যে এই ছাউনির চারদিকে দেয়াল বরাবর পাথরের ভার বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই ছিল নবীজির ঘর নির্মাণের প্রক্রিয়া। ঘরের দরজা বন্ধ করার জন্যে কোনো কড়া কিংবা শেকল ছিল না। হাত দ্বারা দরজায় আঘাত করে অনুমতি প্রার্থনা করা হতো। জীবনের

শেষ পর্যন্ত এই ছাপড়া ঘরেই ছিল দোজাহানের বাদশাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিবাস।[১]

ভাই ভাই

মক্কা থেকে যেসব মুসলমান হিজরত করে মদীনায় গিয়েছিলেন—তারা গিয়েছিলেন সম্পূর্ণ রিক্তহস্ত। আর সেটা আমরা এ থেকেই আন্দাজ করতে পারি, তারা প্রায় সকলেই হিজরত করেছেন গোপনে রাতের অন্ধকারে। হিজরত করেছেন প্রচণ্ড ভয় ও সংশয়ের মধ্যে। ঘরের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সঙ্গে নিতে গেলে যাত্রার আগেই উদ্দেশ্য ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, ঠিক সে অবস্থাতেই জালেমের পাঞ্জা থেকে বেরিয়ে পড়াকে গনিমত মনে করতেন। খুব বেশি হলে সঙ্গে কিছু নগদ মুদ্রা হয়তো নিয়ে যেতে পেরেছেন। আর সেটাও অসহায় দরিদ্র ক্রীতদাস-শ্রেণির মুসলমানদের কাছে কোথায় ছিল? তারা এসে উঠেছেন সম্পূর্ণ নতুন একটি শহরে। সেখানে তাদের কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই। পুরোনো বন্ধু-বান্ধব নেই। এই শহরে নেই কোনো সরাইখানা কিংবা অতিথিশালা। একটিমাত্র রাত কাটাবার মতো কোনো আপন আশ্রয়ও তাদের এই শহরে নেই। আর সংখ্যায়ও তারা দু'-চারজন নন, কয়েকশো। এই শত শত নবাগত মুসলিমের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্যে কোনো সরকারই কেবল ভার নিতে পারে। সাধারণ জনগণের পক্ষে এত বড় ভার গ্রহণ সম্ভব ছিল না।

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সফরসঙ্গী আবু বকর সিদ্দীক মক্কা থেকে বেরিয়েছেন একেবারে মৃত্যুর মুখ ডিঙিয়ে। মৃত্যুমুখের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে হয়েছিল তাদেরকে। তারপর তিনদিন পর্যন্ত লুকিয়ে থাকতে হয়েছে সুউচ্চ পর্বতগুহায়। অতঃপর যে ভয় ও শঙ্কার ভেতর দিয়ে তারা মদীনায় পৌঁছেন, সেখানে ধন-সম্পদ সঙ্গে নিয়ে আসার কথা তো ভাবাও যায় না। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত খরচ এবং অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো বিপদ সামাল দেওয়ার জন্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু সামান্য নগদ অর্থ সঙ্গে নিয়েছিলেন।

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ২২১।

সুতরাং মুসলমানদের আবাসন ও জীবিকার বিষয়টি ছিল সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল বিষয়। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমান এখলাস দীনদারি আল্লাহ এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সম্পর্ক বিশ্বাস মানবিকতা ও উদার চরিত্রের আলোকে সমাধান করেছিলেন জটিলতম এই সংকটের। মানবজাতির ইতিহাসে এর দ্বিতীয় কোনো উদাহরণ নেই। বিষয়টি ছিল আশু সমাধানযোগ্য। এখানে কালক্ষেপণের কোনো অবকাশ ছিল না। তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘরে আনসার এবং মুহাজির সাহাবীগণকে নিয়ে বসেন। তারপর তাদের পরস্পরে ভাই পাতিয়ে দেন। এ পর্যন্ত পৃথিবী দেখেছে এক মা-বাবার সন্তান হিসেবে একে অপরের ভাই হয়। কিন্তু আজকের এই দিনে বিস্মিত আকাশ সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ করল ইসলাম সম্পূর্ণ অপরিচিত দু'জন ব্যক্তিকে কীভাবে আপন ভাইয়ের মতো ভাই বানিয়ে দেয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাতে একজন আনসারীর হাত ধরছিলেন আর অপর হাতে ধরছিলেন একজন মুহাজিরের হাত। তারপর বলে দিচ্ছিলেন এখন থেকে তোমরা দু'জন পরস্পরে ভাই ভাই।

বলার অপেক্ষা রাখে না—এক ভাইয়ের ওপর আরেক ভাইয়ের অধিকার থাকে। থাকে পরস্পরে স্নেহ ও ভালোবাসার বাঁধন। তারা থাকে পরস্পরের দুঃখ কষ্টের অংশীদার। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে প্রত্যেকের পার্থিব সকল প্রয়োজন-সম্পাদনে এবং তার সমূহ সংকট-নিরসনে অপর ভাইকে দায়িত্বশীল করে দিয়েছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু এই সূত্রেই ভাই হন খারেজা ইবনে যায়েদ খাযরাজীর। উমর ইবনুল খাত্তাব হন ইতবান ইবনে মালেক আনসারীর ভাই। আবু উবায়দা কুরাইশীর ভাই হন সাদ ইবনে মুআয আনসারী—যিনি বনু আবদুল আশহালের নেতা। আবদুর রহমান ইবনে আউফকে ভাই হিসেবে বুকে তুলে নেন সাদ ইবনে রাবী। যুবায়ের ইবনুল আওয়াম ভাই হন সালামাহ ইবনে সালামাহ ইবনে রুকায়েশের। তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহকে ভাই হিসেবে বুকে তুলে নেন কাব ইবনে মালেক। সাঈদ ইবনে যায়েদকে ভাই হিসেবে বরণ করেন উবাই ইবনে কাব। মুসআব

ইবনে উমায়ের পান আবু আইয়ুব আনসারীর মতো ভাই। আবু হুযাইফা ইবনে উতবার ভাই হন আব্বাদ ইবনে বিশর। আম্মার ইবনে ইয়াসিরের ভাই হন হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান। সালমান ফারসিকে ভাই হিসেবে লাভ করেন আবুদ দারদা—রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন। আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত ভ্রাতৃত্বের এগুলো কয়েকটি উদাহরণমাত্র। মূলত প্রত্যেক মুহাজিরকেই কোনো না কোনো আনসারীর ভাই বানিয়ে দিয়েছিলেন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।[১]

ভ্রাতৃত্বও এমন!

এটা শুধুমাত্র রেওয়াজ কিংবা সামাজিক প্রদর্শনী ছিল না, বরং এ ছিল এক এখলাসপূর্ণ বাঁধনের স্বরূপ। মুহাজির সাহাবীগণও ছিলেন প্রচণ্ড আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন স্বাধীনচেতা এবং নিষ্ঠাবান। অন্যদিকে আনসারী সাহাবীগণও ছিলেন আখলাক ভদ্রতা বিসর্জন ও উদারতার মূর্তপ্রতীক। তারা তাদের অকৃত্রিম আবেগ দিয়ে মুহাজির ভাইদের হৃদয় জয় করেছিলেন। আমরা প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ করি—দু'জন আপন ভাই যখন জমি-জমার ভাগ-বটোয়ারার মুখোমুখি হয়, তখন তাদের মধ্যে বিবাদ ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ইসলাম আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে যে ভ্রাতৃত্ব নির্মাণ করেছিল, তা রক্তজাত ভ্রাতৃত্বকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্যে আমরা এখানে একটিমাত্র উদাহরণ দিচ্ছি। এই উদাহরণ থেকে সহজেই অনুমান করতে পারব—তাদের সেই ভ্রাতৃত্ব কতটা সৎ ও কতটা গভীরে প্রোথিত ছিল।

আবদুর রহমান ইবনে আউফ ছিলেন একজন কুরাইশ-খান্দানের সম্মানিত ব্যক্তি। ইসলামে এসে তিনি ঠাঁই করে নেন আশারা মুবাশশারার শ্রেষ্ঠতম তালিকায়। হিজরত করে যখন তিনি মদীনায় আসেন, নবীজি তাকে সাদ ইবনে রাবী আনসারীর ভাই বানিয়ে দেন। হযরত সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে নিয়ে বাড়িতে যান। আকাশের মতো মনের উদারতা ছড়িয়ে বলেন—প্রিয় ভাই, আমি মদীনার অন্যতম ধনীদের একজন। আপনি আমার যাবতীয় সম্পদের অর্ধেক গ্রহণ করুন। সকল

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ২২৬-২২৭

সম্পদ দুই ভাগ করে অর্ধেক আপনার হাতে নিয়ে নিন। আমার বাড়ির অর্ধেকটাও আপনার। আপনি এখানে স্বাধীনভাবে বসবাস করবেন। আমার দু'জন স্ত্রী আছে—তাদের মধ্যে আপনি যাকে বলবেন, তাকেই আমি তালাক দিয়ে দেব, আপনি তাকে বিয়ে করে নেবেন। আমি ভ্রাতৃত্বের কর্তব্য পূর্ণরূপে আদায় করতে চাই। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ উপমাহীন এই উদারতা ও বিসর্জনচিত্তে অবাক এবং মুগ্ধ। আর হবেন নাই বা কেন? পৃথিবী কি কখনো এমন দৃষ্টান্ত দেখেছে? হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ সঙ্গে সঙ্গে বললেন—আল্লাহ তাআলা আপনার সম্পদ ও পরিবারে বরকত দান করুন। এর কোনোটারই আমার প্রয়োজন নেই। আপনি আমাকে শুধু বাজার দেখিয়ে দিন।

একদিকে আনসারী সাহাবীর হৃদ্যতা নিষ্ঠা ও উপমাহীন বিসর্জন অন্য দিকে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফের আত্মমর্যাদাবোধ এবং স্বাধীনচিত্ত—দুটোই উপমাহীন। এমন উদাহরণের সামনে যে কোনো আবেগ ও বোধ বিশ্বাসে অবনত হতে বাধ্য। এ ছিল হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিষ্ঠিত ভ্রাতৃত্বের অনুপম ফল। পৃথিবীর কেউ কোনো ইতিহাসে এর দ্বিতীয় কোনো দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবে না।

ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আনসারী সাহাবী তার খেজুর বাগানের অর্ধেক ফসল স্বীয় মুহাজির ভাইয়ের হাতে তুলে দিচ্ছে। কৃষক আনসারী তুলে দিচ্ছে ফলিত ফলের অর্ধেক। এভাবে আনসার সাহাবীগণের নিষ্ঠাপূর্ণ অনুপম ভ্রাতৃত্বের পরশে মুহাজির সাহাবীগণের অর্থনৈতিক সংকট কেটে যায়। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে আনসার সাহাবীগণের সহৃদয়তার কথা আলোচিত হয়েছে অতীব যত্নের সঙ্গে।

ইহুদিদের একটি ভয়ংকর মিথ্যা প্রচারণা

মুহাজির সাহাবীগণ যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন সেখানে মহামারীর মতো জ্বর ছড়িয়ে পড়ে। দেখা গেছে, একই ঘরে কয়েকজন করে প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত। জননী আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আবু বকর সিদ্দীক বেলাল হাবশি এবং আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযিয়াল্লাহু আনহু একই ঘরে বসবাস করতেন। তারা তিনজনই প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হন। এই

অসুস্থতাটা ছড়িয়ে পড়েছিল মুহাজিরদের মধ্যে। নবীজির কাছে দুআর জন্যে আবেদন করা হলো। তিনি দুআ করলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই এই বিপদ কেটে গেল। কিন্তু এরই মধ্যে ইহুদি-গোষ্ঠী প্রোপাগাণ্ডা ছড়াতে থাকে—আমরা যাদু করে দিয়েছি। মক্কা থেকে যারা এসেছে, তাদের কারও সন্তান হবে না। কথা আছে, বিচ্ছুর অবশিষ্ট মাটি থেকে ইহুদিদের সৃষ্টি। তারা এই বিষাক্ত প্রোপাগাণ্ডা হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুরোকাল জুড়েই ছড়িয়ে গেছে। তাদের এই বিষাক্ত প্রচারণায় অনেকেই আক্রান্ত হয়েছেন। তবে আল্লাহ তাআলা খুব দ্রুতই তাদের মুখ কালো করে দিয়েছেন।

আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কন্যা হযরত আসমার বিয়ে হয়েছিল যুবায়ের ইবনুল আওয়ামের সঙ্গে। নবীজির হিজরতের কয়েক সপ্তাহ পরেই তারা মদীনায় এসেছিলেন। হযরত আসমা ছিলেন তখন গর্ভবতী। ইহুদিদের বিষাক্ত প্রচারণায় উত্তপ্ত এই পরিবেশেই হযরত আসমার ঘরে জন্মলাভ করেন আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু। তার জন্ম ইহুদিদের মুখোশ সরিয়ে দেয়। তাদের মিথ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর মুসলমানগণ আনন্দে তাকবীর-ধ্বনি উচ্চারিত করেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের তাহনীক করেন এবং তার জন্যে বরকতের দুআ করেন।[১]

নবীজির ঘরে জননী আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় এসেছেন আট মাস হলো। নবী-পরিবারের জন্যে মসজিদে নববীর সঙ্গে কয়েকটি ঘর নির্মিত হয়েছে। নবীজিও আবু আইয়ুব আনসারীর ঘর ছেড়ে এই নবনির্মিত ঘরে এসে উঠেছেন। এই বছরেরই শাওয়াল মাসে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে নবীজির ঘরে তুলে দেওয়া হয়। অথচ তার বিয়ে হয়েছিল হযরত খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর মৃত্যুর পর মক্কায়। তবে তখন তাকে নবীজির ঘরে তুলে দেওয়া হয়নি। উম্মুল মুমিনীন হযরত সাওদা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর সঙ্গেও বিয়ে হয়েছিল মক্কায়। কিন্তু যে

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ২৩০।

ভয়াবহ পরিস্থিতিতে নবীজি হিজরত করেছিলেন, তাতে তাকে সঙ্গে আনা সম্ভব ছিল না। মদীনায় অবস্থানের কিছু দিন পর নবীজি যায়েদ ইবনে হারেসা এবং আবু রাফেকে মক্কায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারা গিয়ে নবীজির দুই নন্দিনী হযরত ফাতেমা হযরত উম্মে কুলসুম এবং হযরত সাওদাকে মদীনায় নিয়ে এসেছিলেন। তারা এসে সোজা নবীজির ঘরে ওঠেন। আর হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা নবীজির ঘরে ওঠেন হিজরতের আট মাস পর শাওয়াল মাসে।[১]

আজানের সূচনা

মদীনায় আগমনের পর যখন সব রকমের ভয়-ভীতি সাময়িকভাবে কেটে যায়, তখন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনি বিষয়াবলি প্রতিষ্ঠা, সামাজিক শৃঙ্খলাবিধান, অপরাধসংক্রান্ত শাস্তিবিধান এবং লেনদেনের শিক্ষাদীক্ষা—এককথায় ইসলামী জীবনবিধান প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী সমাজনির্মাণে মনোযোগী হন। মসজিদ নির্মিত হওয়ার পর যথারীতি জামাতসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায সম্পাদিত হতে থাকে। নামায হিজরতের পূর্বেই ফরয হয়েছিল। মেরাজের পূর্বেও দুই রাকাত করে নামায পড়া হতো। মেরাজে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়। নামাযের সময়ও মক্কাতেই নির্দিষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানে জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করা হতো না। তা ছাড়া ঘোষিতভাবে জামাতের সঙ্গে নামায পড়া সেখানে সম্ভবও ছিল না। ঘরের ভেতর কিংবা পাহাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে মুসলমানগণ নামায আদায় করত। সেখানে মুসলমানদের কোনো মসজিদও ছিল না। হযরত আবু বকর সিদ্দীক তার ঈমানী দুঃসাহসে ঘরের সামনে একটি আঙিনা নির্মাণ করেছিলেন। তিনি সেখানেই নামায আদায় করতেন। সেখানেও মক্কার মুশরিক-সম্প্রদায় আপত্তি তোলে। আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর আশ্রয়দাতা ইবনুদ দাগানাকে বলে ঘরের আঙিনায় তার নামায এবং তেলাওয়াত বন্ধ করে দিয়েছিল। সুতরাং এই পরিবেশে মক্কায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সঙ্গে আদায় করা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। মদীনায় আগমনের পর

---

১ ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, ১ : ৫২১।

নবীজি দীর্ঘ সাত মাস অবস্থান করেছেন আবু আইয়ুব আনসারীর বাড়িতে। তারপর যখন মসজিদ নির্মিত হয় নবীজি সেখানে নামায আদায় করতে শুরু করেন। নামাযের সময় হলে সাহাবায়ে কেরাম অনুমান করে মসজিদে চলে আসতেন। জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করতেন। নামায এবং জামাতের সময় জানাবার জন্যে নির্দিষ্ট কোনো পন্থা নবীজি তখনো বলেননি। এই সময় তিনি বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে থাকেন।

একদিন সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের সঙ্গে নবীজি এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। তখন উপস্থিত কেউ কেউ ঘণ্টা ব্যবহারের পরামর্শ দেন। কেউ পরামর্শ দেন বাঁশি বাজাবার। কেউবা পাহাড়ের ওপর পতাকা উড়াবার কথা বলেন আবার কেউবা বলেন অগ্নি প্রজ্জ্বলনের কথা। কিন্তু তাদের কোনো মতই নবীজির মনঃপূত হয়নি। অমীমাংসিতভাবেই মজলিস ভেঙে যায়। সকলেই নিজ নিজ ঘরে চলে যান।

পরের দিন। আনসারী আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে সালাবা ইবনে আব্দে রাব্বিহী আল খাযরাজী নবীজির খেদমতে ছুটে আসেন। এসে বলেন, আমি ঘুম ও জাগরণের মাঝামাঝি অবস্থায় ছিলাম। এই তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যে লক্ষ করলাম—এক ব্যক্তি হাতে করে ঘণ্টা বিক্রি করছে। আমি তাকে কাছে ডেকে বললাম, তুমি কি এই ঘণ্টা বিক্রি করো? সে আমাকে বলল, তুমি এই ঘণ্টা দিয়ে কী করবে? আমি বললাম, মানুষকে নামাযের জন্যে ডাকব। সে আমাকে বলল, আমি তোমাকে এর চেয়ে ভালো জিনিস শিখিয়ে দিচ্ছি। তার দ্বারা তুমি মানুষকে নামাযের জন্যে ডাকতে পারবে। আমি বললাম, শিখিয়ে দাও। সে আমাকে আজানের শব্দগুলো শিখিয়ে দিলো। তারপর আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ নবীজিকে আজানের শব্দগুলো শোনালেন। শব্দগুলো তিনি স্বপ্নের মধ্যেই মুখস্থ করে নিয়েছিলেন। পুরো আজান শোনার পর নবীজি বললেন—

انه لرؤيا حق ان شاء الله.

ইনশাআল্লাহ, এটা সত্য স্বপ্ন।

তারপর তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদকে বললেন, বেলালের আওয়াজ বেশ উঁচু। তুমি তার পাশে দাঁড়িয়ে আজানের শব্দগুলো শিখিয়ে দাও। আর

বেলাল আজান দেবে। হযরত বেলাল আজান দিলেন। সর্বপ্রথম উচ্চারিত এই আজানের বাণী নীরব নিস্তব্ধ মদীনাজুড়ে এক অভাবিত আবেগ ছড়িয়ে দেয়। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘর ছিল কাছেই। আজান শুনে তিনি ছুটে আসেন। এসে নিবেদন করেন—হে রাসূল, খোদার কসম, এই স্বপ্ন আমিও দেখেছি। নবীজি তখন বলেন, আলহামদুলিল্লাহ। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদের স্বপ্নের সমর্থন হলো।[১] এরপর থেকে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আজান হতে থাকে। আর জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করা হয় বাধ্যতামূলক। এভাবেই হিজরতের পর নবীজির মসজিদে নিয়মিত জামাতের সঙ্গে নামায আদায়ের প্রচলন হয়।

মদীনায় ইসলামের বিজয়

মদীনায় আসার পর অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে যায়। মুসলমানগণ প্রাত্যহিক নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি পান। যবনিকাপাত হয় ভয়-শঙ্কার। ভয়াবহ হিংস্রতা ও বর্বরতার হাত থেকে মুক্তিলাভ হয় পরিপূর্ণরূপে। মদীনায় দ্রুততার সঙ্গে প্রসারিত হতে থাকে ইসলাম। পুরো মদীনায় মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। সবদিকে তাদের বিজয়ই ছিল সমুজ্জ্বল। এখানে ইসলামের বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস করত খুব কম লোকই। ইসলামের বিরুদ্ধে কেউ সামান্য কটুকথা বললেও তাকে তার শাস্তি ভোগ করতে হতো। মদীনা এবং মদীনার চারপাশে ইসলাম এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে—ইসলাম-দুশমনদের পক্ষেও ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো শব্দ উচ্চারণ করা সম্ভব ছিল না। মুসলমান যুবকগণ অনুসন্ধান করে ফিরত—কোথায় কার ঘরে মূর্তি রাখা আছে, কোথায় কে মূর্তিপূজা করে। জানামাত্র ছুটে গিয়ে মূর্তি ভেঙে বাইরে ছুঁড়ে ফেলত। কেউ তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলবার সাহস করত না। একদা যে জনবসতির নাম ছিল ইয়াসরিব, নবীজির আগমনে তার নাম বদলে যায়। এখন মানুষের মুখে মুখে সেই জনবসতি 'মাদীনাতুর রাসূল'—নবীজির শহর। এই শহরই ধীরে ধীরে দোজাহানের বাদশাহর রাজধানী হিসেবে গড়ে উঠে। আর এই রাজধানী থেকেই সূচিত হয় ইসলামী শাসনব্যবস্থা।

---

১ *সুনানে আবু দাউদ*, ১ : ৭১-৭২।

মদীনার আশেপাশে বেশ কিছু বড় বড় ইহুদি জনবসতি ছিল। তারা ছিল শিক্ষিত এবং ধনী। তারা সুদি ব্যবসা করত। গরিব আনসারগণ তাদের থেকে সুদে ধার করত। ফলে তারা তাদের অনুগ্রহের অধীন হয়ে থাকত। তা ছাড়া তাদের অনেক সন্তান ইহুদিদের ঘরে লালিত-পালিত হয়ে তাদের ধর্ম গ্রহণ করে নিয়েছিল। আনসারদের অনেক খান্দানই এই জাতীয় ইহুদি-সদস্য ছিল। ইহুদিদের চরিত্র সাপের মতো দংশন করা ছিল না, তাদের চরিত্র ছিল বিচ্ছুর মতো কামড় বসানোর। মদীনার ইহুদিদের জন্মও ছিল এই বিচ্ছু তৈরির মাটি থেকে। একটা সময় এসে তারা খোলামেলা ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারত না। ফলে দৃশ্যত তারা ইসলাম কবুল করে নেয়। ভেতরে ভেতরে থেকে যায় পূর্ণ ইহুদি। তাদের রক্তে মাংসে মিশে ছিল ইসলামের শত্রুতা। মদীনায় এই ধরনের মোনাফেকদের সংখ্যা খুব বেড়ে যায়। মসজিদে নববীতে তারা নবীজির মজলিসে শরিক হতো। মজলিস থেকে উঠে গিয়ে মুসলমানদের কাজকর্ম নিয়ে হাস্য-রসিকতা করত। আমাদের ইতিহাসের গ্রন্থাবলিতে মোনাফেকদের এই জাতীয় নিকৃষ্ট আচরণের বিপুল ঘটনা বর্ণিত আছে।

মোনাফেকদের বিদ্রূপ এবং...

সাদ ইবনে হুনায়েফ এবং যায়েদ ইবনে লুসায়ের ছিল মোনাফেক। একবার হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উষ্ট্রীটি হারিয়ে যায়। সাহাবায়ে কেরাম অনেক খোঁজাখুঁজি করেও উষ্ট্রীটি পাননি। তখন এই হতভাগা মোনাফেকরা বলতে থাকে—মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন আমার কাছে ওহী আসে আসমানের সংবাদ নিয়ে, অথচ তিনি তার উটের সংবাদই বলতে পারেন না। মোনাফেকদের এটাই ছিল চরিত্র। নিজেদেরকে মুসলমান পরিচয় দিত। নামায পড়ার জন্যে মসজিদে নববীতে আসত। তাদের এই বিষাক্ত আচার-আচরণ যখন ধৈর্যের বাইরে চলে যায়, তখন একদিন এর সামান্য চিকিৎসা করা হয়।

মোনাফেকগোষ্ঠী যখন নামাযের জন্যে মসজিদে আসত, তখন পরস্পরে কাছাকাছি বসত। পাশাপাশি বসে হাসি-ঠাট্টা করত। এদিক সেদিক ইশারা-ইঙ্গিত করত। মুসলমানদের কথা শুনত। শুনে একজন আরেকজনকে দেখাত শোনাত হাসাত। এটা ছিল তাদের নিয়মিত রুটিন। একদিন

কয়েকজন মোনাফেক মসজিদে আসে। তাদের রুটিনমাফিক অসংযত ও অশোভন আচরণ করতে শুরু করে। একজন আরেকজনের সঙ্গে একেবারে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে। কানাকানি করতে থাকে। ফিসফিসিয়ে কথা বলতে থাকে। মুসলমানদেরকে দেখিয়ে দেখিয়ে রসিকতা করতে থাকে। বিষয়টি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নজরে পড়ে। তাদের এই হীন ও অশোভন আচরণ দেখে সঙ্গে সঙ্গে সাহাবায়ে কেরামকে আদেশ করেন—এদেরকে এখনই মসজিদ থেকে বের করে দাও। সাহাবায়ে কেরাম বিদ্যুতের গতিতে উঠে দাঁড়ান। প্রত্যেকে নিজ নিজ মহল্লার মোনাফেকের দিকে ঝড়ের বেগে ছুটে যান। আবু আইয়ুব আনসারী ছুটে যান আমর ইবনে কায়েস নাজ্জারীর দিকে। তার দুই পা ধরে টেনে হেঁচড়ে মসজিদের বাইরে ছুঁড়ে মারেন। এই আমর ইবনে কায়েস এই সময়ও তার মোনাফেকি দেখিয়েছে। সে বলেছে, আবু আইয়ুব আমাকে বনু সালাবার ভাগাড় থেকে বের করে দিয়ে কাজটি ভালো করেনি—অর্থাৎ সে মসজিদে নববীকে ভাগাড় বলেছে। আবু আইয়ুব আনসারীর মহল্লার আরেক মোনাফেক রাফে ইবনে ওদীয়াও সেখানে ছিল। এবার তিনি তার দিকে ছুটে যান। প্রথমেই তাকে নিজের চাদরে বেঁধে ফেলেন। কষে দুটো চড় বসান। তারপর মসজিদের বাইরে নিয়ে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেন। হযরত উমারা ইবনে হাযম এগিয়ে যান মোনাফেক যায়েদ ইবনে আমরের দিকে। তার দাড়ি ছিল খুবই দীর্ঘ। তার দাড়ির গোছা মুঠোয় ভরে আরেক হাতে থাপড়াতে থাপড়াতে টেনে-হেঁচড়ে মসজিদের বাইরে তাড়িয়ে দেন।

হযরত আবু মাসউদ বাদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু মোনাফেক কায়েস ইবনে আমর ইবনে সুহায়েলের দিকে ছুটে যান। কায়েস ছিল খুবই শক্তিমান। হযরত আবু মাসউদ পেছন দিক থেকে তার ঘাড় চেপে ধরেন। তারপর ধাক্কাতে ধাক্কাতে মসজিদের বাইরে নিয়ে যান। মসজিদের সীমানার একেবারে কাছাকাছি গিয়ে সজোরে ঝাঁকুনি দেন এবং ধাক্কা দিয়ে বাইরে ফেলে দেন। বনু খাদরার এক সাহাবী মোনাফেক হারেস ইবনে আমরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তার মাথার চুল ছিল দীর্ঘ। পুরো চুল মুঠোয় ভরে টেনে-হেঁচড়ে মসজিদের বাইরে নিয়ে রেখে আসেন। বনু আমর ইবনে আউফের এক ব্যক্তি মোনাফেক ছিল। সেও মোনাফেকদের নানা কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করত। এক সাহাবী তার দিকে ছুটে যান। তার নাক চেপে ধরে

সজোরে ধাক্কা দেন এবং বলেন—কুলাঙ্গার, বের হও মসজিদ থেকে। তোমার ওপর শয়তান জেঁকে বসেছে।[১]

মদীনায় মুসলমানগণ এখন একটা অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত। মুসলমানদের কোনো বিষয়ে নাক গলাবার সাহস ছিল না কারও। ইসলামের বিধি-বিধান সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রত্যেক মুসলমান ছিল স্বাধীন। সমাজের চোখে তারা ছিল বরিত ও সম্মানিত। মাত্র এক বছরের ব্যবধানে মদীনার জীবনে এই বিস্ময়কর বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল।

মদীনা হলো ইসলামের রাজধানী

মদীনায় যখন ইসলামী শাসনব্যবস্থার সূচনা হলো, তখন মদীনাকে সব ধরনের শঙ্কা ও বিপদ থেকে নিরাপদ রাখা এবং সম্ভাব্য সব ধরনের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা একজন কুশলী শাসক হিসেবে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্যে অনিবার্য হয়ে উঠে। এদিকে নবীজির মাথার মূল্য ঘোষণা করে রেখেছে একশো উট—মক্কার মুশরিক-সম্প্রদায়। তাদের ঘোষিত ওই হুলিয়া এখনো শেষ হয়নি। এই পরিস্থিতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আশ্রয় দেওয়ার অর্থই ছিল মক্কার কুরাইশ এবং অন্য মুশরিকদের উন্মুক্ত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা। কারণ, কুরাইশ-সম্প্রদায় যে কোনো মূল্যে তাদের প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে চাইবে—এটাই স্বাভাবিক। বাস্তবেও দেখা গেছে, নবীজি মদীনায় আসার পর তাদের শত্রুতা শেষ হয়নি, বরং বেড়েছে। তারা যে কোনো মূল্যে নবীজির জীবনপ্রদীপ নিভিয়ে দেওয়ার জন্যে ছিল বদ্ধপরিকর। নানা ষড়যন্ত্রে তারা ছিল নিশ্ছিদ্র নিমগ্ন। এ বিষয়ে মক্কায় বরাবর শলাপরামর্শ চলছিল। সম্মিলিত শক্তিমান কোনো আক্রমণের মাধ্যমে নবীজির আশ্রয়কেন্দ্র মদীনাকে তছনছ করে দিতে তারা ছিল সদা উদ্গ্রীব। পরবর্তী সময়ে সংঘটিত ঘটনাবলি থেকেও এটাই প্রমাণিত হয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে মক্কার মুশরিকদের বিষয়ে নবীজির পক্ষে নিশ্চিন্ত থাকা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া এরই মধ্যে নবীজির প্রতি ওহী

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ২৪০।

অবতীর্ণ হয়েছে। আদেশ এসেছে, তোমাদেরকে যারা তোমাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দিয়েছে, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে প্রস্তুত হও। তাই এখন আক্রমণ করা আর আত্মরক্ষা করার মধ্যে কোনো পার্থক্য রইল না। আজকালের পরিভাষায় বলা যায়—এই সময়টাতে মক্কার মুশরিক-সম্প্রদায় এবং মুসলমানদের মধ্যে শীতল যুদ্ধ চলতে থাকে। উভয় পক্ষ প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার কৌশল ভাবতে থাকে।

জানা কথা, সেকালের আরব পরিচালিত হতো কবিলাকেন্দ্রিক। স্বাভাবিক কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থা তাদের মধ্যে ছিল না। ফলে, সেনাবাহিনী কিংবা সুনির্দিষ্ট কোনো সেনাছাউনিও ছিল না। কবিলাকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা হওয়ার কারণে যখনই কোনো যুদ্ধ বাঁধত, তখন প্রতিটি কবিলার প্রত্যেক সদস্যই হতো একজন যোদ্ধা ও সৈনিক। তাকে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হতো। ফলে প্রত্যেক কবিলার সকল নাগরিকই বলা যায় উর্দিবিহীন স্বেচ্ছাসেবক সৈন্য ছিল। তাই এখানে আমরা ধরে নিতে পারি—ইসলামের শত্রুশ্রেণির প্রতিটি সদস্যই ছিল সৈন্য এবং যোদ্ধা। তারা সকলে মিলে শত্রুপক্ষের সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী বিবেচিত হতো। আর প্রতিপক্ষের সৈন্যবাহিনী যাকে যখন যেখানে পাওয়া যাবে, যেখানেই পাওয়া যাবে প্রতিপক্ষের কাউকে—তাকে পরাজিত কিংবা হত্যা করা হয়ে উঠেছিল একান্ত কর্তব্য। ফলে, পুরো শত্রুপক্ষকে বলা যায় উর্দিবিহীন সম্মিলিত সেনাবাহিনী। এই অবস্থাতে কোথাও এক-দুইটি সাপকে চলে যেতে দেখে নীরবে ছেড়ে দেওয়া কোনো বুদ্ধিমানের পরিচায়ক ছিল না। কারণ, সাপ যে কোনো মুহূর্তেই দংশন করতে পারে।

হিজরতের রাতেই মক্কার মুশরিক-সম্প্রদায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছিল। যুদ্ধের সেই ঘোষণাবাণী তখনো ইথারে ভেসে বেড়াচ্ছিল। তাই একজন সতর্ক সচেতন কুশলী রাষ্ট্রনায়কের জন্যে এই অবস্থাতে চোখ বন্ধ করে থাকার কোনো অবকাশ ছিল না। ফলে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করবার পর মক্কার মুশরিকদের দুষ্টুমি-দমনে এবং তাদের সব রকমের ষড়যন্ত্র ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

পর্যবেক্ষণ এবং সংবাদমাধ্যম

এই পরিস্থিতিতে মদীনার চারপাশে মক্কার মুশরিকদের তৎপরতার প্রতি সবিশেষ নজরদারি এবং এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা ছিল একটি আশু প্রয়োজন। শত্রুর নীরবতা বরাবরই ভয়াবহ হয়ে থাকে। দৃশ্যত মদীনায় আসার পর মুসলমানগণ সার্বিক মানসিক স্বস্তি লাভ করেন। কিন্তু হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে যথার্থ সচেতন হওয়ার কারণে বিশ্বাস করতেন—শত্রু একবার ব্যর্থতার আগুনে পোড়ার পর কখনো চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। কুরাইশের মতো দাম্ভিক এবং অহংকারী-গোষ্ঠী মনে-প্রাণে ব্যর্থতাকে মেনে নেবে, এটা অসম্ভব। এ কারণেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার চারপাশে এবং মদীনার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া ব্যবসায়ী কাফেলার পথঘাট এবং সেখানে সম্পাদিত সব রকমের তৎপরতা সম্পর্কে সংবাদ লাভের যথাযথ ব্যবস্থা করেন—কখন কোন কাফেলা এ পথে যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে, কাফেলায় লোকসংখ্যা কত, এই কাফেলায় বিখ্যাত নবীদুশমনদের মধ্যে কে কে আছে, তাদের সঙ্গে কী পরিমাণে বাহন আছে এবং কী কী বাহন আছে? সেকালের আরবদের প্রত্যেক কাফেলার প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে অস্ত্র থাকা একটি স্বাভাবিক বিষয় ছিল। তাই এ পথে গমনকারী প্রতিটি কাফেলাই সশস্ত্র—এ কথা নবীজির জানা ছিল। এই পরিস্থিতিতে তিনি শত্রুপক্ষকে প্রভাবিত করতে এবং তাদের অন্তরে মুসলমানদের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করতে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি পঁচিশ-পঞ্চাশজন যুবকের একেকটি সশস্ত্র টিম একেক দিকে পাঠিয়ে দিতেন। মাঝেমধ্যে হামলা করারও আদেশ করতেন। উদ্দেশ্য ছিল, যেন এই পদক্ষেপের কারণে শত্রুপক্ষের সাহস ভেঙে পড়ে। তাদের শত্রুতা এবং প্রতিশোধস্পৃহা ডানা নামিয়ে দিতে বাধ্য হয়। দু'টি দেশ তাদের সীমান্তে ঠিক যেভাবে সৈন্য-মহড়া দিয়ে থাকে—অবস্থাটা ছিল প্রায় সেই রকমেরই। সীমান্ত রক্ষা করা, সীমান্ত পাহারা দেওয়া যে কোনো সচেতন শাসক ও সিপাহসালারের প্রধান কর্তব্য। নিজেদের দেশ ও সীমান্ত-রক্ষা, প্রতিপক্ষের অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং সতর্কতায় যত্নবান হওয়ার লক্ষ্যে সদা সজাগ ও তৎপর মুসলমানদের এইসব টিমকে ইসলামের ইতিহাসে সারিয়্যা বলা হয়। এসব সারিয়্যার সংখ্যা সত্তর থেকে আশিটি। দেখা গেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও কোথাও ছোট ছোট টিম পাঠিয়েছেন। তারা দেশ ও বিশ্বাস রক্ষার অনির্বাণ চেতনায় অস্ত্র হাতে ছুটে গেছেন। কিন্তু শত্রুর সঙ্গে তাদের কোনো মোকাবেলা হয়নি, লড়াই হয়নি। এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সশস্ত্র তৎপরতায় তরবারি ঝংকৃত হয়েছে খুব কমই। তবে মক্কার মুশরিকদের মধ্যে একটা ভীতি ছড়িয়েছে অবশ্যই। তাদের সাহস মৃত্তিকামুখি হয়েছে। যারা নানা ছুতো খুঁজে খুঁজে অসহায় দুর্বল মুসলমানদের ধরে এনে অত্যাচার করত আর নিজেদেরকে মনে করত পৃথিবীর সবচেয়ে সাহসী জাতি—তারাই এখন মদীনার আশপাশ দিয়ে দলবেঁধে যাওয়ার সময় ভয়ে কম্পিত হয়। তাদের অন্তর দুরুদুরু করে। মানসিক এই বিপ্লব ছিল মুসলমানদের অনেক বড় বিজয়।

সর্বপ্রথম সাহসী পদক্ষেপ

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারেন, মক্কার একটি দল সমুদ্রের তীরবর্তী পথ হয়ে সিরিয়া যাচ্ছে। নবীজি তার চাচা হযরত হামযাকে ডেকে বলেন, আপনি এখনই তিরিশজন মুহাজির নিয়ে সমুদ্রের তীরবর্তী পথের দিকে বেরিয়ে পড়ুন। আনসারীগণকে সঙ্গে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। সময়টা ছিল রমযান মাস।[১]

হযরত হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহু তিরিশজন আরোহী নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। সমুদ্রবর্তী পথ দিয়ে তখন আবু জেহেলের নেতৃত্বে তিনশো সদস্যের একটি দল যাচ্ছিল। তারা যাচ্ছিল সমুদ্রের তীর ঘেঁষে। তাদেরকে দেখামাত্র হযরত হামযা আক্রমণের জন্যে এগিয়ে যান। তারাও বিপদ দেখে মোকাবেলার জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার বিখ্যাত নেতা মাজদী ইবনে আমর আল জুহানী মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। উভয় পক্ষকে কোনোরকম বুঝিয়েসুজিয়ে আপাতত নিরস্ত্র করে। ফলে, এ যাত্রায় কোনো যুদ্ধ হয়নি। হযরত হামযা সেখান থেকে ফিরে আসেন। তবে এই দুঃসাহসী পদক্ষেপের কারণে শত্রুশিবিরে একটা বড় ধাক্কা লাগে। যে আবু জেহেল মক্কায় যেকোনো দুর্বল মুসলমানকে যখন-তখন চড় বসিয়ে দিত, এই আবু জেহেলই হযরত সুমাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বর্শার

---

১ ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, ১ : ৫২১; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ২৩৪।

আঘাতে শহীদ করে দিয়েছিল, এই আবু জেহেলই আবু বকর-কন্যা হযরত আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে চড় মেরে তার কানের দুল মাটিতে ফেলে দিয়েছিল, কিন্তু কেউ তাকে কোনো জবাব দিতে পারেনি, মুসলমানদের জবাব দেওয়ার মতো কোনো অবস্থা ছিল না—আজ হযরত হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর এই দুঃসাহসী পদক্ষেপে আবু জেহেল বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়—এখন আর মুসলমানগণ অসহায় এবং দুর্বল নয়। এখন তারা ইচ্ছা করলে আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়াতে পারে। আঘাতের পিঠে আঘাত করতে পারে। ভবিষ্যতে তারা আমাদের কৃতকর্মের শাস্তিও দিতে পারবে।

দ্বিতীয় দল প্রেরিত হলো

এক মাস পর শাওয়াল মাসে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারেন—সানিয়্যাতুল মাররাহ এলাকায় কুরাইশ-সম্প্রদায় তাঁবু ফেলেছে। নবীজি সঙ্গে সঙ্গে আবু উবায়দা ইবনুল হারেস ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে ষাট কিংবা আশিজন সওয়ারিসহ সেখানে পাঠান। এই টিমেও কোনো আনসার সাহাবী ছিলেন না। তারা সানিয়্যাতুল মাররার কাছাকাছি পৌঁছে দেখেন সেখানকার নিম্নাঞ্চলে কুরাইশদের বিশাল বাহিনী। এখানেও যুদ্ধ হয়নি। তবে হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু একটি তির বের করে কুরাইশদের দিকে নিক্ষেপ করেন। কুরাইশ-সম্প্রদায় জানতে পারে—মুসলমানগণ তাদের পিছু নিয়েছেন। কুরাইশদের এই দল থেকে তখন মিকদাদ ইবনে আমর আল বাহরামী আর উকবা ইবনে গাযওয়ান বের হয়ে মুসলমানদের কাছে চলে আসেন। কারণ, প্রকৃতপক্ষে তারা ছিলেন মুসলমান। কুরাইশদের এই দলটির নেতৃত্বে ছিল ইকরিমা ইবনে আবু জেহেল।[১]

এই ধরনের বেশ কিছু দল মদীনা থেকে বিভিন্ন জায়গায় প্রেরণ করা হয়েছে। মক্কার মুশরিকদের তৎপরতার ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই অমনোযোগিতার পরিচয় দেননি।

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ২৩৭।

আরেকটি দল

এই মাসেই মদীনার চারণভূমি এবং মুসলমানদের পালিত পশুর ওপর কুরয ইবনে জাবের আল ফিহ্‌রী সদলবলে লুটেরা হামলা করে বসে। এর মোকাবেলায় হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। এই সময় নবীজি যায়েদ ইবনে হারেসাকে মদীনার শাসক ও দায়িত্বশীল নিযুক্ত করেন। তারপর সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে করে লুটেরাদের পাকড়াও করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু কোনোভাবে তারা জানতে পারে মুসলমানদের একটি বড় দল আমাদের ওপর আক্রমণ করার জন্যে আসছে। ফলে তারা সঙ্গে সঙ্গে পালাতে শুরু করে। নবীজি অনেক দূর পর্যন্ত তাদেরকে ধাওয়া করেন। বদর অঞ্চলের সীমানায় পৌঁছার পর মদীনায় ফিরে আসেন।

কেবলা পরিবর্তন

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় এসেছেন ষোলো মাস হয়েছে। তখনো পর্যন্ত মুসলমানদের কেবলা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস। ওই দিকে ফিরেই তারা নামায আদায় করতেন। কিন্তু হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন থেকে কামনা করতেন—বায়তুল্লাহ যদি আমাদের কেবলা হত! দীর্ঘ ষোলো মাস পর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এই মর্মে আদেশ অবতীর্ণ হয়—

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর মুসলমানদের কেবলা বদলে যায়। কাবা শরীফ হয়ে ওঠে তাদের সম্মানিত কেবলা। এই আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার পর সর্বপ্রথম আসর নামায আদায় করা হয়।[১]

রোযার বিধান

নামায মক্কাতেই ফরয হয়েছিল। রমযানের রোযা ফরয হয় মদীনায় আসার পর—হিজরতের দ্বিতীয় সালে। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ২৫৩।

আদেশ অবতীর্ণ হয়—

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমনটি তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল। [বাকারা : ১৮৩]

রমযানের রোযা ফরয হওয়ার আগে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ বিশেষ দিনে রোযা রাখতেন। এর আগে আশুরার রোযাও রেখেছেন। শাবান মাসে যখন রমযানের রোযা সম্পর্কিত ওহী অবতীর্ণ হলো, তখন অন্য সকল রোযা রহিত হয়ে গেল। ফরয হিসেবে অবশিষ্ট রইল রমযানের রোযা।[১]

বদর যুদ্ধ : ইসলামের বিজয়ের সূচনা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের পর মক্কার মুশরিক-সম্প্রদায় নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকেনি। তারা ইসলামের শক্তিকে ভেঙে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বরাবর চিন্তা করেছে। নানা কৌশল নিয়ে ভেবেছে। কারণ, নবীজি এখন একটি নিরাপদ শহরে আশ্রিত। তাঁকে হেফাজতের জন্যে কাফনের কাপড় কাঁধে নিয়ে সদাপ্রস্তুত জানবাজ এক বিশাল বাহিনী। তাই এখন কোনো ধরনের প্রস্তুতি ছাড়া নবীজির বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এজন্যে মক্কার মুশরিক-সম্প্রদায় অনেক ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নিল—কুরাইশদের প্রতিটি পরিবার থেকে পুঁজি সংগ্রহ করে জাতীয় পর্যায়ে বাণিজ্য করা হবে। এই বাণিজ্যে যা লাভ হবে, তা মুহাম্মাদেও [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যয় করা হবে। এর মুনাফার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কেনা হবে। এ থেকে যুদ্ধেও ব্যয়ভার বহন করা হবে। সিদ্ধান্তমাফিক পদক্ষেপ গস্থহণ করা হয়। সংগৃহীত অর্থসহ আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে ব্যবসায়ী কাফেলা সিরিয়ার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়। সিরিয়া থেকে সফল ব্যবসা কওে ফিওে আসার পর আবু সুফিয়ান বলেছিলেন—

والله ما بمكة من قرشي ولا قرشية له نش فصاعدا الا قد بعث به معنا.

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ২৫৪।

কুরাইশদের নারী-পুরুষ এমন কেউ নেই, যে তার কম-বেশি পুঁজি আমাদের এই ব্যবসায় বিনিয়োগ করেনি।[১]

আবু সুফিয়ান তিরিশ কিংবা চল্লিশ ব্যক্তির একটি ব্যবসয়ী দল নিয়ে সিরিয়া যান। সফল ব্যবসা সম্পাদনের পর মক্কায় ফিরছিলেন। যদি এই পুঁজি কুরাইশদের হাতে এসে পৌছয়, তা হলে নবীজির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে তারা বড় অংকের অর্থ হাতে পাবে, বড় করে তারা যুদ্ধেরও সূচনা করতে পারবে।

বিচক্ষণতা এবং সুচিন্তিত কর্মকৌশল

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম বরাবর মক্কার মুশরিকদের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবগত করত। সেই ধারাবাহিকতায় আবু সুফিয়ানের কাফেলা সম্পর্কেও হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বরাবর তথ্য সংগ্রহ করতে থাকেন। অবশেষে যখন এই ব্যবসায়ী দলটি সিরিয়া থেকে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করে, তখন নবীজি বিষয়টি জানতে পারেন। এও জানতে পারেন—দলটি মদীনার পার্শ্ববর্তী একটি পথ দিয়ে যাবে। এই ব্যবসায়ী দলটিকে অবহেলা করা হবে অনেক বড় একটি রাজনৈতিক ভুল। এদেরকে নিরাপদে ঘরে ফিরে যেতে দেওয়ার অর্থ হলো, শত্রুকে শক্তিসঞ্চয় করতে দেওয়া এবং নিজেদের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ দেওয়া। যখন এই দলটি সম্পর্কে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব ধরনের তথ্য হাতে পান, তখন সাহাবায়ে কেরামকে সমবেত করে বলেন—

هذه عير قريش فيها اموالهم فاخرجوا اليها لعل الله ينفاكموها.

কুরাইশদের ব্যবসায়ী কাফেলা তোমাদের সামনে। চলো, আল্লাহ তাআলা হয়তো তাদের সম্পদ তোমাদের হাতে তুলে দেবেন।[২]

শত্রুর যুদ্ধ প্রস্তুতিকে আগেভাগেই তছনছ করে দিতে পারা যুদ্ধজয়ের একটি মূলনীতি। শত্রু আশ্রয় নিতে পারে, এমন যে কোনো ডালপালা

---

১ ইবনে সাদ, *আত তাবাকাতুল কুবরা*, ২ : ১৩।

২ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ২ : ২৪৪।

আগে থেকেই কেটে ফেলা দক্ষ সিপাহসালারের বৈশিষ্ট্য। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচ্ছিলেন—এই ব্যবসায়ী দলের ওপর হামলা করে কুরাইশদের মাথা থেকে যুদ্ধের নেশা নামিয়ে দেবেন। তিনি চাচ্ছিলেন, তারা যেন খালি হাতে মক্কায় ফিরে যায়। তাদের সাহসের ওপর যেন বরফ নেমে আসে। মুসলমানদের একটি দল নিয়ে তিনি মদীনা থেকে বেরিয়ে পড়েন। মদীনায় নামায পড়াবার দায়িত্ব দিয়ে যান আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমকে। আর শহরের দেখাশোনার ভার দিয়ে যান হযরত আবু লুবাবাকে।[১]

আবু সুফিয়ানের সতর্কতা

মদীনার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আবু সুফিয়ান গোয়েন্দা পাঠিয়ে মুসলমানদের অবস্থা জানার চেষ্টা করেন—মুসলমানগণ তাদের পথে কোনো সংকট সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছে কিনা! তা ছাড়া তিনি ওই পথে আগত যে কারও কাছ থেকে নিজেও তথ্যাদি সংগ্রহ করছিলেন। এরই মধ্যে প্রেরিত গোয়েন্দাদল এসে তাকে অবহিত করে, মুসলমানগণ তাদের কাফেলার ওপর আক্রমণ করার জন্যে পূর্ণ প্রস্তুত। তারা এই উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। এই সংবাদ পাওয়ামাত্র আবু সুফিয়ান সর্বপ্রথম যমযম ইবনে আমরকে একটি দ্রুতগামী উষ্ট্রীতে করে মক্কায় পাঠিয়ে দেন। তাকে বলে দেন—মক্কায় গিয়ে ঘোষণা করে দাও—কুরাইশ যেন এখনই তাদের কাফেলা বাঁচাবার জন্যে ছুটে আসে।[২]

আবু সুফিয়ান যমযমকে পাঠিয়ে দেওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে তার পথ বদলে ফেলেন। সমুদ্রতীরবর্তী পথে চলতে শুরু করেন। কাফেলার গতি বাড়িয়ে দেন—যেন যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব মদীনার সীমানা পেরিয়ে যেতে পারেন।

মক্কার তৎপরতা

মক্কার মুশরিক-সম্প্রদায় মোটামুটি নিশ্চিন্তই ছিল। তারা তাদের কাফেলার পথ চেয়েছিল। এরই মধ্যে এক রাতে আবদুল মুত্তালিবের কন্যা,

---

১ ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, ১ : ৫২৫; ইবনে সাদ, *আত তাবাকাত*, ২ : ১২।

২ *সীরাতে ইবনে ইবনে হিশাম*, ২ : ২৪৪; ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, ১ : ৫২৫।

হযরত আব্বাসের বোন এবং নবীজির ফুপু আতেকা একটি স্বপ্ন দেখেন। তখনো পর্যন্ত হযরত আব্বাস এবং আতেকা কেউই মুসলমান হননি। মক্কায় মুশরিকদের সঙ্গেই বসবাস করছিলেন। আতেকা স্বপ্নে দেখলেন—এক ব্যক্তি উটে করে মক্কায় এসেছে। বাতহ নামক জায়গায় দাঁড়িয়ে সে চেঁচিয়ে বলছে—হে প্রতারক-সম্প্রদায়, প্রত্যেকেই নিজ নিজ মরণস্থলের দিকে চলো। আতেকা সকালবেলা তার ভাই হযরত আব্বাসকে ডেকে এই স্বপ্নের কথা বলেন। এও বলেন, আমি দেখলাম—তার ডাকে অনেক লোক এসে সমবেত হয়েছে। সে ছুটে চলেছে। আর মানুষ তার পেছনে পেছনে যাচ্ছে। তারপর সে কাবা শরীফের ছাদে উঠে গেল। ছাদে দাঁড়িয়ে তিনবার একই ঘোষণা করল। তারপর সে একটি পাথর তুলে পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে ছুঁড়ে মারল। পাথরটি টুকরো টুকরো হয়ে গেল। সেই টুকরোগুলো মক্কার সবগুলো ঘরে গিয়ে পড়ল। হযরত আব্বাস স্বপ্ন শোনার পর বোনকে বললেন—এই স্বপ্নের কথা কাউকে বোলো না।[১]

গোপন রইল না স্বপ্ন

ওলীদ ইবনে উতবা ছিল হযরত আব্বাসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে তার বোনের স্বপ্নের কথা বললেন। সঙ্গে জোর দিয়ে বললেন—এই কথা কাউকে বোলো না।[২]

কিন্তু ওলীদ এই স্বপ্নের কথা তার বাবা উতবা ইবনে রাবীআকে বলে দিলো। উতবা গিয়ে কথাটি পুরো কুরাইশদের মধ্যে ছড়িয়ে দিলো। ফলে কুরাইশদের প্রতিটি বৈঠকের আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠল হযরত আতেকার স্বপ্ন। হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি সকালবেলা কাবায় গেলাম। দেখলাম, আবু জেহেল এবং কুরাইশের অনেক লোক বসে আছে। তারা সকলে মিলে আতেকার স্বপ্ন নিয়ে আলোচনা করছে। আমাকে দেখামাত্র আবু জেহেল বলল, আবুল ফযল, তাওয়াফ শেষ করে আমাদের কাছে চলে এসো। হযরত আব্বাস মজলিসে আসার পর আবু জেহেল বলল, জানতে পারলাম, তোমাদের বংশে নাকি একজন মহিলা নবীর

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ২ : ২৪৪-২৪৬।

২ ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, ১ : ৫২৫।

আবির্ভাব হয়েছে? হযরত আব্বাস বললেন, কী বলতে চাচ্ছ? আবু জেহেল তখন হযরত আতেকার স্বপ্নের কথা বলল। এও বলল, এ পর্যন্ত তো তোমাদের বংশে পুরুষ নবী হতো, এখন তোমাদের মেয়েরাও নবী হতে শুরু করেছে। তারপর ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, আমি তিন দিন অপেক্ষা করব। যদি এই তিন দিনের মধ্যে এই স্বপ্নে বর্ণিত কোনো ঘটনা না ঘটে, তা হলে এইখানে কুরাইশদের মজলিসে এই মর্মে একটি প্রস্তাব লেখাব—

انكم اكذب اهل بيت في العرب.

তোমরা হলে আরবদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী পরিবার।

হযরত আব্বাস ঘরে ফিরে আসেন। সন্ধ্যায় খান্দানের মেয়েরা তার ঘরে সমবেত হয়। তারা সকলে হযরত আব্বাসকে এই বলে তাদের ক্ষোভের কথা জানায়—এই ইতর বদমাশ আবু জেহেল আমাদের খান্দানের ইজ্জত আব্রুর পেছনে তো আগে থেকেই লেগে আছে। এখন সে আমাদের খান্দানের মেয়েদের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করেছে। তুমি কেমন আত্মমর্যাদাহীন পুরুষ—তার কথা শুনে নীরবে ঘরে চলে এসেছ। হযরত আব্বাস অনেক কষ্টে তাদেরকে শান্ত করেন। মনে মনে সিদ্ধান্ত নেন, আবার যদি এমন ঘটনা ঘটে, তা হলে আবু জেহেলকে এমন মজা দেখাব, আমরণ যেন মনে রাখতে বাধ্য হয়।[১]

আবু সুফিয়ানের প্রতিনিধি মক্কায়

হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তৃতীয় দিন সকালবেলা আমি ক্ষুব্ধ মনে হেরেমে গেলাম। মনে মনে শপথ নিয়েছি, আজ আবু জেহেলকে শিক্ষা দেব। দেখলাম, আমাকে দেখামাত্র সে হেরেমের দরজার দিকে ছুটে গেল। অনুমান করলাম, আমার ক্ষোভ সে হয়তো টের পেয়েছে। এজন্যেই পালিয়ে গেছে। কিন্তু পরে বুঝলাম, বিষয়টি তা নয়। সে আবু সুফিয়ানের প্রতিনিধি যমযম ইবনে আমর গিফারীর আওয়াজ শুনতে পেয়েছে। তার আওয়াজ শুনেই বাইরে ছুটে গেছে। যমযম প্রান্তরে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছিল। সে

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ২ : ২৪৬।

উটের ওপর দাঁড়িয়েছিল। উটের নাক কেটে দিয়েছিল। উল্টে দিয়েছিল উটের হাওদা। তারপর গায়ের জামা ছিঁড়ে চিৎকার করে বলছিল—'আল গাউস, আল গাউস'—বাঁচাও, বাঁচাও! তোমাদের সমুদয় সম্পদ আবু সুফিয়ানের হাতে। মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এবং তার সঙ্গীগণ আবু সুফিয়ানকে ঘিরে ফেলেছে। তোমরা এখনই ছুটে যাও।[১]

যমযম ইবনে আমর আল গিফারী আসার পর কুরাইশের প্রতিটি মানুষ উন্মাদ হয়ে পড়ে। তারা প্রস্তুতির জন্যে ছোটাছুটি শুরু করে দেয়। শুধু আবু লাহাব ছাড়া কুরাইশের সম্ভ্রান্ত সকলেই এই দলে অংশগ্রহণ করে। আবু লাহাব তার স্থলে আসী ইবনে হিশাম ইবনে মুগীরাকে পাঠিয়ে দেয়। তার কাছে আবু লাহাবের পাওনা ছিল। তাই সে অস্বীকার করতে পারেনি। এর বাইরে মক্কার প্রতিটি পরিবার থেকেই কোনো না কোনো সদস্য আবু সুফিয়ানকে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে এই দলে অংশগ্রহণ করে। এই দলের সদস্য সংখ্যা ছিল নয়শো পঞ্চাশজন। তাদের সঙ্গে দুইশো ঘোড়া ছিল। সঙ্গে ছিল নর্তকী গায়িকা ও বাদিকা, যারা হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিন্দায় লিখিত গান গেয়ে বেড়াত বিভিন্ন মজলিসে। তারা এই দলে অংশগ্রহণ করেছিল।

মুসলমানদের বাহিনী

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা থেকে বের হন আট রমযান সোমবার। তাঁর বাহিনীতে সত্তরটি উট ছিল। আর ঘোড়া ছিল মাত্র দু'টি। একেকটি উটে তিনজন করে পালাক্রমে আরোহণ করতেন। মদীনা থেকে এক মাইলের পথ—বীরে আবু উতবায় পৌঁছার পর পুরো বাহিনীকে আরেকবার পরখ করেন। যারা অল্পবয়স্ক, তাদেরকে সেখান থেকেই মদীনায় পাঠিয়ে দেন। অবশেষে নবীজির সঙ্গে থেকে যান তিনশো পাঁচজন। তাদের মধ্যে মুহাজির ছিলেন চুয়াত্তর জন। অবশিষ্ট সকলেই মদীনার আনসার। আট ব্যক্তিকে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন। ফলে, তারা বদর যুদ্ধে

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ২ : ২৪৬।

অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তারপরও তাদেরকে অংশগ্রহণকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। তাদেরকে গনিমতের অংশ দেওয়া হয়েছে।[১] মোটকথা, বদরের ময়দানে মুশরিকদের সৈন্যসংখ্যা ছিল নয়শো পঞ্চাশজন। এদের বিপরীতে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল তিনশো পাঁচজন। অবশিষ্ট এমন আট ব্যক্তিকেও বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হিসেবে শুমার করা হয়েছিল, যারা যুদ্ধের ময়দানে ছিলেন না। নবীজির পক্ষ থেকে প্রদত্ত বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো—

এক. হযরত উসমান ইবনে আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তাঁর প্রিয় কন্যা হযরত রুকাইয়ার কাছে রেখে গিয়েছিলেন। হযরত রুকাইয়া ছিলেন হযরত উসমানের স্ত্রী। তখন তিনি খুবই অসুস্থ ছিলেন। তাকে দেখাশোনার জন্যে হযরত উসমানকে মদীনায় রেখে যান। এই সময়ই তিনি ইন্তেকাল করেন।

দুই. তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু।

তিন. সাঈদ ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু। এই দুইজনকে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সুফিয়ানের কাফেলার তথ্যসংগ্রহের জন্যে পাঠিয়েছিলেন। তাদের দায়িত্ব ছিল এই ব্যবসায়ী দলের তথ্য পাওয়ামাত্র নবীজিকে অবহিত করবেন। এই তিনজনই ছিলেন মুহাজির-শ্রেণির।

চার. আবু লুবাবা ইবনে আবদুল মুনযির আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু। নবীজি তাকে রেখে গিয়েছিলেন মদীনার হেফাজত ও দেখাশোনার জন্যে।

পাঁচ. আসেম ইবনে আদী আজলানী রাযিয়াল্লাহু আনহু। তাকে রেখে গিয়েছিলেন শহরের বাইরের হেফাজত ও তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্যে।

ছয়. হারেস ইবনে হাতেব রাযিয়াল্লাহু আনহু। কোবা অঞ্চলের রাওহা থেকে কবিলা আমর ইবনে আউফ পর্যন্ত অঞ্চলের দেখাশোনা ও হেফাজতের দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন তাকে।

---

১. *ইবনে সাদ*, ২ : ১২; *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ২ : ৩২৪-৩৫—এখানে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীর বিস্তারিত তালিকা দেওয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে মুহাজির সাহাবী ছিলেন তিরাশি জন। আউস গোত্রের একষট্টিজন এবং খাযরাজ গোত্রের সত্তরজন। তাদের প্রত্যেককেই গনিমতের অংশ দেওয়া হয়েছিল।-আসীর আদরবী

সাত. হারেস ইবনে সম্মাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু।

আট. খোরাত ইবনে যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু। এই দুইজনকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওসা অঞ্চলে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করেছিলেন।[১]

বদর যুদ্ধে মুসলমানগণ বিজয় লাভ করেন। গনিমতের সম্পদ অর্জিত হলে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আট ব্যক্তিকে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তিনশো পাঁচ ব্যক্তির মতোই গনিমতের অংশ দেন। তাদেরকে সমানহারে গনিমতের অংশ দেওয়াটাই প্রমাণ করে তারাও বদরী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত।

বিষয় হলো এই, যখন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনী বেরিয়ে পড়ে, তখন সেনাপতির আদেশই আইন বলে বিবেচিত হয়—এটাই যুদ্ধের মূলনীতি। সেনাপতির হুকুম লঙ্ঘন করা হয় হত্যাযোগ্য অপরাধ। সেনাপতি যাকে যে দায়িত্বে নিয়োজিত করবেন, সেই দায়িত্ব সম্পাদন করাই তার কর্তব্য। সেনাপতি কাউকে যুদ্ধাহতদের চিকিৎসার দায়িত্বে নিয়োজিত করতে পারেন, কাউকে বা যুদ্ধক্ষেত্রের আশেপাশে গোয়েন্দার দায়িত্বে নিয়োজিত করতে পারেন—যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে হওয়া সত্ত্বেও এইসব দায়িত্বে নিয়োজিতগণ ময়দানের যোদ্ধা হিসেবে বিবেচিত হন।

যেহেতু এই আটজনকে যুদ্ধের সেনাপতি যুদ্ধ শুরু করার সময় বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত করেছেন, তাই তাদেরকে মূল বাহিনীর সদস্য হিসেবেই শুমার করা হয়েছে। গনিমত এবং সাওয়াবের ক্ষেত্রেও তাদেরকে মূল যোদ্ধাদের সঙ্গী ধরা হয়েছে। এইভাবে ময়দানে যুদ্ধকারী তিনশো পাঁচ জন আর বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত আট জন মিলে মোট মুজাহিদের সংখ্যা দাঁড়ায় তিনশো তেরো জন। আমাদের ইতিহাসে এই সংখ্যাটিই বিখ্যাত।[২]

লড়াই হবে কার সঙ্গে?

বদর যুদ্ধের সময় দীর্ঘক্ষণ এটাই ঠিক করা যাচ্ছিল না—মুসলমানগণ আসলে কার বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাচ্ছে, কার সঙ্গে তাদের লড়াই হচ্ছে,

---

১ ইবনে সাদ, *তাবাকাত*, ২ : ১২; ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, ১ : ৫৩৯।

২ ইবনে সায়্যিদুন নাস, *উয়ুনুল আসার*, ১ : ৩৮৩।

শত্রুপক্ষের পরিমাণ কী, তাদের প্রস্তুতিই বা কেমন? মদীনা থেকে বের হওয়ার পর মুসলমানদের প্রধান অনুসন্ধান ছিল আবু সুফিয়ানের কাফেলা, তার অবস্থান এবং সে বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করা। যাখরান নামক উপত্যকায় পৌঁছার পর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুসাইস ইবনে আমর এবং আদী ইবনে যাগবা নামক দুইজন গুপ্তচর প্রেরণ করেন। তাদের কাজ ছিল, বদরের দিকে গিয়ে দেখা—আবু সুফিয়ানের কাফেলা এসেছে কি না! এই গুপ্তচর দুই সাহাবী যাখরান উপত্যকায় এসে নবীজিকে সংবাদ দিলেন আবু সুফিয়ানের কাফেলার কোনো পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। তবে মক্কার মুশরিকদের বাহিনী আবু সুফিয়ানের কাফেলাকে হেফাজত করার জন্যে আসছে।[১]

শঙ্কা অনুভব করল আবু সুফিয়ান

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুপ্তচর ফিরে আসার পর আবু সুফিয়ানের কাফেলা সেখানে পৌঁছয়, যেখান থেকে তারা ফিরে এসেছে। সেখানে এক বিখ্যাত ব্যক্তি ছিল বাজদী ইবনে আমর। আবু সুফিয়ান তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—এখানে কি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুপ্তচর এসেছিল? সে বলল, কোনো বিদেশিকে তো দেখিনি, তবে দুইজন আরোহীকে দেখেছি। অমুক জায়গা থেকে তারা ফিরে গেছে। আবু সুফিয়ান সঙ্গে সঙ্গে সেই জায়গাটায় ছুটে যায়। সেখানে গিয়ে উটের বিষ্ঠা পড়ে থাকতে দেখে। উটের বিষ্ঠা ভেঙে দেখার পর লক্ষ করে তাতে খেজুরের বিচি রয়েছে। এটা দেখামাত্র আবু সুফিয়ান ঘাবড়ে যায়। খোদার কসম করে বলে নিশ্চয় এটা ইয়াসরিবের উটের বিষ্ঠা। যারা এসেছিল, তারা মুহাম্মাদের গুপ্তচর। আবু সুফিয়ান সেখান থেকেই পথ বদল করে চরম অস্থিরতার মধ্যে তার কাফেলা নিয়ে ছুটতে থাকে। অবশেষে আশঙ্কার সীমানা পার করে যায়। নিরাপদ স্থানে পৌঁছার পর সঙ্গে সঙ্গে কুরাইশ-বাহিনীকে অবগত করে—আমরা নিরাপদ আছি, তোমরা ফিরে যেতে পারো, সামনে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আবু জেহেলের ঔদ্ধত্য তখন বাতাসে উড়ছিল। সে কসম করে বসল—আমরা প্রথমে বদর

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ২ : ২৫২-২৫৩।

যাব। সেখানে গিয়ে উৎসব করব। এর আগে মক্কায় যাব না। অবশ্য বনু যুহরা ও বনু আদীর লোকজন সেখান থেকেই তাদের বাড়ির দিকে রওনা হয়ে যায়।[১]

মতামত চাইলেন আনসারদের

প্রেরিত দুইজন গুপ্তচর ফিরে এসে যখন জানাল আবু সুফিয়ানের কাফেলার কোনো হদিস পাওয়া যাচ্ছে না, তবে তাদেরকে বাঁচাবার জন্যে কুরাইশদের এক বিরাট বাহিনী আসছে, তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মর্মে সংশয়বোধ করলেন—আনসার সাহাবীগণ তো তাদের শহরে আমাকে নিরাপত্তাদানের দায়িত্ব নিয়েছে। শহরের বাইরে এসে আমাদের শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার দায়িত্ব তো তারা নেয়নি, তারা এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে কোনো অঙ্গীকারও করেনি। এখন আমরা যদি অগ্রসর হই, তা হলে ব্যবসায়ী কাফেলার পরিবর্তে সশস্ত্র এক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, তাই এখানে আনসারদের মতামত জানা জরুরি।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানেই যাত্রাবিরতি করেন। সাহাবায়ে কেরামের সামনে নতুন পরিস্থিতি তুলে ধরেন। তারপর তাদের মতামত জানতে চান। প্রথমেই দাঁড়িয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা সর্বাবস্থায় আপনার সঙ্গে আছি। একই কথা হযরত উমরও বলেন। হযরত মিকদাদ ইবনে আমর দাঁড়িয়ে এক আবেগঘন বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা বনী ইসরাঈল নই—যে, আমরা আমাদের পয়গম্বরকে এ কথা বলে দেব—

فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ.

আপনি ও আপনার প্রভু গিয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করুন। আর আমরা এখানেই বসে থাকব। [মায়েদা :২৪]

আমরা বরং আপনার সঙ্গে আছি। কয়েক কদম সামনেই তো বদর। আমাদেরকে যদি ইয়েমেনের সীমান্ত পর্যন্ত ছুটে যেতে হয়, তবুও আমরা

---

১ ইবনে সাদ, *তাবাকাত*, ২ : ১৩ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ২ : ২৫৮; ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, ১ : ৫২৮; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ২৬৬।

আপনার সঙ্গেই থাকব। আমরা আগত সকল শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত আছি।[১]

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সকলকে দুআ দেন। অতঃপর বলেন, হে লোকসকল, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও। তোমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতামত জানাও। নবীজির ইঙ্গিত ছিল আনসারদের প্রতি। নবীজি তাদেরই মতামত জানতে চাচ্ছিলেন। হযরত সাদ ইবনে মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু বিষয়টি অনুমান করতে পারেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি মনে হয় আমাদের মতামত জানতে চাচ্ছেন। নবীজি বললেন, হ্যাঁ। এর উত্তরে হযরত সাদ ইবনে মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু এক আবেগঘন উত্তাপপূর্ণ ভাষণ দেন। তার সে ভাষণে মুসলমানদের পুরো বাহিনীতে নতুন প্রাণ ছড়িয়ে পড়ে। তিনি তার ভাষণে বলেন—

ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি। আপনাকে সত্য বলে মেনেছি। আমরা সাক্ষ্য দিয়েছি, আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সব সত্য। আমরা আপনার হাতে আনুগত্যের শপথ নিয়েছি। আমরা আপনার সামনে অঙ্গীকার করেছি। সুতরাং, আপনি যা খুশি সিদ্ধান্ত নিন। আমাদেরকে কী করতে হবে, আদেশ করুন। আমরা সর্বাবস্থায় আপনার সঙ্গে আছি, থাকব। ওই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন—আপনি যদি আমাদেরকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেন, তা হলে সকল আনসারী সমুদ্রেই ঝাঁপিয়ে পড়ব, আমাদের মধ্যে একজনও পেছনে থাকবে না। আমরা শত্রুকে ভয় করার মানুষ নই। আমরা অবিচল যুদ্ধ করার মানুষ। আমরা যখন শত্রুর মুখোমুখি হই, তখন আমাদের মাথা থাকে আমাদের মুঠোয়। আমরা জীবন বিলিয়ে দিয়ে লড়াই করি। আমরা আশা করি—শত্রুর সঙ্গে যখন লড়াই হবে, তখন আমাদের পদক্ষেপ দেখে আপনার চোখ শীতল হবে।[২]

সাদ ইবনে মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর এই ভাষণে নবীজি খুশি হন। তাকে দুআ দেন এবং বলেন, সাহসের সঙ্গে সামনে চলো। আল্লাহ তাআলা

---

১ ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, ১ : ৫২৮।

২ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ২ : ২৫৪; ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, ১ : ৫২৮।

আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন—ওদের দুটো দলের যে কোনো একটি আমরা জয় করব। আর আমি এখান থেকেই ইসলামের শত্রুদের মৃত্যুর স্থানগুলো দেখতে পাচ্ছি।

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী ইবনে আবু তালেব, যুবায়ের ইবনুল আওয়াম এবং সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসসহ কয়েকজন সাহাবীকে বদর-প্রান্তরের দিকে পাঠিয়ে দেন। তারপর তিনি অবশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে বদরের দিকে যেতে থাকেন। প্রেরিত অগ্রদল পানিবাহী দুই উটচালককে পথে পেয়ে গ্রেপ্তার করে। তারপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করে—তোমরা কাদের জন্যে পানি নিয়ে যাচ্ছ? তারা বলল, মক্কা থেকে আগত কুরাইশ-বাহিনীর জন্যে। তখন তারা তাদেরকে শক্ত করে চপেটাঘাত করে বলে, আমাদের সঙ্গে তোমরা মিথ্যে বলছ। তোমরা কি আবু সুফিয়ানের কাফেলার জন্যে পানি নিয়ে যাচ্ছ না? তারা দেখল, আমরা যদি আবু সুফিয়ানের কথা না বলি, তা হলে আবার মার খাব। তাই সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যা বলতে শুরু করে—হ্যাঁ, আমরা আবু সুফিয়ানের কাফেলার জন্যে পানি নিয়ে যাচ্ছি। সাহাবীগণ তাদেরকে ছেড়ে দেয়। এই সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ছিলেন। নামায শেষ করে বললেন, এরা যখন সত্য বলছিল, তখন তোমরা মেরেছ। আর যখন মিথ্যা বলেছে, তখন ছেড়ে দিয়েছ। কুরাইশদের বাহিনী আসছে। তারা এই পাহাড়ের পেছনেই আছে।[১]

বদর যুদ্ধ

মক্কার মুশরিক-বাহিনী বদর-প্রান্তরে সামনাসামনি এসে দাঁড়ায়। কুরাইশ-বাহিনী তাদের সংখ্যাধিক্য এবং বিপুল পরিমাণে যুদ্ধসামগ্রী সঙ্গে থাকায় অহংকারে মাটিতে পা পড়ছিল না। উত্তাপে আবেগে গজগজ করছিল। উভয় পক্ষ যখন সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন কুরাইশ-বাহিনীর সারি ভেঙে সামনে চলে আসে উতবা ইবনে রাবীআ, শায়বা ইবনে রাবীআ এবং ওলীদ ইবনে উতবা। এসেই চেঁচিয়ে চ্যালেঞ্জ দেয়—

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩:২৬৫।

هل من مبارز؟

তোমাদের মধ্যে আমাদের সঙ্গে লড়বার মতো কোনো বাহাদুর আছে?

সঙ্গে সঙ্গে তিনজন আনসারী সাহাবী এগিয়ে যান।

তোমরা কারা?—কুরাইশ-যোদ্ধারা জানতে চায়। তারা বললেন, আমরা আনসার। তখন কুরাইশ-যোদ্ধারা বলল—

نحن نريد بني عمنا

আমরা তো আমাদের খান্দানের যোদ্ধাদের চাচ্ছি।

তোমরা চলে যাও। বিষয়টি হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানার পর হযরত হামযা হযরত আলী এবং হযরত উবায়দাকে তাদের মোকাবেলা করার জন্যে পাঠিয়ে দেন। হযরত হামযা শায়বাকে, হযরত আলী ওলীদ ইবনে উতবাকে কয়েক মিনিটের মধ্যে ধুলো গিলিয়ে দেন। হযরত উবায়দা অনেক্ষণ পর্যন্ত উতবার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যান। হযরত হামযা এবং হযরত আলী নিজ নিজ কাজ শেষ করার পর উতবার দিকে এগিয়ে যান এবং সংক্ষেপে তার লাশ মাটিতে বিছিয়ে দেন।[১]

নিহত হলো আবু জেহেল

আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন বদর-প্রান্তরে যোদ্ধাগণ সারিবদ্ধ হয়ে অবস্থান গ্রহণ করলেন, তখন আমিও একটি সারিতে দাঁড়ালাম। দাঁড়াবার পর যখন ডানে বামে লক্ষ করলাম, তখন দেখলাম, আমার ডানপাশে একজন অল্পবয়সী আনসারী। আমার বামপাশেও ঠিক তার বয়সেরই আরেকজন আনসারী। আমি মনে মনে হতাশ হলাম। ভাবলাম—এরা ছেলেমানুষ। যুদ্ধের কোনো অভিজ্ঞতা এদের নেই। যুদ্ধ যদি ভায়াবহরূপ পরিগ্রহ করে, তখন এই অনভিজ্ঞ অল্পবয়স্ক যোদ্ধাদের মাঝে দাঁড়িয়ে আমি কী করব? ভালো হতো, যদি আমার ডানে বামে শক্ত সমর্থ অভিজ্ঞ যোদ্ধা থাকত। কিন্তু কী করব? যুদ্ধের

---

১ *আবু দাউদ; মেশকাত শরীফ*, ৩৪৩।

বিন্যাস সমাপ্ত হয়েছে। আমি তখন রণাঙ্গনের দিকে তাকিয়ে আছি। এরই মধ্যে আমার ডান পাশের ছেলেটি আমার কোমরে আঙুল রেখে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বলল, চাচাজান, আপনি আবু জেহেলকে চেনেন? আমি বললাম, চিনি। কিন্তু ভাতিজা, তুমি তাকে দিয়ে কী করবে? ছেলেটি বলল, মানুষের কাছে শুনেছি, এই নরাধম হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালিগালাজ করে, বরাবর মন্দ বলে। খোদার কসম করে বলছি, তাকে যদি আমি দেখি, তা হলে হয়তো সে মৃত্যুবরণ করবে কিংবা আমি; এর আগে তার শরীর থেকে আমার শরীর আলাদা হবে না। ছেলেটির সাহসে আমি বিস্মিত হলাম। অবাক হয়ে ভাবলাম, একজন অনভিজ্ঞ ছেলেমানুষ আর আবু জেহেল হলো হাজার জনের সমান এক অভিজ্ঞ যোদ্ধা আর এই ছেলে তার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে প্রস্তুত। আমার বিস্ময় তখনো কাটেনি। এরই মধ্যে দ্বিতীয় ছেলেটি আমাকে লক্ষ করে ঠিক ওই কথাই বলল—প্রথম জন আমাকে যা বলেছিল। তাদের কথা মাত্র শেষ হয়েছে, আমার দৃষ্টি কুরাইশ-বাহিনীর ওপর। লক্ষ করলাম—আবু জেহেল সারি ভেঙে বাইরে এসে সৈন্যবাহিনীর সারি ঠিক করছে। আমি তখন ওই দুই ছেলেকে বললাম, দ্যাখো, যোদ্ধাদের সারির সামনে যে লোকটি ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এ-ই আবু জেহেল—তোমরা যাকে খুঁজছ। আমার কথা তখনো শেষ হয়নি—ওই দুই কিশোর বাজপাখির মতো ডানা ঝাপটে ছুটতে লাগল। তাদের হাতে কোষমুক্ত তরবারি। তারা শত্রুবাহিনীর কাছে চলে যায়। কাছে গিয়ে আবু জেহেলের ওপর এলোপাথারি তরবারি চালাতে থাকে। আবু জেহেল মাটিতে পড়ে গেলে তারা আবার উল্টো ছুটে এসে মুসলমানদের সারিতে দাঁড়িয়ে যায়। এই দুই কিশোর ছিল সাহাবিয়া হযরত আফরা রাযিয়াল্লাহু আনহার দুই পুত্র।[১]

শেষ হলো যুদ্ধ

হিজরী দ্বিতীয় বর্ষের সতেরো রমযান। শুক্রবার। এই দিন বদর যুদ্ধের ফয়সালা হয়। যুদ্ধে মুসলমানগণ বিজয় লাভ করেন। মুসলমানদের মধ্যে ছয়জন মুহাজির এবং আটজন আনসার শাহাদাত বরণ করেন। মুশরিকদের

---

১ *বুখারী ও মুসলিমের সূত্রে মেশকাত*, ৩৫১-৩৫২।

মধ্যে সত্তর জন নিহত হয়। বন্দি হয় সত্তর জন। এই সত্তর জনকে বেঁধে মদীনায় আনা হয়।[১]

এই যুদ্ধে কুরাইশদের উল্লেখযোগ্য অধিকাংশ নেতা মারা পড়েন। এদের মধ্যে শায়বা, উতবা, ওলীদ ইবনে উতবা, আস ইবনে সাঈদ ইবনে আস, আবু জেহেল ইবনে হিশাম, আবুল বুখতারী, হানজালা ইবনে আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, যামআহ ইবনুল আসওয়াদ, নাওফাল ইবনে খুওয়াইলিদ, উকবা ইবনে আবু মুঈত, আস ইবনে হিশাম ইবনে মুগীরা এবং উমাইয়া ইবনে খালফ প্রমুখ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কী জীবনে এদের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এদের হাতে মুসলমানদেরকে প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হতে হয়েছে। আর যারা মদীনায় গ্রেপ্তার হয়ে এসেছিল, তাদের মধ্যে নাওফাল ইবনে হারেস ইবনে আবদুল মুত্তালিব, আকীল ইবনে আবু তালেব, আবুল আস ইবনে রবী [নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামাতা, হযরত যায়নাবের স্বামী], আদী ইবনে খিয়ার, ওলীদ ইবনুল ওলীদ ইবনুল মুগীরা এবং আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে খালফ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২]

যুদ্ধবন্দিদের বিষয়

বদর-প্রান্তর থেকে যাদেরকে গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার নির্দেশে তাদের ফয়সালার ভার সাহাবায়ে কেরামের মত ও ফয়সালার ওপর ছেড়ে দেন। জানিয়ে দেন—তারা পরামর্শ করে যে বিষয়ে একমত হবে, সেটাই করা হবে। এ বিষয়ে নবীজি কোনো মত দেননি। সাহাবায়ে কেরামের কেউ কেউ পরামর্শ দেন—এদেরকে মেরে ফেলা হোক—নাপাক কমে যাবে, দুনিয়া পবিত্র হবে। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবীর মত ছিল, তাদেরকে জরিমানা করা হোক। জরিমানার অর্থ যারা আদায় করবে, তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে। হয়তোবা তাদের মধ্যে কারও ঈমান নসিব হতে পারে এবং তারা দীনের খেদমত করারও সুযোগ লাভ করতে পারে। অবশেষে সকলে এই মতে

---

১ ইবনে সাদ, *তাবাকাত*, ২ : ১৮।

২ ইবনে সাদ, *তাবাকাত*, ২ : ১৮।

একমত হন। জরিমানা নির্ধারণ করা হয় এক হাজার দুই হাজার তিন হাজার এবং চার হাজার দেরহাম। এই অর্থদণ্ড মূলত প্রত্যেক বন্দির অর্থনৈতিক অবস্থার বিবেচনায় নির্ধারণ করা হয়েছিল। বন্দিদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল একেবারে নিঃস্ব। কোনো রকমের অর্থদণ্ড আদায় করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়—যারা লেখাপড়া জানে, তারা মুসলমানদেরকে লেখা-পড়া শেখাবে। তারপর তাদেরকে অর্থদণ্ড ছাড়াই ছেড়ে দেওয়া হবে।[১]

মক্কায় রোল পড়ল বিলাপের

মুসলমানগণ তাদের তিন গুণ বাহিনীকে এমন লজ্জাজনক পরাজয়ের স্বাদ আস্বাদন করাবে মক্কার মুশরিক-সম্প্রদায় কোনো দিন কল্পনাও করেনি। বদর-প্রান্তরে পরাজয়ের পর মুশরিক-সম্প্রদায় পালিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে মক্কায় পৌছয়। সেখানে গিয়ে যুদ্ধের পরিণতি বর্ণনা করে। মক্কায় এমন কোনো ঘর ছিল না, যেখানে বিলাপের রোল পড়েনি। চারদিকে কান্না আর কান্না। মাতম আর মাতম। বদরের পরাজয়ের পর সর্বপ্রথম মক্কায় পৌছয় হায়সান ইবনে আবদুল্লাহ খুযায়ী। সে মক্কায় পৌছামাত্র লোকজন তার কাছে ছুটে আসে। যুদ্ধের ফলাফল জানতে চায়। তখন সে বলে, কী আর বলব—উতবা ইবনে রাবীআ মারা পড়েছে, মারা পড়েছে শায়বা ইবনে রাবীআ, আবু জেহেল ইবনে হিশাম, উমাইয়া ইবনে খালফ, যামআহ ইবনুল আসাদ। নাবীহ ইবনুল হাজ্জাজ এবং মানীহ ইবনুল হাজ্জাজও নিহত হয়েছে। খুন হয়েছে আবুল বুখতারী ইবনুল হিশাম। সে একে একে কুরাইশ-নেতাদের যখন নাম নিতে থাকে, তখন ঘরে-বসা সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া চেঁচিয়ে উঠে—খোদার কসম, এর মাথা খারাপ হয়েছে। এ সম্পূর্ণ পাগল হয়ে গেছে। এর কোনো হুঁশ নেই। আচ্ছা, তোমরা একে আমার কথা জিজ্ঞেস করো তো! যখন জিজ্ঞেস করা হলো, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার কী হয়েছে? হায়সান ইবনে আবদুল্লাহ বলল, সাফওয়ান তো তার ঘরে লুকিয়ে আছে। খোদার কসম, আমি তার পিতা এবং ভাইয়ের লাশ দেখে এসেছি।

---

১ ইবনে সাদ, *তাবাকাত*, ২ : ১৮।

এতে এটাই প্রমাণিত হয়—মক্কার মুশরিকদের ধারণা ছিল, বদরে তারা বিশাল বিজয় লাভ করবে। এমন ভয়াবহ পরাজয়ের কথা তারা ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেনি। তাই তারা কোনোভাবেই হায়সানের কথা মানতে পারছিল না। মক্কার মুশরিকদের স্তব্ধতা এবং অস্থিরতার এই দৃশ্যও দর্শনযোগ্য। আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের এক গোলাম ছিল আবু রাফে। এই আবু রাফে বর্ণনা করেছে, আমি তখন হযরত আব্বাসের ক্রীতদাস ছিলাম। আমাদের ঘরে তখন ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছিল। স্বয়ং আব্বাসও মুসলমান ছিলেন। তার স্ত্রী উম্মুল ফযলও ইসলাম কবুল করেছিলেন। স্বয়ং আমিও ছিলাম মুসলমান। কিন্তু আব্বাস তার সম্প্রদায়কে ভয় করতেন। তিনি কুরাইশদের ভয় পেতেন। যতটা সম্ভব, তাদের সঙ্গে সব ধরনের বিরোধ এড়িয়ে চলতেন। এ কারণেই তিনি তার ইসলামের কথা কাউকে জানাননি। তার অনেক বড় ব্যবসা ছিল। তিনি ভয় করতেন—ওদের সঙ্গে বিবাদে জড়ালে তার বিস্তৃত বাণিজ্যের বিরাট অর্থ ডুবে যাবে। বদরের পরাজয়ের পর যখন মক্কার মুশরিক-সম্প্রদায় পরাজিত হয়ে ফিরে আসতে থাকে এবং পরাজয়ের গল্প শোনাতে থাকে, তখন তো আমাদের খুশির কোনো অন্ত নেই। আমি ছিলাম একজন মামুলি কারিগর। কাঠের পেয়ালা বানাতাম। তখন আমি আমার কাজ করছিলাম। আমার পাশেই উপবিষ্ট ছিলেন হযরত আব্বাসের স্ত্রী উম্মুল ফযল। এমন সময় আবু লাহাব পা হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে এসে ঘরের মুখে বসে পড়ে। তার পিঠ ঠিক আমার পিঠ বরাবর। এমন সময় কয়েকজন লোক এসে জানায়—আবু সুফিয়ান ইবনুল হারেস এসেছে। আবু লাহাব বলল, তাকে ডাকো। তার কাছ থেকে বদরের অবস্থা জানতে পারব। আবু সুফিয়ান আসার পর আবু লাহাব বলল, ভাতিজা, ওখানকার খবর বলো তো! আসলে কী হয়েছে ওখানে? আবু সুফিয়ান বলল, চাচা, কী বলব আপনাকে! মনে হচ্ছিল কি, শূন্যের ওপর শুভ্র পা বিশিষ্ট কালো বর্ণের ঘোড়া ছুটে বেড়াচ্ছে আর আমাদের গর্দান উড়িয়ে যাচ্ছে। আমাদের কাঁধ ভেঙে দিচ্ছে। আমাদের কাউকে হত্যা করছে। কাউকে বা কয়েদি করছে। আমরা তাদের বিরুদ্ধে কিছুই করছি না। আমরা একেবারে অসহায়। আবু রাফে বলেন, আমি এমন সময় বলে উঠলাম, তারা ছিল আল্লাহ প্রেরিত ফেরেশতা। আমার এ কথা শোনামাত্র আবু

লাহাব আমার দিকে ফিরে সজোরে আমার গালে চড় বসিয়ে দেয়। তারপর সে আমাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে আমার বুকের ওপর উঠে বসে। এই দৃশ্য দেখে উম্মুল ফযল তাঁবুর একটি খুঁটি তুলে সজোরে আবু লাহাবের মাথায় আঘাত করে। তার মাথা ফেটে যায়। উম্মুল ফযল ক্রোধের সঙ্গে বলেন—একে অসহায় মনে করে এর ওপর রাগ ঝারছ, এর প্রতি অবিচার করছ, মনে করেছ, এর মালিক ঘরে নেই, একে কে সাহায্য করবে? আমি এর মালিক। একজন মেয়ের মুখে এ কথা শোনার পর আবু লাহাব আর কী বলবে? সে নীরবে এই আঘাত ও অপমান সয়ে যায়। তারপর সেদিনই তার শরীরে প্লেগের ফোঁড়া উঠে। এর সাত দিনের মাথায় দৃষ্টান্তমূলক মৃত্যুর মুখে পতিত হয়।[১]

আবু লাহাবের পরিণতি

আবু লাহাবের পরিণতি হয়েছিল খুবই ভয়াবহ। সে যে রোগে আক্রান্ত হয়েছিল, আরবরা সেটাকে ছোঁয়াছে রোগ মনে করত। তাদের বিশ্বাস ছিল—যে-ই তার কাছে যাবে, সে-ই ওই রোগে আক্রান্ত হবে। এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে এক সপ্তাহ মৃত্যুর বিছানায় পড়ে থেকেছে। এই সময় পরিবার-পরিজন কেউ তার কাছে যায়নি। সে মারা যাওয়ার পর সন্তানরা তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলতেও প্রস্তুত হয়নি। তার লাশ ঘরের মধ্যে পচতে থাকে। চারদিকে দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে। প্রতিবেশীগণ দুর্গন্ধে অস্থির হয়ে পড়ে। অবশেষে এক কুরাইশী তার ছেলেদেরকে গিয়ে বলে, তোমাদের কী লজ্জা নেই, তোমাদের বাবা মারা গেছে, তার লাশ ঘরে পচে গেছে, তোমরা লাশটা কোথাও ফেলছও না! আমার সঙ্গে চলো। আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব। অবশেষে তারা দূরে দাঁড়িয়ে আবু লাহাবের লাশের ওপর পানি ঢেলে দেয়। তারপর তাকে হেঁচড়ে মক্কার বাইরে এক কঙ্করময় ভূমিতে নিয়ে যায়। তারপর তার ওপর অনেকগুলো পাথর দিয়ে তার লাশ ঢেকে দেয়—যেন তার গন্ধ ছড়াতে না পারে।[২]

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ২ : ২৯০।

২ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৩০৯।

নবীকন্যা হযরত যায়নাবের প্রত্যাগমন

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড় মেয়ে হযরত যায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহার বিয়ে হয়েছিল মক্কাতেই। তার স্বামী ছিল আবুল আস ইবনে রবী। আবুল আস বদর যুদ্ধে মক্কার মুশরিকদের সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়ে মদীনায় আসে। তারপর সে মুক্তিপণ পরিশোধের জন্যে তার স্ত্রীকে সংবাদ পাঠায়। হযরত যায়নাব মুক্তিপণের ব্যবস্থা করতে গিয়ে কিছু পয়সা কম পড়ে। তখন তিনি তার মায়ের-দেওয়া গলার হারটি মুক্তিপণের অর্থের সঙ্গে মদীনায় পাঠিয়ে দেন। আবুল আসের মুক্তিপণের অর্থ যখন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে আসে, তখন তিনি হারটি দেখে চিনতে পারেন। হযরত খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার কথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায়, যায়নাবকে স্বামীর ঘরে তুলে দেওয়ার সময় এই হার তিনি কন্যাকে পরিয়ে দিয়েছিলেন। নবীজির অন্তর বেদনায় গলে যায়। সাহাবায়ে কেরামকে ডেকে বলেন, তোমরা যদি মত দাও, তা হলে এই অর্থ এবং এই হার ফিরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। আর এর বিনিময়ে যায়নাবকে মদীনায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা যায়। সাহাবায়ে কেরাম এই প্রস্তাব আন্তরিকভাবে কবুল করেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবুল আসকে ডেকে বলেন, তুমি কথা দাও, তোমার সওয়ারিতে করে যায়নাবকে বতনে ইয়াজিজে পৌঁছে দেবে। সেখান থেকে আমাদের লোকজন তাকে নিয়ে আসবে। আবুল আস নবীজির কাছে এ মর্মে ওয়াদা করে।[১]

আবুল আস মক্কায় গিয়ে হযরত যায়নাবকে বলে—মদীনায় যাওয়ার প্রস্তুতি নাও। তারপর আবুল আস তার ভাই কেনানা ইবনে রবীকে বলে, তুমি যায়নাবকে উটের ওপর তুলে বতনে ইয়াজিজে পৌঁছে দাও। কেনানা সঙ্গে সঙ্গে উট নিয়ে আসে। উটের ওপর হাওদা বাঁধে। হযরত যায়নাব হাওদায় উঠে বসেন। কেনানা তির ধনুক সঙ্গে নিয়ে উটের রশি ধরে মদীনার দিকে চলতে শুরু করে। তখন ছিল দিন। সেখানকার সবাই বিষয়টি লক্ষ করে। তারপর হযরত যায়নাবের মদীনাগমন সকলের আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠে। অনেকেই বিষয়টিকে তাদের জন্যে বড় অপমানজনক মনে করে। কয়েকজন বাধা দেওয়ার জন্যে এগিয়ে আসে।

---

১ *মেশকাত শরীফ*, ২৩৪৬।

হযরত যায়নাবের উট তখন যিতোওয়া প্রান্তরে। সবার আগে হাইয়ার ইবনুল আসাদ এগিয়ে আসে। সে সামনে এসে হযরত যায়নাবকে ভয় দেখাবার জন্যে তার দিকে বর্শা তাক করে। কেনানা সঙ্গে সঙ্গে উট থামিয়ে তূণীর থেকে তির বের করে আনে। তারপর সবগুলো তির সামনে ছড়িয়ে দেয় এবং চেঁচিয়ে বলে—যে-ই আমার কাছে আসবে, এই তির তার শরীরে ঢুকে যাবে। সে একটি তির তুলে নিয়ে ধনুকে স্থাপন করে। তারপর তাক করে দাঁড়িয়ে যায়। কেনানার মতিগতি দেখে সকলেই পেছনের দিকে সরতে থাকে। কেউ সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহস করে না। এমন সময় সেখানে আরও কয়েকজনসহ আবু সুফিয়ান চলে আসে। এসেই কেনানাকে বলে, কেনানা, ধনুক থেকে তির সরাও। আমি তোমার সঙ্গে একটু কথা বলব। কেনানা ধনুক নামিয়ে নেয়। আবু সুফিয়ান কাছে এসে বলে, মাত্র একমাস হলো আমরা পরাজিত হয়ে এসেছি। সকলের অন্তরেই কাঁচা ঘা। এই পরিস্থিতিতে তুমি যদি ঘোষণা দিয়ে মুহাম্মাদের মেয়েকে নিয়ে যাও, তা হলে সকলেই আঘাত পাবে। আমি তোমাকে বাধা দিচ্ছি না। শুধু এইটুকু চাচ্ছি—এখন বাড়ি ফিরে যাও। যখন রাত হবে, মানুষের চলাফেরা বন্ধ হয়ে যাবে, তখন তাকে পৌঁছে দাও। কেনানা এই কথা মেনে নেয়। হযরত যায়নাবকে নিয়ে ঘরে ফিরে যায়। রাতের বেলা বতনে ইয়াজিজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত দুই প্রতিনিধির হাতে তুলে দেয়। সেখানে আগে থেকেই হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা এবং আরেকজন আনসারী অপেক্ষা করছিলেন। তারা হযরত যায়নাবকে একটি উটের ওপর বসিয়ে নেয়। তারপর রাতের বেলা তাকে নিয়ে মদীনায় পৌঁছয়।[১]

কসম করল আবু সুফিয়ান

আবু সুফিয়ান ব্যবসায়ী কাফেলাকে বাঁচিয়ে মক্কায় পৌঁছে যায়। অন্যদিকে তার সাহায্যের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে-আসা কুরাইশ-বাহিনী গিয়ে পৌঁছয় বদর-প্রান্তরে। শিকার হয় লাঞ্ছনাকর পরাজয়ের। মক্কার অধিকাংশ নেতা মারা পড়ে। প্রতিটি ঘরে রোল পড়ে যায় বিলাপের। বদর-প্রান্তরে পরাজিতরা যখন বেসামাল হয়ে মক্কায় পৌঁছে, তখন আবু সুফিয়ান শপথ

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩ : ৩৩০।

করে বলে, এই পরাজয়ের প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত আমি গোসল করব না, মাথায় তেল দেব না। তারপর সে তার শপথ বাস্তবায়নের প্রস্তুতি শুরু করে। একা একা বসে কৌশল আঁটতে থাকে।

বদর যুদ্ধ হয়েছিল রমযান মাসে। শাওয়াল মাস নীরবে কেটে যায়। তারপর শুরু হয় হজের মওসুম। মুশরিক-সম্প্রদায় মক্কায় আসে। হজের রেওয়াজ পালন করে নিজ নিজ এলাকায় চলে যায়। জিলহজ মাসের শেষের দিকে আবু সুফিয়ান দুইশো কুরাইশী সৈন্য নিয়ে শপথ পূরণ করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। এদিকে মুসলমানগণ বদর-প্রান্তরে তাদের শক্তির পূর্ণ পরিচয় দেখিয়েছে। ফলে, কুরাইশদের মধ্যে এখন আর আগের মতো সাহস নেই, শক্তিও নেই। তারা বরং মুসলমানদের প্রতি ভীত। আবু সুফিয়ান রাতের পর রাত সফর করে নাইব নামক জায়গায় পৌঁছয়। সেখান থেকে মদীনা প্রায় বারো মাইল। সেখানেই পাহাড়ের কোলে তাঁবু পেতে সফরসঙ্গীদেরকে রেখে একা বেরিয়ে পড়ে। প্রথমে যায় ইহুদি জনবসতী বনু নজীরে। বনু নজীরের বিখ্যাত নেতা হুওয়াই ইবনে আখতাবের বাড়িতে গিয়ে ওঠে রাতের বেলা। দরজায় কড়া নাড়ায়। হুওয়াই ঘরের ভেতর থেকেই দরজা খুলতে অস্বীকৃতি জানায়। কারণ, সে নিজেও ছিল ভীতসন্ত্রস্ত। আবু সুফিয়ান সেখান থেকে ব্যর্থ হয়ে আরেক ইহুদি নেতা সালাম ইবনে মিশকামের কাছে যায়। এই সালাম ছিল ইহুদি-সংগঠনের অর্থবিষয়ক দায়িত্বশীল। তখন সে বনু নজীরের নেতাও ছিল। আবু সুফিয়ান কড়া নাড়ালে সালাম তাকে বাড়ির ভেতর ডেকে পাঠায়। ভালো খাতির করে। আবু সুফিয়ান তাকে আগমনের উদ্দেশ্য খুলে বলে। আগমনের উদ্দেশ্যের কথা সালামকে জানিয়ে রাতেই আবার আবু সুফিয়ান সঙ্গীদের কাছে ফিরে আসে।

তারপর আবু সুফিয়ান তার বাহিনী থেকে কয়েকজনকে নির্বাচন করে। নির্বাচিত যোদ্ধাদেরকে সঙ্গে করে মদীনার দিকে বেরিয়ে পড়ে। মদীনার বাইরে আরিশ নামক স্থানে পৌঁছয়। সেখানে খেজুরের অনেক বাগান ছিল। তারা গিয়ে বাগানে আগুন ধরিয়ে দেয়। সেখানে এক আনসারী এবং তার একজন সঙ্গী ছিল। কুরাইশীরা মিলে তাদেরকে হত্যা করে। তারপর রাতের মধ্যেই সঙ্গীদের কাছে পালিয়ে যায়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি জানতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে সাহাবায়ে কেরামের একটি দল নিয়ে আক্রমণকারীদেরকে ধরার জন্যে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু অনেক দূর পর্যন্তও তাদের কোনো নাম নিশানা ছিল না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে খুঁজতে খুঁজতে কারকারাতুল কাদর নামক স্থানে পৌঁছে যান, কিন্তু তাদের কোনো সন্ধান পাননি। কারণ, আবু সুফিয়ান রাতেই তার লোকদেরকে নিয়ে মক্কায় পালিয়ে গিয়েছিল। তারা অনেক দূর পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। মুসলমানগণ পাল্টা হামলা করতে পারে, এই ভয় তাদের ভালো করেই ছিল। ফলে পালাতে সামান্য দেরি করেনি। তারা এতটাই ভীত কম্পিত হয়ে পালিয়ে ছিল—পালাতে এবং ছুটতে অসুবিধা হচ্ছে বলে সঙ্গে-আনা খাদ্যসামগ্রী পর্যন্ত পথে ফেলে দিয়েছিল। সাহাবায়ে কেরাম যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আবু সুফিয়ানের পলায়নের রাস্তা দিয়ে আসতে থাকেন, তখন পথে ছাতুর স্তূপ দেখতে পান। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ, এগুলো কি গনিমতের সম্পদ? নবীজি বললেন, হ্যাঁ, এগুলো তুলে নাও। ছাতুকে আরবীতে ছাওয়ীক বলে। এই জন্যে আমাদের ইতিহাসে এই ঘটনাকে গাযওয়ায়ে ছাওয়ীক বলা হয়। এভাবে আবু সুফিয়ান তার শপথ পূর্ণ করে।[১]

ইয়াসরিব এখন মদীনা

হিজরতের পর দুই বছরের মধ্যেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বাঁধন প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে তাদের মধ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব ভালোবাসা ও হৃদ্যতার পরিবেশ গড়ে উঠে। যারা ইসলাম কবুল করেছেন কিংবা মক্কা থেকে আগমন করেছেন, তাদের একটি বড় অংশ ইয়াসরিবকে দারুল হিজরত এবং নিজেদের দ্বিতীয় দেশ হিসেবে বরণ করে নেয়। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের আগ পর্যন্ত এই অঞ্চলকে ইয়াসরিব বলা হতো। নবীজির আগমনের পর এই নাম বর্জন করা হয়। এখন এর নাম রাখা হয় মদীনাতুর রাসূল। পরবর্তী সময়ে বিপুল ব্যবহারের কারণে মানুষ

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ২ : ৪২২; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩:৩৪৪।

সংক্ষেপে মদীনা বলতে থাকে। পৃথিবীর ইতিহাসে এই নামই পরে বিখ্যাত হয়ে যায়। হিজরতের দুই বছর পর এই ইয়াসরিব হয়ে উঠে সর্বসম্মতিক্রমে মদীনা। বদর-প্রান্তরে যেভাবে উভয় পক্ষের মুখোমুখি যুদ্ধ ঘটে যায়—তা ছিল সকলের কাছেই এক কল্পনাতীত ব্যাপার। কিন্তু এই ঘটনা ইসলামের শক্তি ও বিজয়ের বুনিয়াদ তৈরি করে দেয়। পুরো আরবে এই ঘটনা ছড়িয়ে পড়ে। মুসলমানদের শক্তি শক্ত পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে যায়। মক্কার সকল নেতা এবং কুরাইশপ্রধানদের মস্তক যেভাবে মুলা এবং গাজরের মতো কেটে বদরের প্রান্তরে ছুঁড়ে মারা হয়, তা ছিল সত্যিই অবিশ্বাস্য। তাদের মধ্যে অনেকেই এমন ছিল, যাদের নাম শোনামাত্র অন্যদের শরীরে কাঁপন সৃষ্টি হতো। অথচ বদরের প্রান্তরে খুবই মামুলি এবং অল্পবয়স্ক যোদ্ধাগণ তাদেরকে একেবারে ধুলো গিলিয়ে দিয়েছে। তাদের বীরত্বের সকল গল্প বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছে। মুসলমানগণ অনেকাংশেই কুরাইশদের শক্তি ভেঙে দিয়েছেন। বিশেষ করে তাদের গর্ব ও অহংকারের ডানা যেভাবে আকাশে সদর্পে দাপাদাপি করছিল, তা মুহূর্তে এমনভাবে ধুলোর সঙ্গে মিশে যায়, যা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। তাদের সাহস ভেঙে পড়ে। ব্যবসার সকল মুনাফা একত্রিত করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিশালায়তনে যুদ্ধ করবার পরিকল্পনা মাটির সঙ্গে মিশে যায়। কুরাইশ-সম্প্রদায় বিলাপ এবং কান্নাকাটি করেই শেষ করতে পারছিল না। অবশেষে মাতম করতে করতে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। বাতাসে বিলাপ কান্না ও আহাজারির ধ্বনি থেমে যায়। অন্যদিকে মুসলমানগণ তাদের রাজধানী মদীনার চারপাশে সতর্ক প্রহরা আরও বাড়িয়ে দেয়। সাহাবায়ে কেরামের ছোট ছোট দল বিভিন্ন সময় মদীনার চারদিকে চক্কর দিতে থাকে এবং মুশরিকদের চালচলন ও তৎপরতার প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলে। প্রেরিত এই ধরনের যোদ্ধাবাহিনীকে ইসলামের ইতিহাসে সারিয়্যাহ বলা হয়। *তাবাকাত* গ্রন্থে ইবনে সাদ রহ. পঞ্চান্নটি সারিয়্যার কথা উল্লেখ করেছেন। অন্য ঐতিহাসিকগণ বলেছেন সত্তরটি।

হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষের কয়েকটি ঘটনা

দ্বিতীয় বছর বদর যুদ্ধের সময় প্রিয় নবীজির কন্যা হযরত রুকাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা ওফাত লাভ করেন। তিনি ছিলেন হযরত উসমান ইবনে

আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী। তারপর নবীজি তার আরেক কন্যা হযরত উম্মে কুলসুম রাযিয়াল্লাহু আনহাকে হযরত উসমানের কাছে বিয়ে দেন। এজন্যে ইসলামের ইতিহাসে হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে যিননূরাইন বলা হয়। হিজরতের এই দ্বিতীয় বর্ষের একেবারে শেষ দিকে নবীজির সবচেয়ে ছোট মেয়ে হযরত ফাতেমার বিয়ে হয় আলী ইবনে আবু তালেবের সঙ্গে। এই বছরই বায়তুল মুকাদ্দাসের স্থলে কাবা শরীফ মুসলমানদের কেবলা হিসেবে বরিত হয়। এই বছরই মুসলমানদের ওপর রোযা ফরয হয় এবং যাকাত আদায়ের নির্দেশ আসে। যাকাতের নেসাবও এই বছরই নির্দিষ্ট করা হয়। সদকাতুল ফিতর আদায়ের আদেশ হয় এই বছরই। এই বছরই মদীনার মুশরিক-সম্প্রদায় এবং বনু কায়নাকা, বনু নাজীর, বনু কুরায়যা এবং বনু হারেসার ইহুদি-সম্প্রদায় মুসলমানদের অধীনস্থতা স্বীকার করে নেয়। তাদের মধ্যে কিছু লোক দৃশ্যত ইসলাম কবুল করে মুসলমানদের দলভুক্ত হয়ে পড়ে। প্রকৃত অর্থে এরা ছিল মোনাফেক। এরা গোপনে গোপনে ইহুদিদের সঙ্গে মিলে নানা ষড়যন্ত্র করে মুসলমানদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করে। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে রক্ষা করেন।

বনু কায়নাকা

ইবনে সাদের বর্ণনা মোতাবেক হিজরী দ্বিতীয় সালের শাওয়াল মাসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবলীগের উদ্দেশ্যে বনু কায়নাকার বাজারে যান। সেটা ছিল বদর যুদ্ধের প্রায় এক মাস পরের ঘটনা। সেখানে যাওয়ার পর যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে, তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। এটা ছিল ইহুদিদের জনবসতি। তারা সোনা-রুপার কাজ করত। আর এদেরকে ইহুদিদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী মনে করা হতো। এরা ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলের গোত্রের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। তারা তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থের কথা বিবেচনা করে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গেও সন্ধি করে রেখেছিল।[১]

---

১ ইবনে সাদ, *আত তাবাকাত*, ২ : ২৯।

অবশ্য ইবনে হিশাম এবং হাফেজ ইবনে কাসীর এই ঘটনাটিকে হিজরীর তৃতীয় সালের ঘটনাবলির মধ্যে উল্লেখ করেছেন। তারা বলেছেন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বাজারে সমবেত করে বলেছিলেন—বনু কায়নাকা, তোমরা ইসলাম কবুল করে নাও। আল্লাহকে ভয় করো, নইলে আজাবে নিপতিত হবে। এমন যেন না হয়—কুরাইশ-সম্প্রদায় যেমন লজ্জাজনক পরাজয়ের মুখোমুখি হয়েছে—আল্লাহ তাআলাই তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছেন—সাবধান, তোমাদের পরিণতিও যেন তাদের মতো না হয়। সুতরাং হেদায়েত কবুল করো। তোমরা তো তাওরাতের পাঠক এবং খুব ভালো করেই জানো, আমি আল্লাহর রাসূল। তোমরা তোমাদের পঠিত গ্রন্থে আমার আলোচনা পড়েছ। আগতব্য নবীর প্রতি ঈমান আনার অঙ্গীকারও তোমরা করেছ। এখন সে অঙ্গীকার পূর্ণ করো।

বনু কায়নাকা অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নবীজিকে জবাব দেয়। তারা বলে, মুহাম্মাদ, তুমি কি আমাদেরকে তোমার গোত্রের লোকদের মতো মনে করেছ? তুমি ধোঁকায় পড়ে আছ। তোমরা এমন লোকদের সঙ্গে লড়াই করেছ, যারা যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কে কিছুই জানে না। তাই তোমরা বিজয় লাভ করেছ। খোদার কসম, আমাদের সঙ্গে যদি তোমাদের যুদ্ধ বাধে, তা হলে টের পাবে—কেমন সাহসী জাতির পাল্লায় পড়েছ।

এই আলোচনার পর বনু কায়নাকা সেখানেই কৃত চুক্তিনামা ছিঁড়ে ফেলে। চুক্তিনামা ছিঁড়ে আবর্জনার স্তূপে ফেলে দেয়। ইহুদি-গোত্রগুলোর মধ্যে এরাই সর্বপ্রথম চুক্তিভঙ্গ করে। ফলে, বদর এবং ওহুদের মধ্যবর্তী সময়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়।[১]

উসকানিমূলক ঘটনা

ঠিক এই সময়ই এমন একটি ঘটনা ঘটে যায়, যা কিনা উপস্থিত যুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলে। ঘটনাটি ছিল এই—একজন আরব নারীকে বিক্রি করার জন্যে এক ব্যক্তি বনু কায়নাকার বাজারে নিয়ে যায়। তাকে কিনে

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ২ : ৪২৬; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪ : ৩।

নেয় একজন স্বর্ণকার। সেই মহিলা স্বর্ণকারের দোকানে গিয়ে বসে পড়ে। তার চেহারা ছিল নেকাবঢাকা। খরিদদার ইহুদি তাকে মুখের নেকাব খুলতে বলে। আরব মহিলা বরাবর তা অস্বীকার করতে থাকে। ইহুদি তখন মহিলার গায়ের চাদরের দুই প্রান্ত ধরে পেছনের দিকে টান দেয়। মহিলা চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। যখন সে দাঁড়াতে চেষ্টা করে, তার লজ্জাস্থান বসনমুক্ত হয়ে পড়ে। তখন স্বর্ণকার ইহুদি এবং তার পাশে উপবিষ্ট লোকজন অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। মহিলাও সজোরে চিৎকার করে উঠে। চিৎকার শুনে একজন মুসলমান স্বর্ণকার ইহুদির দিকে ছুটে আসে। এসেই তার গর্দান উড়িয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন ইহুদি ছুটে এসে ওই মুসলমানকে হত্যা করে ফেলে। ফলে, সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে একটা তুফান ছড়িয়ে পড়ে।[১]

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই ঘটনাটি জানতে পারেন, তখন বলেন, বনু কায়নাকা সম্পর্কে সংশয়ের দরজা খুলে গেল। তারা তো অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে শুরু করে দিয়েছে। তাই তাদেরকে প্রতিরোধ করা দরকার। সাহাবায়ে কেরামকে ডেকে পরামর্শ করলেন। সম্মিলিত সিদ্ধান্তের পর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করলেন। মদীনার দেখাশোনা ও নিরাপত্তার দায়িত্বে হযরত আবু লুবাবা আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিযুক্ত করলেন। মুসলমানদের পতাকা দিলেন হযরত হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাতে। তারপর মুসলিম-বাহিনী মদীনা থেকে বেরিয়ে পড়ে। বনু কায়নাকায় গিয়ে তাদের কেল্লা অবরোধ করেন। তারা কেল্লার ভেতর অবরুদ্ধ হয়ে বসে থাকে। শেষ পর্যন্ত মোকাবেলা করার সাহস করেনি। এই অবরোধ পনেরো দিন পর্যন্ত অব্যহত থাকে। এই পনেরো দিন তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে সংবাদ পাঠায়—আপনার যে কোনো ফয়সালা আমরা মেনে নেব। তারপর তারা কেল্লার দরজা খুলে বেরিয়ে আসে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেন, এদেরকে রশিতে বেঁধে একদিকে ফেলে রাখো।[২]

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ২ : ৪২৭; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪ : ৪।

২ ইবনে সাদ, *আত তাবাকাত*, ২ : ২৯; *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ২ : ৪২৭।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল বনু কায়নাকার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিল। এই সুবাদে সে তাদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়। হাজির হয়ে বলে, মুহাম্মাদ, আমার বন্ধুদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করুন। নবীজি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেন। তারপর সে খোশামোদি ভঙ্গিতে নবীজির লৌহবর্মে হাত রাখে এবং অনুনয় বিনয় করতে থাকে। বারবার বলতে থাকে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এরা আমাকে সাহায্য করেছে। আপনি আমাকে আমার বন্ধুদের থেকে বঞ্চিত করবেন না। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগত স্বরে বলেন, ছাড়ো! তখন সে খোদার কসম করে বলে, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি তাদের সম্পর্কে উত্তম আচরণের আদেশ না দেবেন, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত ছাড়ব না। আমি ভবিষ্যত সম্পর্কে অনেক আশঙ্কা করছি। তার কথায় নবীজির চেহারা বিবর্ণ হয়ে উঠে। তার পীড়াপীড়ির কারণে বনু কায়নাকাকে কোনো শাস্তি দেননি। কিন্তু পরবর্তী সময় ইহুদি-সম্প্রদায় তাদের যে স্বভাবসুলভ চরিত্রের প্রকাশ ঘটিয়েছে, তাতে ইহুদিদের প্রতি মুসলমানদের আস্থা সম্পূর্ণরূপে উঠে যায়।

কাব ইবনে আশরাফ : নিকৃষ্টতর শত্রু

কাব ইবনে আশরাফ ছিল ইহুদিদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। সে ছিল 'তায়' কবিলার লোক। অবশ্য তার মা ছিল বনু নাজীর গোত্রের মেয়ে। কাব ব্যক্তিগতভাবে ছিল নষ্টমন ফেতনাবাজ এবং ষড়যন্ত্র-চরিত্রের মানুষ। মুসলমানদের সঙ্গে যেন তার ছিল অনাদিকালের লড়াই। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধে বিজয় লাভ করার পর যায়েদ ইবনে হারেসা এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বদর-প্রান্তর থেকে মদীনায় এসে মুসলমানদের বিজয়সংবাদ জানাবার জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সঙ্গে আদেশ করেছিলেন—যেন নামসহ নিহত বিখ্যাত মুশরিকদের দুঃসংবাদটিও সকলকে অবহিত করেন। তারা দুইজন মদীনায় এসে এই সুসংবাদ ঘোষণা করার পর বাতাসের ডগায় করে খবরটি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সংবাদটি সবিস্তারে কাব ইবনে আশরাফও জানতে পারে। প্রথমে সে কথাটি বিশ্বাস করেনি। পরে যখন ধারণা বদ্ধমূল হতে থাকে, তখন বলে, এই দুই দূতের কথা যদি সত্যি হয়, তা হলে আমাদের

বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো। কুরাইশদের এই ব্যক্তিবর্গ ছিলেন শ্রেষ্ঠ আরব এবং তাদের শাসন চলত মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে। তাদের নিহত হওয়ার সংবাদে আমি যারপরনাই আঘাত পেয়েছি। তারপর সে দ্রুত মক্কায় ছুটে যায়। সেখানে গিয়ে মুত্তালিব ইবনে ওয়াদাআহ সাহমীর বাড়িতে উঠে। সেখানে তখন আতেকা বিনতে আবু লাইস ইবনে উমাইয়া উপস্থিত ছিল। তারা কাবকে সসম্মানে বসতে দেয় এবং বেশ খাতির করে। সে তখন তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নতুন করে যুদ্ধে নামার জন্যে উৎসাহ দিতে থাকে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে নানা অশোভন কথাবার্তা বলতে থাকে। সে এ সম্পর্কে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনাতে থাকে। তার সে দীর্ঘকবিতায় বদর যুদ্ধে নিহত সত্তরজন মুশরিকের বেদনাতুর ঘটনা এবং একটি বিরান কূপে তাদের নিক্ষিপ্ত হওয়ার নির্মম কাহিনী তুলে ধরে। তার সে কবিতা ছিল—মাতম ও বিলাপধ্বনি। তার এই শোকগাথার উদ্দেশ্য ছিল—মক্কার লোকদের ভেতর যুদ্ধের উন্মাদনা জাগিয়ে তোলা। সে চাচ্ছিল, মক্কাবাসী যেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠে। সে বরাবর মক্কার মুশরিকদেরকে শেষ দিন পর্যন্ত উসকানি দিতে থাকে। তারপর মদীনায় ফিরে আসে। এখানে এসেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে রচিত তার শোকগাথা ও কবিতা আবৃত্তির ভেতর দিয়ে বিষ ছড়াতে থাকে। স্বরচিত প্রেমকাব্যে বিশেষ করে মুসলিম নারীদের কথা তুলে ধরতে থাকে। ফলে, মুসলমানগণ মানসিকভাবে আক্রান্তবোধ করতে থাকে। যখন তার এই ফেতনাবাজি এবং অশুভ কাব্যচর্চা সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন একদিন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ করে বলেন, এই নিকৃষ্ট কাব ইবনে আশরাফের বিষাক্ত আক্রমণ থেকে মুসলমানদের রক্ষা করতে পারবে কে? হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাযিয়াল্লাহু আনহু সঙ্গে সঙ্গে আরজ করলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এর চিকিৎসা করে দিতে পারব। তবে আমাকে কিছু অবাস্তব কথা বলার অনুমতি দেওয়া হোক। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

الحرب خدعة.

যুদ্ধ হলো কৌশলের খেলা।

আবু নায়েলা সালাকান ইবনে সালামাহ ইবনে রুকায়েশ রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন কাব ইবনে আশরাফের দুধভাই। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু এই মিশনে তাকে সঙ্গে নিলেন। আরও সঙ্গে নিলেন আব্বাদ ইবনে বিশর এবং আবু আবস ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহুমকে। সকলকে সঙ্গে করে কাব ইবনে আশরাফের বাড়িতে যান। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ প্রথমে একা আবু নায়েলাকে কাবের কাছে পাঠান। কারণ, আবু নায়েলা ছিলেন কবি। আর কাব ইবনে আশরাফও ছিল একজন শক্তিমান প্রতিভাবান কবি। আগে পাঠিয়েছেন, তারা যেন পরস্পরে স্বরচিত কবিতা শুনিয়ে ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠতে পারে। কিছুক্ষণ কবিতা আবৃত্তির পর আবু নায়েলা বললেন, আমি তোমার কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে এসেছি। তবে বিষয়টি কাউকে জানানো যাবে না। কাব বলল, বলো। আবু নায়েলা বললেন, এই যে মক্কা থেকে আগত লোকটি আছেন না, লোকটি আমাদের জন্যে ধীরে ধীরে বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার কারণে পুরো আরব-দুনিয়া আমাদের শত্রু হয়ে গেছে। আমরা এখন সকলের তিরের নিশানা হয়ে পড়েছি। ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। অভাব ও নিঃস্বতা আমাদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। কী করব, আমরা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। আমি তোমার কাছে কিছু শস্য চাইতে এসেছি। কাব বলল, ইবনে সালামাহ, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। শস্য নিতে চাও, নিতে পারো। কিন্তু আগে বলো, এর বিপরীতে কী বন্ধক রাখবে? ভালো হয়, তোমার সন্তানদেরকে বন্ধক রাখো। আবু নায়েলা বললেন, তুমি তো আমাকে চিরদিনের জন্যে লজ্জিত করতে চাচ্ছ। দুনিয়া বলাবলি করবে, সামান্য খাদ্যের জন্যে পিতা তার পুত্রদেরকে বন্ধক রেখেছে। কাব বলল, তা হলে তোমার স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখো। আবু নায়েলা বললেন, তুমি হলে একজন সুদর্শন আরব যুবক। আমরা যদি স্ত্রীদেরকে তোমার কাছে বন্ধক রাখি, তারা তোমার প্রেমে পড়ে যাবে, সুতরাং এটা হতে পারে না। আমি ভেবে এসেছি, তোমার কাছে অস্ত্র বন্ধক রাখব। তা ছাড়া এটাও তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি, আমার আরও কয়েকজন বন্ধুর শস্য দরকার। তারাও শুধু অস্ত্র বন্ধক রাখবে, অন্য কিছু নয়। আজ রাতের বেলা বন্ধুদেরকে নিয়ে আমি তোমার কাছে আসব।

এই আলোচনা করে আবু নায়েলা কাবের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। গল্পেসল্পে পথ সহজ করে রেখে আসেন। সন্দেহ ও সংশয়ের পথও বন্ধ করে দিয়ে আসেন। তারপর রাতের বেলা আবু নায়েলা রাযিয়াল্লাহু আনহু সব বন্ধুদেরকে নিয়ে কাবের বাড়িতে যান। কাব তার বাড়ির দ্বিতীয় তলায় অবস্থান করছিল। এদের ডাকে নিচে নেমে আসে। এই সময় তার স্ত্রী তাকে বাধা দিয়ে বলে, এটা কি নিচে যাওয়ার কোনো সময় হলো? কাব তখন বলে, আরে, এ হচ্ছে আমার দুধভাই। আর ও হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা। কোনো ভদ্র লোককে যখন কোথাও ডাকা হয়, তাকে সেখানে যেতে হয়। কাব স্ত্রীকে বুঝিয়ে নিচে নেমে আসে। তার শরীর থেকে তখন মদির সুরভি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। কাছে আসতেই আবু নায়েলা বললেন, জীবনে কখনো এমন সুগন্ধি তো শুঁকিনি। যদি অনুমতি দাও, তা হলে ভালোভাবে তোমার চুলের ঘ্রাণ নিতে পারব। কাব তখন অহংকারের সুরে বলল, কেন নেবে না, অবশ্যই নাও! আবু নায়েলা ভালো করে ঘ্রাণ নিলেন। তারপর পালা করে তার সঙ্গীগণও সুবাসিত চুলের ঘ্রাণ নিলেন। সর্বশেষ সঙ্গী চুল শুঁকে দেখার নাম করে খুব শক্তভাবে চুলগুলো মুঠোয় ভরে নেন। তারপর সঙ্গীদের লক্ষ করে বলেন, বিসমিল্লাহ! সঙ্গে সঙ্গে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাযিয়াল্লাহু আনহু তার গর্দান উড়িয়ে ফেলেন। তারপর তার শরীর যখন নিথর হয়ে পড়ে, তারা সেখান থেকে চলে আসেন। এসে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদ দেন—কাব ইবনে আশরাফকে আমরা জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়ে এসেছি।[১]

ওহুদ যুদ্ধ

বদরে পরাজিত হওয়ার পর মক্কার মুশরিক-সম্প্রদায় চরম বেদনা ও অস্থিরতায় ডুবে ছিল। তারা সম্পূর্ণরূপে বোধ ও চেতনা হারিয়ে ফেলেছিল। ধীরে ধীরে যখন নিহতদের জন্যে কান্নাকাটি করে কিছুটা হালকা হয় এবং চোখের পানি মুছে নিতে সক্ষম হয়, তখন তাদের অন্তরে প্রতিশোধের আগুন লাভা ছড়াতে শুরু করে। বদর-প্রান্তরে যারা মারা

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪ : ৬; *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ২ : ৪৩০-৪৩৮ ; ইবনে সাদ, *আত তাবাকাত*, ২ : ৩০-৩৪; ইবনে সাইয়্যিদুন নাস, *উয়ুনুল আসার*, ১ : ৪৪১-৪৫১; ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, ১ : ৫৪৩-৫৪৫।

পড়েছিল, তারা কোনো সাধারণ পরিবারের লোক ছিল না। তারা ছিল কুরাইশের প্রথম সারির নেতা। সমাজের সকলের কাছে তারা ছিল বরিত ব্যক্তিবর্গ। তাই চোখের পানি শুকাবার পর তারা প্রতিশোধের পরিকল্পনা আঁটতে শুরু করে। আবু সুফিয়ানের ব্যবসায়ী কাফেলা নিরাপদে পৌঁছে গিয়েছিল মক্কায়। ফলে তাদের অর্থনৈতিক কোনো ক্ষতি হয়নি। ব্যবসার সকল সম্পদ দারুন নাদওয়ায় সংরক্ষণ করা হয়েছিল। এই সম্পদ ছিল অনেকটা জাতীয় অর্থের মতো। কুরাইশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আবু সুফিয়ানের কাছে এসে সমবেত হয়। তারা এসে আবু সুফিয়ানকে বলে, এবারের যাবতীয় লভ্যাংশের অর্থ আমাদের হাতে তুলে দিন। আমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেব। এই পয়সায় অস্ত্র কিনব। এই পয়সা থেকেই যুদ্ধের খরচ বহন করা হবে। আবু সুফিয়ান নিজেও প্রতিশোধস্পৃহায় ছিল অগ্নিময়। সুতরাং এ বিষয়ে তার কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। আবু সুফিয়ান সোজা জানিয়ে দেয়—আপনাদের এই আবেদন মঞ্জুর করা হলো। এ বিষয়ে বনু আব্দে মানাফ আমার সঙ্গে আছে। সিরিয়া থেকে আমদানিকৃত মালপত্র বিক্রি করে অর্জিত সোনা-রুপা আগেই জমা করে রাখা হয়েছিল। আমদানিকৃত মালপত্র বিক্রয় বাবদ এক হাজার উট, পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ছিল নগদ সম্পদ। এই ব্যবসায়ী সফরে যে ব্যক্তি যতটুকু পয়সা লগ্নি করেছিল, প্রত্যেককে তার মূল পুঁজি ফিরিয়ে দেওয়া হলো। অবশিষ্ট সমুদয় মুনাফার অর্থ জাতীয় সম্পদ ধরে যুদ্ধের জন্যে রেখে দেওয়া হয়। কুরাইশদের সাধারণ মুনাফা হতো শতকরা পঞ্চাশভাগ। সে হিসেবে এবারের বাণিজ্যে তাদের মুনাফা হয়েছিল পঁচিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা এবং পাঁচশো উট। এই পুরো সম্পদটাই যুদ্ধের খরচ বাবদ রেখে দেওয়া হয়।[১]

উদ্দেশ্য ছিল, বিশাল আয়তনে যুদ্ধের প্রস্তুতি। তাই বিপুল সংখ্যক যোদ্ধা সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে কুরাইশদের বক্তা কবি এবং অনর্গল কথা বলতে অভ্যস্ত লোকদেরকে সবিশেষ কাজে লাগানো হয়। তাদেরকে জাতীয় তহবিল থেকে খরচ দিয়ে মক্কার আশপাশের গোত্রগুলোতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আবেগপূর্ণ নানা কাব্য রচিত হয়। সেই কবিতা আবৃত্তি করে চারদিকে প্রতিশোধের আগুন ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তাদের চেষ্টা সাধনা

---

১ ইবনে সাদ, *আত তাবাকাত*, ২৩৬-৩৭।

বিফলে যায়নি। বিভিন্ন গোত্র থেকে বীর যুবক-সম্প্রদায় কুরাইশকে সহযোগিতা করার জন্যে দলে দলে ছুটে আসে। তা ছাড়া নারীদেরকেও যুদ্ধে সঙ্গে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। তাদের কাজ হলো, নিহতদের নামে মাতম ও বিলাপ করে যুবকদের অন্তরে প্রতিশোধের আগুন জ্বালানো। মক্কার মুশরিক-সম্প্রদায় পূর্ণ প্রস্তুতিসহ যখন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হয়, তখন তাদের যোদ্ধাসংখ্যা তিন হাজার। তন্মধ্যে লৌহবর্ম পরিহিত যোদ্ধা সাতশো। আর দুইশো ঘোড়সওয়ার। সঙ্গে আছে তিন হাজার উট এবং পনেরো জন নারী। সেকালের আরবদের মধ্যে এমন বিশাল সংখ্যক যোদ্ধার অংশগ্রহণ ছিল এক বিরল ঘটনা। যখন এই বিশাল বাহিনী মক্কা থেকে বের হয়, তখন চারদিকে তার খ্যাতি ছড়াতে থাকে। প্রতিটি গোত্রে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠে বিশাল এই যোদ্ধাবহর। মক্কার মুশরিক-সম্প্রদায় এই বিশাল প্রতাপ ও প্রভাব ছড়াতে ছড়াতে যুল হুলায়ফায় এসে পৌঁছয়। যুল হুলায়ফা মদীনা শহর থেকে সামান্য দূরে। মদীনাবাসীর হজের মীকাত এটা।

আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব মদীনায় একটি গোপন পত্র পাঠান। এই পত্রে তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই মর্মে অবহিত করেন—কুরাইশদের এক বিশাল বাহিনী মদীনা আক্রমণের লক্ষ্যে বেরিয়ে পড়েছে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদ ইবনে রবী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের চিঠি সম্পর্কে অবহিত করেন এবং এই বাহিনীকে মোকাবেলার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণের আদেশ দেন। তা ছাড়া ফুযালা আজ জফারীর দুই পুত্র আনাস এবং মুনিস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মক্কার এই মুশরিক-বাহিনীর তথ্য সংগ্রহের দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। তারা খোঁজখবর নিয়ে নবীজিকে অবহিত করেন—মক্কার মুশরিক-গোষ্ঠী আরিজ নামক স্থানের চারণভূমিতে তাদের উট ও ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে রেখেছে। পুরো আরীজ প্রান্তর তাদের প্রাণীগুলোয় ভরে উঠেছে। প্রাণীগুলো সেখানকার ঘাস এবং ক্ষেত-খামার খেয়ে বিরান করে ফেলেছে। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হুবাব ইবনুল মুনযির ইবনে জামুহকে গুপ্তচর করে পাঠান। তিনিও ফিরে এসে নবীজিকে মুশরিকদের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে সবিস্তারে

অবহিত করেন। ফলে পুরো মদীনায় অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ে। নবীজির হেফাজতের উদ্দেশ্যে পাহারাদারিতে কঠোরতা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। সাদ ইবনে মুআয, উসাইদ ইবনে হুযাইর এবং সাদ ইবনে উবাদা সশস্ত্র অবস্থায় নবীজির দরজায় রাত-দিন পাহারা দিতে থাকেন। জুমার রাতে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি স্বপ্ন দেখেন। তিনি এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেন—মদীনার ভেতরে থেকেই শত্রুদের মোকাবেলা করা উচিত। মদীনার বাইরে গিয়ে শত্রুদের মোকাবেলা করতে গেলে নানা ধরনের আশঙ্কা রয়েছে এবং মুসলমানদেরকে বিভিন্ন রকমের বিপদের মুখোমুখি হতে হবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশিষ্ট সাহাবীগণের সামনে তার এই মতের কথা বলেন এবং তাদের কাছে পরামর্শ চান—আমরা মদীনার ভেতরে থেকে যুদ্ধ করব না বাইরে গিয়ে? বিশিষ্ট মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনোভাব বুঝতে পারেন। তাই তারা পরামর্শ দেন—মদীনার ভেতরে থেকেই শত্রুদের মোকাবেলা করা হোক।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মদীনার নিরাপত্তাব্যবস্থা এবং সেই সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে আদেশ দেন। সেই সঙ্গে এও জানিয়ে দেন—নারী ও শিশুদের কেল্লার ভেতর পাঠিয়ে দেওয়া হোক আর সশস্ত্র যুবকদেরকে পাহারাদার নিযুক্ত করা হোক। মূলত বিশিষ্ট কয়েকজন সাহাবীর সঙ্গে পরামর্শ করে নবীজি এই আদেশ দিয়েছিলেন। তারা এই আদেশ সঙ্গে নিয়ে নিজ নিজ বাড়িতে যান। তারপর চারদিকে এ কথা ছড়িয়ে পড়ে—মদীনার প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সম্পন্ন করে মদীনায় থেকেই শত্রুদের মোকাবেলা করা হবে। কথাটি শোনার পর যুবক সাহাবীগণের মধ্যে যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, আহত বোধ করেন। বদর যুদ্ধের বঞ্চনার কারণে তাদের ভেতর প্রচণ্ড আক্ষেপ ছিল। তারা চাচ্ছিল—আমরাও বড় কোনো খেদমত আঞ্জাম দেব। এই আবেগ থেকেই তারা বলল, মদীনার সম্পূর্ণ বাইরে গিয়ে খোলা মাঠে শত্রুদের মোকাবেলা করা উচিত। এটা ছিল সাধারণ যুবক সাহাবীদের মত। ধীরে ধীরে পুরো মদীনার পরিবেশই এমন হয়ে উঠে—শহরের বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করাই সঙ্গত হবে, অথচ এটা ছিল হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

মনোভাব পরিপন্থী। তারপরও এটাই ছিল অধিকাংশের মত। পরের দিন ছিল শুক্রবার। নবীজি জুমার নামায পড়ালেন। খুতবা দিলেন। সাধ্যমতো জিহাদে অংশগ্রহণের প্রতি উৎসাহিত করলেন। বললেন, তোমরা যদি দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে অবিচল থাক, তা হলে আল্লাহ্ তাআলার সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। তারপর তিনি সকলকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে আদেশ দেন।

আসরের সময় হলো। নবীজি নামায পড়ালেন। ততক্ষণে মদীনার বাইরের বাসিন্দাগণ শহরে চলে এসেছেন। এদিকে শহরবাসীও সমবেত হচ্ছেন। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে গিয়েছেন। বাইরে অস্ত্রসজ্জিত মুসলমানগণ সারিবদ্ধ হয়ে নবীজির জন্যে অপেক্ষা করছেন। এমন সময় সাদ ইবনে মুআয এবং উসাইদ ইবনে হুযায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু উপস্থিত লোকদেরকে বলেন, তোমরা নবীজিকে মদীনার বাইরে যেতে বাধ্য করে ভালো করোনি। নবীজির কাছে ওহী আসে। তিনি সে ওহীর আলোকে ফয়সালা করেন। আর সেই ফয়সালাই যথার্থ হয়। তোমরা তোমাদের মতকে ফিরিয়ে নাও। নবীজিকে অনুরোধ করে বলো, আমরা আমাদের মতকে প্রত্যাহার করছি। আমরা মদীনার ভেতরে থেকেই শত্রুর মোকাবেলা করব। এই কথাবার্তা চলাকালেই নবীজি ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। তিনি পূর্ণ অস্ত্রসজ্জিত। দু'টি লৌহবর্ম পরিহিত। কাধে তরবারির খাপ ঝুলছে। পিঠের ওপর ঝুলছে ঢাল। যুবক সাহাবীগণ তখন এগিয়ে গিয়ে লজ্জাবনত চিত্তে আরজ করলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা ভুল করে ফেলেছি। আপনার মনোভাবপরিপন্থী মত প্রকাশ করেছি। আপনি আপনার মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত নিন। আমরা পূর্ণ প্রস্তুত আছি। উত্তরে নবীজি বললেন, কোনো নবীর জন্যে যুদ্ধাস্ত্র তুলে নেওয়ার পর শত্রুদের মোকাবেলা এবং আল্লাহর ফয়সালা না আসা পর্যন্ত তা নামিয়ে রাখার অনুমতি নেই। সুতরাং তোমাদেরকে যা আদেশ করা হয়েছে, তাই করো। আর আল্লাহর ওপর ভরসা করে বেরিয়ে পড়ো। আল্লাহ তাআলাই তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।

এরপর নবীজি তিনটি বর্শা আনিয়ে তাঁর মাথায় পতাকা বাঁধেন। একটি পতাকা আউস গোত্রের সর্দার উসাইদ ইবনে হুযায়েরের হাতে দেন।

দ্বিতীয়টি দেন খাযরাজ গোত্রের সর্দার হুবাব ইবনুল মুনযির কিংবা সাদ ইবনে মুআজের হাতে। আর মুহাজিরদের পতাকা দেন আলী ইবনে আবু তালেবের হাতে। মদীনা দেখাশোনার দায়িত্ব দেন আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমকে। এরপর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়ার ওপর উঠে বসেন। কাঁধে ধনুক। হাতে বর্শা। সঙ্গে মুসলমানগণও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। তাদের মধ্যে লৌহবর্ম পরিহিত একশো জন। আসআদ ইবনে মুআয আর সাদ ইবনে উবাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু সকলের সামনে। অন্য সকল মুসলমান তাদের ডানে বামে এবং পেছনে। শাখীন নামক স্থানে পৌছার পর একটা ভিড় নজরে পড়ে। জিজ্ঞেস করা হলো, এরা কারা? লোকেরা বলল, ইহুদিদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল। তারাও মুসলমানদের বাহিনীতে শামিল হতে চায়। নবীজি বললেন, মুশরিকদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের থেকে সাহায্য নেওয়া বৈধ হবে না। এদেরকে ফিরিয়ে দাও।

মুসলিম-বাহিনী আসর নামাযের পর মদীনা থেকে বেরিয়েছিল। এরই মধ্যে সূর্য অস্তমিত হয়েছে। সেখানেই হযরত বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু আজান দিলেন। নবীজি মাগরিব পড়ালেন। শাখীনেই রাত কাটালেন। নবীজি অবস্থান করেন বনু নাজ্জার গোত্রে। রাতে পাহারা দেন মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাযিয়াল্লাহু আনহু। তার সঙ্গে তার সশস্ত্র বাহিনী ছিল। পুরো রাত তারা ঘুরে ঘুরে পুরো মুসলিম-বাহিনীর পাহারাদারি করেন। রাতের শেষ ভাগে এসে মুসলিম-বাহিনীকে এগিয়ে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। পথ দেখাবার জন্যে আবু খায়সামা হারেসীকে সকলের সামনে রাখা হয়। ওহুদ পর্বতের কাছে পৌছাবার পর ফজরের সময় হয়। হযরত বেলাল আজান দেন। নবীজি ফজরের নামায পড়ান।

এখানে এসেই আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল এ কথা বলে আলাদা হয়ে যায়, আমাদের কথা মানা হলো না। মানা হলো, অনভিজ্ঞ ছেলেদের কথা, এজন্যে আমরা ফিরে যাচ্ছি। সে তার তিনশো সঙ্গীসহ আলাদা হয়ে যায়। মুসলমানদের পুরো সৈন্যসংখ্যা ছিল এক হাজার। এখন অবশিষ্ট রইল মাত্র সাতশো।[১]

---

১ ইবনে সাদ, *তাবাকাত*, ২ : ৩৯।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে সারিবদ্ধ করে দাঁড় করাতে থাকেন। ওহুদ পর্বত ছিল মুসলমানদের পশ্চাতে। সামনে শত্রুবাহিনী। পঞ্চাশ জন সশস্ত্র তিরন্দাজ যোদ্ধাকে একটি টিলার ওপর নিযুক্ত করেন। উদ্দেশ্য ছিল—শত্রুপক্ষ যদি পাহাড়ের পেছন দিক থেকে এসে হামলা করতে চায়, তা হলে এই পঞ্চাশ তিরন্দাজ তাদেরকে রুখে দাঁড়াবে। এই বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করা হয় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাবেরকে। নবীজি তাকে এই মর্মে শক্ত তাগিদ করেন—তোমরা তোমাদের জায়গায় অবিচল থাকবে। আমরা যুদ্ধে হারি বা জিতি, তোমরা তোমাদের জায়গা থেকে নড়বে না। আমার পক্ষ থেকে আদেশ না আসা পর্যন্ত এখানেই অবিচল থাকবে।

ওদিকে মুশরিক-সম্প্রদায়ও পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে যোদ্ধাদেরকে সারিবদ্ধ করে দাঁড় করায়। ডান দিকের নেতৃত্বে খালেদ ইবনুল ওলীদকে আর বাম দিকের নেতৃত্বে ইকরিমা ইবনে আবু জেহেলকে নিযুক্ত করে। তাদের কাছে দুইশো ঘোড়সওয়ার ছিল। এই ঘোড়সওয়ারদের নেতৃত্বে রাখা হয় সাফওয়ান ইবনে উমাইয়াকে। তিরন্দাজ-বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া হয় আবদুল্লাহ ইবনে আবু রবীর হাতে। মুশরিক-সম্প্রদায় তাদের ঝাণ্ডা তুলে দেয় তালহা ইবনে আবু তালহার হাতে। আর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পতাকা হযরত মুসআব ইবনে উমায়েরের হাতে দিয়ে নিজের সামনে দাঁড় করিয়ে দেন।

সর্বপ্রথম মুশরিকদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ময়দানে নেমে আসে আবু আমের ফাসেক। তার সঙ্গে আরও পঞ্চাশ জন যোদ্ধা। সে ময়দানে এসেই মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্যে আহবান জানায়। মুসলমানগণ সঙ্গে সঙ্গে পাথর বর্ষণ শুরু করেন। পাথরের তুমুল বর্ষণ তাদেরকে পেছনে ফিরে যেতে বাধ্য করে। এদেরকে পেছনে ফিরে যেতে দেখে মুশরিক নারীরা ঢোল বাজিয়ে তাদের সাহস বাড়াবার চেষ্টা করে এবং পলায়নরতদের লজ্জিত করে। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে একবার পা উঠে গেলে আবার স্থির হয়ে দাঁড়ানো সহজ কথা নয়। আবু আমেরের পুরো বাহিনী পেছনে সরে যায়। তারপর শুরু হয় উভয় পক্ষের চরম যুদ্ধ। মুশরিকদের পতাকা যার হাতে ছিল, মুসলমানগণ প্রবল আক্রমণে তাকে ঝাণ্ডাসহ মাটির সঙ্গে

মিশিয়ে ফেলে। মুসলমান তিরন্দাজগণ মুশরিকদের ঘোড়াগুলো টার্গেট করে তির ছুঁড়তে থাকেন। ফলে তাদের ঘোড়াগুলো ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে এদিক সেদিক ছুটতে থাকে। ঘোড়া সওয়ারদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে মুশরিকদের পুরো বাহিনী। মুসলমানগণ তাদের ধাওয়া করতে থাকেন। মুশরিকদের সাহস কুঞ্চিত হতে থাকে। মুসলমানগণ নারায়ে তাকবীর বলে পূর্ণ জোশ ও উচ্ছ্বাসে আকাশ থেকে পতিত শক্তিমান বজ্রপাতের মতো শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুসলমানদের কাছে বিশ্বাসের স্লোগান ছিল। মুশরিকদের কাছে কোনো স্লোগান ছিল না। মুসলমানগণ চরম শক্তিতে হামলা করছে। মুশরিক-সম্প্রদায় ছত্রভঙ্গ হয়ে পিঠ দেখিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে। তারা যতই হতবল হয়ে পড়ছে, তাদের সঙ্গী নারীগোষ্ঠী তাদেরকে ঠাট্টা বিদ্রূপ ও ভর্ৎসনা করে তাদের আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করছে। সামনে দাঁড়িয়ে তাদের পথ রোধ করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে একবার পা স্খলিত কিংবা কম্পিত হলে দৃঢ়তা ফিরিয়ে আনা কোনো কালেই সহজ নয়। মুসলমানদের আঘাত ফলপ্রসূ হলো। তারা মুশরিকদের সারির ভেতর ঢুকে পড়লেন। তাদের সারি ভেঙে পৌঁছে গেলেন তাদের তাঁবু পর্যন্ত। তারপর দীপ্ত সাহসিকতায় তাদের তাঁবুগুলো তছনছ করতে লাগলেন। মুশরিক-সম্প্রদায় তাদের তাঁবু পেছনে রেখে অনেক দূর সামনে চলে গিয়েছিল। তাদের কোনো বীরপুরুষই পেছনে ফিরে মুসলমানদের আক্রমণ থেকে তাদের তাঁবুগুলো রক্ষা করবে—এই সাহস করতে পারছিল না। এককথায় কোনো মুশরিকই মুসলমানদের বিরুদ্ধে দৃঢ়পদে যুদ্ধ করবার মতো ছিল না, বরং তারা শিকারীর তাড়া-খাওয়া আহত শিকারের মতো উদ্ভ্রান্ত হয়ে পালাবার চেষ্টা করে যাচ্ছিল।

জয়ের পর নেমে এল পরাজয়

মুশরিক-সম্প্রদায় যখন তাদের তাঁবুগুলো বেওয়ারিশ রেখে সামনে ছুটে গেলো, তখন মুসলমানগণ এসে সেই জায়গাটায় দাঁড়ালেন, যেখানে কিছুক্ষণ আগে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো ছিল প্রতিপক্ষ শিবির। টিলার ওপর নিয়োজিত মুসলিম তিরন্দাজ-বাহিনী লক্ষ করল—মুসলমানগণ শত্রুপক্ষকে

পরিপূর্ণরূপে পরাজিত করেছে। যুদ্ধ শেষ। শত্রুপক্ষ পলায়নের পথ বেছে নিয়েছে। যুদ্ধ সমাপ্ত এই কথা ভেবে তিরন্দাজদের বেশিরভাগ পাহাড়ের টিলা থেকে নেমে আসে। দলপতি আবদুল্লাহ ইবনে জাবের তাদেরকে পইপই করে বাধা দিতে থাকেন। কিন্তু আট-দশজন ছাড়া অবশিষ্ট সকলেই টিলা থেকে নিচে নেমে আসে। এমন সময় খালেদ ইবনুল ওলীদের দৃষ্টি পড়ে সেই টিলাটির ওপর। খালেদ লক্ষ করে—আক্রমণের এই মোর্চাপথ সম্পূর্ণ খালি। কয়েকজনমাত্র ব্যক্তি উপরে দাঁড়িয়ে আছে। তখন তারা ঘুরে এসে এই টিলার পেছনের দিক থেকে মোর্চা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অন্য মুশরিকরাও তাকে অনুসরণ করে। ইকরিমা ইবনে আবু জেহেল তার বাহিনী নিয়ে দ্রুত সেখানে পৌঁছে যায়। টিলার ওপর উপস্থিত মুসলমানগণকে শহীদ করে ফেলে। তারপর টিলা থেকে নেমে এসে পেছন দিক থেকে মুসলমানদের ওপর হামলা করে বসে। সামনেও মুশরিক-বাহিনী। পেছনেও মুশরিক-বাহিনী। মুসলমানগণ যাতার দুই পাটের মাঝখানে পড়ে যায়। ফলে জয়-করা যুদ্ধ পরাজয়ে পর্যবসিত হয়।[১]

পলায়নপর মুশরিক-বাহিনী ফিরে দেখে, আমাদের বাহিনী মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করছে। তখন তারাও দ্রুত ফিরে আসে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়তে শুরু করে। পরিস্থিতি একদম বদলে যায়। অনেক মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। কথা এ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও শহীদ করা হয়েছে। সাহস ভেঙে পড়ে মুসলমানদের। লড়াইয়ের ময়দানে নবীজির সঙ্গে হযরত আবু বকর ব্যতীত মাত্র চৌদ্দজন টিকে আছেন। তারা পূর্ণ শক্তি দিয়ে নবীজিকে শত্রুর হামলা থেকে রক্ষা করেছেন। তারপরও নবীজি কয়েক জায়গায় আহত হন। সামনের চারটি দাঁত ভেঙে যায়। কপাল এবং চেহারায় জখম হয়। চেহারা মোবারক রক্তে ভিজে যায়। সাধারণ যোদ্ধাগণও জানতে পারেন—নবীজিকে শহীদ করে ফেলা হয়েছে। কিন্তু পরে যখন তারা জানতে পারেন—সংবাদটি মিথ্যা, নবীজি নিরাপদ আছেন—তখন তারা নতুন জোশ ও আবেগে সম্মিলিতভাবে মুশরিকদের ওপর হামলা করেন। বাধ্য

---

১ ইবনে সাদ, *আত তাবাকাত*, ২ : ৪২।

হয়ে তারা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে দেয়। কিছুক্ষণ পর যুদ্ধের ময়দান শত্রুশূন্য হয়ে পড়ে।[১]

যুদ্ধের প্রভাব

এই যুদ্ধে মুসলমানগণকে অনেক বড় ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয়। বেশ কজন বিশিষ্ট সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। তাদের মধ্যে নবীজির চাচা হযরত হামযা, হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের, আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ, আবু সাঈদ খুদরীর পিতা মালেক ইবনে সিনান, আব্বাস ইবনে উবাদাহ ইবনে নাজলাহ, আমর ইবনুল জামুহ রাযিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রায় সত্তরজন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। এর বিপরীতে মুশরিকদের মধ্যে মারা পড়ে মাত্র তেইশ জন।[২] আবু উযযা আল হাজামী নামে একজন কবি গ্রেপ্তার হয়। বদর যুদ্ধেও সে গ্রেপ্তার হয়েছিল। নবীজি তখন তাকে বিনা পণে ছেড়ে দিয়েছিলেন। সে কথা দিয়েছিল—ভবিষ্যতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে না, কিন্তু সে তার কথা রাখেনি। আবেগপূর্ণ কবিতা লিখে মুশরিকদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উসকানি দিয়েছে। অধিকন্তু সশরীরে যুদ্ধে শরিক হয়েছে। গ্রেপ্তার হওয়ার পর সে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এই বলে আবেদন করে—আপনি বদর যুদ্ধের সময় আমার প্রতি যেমন অনুগ্রহ করেছিলেন, এবারও তেমনি অনুগ্রহ করুন। উত্তরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন—

لا يلدغ المؤمن من جحرة مرتين.

মুমিন বান্দা এক গর্তে দুইবার দংশিত হয় না।

তারপর তিনি তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার আদেশ দেন। হযরত আসেম ইবনে সাবেত ইবনে আবুল আফলাহ তার গর্দান উড়িয়ে দেন।[৩]

---

১ ইবনে সাদ, *আত তাবাকাত*, ২ : ৩৯-৪৫; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪ : ৯-১৭; ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, ১:৫৪৭-৫৫২।

২ ইবনে সাদ, *আত তাবাকাত*, ২ : ৪৩।

৩ ইবনে সাদ, *আত তাবাকাত*, ২ : ৪৩।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল শহীদের লাশ একত্রিত করে জানাযা পড়েন। দুইজন-দুইজন করে একেক কবরে দাফন করেন। অবশ্য কোনো কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন—ওহুদের শহীদদের জানাযা পড়া হয়নি। এটা আমাদের এখানকার আলোচ্য বিষয় নয়। এ বিষয়ে সবিস্তারে জানতে চাইলে হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলো পাঠ করা যেতে পারে।

কয়েকটি হৃদয়বিদারক দৃশ্য

শহীদগণের লাশ অনুসন্ধানের সময় বেশ কিছু হৃদয়বিদারক দৃশ্য নজরে পড়ে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বলেন, সাদ ইবনে রবীকে খুঁজে দ্যাখো—জীবিত আছে, না শাহাদাত বরণ করেছে। এখানে স্মরণযোগ্য, এই সাদ ইবনে রবী রাযিয়াল্লাহু আনহু সেইসব বীর মুসলিমদের অন্যতম, যারা দ্বিতীয় আকাবায় নবীজির হাতে হাত রেখে শপথ গ্রহণ করেছিল। নবীজির নিরাপত্তার জন্যে নির্বাচিত বারো নকীবের অন্যতম এই সাদ ইবনে রবী। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি পূর্ণ বীরত্ব ও বিসর্জিত প্রাণে ইসলামের প্রচার ও নবীজির নিরাপত্তায় রাত-দিন নিমগ্ন ছিলেন। মুহূর্তের জন্যে নিজেকে মহান এই দায়িত্ব থেকে আলাদা করেননি। এক সাহাবী যুদ্ধের ময়দানে খুঁজতে খুঁজতে হযরত সাদ ইবনে রবীর কাছে পৌঁছান। তিনি তখন মাটির ওপর পড়ে আছেন। আঘাতে আঘাতে অবশ তার দেহ। তার ওপর মৃত্যু ছায়া ফেলে রেখেছে। সামান্য শ্বাস-প্রশ্বাস বাকি মাত্র। সাহাবী কাছে গিয়ে বললেন, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আদেশ করেছেন, সাদ জীবিত না মৃত, খুঁজে দেখার জন্যে। হযরত সাদ খুবই দুর্বল ও অস্ফুট স্বরে বললেন, মৃতদের মধ্যে আছি। তুমি নবীজিকে আমার সালাম বলবে। বলবে, সাদ ইবনুর রবী আপনাকে বলেছে—

جزاك الله عنا خير ما جزي نبيا عن امته.

আল্লাহ তাআলা কোনো নবীকে তার উম্মতের পক্ষ থেকে যেরূপ প্রতিদান দিয়ে থাকেন, তার চেয়ে উত্তম প্রতিদানে আপনাকে ভূষিত করুন।

আর আমার সম্প্রদায়কে আমার এই পয়গাম পৌঁছে দেবে—সাদ তোমাদেরকে সালাম বলেছে। আর বলেছে, তোমরা যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে পূর্ণ সততা ও জীবন-বিসর্জনমূলক সৌহার্দ বজায় না রাখো, তা হলে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন না। হযরত সাদ খুব কষ্টে এ কথা কয়টি বলেন। তারপর তার প্রাণপাখি উড়ে যায়।[১]

কয়েকজন সাহাবী নবীজির চাচা হযরত হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর খোঁজে বের হন। তাদের সঙ্গে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ছিলেন। উন্মুক্ত প্রান্তরে হযরত হামযার লাশ খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু দেখা যায়, তার উদর বিদীর্ণ। তার কলিজা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন। হৃদয়বিদারক এই দৃশ্য দেখে নবীজির অন্তর কেঁদে উঠে। তার নয়নযুগল অশ্রুতে ভরে উঠে। নবীজি তখন বলেন, আজ আমি যতটা কষ্ট পেয়েছি, জীবনে হয়তো এমন কষ্ট কমই পেয়েছি। নবীজি এও বলেন, হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে সাত আসমানে লিখে দেওয়া হয়েছে—'আসাদুল্লাহ ওয়া আসাদু রাসূলিহ'।[২]

ধৈর্য ও সংযমের মূর্তপ্রকাশ

মদীনার ঘরে ঘরে ছিল মাতম আর মাতম। কারণ, অনেক ঘরের সন্তানই এই যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। অবশ্য এই ঘটনায় পুরুষের চেয়ে নারীগণ ধৈর্য সংযম ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন বেশি। অথচ এটা তাদের মেজাজ ও স্বভাবের পরিপন্থী। মূলত এটা ছিল ইসলামের শিক্ষার বরকত এবং হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের ফসল।

মদীনায় ফেরার পথে কয়েকজন সাহাবী হযরত হামনা বিনতে জাহাশ রাযিয়াল্লাহু আনহাকে আসতে দেখেন। সাহাবায়ে কেরাম তাকে দেখে আক্ষেপ করে বলেন, তোমার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ শাহাদাত বরণ

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪:২৯; ইবনে সায়্যিদুন নাস, *উয়ূনুল আসার*, ২ : ৩০।

২ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪ : ৪০।

করেছেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পাঠ করেন। ভাইয়ের জন্যে মাগফেরাতের দুআ করেন। তারপর একজন সাহাবী বলেন, তোমার মামা হযরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব শাহাদাত বরণ করেছেন। এবারও তিনি ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন বলেন। মামার জন্যে দুআ করেন। এমন সময় একজন বলেন, তোমার স্বামী হযরত মুসআব ইবনে উমায়েরও শাহাদাত বরণ করেছেন। এ কথা শোনামাত্র হযরত হামনা বিচলিত হয়ে পড়েন। পড়ে এই ঘটনাটি সাহাবায়ে কেরাম হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালে তিনি বলেন, মেয়েদের কাছে তাদের স্বামীর স্থান অনেক ঊর্ধ্বে। এই কষ্ট একান্তই স্বভাবজাত।[১]

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে মদীনায় ফিরছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা অনেক। যারা কাফেলার সামনে ছিলেন, তাদের সাক্ষাৎ হয়ে যায় বনু দিনারের এক নারীর সঙ্গে, এই যুদ্ধে যার স্বামী ভাই এবং বাবা অংশগ্রহণ করেছিলেন। আকস্মিক ব্যাপার হলো, ওহুদ যুদ্ধে তাদের সকলেই শাহাদাত বরণ করেছিলেন। তার ঘর পূর্ণরূপে বিরান হয়ে যায়। সাহাবায়ে কেরাম যখন তাকে তার পরিবারের লোকদের শাহাদাতের সংবাদ জানান, তখন তিনি বলেছিলেন, আমাকে বলো—আল্লাহর রাসূল কেমন আছেন? সকলেই বললেন, আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহে নবীজি ভালো আছেন। কিন্তু তিনি বললেন, এ কথায় আমি শান্ত হতে পারব না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়ে দাও। আমি আমার চোখে দেখে তারপর বিশ্বাস করতে চাই। সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে নবীজি সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে কথা বলছিলেন। সাহাবীগণ সেইদিকে ইশারা করে বললেন, ওই যে দেখুন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওখানে আছেন এবং ভালো আছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নজর পড়তেই এই মহীয়সী নারী বলে উঠেছিলেন—

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪ : ৪৭।

كل مصيبة بعدك جلل.

আপনি বেঁচে আছেন, তো সকল বিপদই তুচ্ছ।[১]

বিষ ছড়াতে লাগল ইহুদি এবং মোনাফেক-সম্প্রদায়

ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানগণ যে আঘাতের শিকার হন, তাতে খুব স্বাভাবিকভাবেই দুঃখ বেদনায় ছেয়ে যায় পুরো মদীনা। সকলের দৃষ্টি উদাস। মন নিষ্প্রাণ। চোখের তারায় বেদনার ছাপ। চারদিকে দুঃখ ভাঙন ও হতাশার ছায়া দৃশ্যমান। এই বিষাদময় পরিবেশে ইহুদি ও মোনাফেকদের ঠোঁটে সর্বদা লক্ষ করা যেত বিদ্রূপের হাসি। তারা বিষমাখা কথাবার্তা বলে বেড়াত। ইহুদি-সম্প্রদায় বলে বেড়াতে লাগল, যদি সত্যিই তিনি আল্লাহর রাসূল হতেন, তা হলে পরাজিত হতেন না, আসমানের ফেরেশতাগণ তাকে সাহায্য করত। যদি এরা সত্য পথের পথিক হতো, তা হলে এভাবে বিপদের মুখোমুখি হতে হতো না। আসলে মুসলমানগণ সম্পদ ও ক্ষমতার ভিখিরি। তাই তাদেরকে এর প্রায়শ্চিত্ত ভুগতে হয়েছে। এদের কথাবার্তায় মোনাফেক-সম্প্রদায় ডানে বামে মাথা হেলাত এবং সমর্থনের তালি বাজাত। মুসলমানদেরকে বলত—তোমরা যদি আমাদের কথা মানতে, তা হলে এই বিপদে পড়তে হতো না। এদের কথায় মুসলমানদের সীমাহীন কষ্ট হতো। তাদের বেদনার বোঝা আরও ভার হতো।

ওহুদ যুদ্ধের পরিশিষ্ট

সাধারণ মুসলমানগণ মদীনায় ফিরে এসেছেন। জখম ও আঘাতের চিকিৎসা ও পরিচর্যা করছেন। এমন সময় মক্কা থেকে এক ব্যক্তি মদীনায় আসে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, আবু সুফিয়ান সম্পর্কে কিছু জানো? সে এখন কোথায় আছে এবং কী করছে? ওই ব্যক্তি বলল, পথে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। এক জায়গায় আবু সুফিয়ান তার লোকদেরকে থামিয়ে

---

১ ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, ১ : ৫৫৮; *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৩ : ১০৫; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪ : ৪৭।

মুসলমানদের ওপর পুনরায় আক্রমণ করার জন্যে উৎসাহিত করছিল। আবু সুফিয়ান তার লোকদেরকে বলছিল, তোমরা তোমাদের শত্রুদেরকে হাতের মুঠোয় পেয়ে ছেড়ে দিয়েছ। এদেরকে শেকড়সুদ্ধ তুলে ছুঁড়ে মারা উচিত ছিল। এখনই তোমরা ফিরে চলো। এদের ওপর এমনভাবে আক্রমণ করো যেন এদের চিহ্নটুকুও মাটির ওপর না থাকে। আমি দেখে এসেছি—আবু সুফিয়ান তার লোকদেরকে নিয়ে আপনাদের ওপর পুনরায় আক্রমণ করার চেষ্টা করছে।

হিজরী তৃতীয় সালের পনেরো শাওয়াল শনিবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সংবাদটি জানতে পারেন। পরের দিন ছিল রোববার। নবীজি সঙ্গে সঙ্গে পুরো মদীনায় ঘোষণা করে দেন—যারা ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলে, তারা এখনই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সমবেত হও। এখনই শত্রুদের ধাওয়া করতে হবে। নবীজির উদ্দেশ্য ছিল, শত্রুদেরকে ভয় ধরিয়ে দেওয়া এবং এ কথা জানিয়ে দেওয়া—আমাদের সাহস এখনো অনেক উঁচুতে। এই পরিস্থিতিতেও আমরা এগিয়ে গিয়ে হামলা করতে পারি। নবীজি খুব জোর দিয়ে এ কথা ঘোষণা করেন—যারা ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, তারা যেন কোনো ক্রমেই আমাদের সঙ্গে না আসে। কাল যারা শত্রুর মোকাবেলা করেছে, আজ আমাদের সঙ্গে কেবল তারাই যাবে। যোদ্ধাগণ অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সমবেত হওয়ার পর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নিয়ে মদীনা থেকে বের হন। মদীনা থেকে আট মাইল দূরে হামরাউল আসাদে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। সেখানে সোম, মঙ্গল, বুধ তিনদিন অবস্থান করেন। মদীনার দায়িত্বে রেখে যান আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাযিয়াল্লাহু আনহুকে। মাবাদ ইবনে আবুল মাবাদ খুজায়ীর গোত্র বসবাস করত হামরাউল আসাদে। এই গোত্রের কিছু লোক ছিল মুসলমান আর কিছু লোক ছিল মুশরিক। তবে পুরো গোত্রটি মুসলমানদের প্রতি আন্তরিক ছিল, কল্যাণকামী ছিল। তারা নবীজির কাছে কোনো কথা লুকাত না। গোত্রপতি মাবাদ তখনো মুশরিক। তিনি নবীজির খেদমতে এসে আরজ করলেন, আপনারা সত্যের খাতিরে যে কষ্টের শিকার হয়েছেন, তাতে আমরাও ব্যথিত। আমরা দুআ করি, আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে নিরাপদে রাখুন।

নবীজির সঙ্গে সাক্ষাতের পর মাবাদ সোজা রাওহায় চলে যান। আবু সুফিয়ানের কাফেলা সেখানেই অবস্থান করছিল। মাবাদ এমন সময় গিয়ে সেখানে পৌঁছান, যখন তারা পুনরায় মুসলমানদের ওপর হামলা করার বিষয়টি নিশ্চিত করে নিয়েছে। মাবাদকে দেখামাত্রই আবু সুফিয়ান কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করে, মুসলমানদের কী অবস্থা? মাবাদ বলেন, সে কথা আমি কী বলব? মুহাম্মাদ তার সঙ্গীদেরকে নিয়ে তোমাদের খুঁজে ফিরছেন। তারা মদীনা থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। আমি তাদেরকে দেখেছি—রাগে ক্ষোভে অগ্নিমান। যারা গতকালের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, তারাও সকলে বেরিয়ে এসেছে। তারা তাদের পরাজয়ের কারণে লজ্জিত এবং আহত। তারা জোশে ও আবেগে এবং ক্রোধে ও ক্ষোভে কম্পিত। আবু সুফিয়ান বলল, কী তুমি আবোল তাবোল বকছ? মাবাদ বললেন, তুমি চলো আমি তোমাকে তাদের ঘোড়ার কপালগুলো দেখিয়ে দেব। আবু সুফিয়ান বলল, আমরা তো সিদ্ধান্ত নিয়েছি—আমরা তাদের ওপর এখনই পুনর্বার হামলা করব। তাদের শেকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলব। মাবাদ বললেন, তোমাদের প্রতি আমার ভালোবাসা আছে বলে আমি তোমাদেরকে বাধা দিচ্ছি। এই পরিস্থিতিতে তাদের মুখোমুখি হলে তোমাদেরকে লজ্জাজনক পরাজয় বরণ করতে হবে। তোমরা তাদের আক্রমণ সামলাতে পারবে না। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যুদ্ধে জড়ানোর প্রতি সতর্কবার্তা উল্লেখ করে লিখিত স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনান মাবাদ। আবু সুফিয়ান এবং তার সঙ্গীগণ তার দীর্ঘ কাসীদার প্রশংসা করে এবং নিজেদের মত বদলে ফেলে। সেখান থেকেই মক্কায় ফিরে যাওয়ার ঘোষণা দেয় আবু সুফিয়ান।

মোনাফেক মোনাফেকই থাকবে

হামরাউল আসাদে তিন দিন অবস্থান গ্রহণ করার পর বৃহস্পতিবার মদীনায় ফিরে আসেন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। পরের দিন ছিল শুক্রবার। নবীজি জুমার খুতবা দিচ্ছিলেন। বিখ্যাত মোনাফেক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলের অভ্যাস ছিল খুতবা চলাকালে নিজের পক্ষ থেকে কিছু কথা যোগ করে দিয়ে খুতবায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করা। সে তার অভ্যাসমাফিক আজকের খুতবা চলাকালে যখন কথা বলতে শুরু

করে, তখন কয়েকজন মুসলমান তার হাত ধরে টান দেন এবং বলেন—বসো। মুসলমানগণ এমনিতেই ক্ষুব্ধ। এইমাত্র কয়েকদিন আগে যুদ্ধের ময়দান থেকে সে তার লোকদেরকে নিয়ে ফিরে এসেছিল। মুসলমানদের শক্তিকে খর্ব করে দিয়েছিল। সে নবীজিকে ধোঁকা দিয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম তার প্রতি চরম অসন্তুষ্ট। এক সাহাবী তাকে ধমক দিয়ে বলেন, আবদুল্লাহ, বসো! তুমি কথা বলার কেউ না। এই কথায় সেও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। মানুষের ঘাড়ের ওপর দিয়ে শাঁ শাঁ করে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যায়। যেতে যেতে বলতে থাকে, ইশ, মনে হয় যেন আমি কোনো মন্দ কথা বলেছি। আমি যেন কোনো ভুল কথা বলেছি। আমি তো নবীজির কথাকে আরও দৃঢ় করছিলাম। মসজিদের দরজায় এক ব্যক্তি তাকে দেখে জিজ্ঞেস করল—কী হয়েছে, আবদুল্লাহ! বলল, আমি নবীজির কথাকে সমর্থন করছিলাম। লোকেরা আমাকে হাত ধরে বসিয়ে দিয়েছে। নানা কথা বলছে। ওই আনসারী তাকে বললেন, গিয়ে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ক্ষমা চাও। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার জন্যে মাগফেরাতের দুআ করে দেবেন। এ কথা শোনামাত্র সে ঝাড়া দিয়ে বলল—মুহাম্মাদের দুআর দরকার নেই আমার।[১]

হিজরতের চতুর্থ বছর

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বরাবর যত্নবান ছিলেন সমকালীন সংবাদমাধ্যমগুলো সজাগ ও সক্রিয় রাখতে। আরব-জাহানে সংঘটিত সব রকমের কর্মতৎপরতার প্রতি তাঁর দৃষ্টি থাকত সদা নিবদ্ধ। ইসলাম ও মুসলমান সমকালীন যে সকল অবস্থার ভেতর দিয়ে কালাতিপাত করছিল, এক মুহূর্তের জন্যেও তিনি সে বিষয়ে উদাসীন থাকেননি। তা ছাড়া বাতাসের গতি-প্রকৃতি জানার জন্যে সমকালীন পরিবর্তন শত্রু-মিত্র সামাজিক কর্মকাণ্ড এবং ইহুদি ও মোনাফেকদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত থাকতে হলে এর কোনো বিকল্পও ছিল না। এটা সত্য, বর্তমান কালের মতো সেকালে সংবাদমাধ্যম কোনো সহজসাধ্য ছিল না। তারপরও তিন-চারশো মাইলের ভেতর যেখানেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো তৎপরতা

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪ : ৫১।

সক্রিয় হতো, মদীনায় তার সংবাদ পৌঁছে যেত। ফলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণেরও সুযোগ হতো।

হিজরী চতুর্থ সাল যখন শুরু হয়, তখনো ওহুদ যুদ্ধের জখম শুকায়নি। মুসলমানগণ এই কাঁচা ঘা নিয়েই তাদের শত্রুপক্ষকে ভীত সন্ত্রস্ত করবার লক্ষ্যে হামরাউল আসাদ পর্যন্ত ছুটে গেছেন। তাদের এই তাৎক্ষণিক উদ্যোগ ভবিষ্যতের অনেক বড় বিপদের পথকে বন্ধ করে দিয়েছিল। মুশরিকদের পরিকল্পনা হয়েছিল ব্যর্থ। মুশরিকদের মতো এমন গভীর বিদ্বেষপরায়ণ শত্রুদের ক্ষেত্রে সামান্য অবহেলা কিংবা উদাসীনতা অনেক বড় ধ্বংস ডেকে আনতে পারে।

এই সময় ঘটে যায় আরেকটি ঘটনা। এক ব্যক্তি হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে সংবাদ দেয়—বনু আসাদের জলাশয়াঞ্চলে তুলাইহা ইবনে খুওয়াইলিদ আল আসাদী এবং তার ভাই সালামাহ ইবনে খুওয়াইলিদ আল আসাদী তাদের সকল মিত্রশক্তিকে সমবেত করেছে। তাদের উদ্দেশ্য, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর আক্রমণ করা। এই সংবাদ পাওয়ামাত্র নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে পাঠান। হযরত আবু সালামা ওহুদ যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। তার অবিরাম চিকিৎসা চলছিল। শরীরের জখমগুলো সবেমাত্র হালকা হতে শুরু করেছে। এই সময় নবীজি তাকে ডেকে বললেন, দেড়শো সৈনিকের একটি বাহিনী নিয়ে বনু আসাদের জলাশয়াঞ্চলের দিকে ছুটে যাও। এই বাহিনীর আমীর তুমি। নবীজি একটি পতাকা বানিয়ে তার হাতে তুলে দেন। তারপর আল্লাহ তাআলার ভয় এবং সহযাত্রীদের প্রতি কল্যাণকামিতার উপদেশ দেন। এও বলে দেন, বনু আসাদ অঞ্চলে গিয়ে শত্রুর ওপর একসঙ্গে হামলা করবে—যেন তারা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার সুযোগ না পায়।

আবু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সহযাত্রীদেরকে নিয়ে বনু আসাদ অঞ্চলে ছুটে যান। বিষয়টি যখন ওই গোত্রের লোকজন জানতে পারে, তখন তারা সমাবেশ ভেঙে এদিক সেদিক পালিয়ে যায়। মুসলমানগণ তাদের কাউকেই ধরতে পারেননি। তবে পালাবার সময় তারা পালে পালে

উট ও ছাগল রেখে যায়। আবু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার সঙ্গীগণ সেগুলো হস্তগত করেন। সেখানে তিনজন ক্রীতদাস ছিল। তাদেরকে গ্রেপ্তার করে ফেলেন। তারপর প্রাপ্ত সব সম্পদসহ মদীনায় ফিরে আসেন।[১]

মদীনায় এই গনিমতের সম্পদ আসার পর যে ব্যক্তি শত্রুপক্ষের সংবাদ এনে দিয়েছিল, নবীজি তাকেও ডেকে ভাগ দেন। তার নাম ছিল দালহাম আল আসাদী। তারপর সমুদয় সম্পদ মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করে দেন। এই অপারেশন থেকে ফেরার পর হযরত আবু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘাগুলো আবার তাজা হয়ে উঠে। এর পাঁচমাস পর তিনি ওফাত লাভ করেন। এ সেই আবু সালামা—মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার সময় মুশরিক-সম্প্রদায় যাকে ভাষাতীত কষ্ট দিয়েছিল। তার স্ত্রী সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। তিনি একা এসে উঠেছিলেন মদীনায়। তার কয়েক মাস পর তার স্ত্রী উম্মে সালামা মুশরিকদের পাঞ্জা থেকে বেরিয়ে পুত্রসহ মদীনায় এসে ওঠেন। এই সেই উম্মে সালামা, পরবর্তী সময়ে যিনি হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনসঙ্গিনী এবং উম্মত-জননী হওয়ার অসামান্য সম্মানে ভূষিত হন।

আবু সুফিয়ানের ষড়যন্ত্র এবং তার জবাব

আবু সুফিয়ান একজন দক্ষ ঘাতক খুঁজে ফিরছিল। অবশেষে পেয়েও যায়। আবু সুফিয়ান তাকে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করবার উদ্দেশ্যে মদীনায় পাঠিয়ে দেয়। লোকটি ছিল মানুষ হত্যায় দক্ষ ও পটু। তার হাতিয়ার ছিল ছোট্ট একটি খঞ্জর। খঞ্জরটি সর্বদা তার সঙ্গে থাকত। মূলত সে ছিল একজন পেশাদার এবং ভাড়াটে খুনি। লোকটি আবু সুফিয়ানের মিশন নিয়ে মদীনায় আসে। মদীনায় এসে এক ব্যক্তির কাছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জানতে চায়। লোকটি তাকে জানিয়ে দেয়—তুমি আবদুল আশহাল গোত্রের দিকে চলে যাও। তিনি সেদিকেই গেছেন। লোকটি তার উটখানা এক জায়গায় বেঁধে নবীজির সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। নবীজি তখন মসজিদে ছিলেন। তার সঙ্গে সাহাবায়ে কেরাম। খুনি লোকটি আসতেই নবীজির দৃষ্টি তার ওপর গিয়ে পড়ে। তিনি

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪ : ৬১-৬২।

তখন সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, আগত এই লোকটি খুবই ভয়ানক। সে যে কোনো কাণ্ডই ঘটাতে পারে। লোকটি মজলিসে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই প্রশ্ন করে—আবদুল মুত্তালিবের পুত্র কে? আমি—নবীজি বললেন। লোকটি তখন একান্তে কথা বলবার ভঙ্গিতে নবীজির প্রতি ঝুঁকে পড়ে। এমন সময় হযরত উসাইদ ইবনে হুযায়ের তাকে ধমক দিয়ে বললেন—দূরে সরো! তারপর তার কাপড় ধরে যখন পেছনে টান দেন, তখন তার কাপড়ের মধ্যে লুকানো খঞ্জরটি নজরে পড়ে। হযরত উসাইদ ইবনে হুযায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু চিৎকার করে ওঠেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ, এই লোক ধোঁকাবাজ। এই তার খঞ্জর।

ঘাতকের রহস্য সকলের সামনে উন্মোচিত হয়ে পড়ে। লোকটি ভয়ে কাঁপতে থাকে। সানুনয় ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তার দিকে চোখ তুলে তাকান এবং বলেন, তুমি আগে সত্য করে বলো, তোমাকে কে পাঠিয়েছে? তারপর আমরা চিন্তা করে দেখব—তোমাকে ক্ষমা করা যায় কি না। লোকটি বলল, আগে আমাকে নিরাপত্তা দান করা হোক। নবীজি বললেন, তুমি নিরাপদ। বলো, তোমাকে কেউ কিছু বলবে না। তখন সে বলল, আমাকে আবু সুফিয়ান পাঠিয়েছে। আপনাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে। কথা দিয়েছে, আমাকে পুরস্কৃত করবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, এখন তোমাকে আমরা অনুমতি দিচ্ছি—যেখানে খুশি চলে যেতে পারো। অবশ্য এর চেয়ে ভালো একটি প্রস্তাবও আছে। লোকটি জানতে চাইল—সেটা কী? নবীজি বললেন, তুমি মুসলমান হয়ে যাও। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে কালেমায়ে শাহাদাত পড়ে মুসলমান হয়ে যায়। ইসলাম কবুল করার পরে সে তার মনের কথা এই ভাবে ব্যক্ত করে—আপনি যে আল্লাহর রাসূল, এটা আমি আগেই বুঝতে পেরেছি। কারণ, মদীনায় আসার পরই আমার বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে যায়। আমার মনের ইচ্ছা দুর্বল হয়ে পড়ে। আর যখন আমার মনের গোপন কথাটি আপনার কাছে প্রকাশিত লক্ষ করেছি, তখন আমার আর সন্দেহ থাকেনি—আপনার রক্ষাকর্তা আল্লাহ। আপনি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছেন। আবু সুফিয়ান ও তার দলবল আছে শয়তানের দলে।

তারপর সে মদীনায় কয়েকদিন কাটিয়ে নবীজির কাছে ফিরে যাওয়ার অনুমতি চায়। অনুমতি নিয়ে চলে যায়।

আবু সুফিয়ানের চক্রান্ত ব্যর্থ হওয়ার পর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিউত্তরে আমর ইবনে উমাইয়া আয যমারীকে মক্কায় পাঠান। আদেশ করেন—আবু সুফিয়ানকে এর শাস্তি দিয়ে আসো। তার সঙ্গে সালামা ইবনে আসলামকেও পাঠান। মক্কায় যাওয়ার পর তারা অনেক খোঁজাখুঁজি সত্ত্বেও কোথাও আবু সুফিয়ানকে পাননি। ফেরার পথে দুই ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। কুরাইশ-সম্প্রদায় তাদেরকে গোয়েন্দা করে মদীনায় পাঠিয়েছিল। আমর ইবনে উমাইয়া বলেন, আমি তাদের উভয়কে ধমক দিয়ে বললাম—তোমরা উভয়ই আমার হাতে বন্দি। তখন তাদের একজন ছুটে পালাতে শুরু করে। আমি সঙ্গে সঙ্গে একটি তির ছুঁড়ে মারি। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং মারা যায়। অপরজনকে শক্ত করে বেঁধে মদীনায় নিয়ে আসি। মদীনায় যখন পৌঁছাই, তখন আনসারদের শিশুরা খেলাধুলা করছিল। আমাকে দেখে তারা ছুটে আসে। ছুটে আসেন কয়েকজন বয়স্ক লোকও। তারা ওই শিশুদেরকে জানায়—এটা হলেন আমর ইবনে উমাইয়া আয যমারী। শিশুরা তখন ছুটে গিয়ে নবীজিকে সংবাদ দেয়। নবীজি ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। আমি তাকে পুরো কাহিনী বলে শুনাই। গ্রেপ্তারকৃত লোকটিকেও নবীজির হাতে তুলে দিই। নবীজি আমাকে অনেক দুআ দেন।[১]

বীরে মাউনার হৃদয়বিদারক ঘটনা

বীরে মাউনার হৃদয়বিদারক ঘটনাটিও সংঘটিত হয় হিজরতের এই চতুর্থ সালে। এই ঘটনায় মুসলমানদের অন্তর ঝাঁঝরা হয়ে যায়। এই ঘটনায় সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে নিকৃষ্ট গাদ্দারি এবং প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। ঘটনাটি ঘটেছিল হিজরী চতুর্থ সালে সফর মাসে।

আবু বারা আমের ইবনে মালেক মদীনায় এসে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। নবীজি তাকে ইসলামের

---

১ ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, ১ : ৫৬২।

দাওয়াত দেন, কিন্তু সে ইসলাম কবুল করেনি এবং ইসলামের প্রতি অসন্তুষ্টিও প্রকাশ করেনি, বরং সে নবীজির দরবারে এই মর্মে আবেদন পেশ করে—আপনি যদি নাজদবাসীর মাঝে ইসলামের দাওয়াত দানের উদ্দেশ্যে আপনার কিছু সঙ্গী পাঠাতেন—আমার বিশ্বাস, তারা ইসলাম কবুল করে নিত। নবীজি বললেন, নাজদবাসীর প্রতি আমার কোনো আস্থা নেই। আমি বরং শঙ্কিত, তারা প্রতারণা এবং ধোঁকাবাজির আশ্রয় নিতে পারে। আবু বারা তখন বলল, এর দায়-দায়িত্ব আমার। যারা মদীনা থেকে যাবেন, তারা আমার আশ্রয়ে থাকবেন। আবু বারার এই আশ্বাস ও আশ্রয় ঘোষণার পর নবীজি চল্লিশ জন সাহাবীকে তার সঙ্গে পাঠিয়ে দেন। তাদের মধ্যে হারেস ইবনে সাম্মাহ, হিযাম ইবনে মিলহান নাজ্জারী, উরওয়া ইবনে আসমা ইবনুস সালত সুলামী, নাফে বুদাইল ইবনে ওয়ারকা আল কুযায়ী এবং আমের ইবনে ফুহাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুমের মতো বিশিষ্ট সাহাবীগণও ছিলেন। এই বিশাল কাফেলা নাজদের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে। বীরে মাউনায় এসে যাত্রাবিরতি করে। এটা মূলত বনু আমের এবং বনু সুলাইম অঞ্চলের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত। বাহন থেকে নেমে হারাম ইবনে মিলহান রাযিয়াল্লাহু আনহু আমের ইবনে তোফায়েলকে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিখিত পত্রখানা পাঠিয়ে দেন। আমের ইবনে তোফায়েল এসে নবীজির চিঠিটি তো দেখেইনি, বরং এসেই এক সাহাবীর ওপর হামলে পড়ে এবং তাকে হত্যা করে ফেলে। তারপর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বনু আমেরের লোকদেরকে ডাকতে থাকে। তার ডাকে অবশ্য বনু আমের গোত্রের কেউ সাড়া দেয়নি। তারা বরং জানিয়ে দেয়—আবু বারা যখন এদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, তখন আমরা এদের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারব না। আমের ইবনে তোফায়েল তখন বনু সুলাইমের লোকদেরকে চেঁচিয়ে ডাকতে থাকে। বনু সুলাইম থেকে তখন গাসিয়্যা রালা যাকওয়ান ছুটে আসে। তারা এসে সাহাবায়ে কেরামকে ঘেরাও করে ফেলে। পরিস্থিতি এভাবে যখন ঘোলাটে হতে দেখেন, সাহাবায়ে কেরাম তখন তরবারি হাতে তুলে নেন। লড়াই করেন। একজন ছাড়া অবশিষ্ট সকলেই শাহাদাত বরণ করেন। এই জীবিত ব্যক্তিটি ছিলেন কাব ইবনে যায়েদ। শত্রুপক্ষ তাকে নিহত মনে করে ফেলে যায়, অথচ তখনো তার

মধ্যে প্রাণ অবশিষ্ট ছিল। রক্তপিপাসু এই হায়েনার দল রক্তপানে তৃপ্ত হয়ে যখন ফিরে যায়, তখন হযরত কাব সতর্কতার সঙ্গে উঠে বসেন। তারপর কোনোক্রমে মদীনায় পৌঁছে যান।[১]

তারপরই সেদিক দিয়ে যাওয়ার পথে হযরত আমর ইবনে উমাইয়া আয যমারী এবং আরেকজন আনসারী সাহাবী শহীদদের লাশগুলো পড়ে থাকতে দেখেন। তাদের ওপর শবভোজি পাখিরা উড়ছে। আনসারী সাহাবী তখন বল্লেন, এই ঘটনা তো আমার পক্ষে বরদাশত করা সম্ভব না। কীভাবে সংবাদ পেয়ে নজদের লোকেরা এসে এই দুইজনকেও ঘিরে ফেলে। আনসারী সাহাবী কিছুক্ষণ লড়াই করে শাহাদাত বরণ করেন। গ্রেপ্তার হন আমর ইবনে উমাইয়া। আমের ইবনে তোফায়েল তাকে জিজ্ঞেস করে, কোন গোত্রের ছেলে তুমি? আমর ইবনে উমাইয়া জানান—আমি মুযার গোত্রের সন্তান। আমের তখন তার চুল ধরে কয়েকটি ঝাঁকুনি দেয়। তারপর ছেড়ে দেয়। তিনি মদীনায় এসে নবীজিকে এই হৃদয়বিদারক কাহিনী শোনান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঘটনার প্রেক্ষিতে দীর্ঘ এক মাস ফজর নামাযে কুনুতে নাযেলা পাঠ করেন এবং ঘাতক নাজদীদের জন্যে বদদোয়া করেন।[২]

একটি ভুল হত্যা

আমর ইবনে উমাইয়া যখন নাজদীদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে মদীনায় আসছিলেন, তখন পথে দুই ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয়। তিনি তাদের পরিচয় জানতে চান। তারা তখন বলে, আমরা বনু আমেরের লোক, অথচ এই বনু আমেরের হাতেই চল্লিশ জন মুসলমান সবেমাত্র নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেছেন। আমর ইবনে উমাইয়া এদেরকে ঘাতকদের লোক মনে করে প্রতিশোধ নেবেন বলে কৃতসংকল্প হন। আমর ইবনে উমাইয়া তখন একটি গাছের ছায়ায় উপবিষ্ট ছিলেন। আগত লোক দু'জনও সেখানে এসে অবস্থান নেয়। আমর ইবনে উমাইয়া তখন তাদের ঘুমানোর অপেক্ষা করতে থাকেন। যখন তারা ঘুমিয়ে পড়ে তাদের কাহিনী সমাপ্ত করে সোজা

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪ : ৭২-৫৩।

২ ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, ১ : ৫৬৩।

মদীনায় চলে আসেন। এসে নবীজিকে সবিস্তারে পুরো কাহিনী শোনান। এই ঘটনা শোনার পর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিন্তিত হয়ে পড়েন। কারণ, বনু আমেরের সঙ্গে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুক্তি ছিল। তাই এদের হত্যা করাটা ছিল আরবদের সমকালীন রেওয়াজপরিপন্থী। কিন্তু কী করার আছে? ঘটনা তো ঘটে গেছে। অজান্তে ঘটে গেছে। এখন তার প্রতিকারেরও কোনো পথ নেই।[১]

বনু নাজীরের ষড়যন্ত্র

বনু নাজীরের সঙ্গে মুসলমানদের চুক্তি ছিল। তারাও ছিল মুসলমানদের মিত্রপক্ষ। এ কারণে উল্লিখিত ঘটনার পর নবীজি তাদের কাছে যান। গিয়ে বলেন, ভুলবশত বনু আমেরের দুই ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে। নিয়মমাফিক তাদের রক্তমূল্য পরিশোধ করতে হবে। এ বিষয়ে তোমরা আমাদেরকে সহযোগিতা করো। সেকালের মিত্রচুক্তির রেওয়াজমাফিক এমন ক্ষেত্রে সহযোগিতা করাটা ছিল বনু নাজীরের অনুপেক্ষ কর্তব্য। বনু নাজীর বলল, নিশ্চয় আমরা সাহায্য করব। তারপর তারা গোপনে পরস্পর পরামর্শ করে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন একটি দেয়ালে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। তারা তখন সিদ্ধান্ত নেয়—আজ হঠাৎ করে তিনি আমাদের এখানে চলে এসেছেন। এই সুযোগে আমরা তাকেই শেষ করে দিই না কেন! তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে এক ব্যক্তিকে ছাদের ওপর পাঠিয়ে দেয়—ছাদের ওপর থেকে সে একটি ভারী পাথর নবীজির মাথার ওপর ছেড়ে দেবে। তারপর তাঁর হাত থেকে চির মুক্তি। কথা হয়—কে উঠবে ছাদের ওপর? আমর ইবনে জাহাশ ইবনে কাব বলে, আমি প্রস্তুত এই কাজের জন্যে। সে উঠে যায় ছাদে। এদিকে হযরত জিবরাঈল এসে নবীজিকে জানিয়ে দেন—আপনি দ্রুত এখান থেকে উঠে চলে যান। নবীজি দ্রুত উঠে স্থান ত্যাগ করায় উপস্থিত সকলেই অনুমান করে—তিনি কোনো কাজে হয়তো যাচ্ছেন। সঙ্গে আগত সাহাবায়ে কেরামও অপেক্ষা করতে থাকেন। অনেকটা বিলম্ব হলে তারা ঘাবড়ে যান। সেখান থেকে উঠে এসে পথে যার সঙ্গেই দেখা হয় নবীজির কথা জানতে চান। এরই মধ্যে মদীনা

---

১ ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, ১ : ৫৬৪।

থেকে আগত এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তাকে প্রশ্ন করার পরে সে জানায়, আমি এইমাত্র হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদীনায় প্রবেশ করতে দেখে এসেছি। সাহাবায়ে কেরাম দ্রুত ছুটে যান মদীনায়। দরবারে উপস্থিত হয়ে জানতে চান—ইয়া রাসূলাল্লাহ, এভাবে এতটা দ্রুততার সঙ্গে চলে এলেন কেন? হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সবিস্তারে জানান—ইহুদিরা আমাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। বিষয়টি আমাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই আমি দ্রুত চলে এসেছি। তারপর তিনি সাহাবায়ে কেরামকে বলেন, বনু নাজীর আমাদের সঙ্গে কৃতচুক্তি ভঙ্গ করেছে। তাই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়েছে। তোমরা সকলে নিজ নিজ ঘরে গিয়ে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসো।

বনু নাজীরের বিরুদ্ধে লড়াই

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মদীনার শাসক করে সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে বনু নাজীর চলে যান। এটা ছিল হিজরী চতুর্থ সালের রবিউল আউয়াল মাসের ঘটনা। মুসলমানগণ যখন বনু নাজীর পৌঁছান, তখন তাদের কেল্লার ফটক বন্ধ হয়ে যায়। তাদের কোনো ব্যক্তিই কেল্লার বাইরে ছিল না। মুসলিম-বাহিনী বেশ কয়েকদিন কেল্লা অবরোধ করে রাখে। অবশেষে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেন—এদের খেজুর-বাগান কেটে দাও এবং বৃক্ষরাজিতে আগুন ধরিয়ে দাও। এদিকে আউফ ইবনে খাযরাজ গোত্রের একটি দল ছিল বনু নাজীরের প্রতি আন্তরিক। এই দলের মধ্যে বিখ্যাত মোনাফেক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল, ওদীয়া মালেক ইবনে নাওফাল, সুওয়াইদ এবং দাগিসও ছিল। তারা বনু নাজীরের কাছে লোক পাঠিয়ে আশ্বস্ত করে—আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি। তোমরা তোমাদের জায়গায় অবিচল থেকো। তোমাদের বিরুদ্ধে যদি লড়াই হয়, তা হলে আমরা তোমাদের সঙ্গে মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করব। তোমাদেরকে যদি এই অঞ্চল থেকে বহিস্কার করা হয়, তা হলে আমরাও তোমাদের সঙ্গে বেরিয়ে যাব।

মুসলমানগণ কেল্লা অবরোধ করে রেখেছেন। ভেতরে আটকা পড়ে আছে বনু নাজীর। তারা অপেক্ষায় আছে মোনাফেকদের সাহায্যের। কিন্তু তাদের কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের সাহস হয়নি। মুসলমানদের প্রভাবে তারা নিজেরাই এতটা ভীত ও কুণ্ঠিত ছিল—বনু নাজীরকে সাহায্য করবার মতো কোনো সাহসই ছিল না তাদের। বরং উল্টো হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আবেদন জানায়, বনু নাজীরকে নির্বাসনে পাঠানো হোক। তাদেরকে যেন হত্যা করা না হয়। তা ছাড়া তারা যদি তাদের সহায়-সম্পদ সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়, সেই সুযোগও যেন তাদেরকে দান করা হয়। অবশ্য তারা সঙ্গে কোনো ধরনের অস্ত্র নেবে না। মূলত বনু নাজীর মোনাফেকদের দিয়ে নবীজির খেদমতে এই আবেদন পাঠিয়েছিল। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সেই আবেদন মঞ্জুর করেছিলেন।

নির্বাসনে বনু নাজীর

তাদের আবেদন মঞ্জুর করার পর তাদেরকে বলে দেওয়া হলো, যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব, এই এলাকা ছেড়ে দাও। যেখানে খুশি চলে যাও। সামানপত্র যা সঙ্গে নিতে চাও, নিয়ে যাও। আমরা কোনো ধরনের বাধা দেব না, আপত্তি করব না। এই ঘোষণা শোনামাত্র ইহুদি-সম্প্রদায় তাদের সামানপত্র উটের ওপর ওঠাতে থাকে। একটি তৃণলতাও ঘরে রেখে যায়নি। ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত তুলে নিয়ে যায়। তাদের অধিকাংশই চলে যায় খায়বারে। কিছু সংখ্যক ইহুদি চলে যায় সিরিয়ায়। এভাবে তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বনু নাজীর গোত্রের বিশিষ্ট ইহুদিদের মধ্যে ছিল সালাম ইবনে আবুল হাকীক, হুওয়াই ইবনে আখতাব। তারা চলে যায় খায়বারে। সেখানকার অধিবাসীরা তাদেরকে অতীব সম্মান ও সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করে এবং বিশিষ্টজনদের সারিতে ঠাঁই দেয়।

নিচুতা ও নির্লজ্জতার উদাহরণ

যখন বনু নাজীরের নারী শিশু ও জীবন-উপকরণ সামগ্রী উটে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তাদের সঙ্গে গায়িকা এবং নর্তকীদের পালও ছিল। তারা কাফেলার পেছনে পেছনে ঢোল বাজাতে বাজাতে যাচ্ছিল। এই

দলের মধ্যে বনু গিফারের একজন অপ্রতিদ্বন্দী সুন্দরীও ছিল—ইহুদিরা যাকে বাজার থেকে কিনে এনেছিল।

বনু নাজীরের বাগানের কিছু অংশ তো কেটে ফেলা হয়েছিল। অবশিষ্ট বাগান ও ক্ষেত-খামার মুসলমানদের হাতে আসে। এই সম্পদ ছিল একান্তই হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। কারণ, এই সম্পদ কোনো যুদ্ধের বিনিময়ে হাতে আসেনি। ফলে, এখান থেকে এক-পঞ্চমাংশ বাদ দেওয়া কিংবা যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করার বিষয়ও ছিল না। এই সম্পদ হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজস্ব চিন্তা ও বিবেচনার আলোকে বণ্টন করেছিলেন। বনু নাজীরের যাবতীয় স্থাবর সম্পদ তিনি অগ্রগণ্য মুহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। এখান থেকে আনসারদেরকে কোনো অংশ দেওয়া হয়নি। অবশ্য দুইজন আনসারী সাহাবী সুহাইল ইবনে হুনাইফ এবং আবু দুজানা সম্পর্কে যখন বলা হলো তারা খুবই অসহায় এবং নিঃস্ব, তখন নবীজি তাদেরকেও বনু নাজীরের সম্পদ থেকে অংশ দান করেন।[১]

মুসলমান হলো দু'জন ইহুদি

বনু নাজীরের কেউই ইসলাম গ্রহণ করেনি। তারা সন্তুষ্টচিত্তেই নির্বাসনের প্রস্তাবকে মেনে নেয়। এক্ষেত্রে মুসলমানগণও কোনো আপত্তি করেননি। কারণ, ইসলাম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। অবশ্য বনু নাজীরের দু'জন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুল করেছিলেন। তাদের একজন ইয়ামীন ইবনে উমায়ের ইবনে কাব। আর অপরজন হলো বুসাদ ইবনে ওয়াহাব। তারা নবীজির দরবারে উপস্থিত হয়ে নবীজির বরকতময় হাতে হাত রেখে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে এবং ঈমানের শপথ নেয়। তারা নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গেই ইসলাম কবুল করেছিল। ফলে তাদেরকে তাদের সম্পদের মালিকানায় বহাল রাখা হয়েছিল। তাদের সহায়-সম্পদে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করা হয়নি। ইবনে ইসহাক আবদুল মুনযিরের বর্ণনা মতে, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামীন ইবনে উমায়েরকে তার ইসলাম গ্রহণের পর বলেছিলেন—

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৩ : ১৯১-১৯২; ইবনে সায়্যিদুন নাস, *উয়ুনুল আসার*, ২ : ৭২।

ইয়ামীন, তুমি কি জানো, তোমার চাচাতো ভাই আমর ইবনে জাহাশ আমার সঙ্গে কী আচরণ করেছিল? মূলত বনু নাজীরে গমনের পর বাড়ির ছাদে উঠে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর পাথর নিক্ষেপের চেষ্টা করেছিল ওই আমর ইবনে জাহাশ। কথাটি হযরত ইয়ামীন রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর অন্তরে গেঁথে যায়। তিনি ভুলতে পারেন না—আমার খান্দানেরই এক ব্যক্তি হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এমন নিকৃষ্ট আচরণ করেছিল, তাঁকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল। আমার বংশের জন্যে এটা একটা স্থায়ী কলঙ্ক। এই কলঙ্ক মুছে ফেলবার জন্যে তিনি যথাযোগ্য অর্থ দিয়ে এক ব্যক্তিকে এই বলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তুমি আমর ইবনে জাহাশকে মেরে ফেলো। চুক্তিমাফিক সে ব্যক্তি আমর ইবনে জাহাশকে খুঁজে বের করে এবং তার কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করিয়ে দেয়।

বিভিন্ন গোত্রের তৎপরতার প্রতি দৃষ্টিপাত

বনু নাজীরের ঘটনার পর আর কোনো লড়াই হয়নি। তবে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন সময় সংবাদ এসেছে, অমুক গোত্র মুসলমানদের ওপর হামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। অমুক গোত্র আক্রমণের পরিকল্পনা আঁটছে। সংবাদ পাওয়ামাত্র হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। যারা প্রতারণা করে মুসলমানদেরকে হত্যা করেছে কিন্তু কোথাও তাদের সঙ্গে মোকাবেলা হয়নি—সাহাবায়ে কেরাম যখনই তাদের অঞ্চলে ছুটে গেছেন, তারা হয়তো পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে কিংবা অনেক দূরে পালিয়ে গিয়েছে। সরাসরি মোকাবেলা করার সাহস করেনি। বনু লিহয়ান, যাতুর রিকা, দাওমাতুল জান্দাল প্রভৃতি যুদ্ধে নবীজি সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু শত্রুর সঙ্গে মোকাবেলা হয়নি।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

হিজরী চতুর্থ সালের রবিউল আউয়াল মাসে মদ হারাম সম্পর্কিত ওহী অবতীর্ণ হয়।[১] এর আগ পর্যন্ত মদপান বৈধ ছিল। যখন মদীনা শহরে মদ

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৩ : ১৯২।

হারাম সম্পর্কিত ঘোষণা প্রচার করা হলো, তখন মদের বিশাল বিশাল মটকা এবং মশকের মুখ খুলে উপুড় করে ঢেলে দেওয়া হয়। বর্ষার জলের মতো পথে পথে মদের বন্যা বয়ে যায়। সাহাবায়ে কেরাম সুরাহি এবং পানপাত্র ভেঙে ফেলেন। শুরুর দিকে অবশ্য মদের পাত্রও ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এই বছরের অরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পুত্রের ওফাত। নবীজির দুহিতা হযরত রুকাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহার গর্ভে জন্মেছিলেন এই আবদুল্লাহ। তখন তার বয়স হয়েছিল ছয় বছর। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযা পড়ান। হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজে কবরে নেমে প্রিয় পুত্রকে সমাধিস্থ করেন।

এই বছরই হযরত আবু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল করেন। হযরত আবু সালামা হলেন নবীজির ফুপু বাররা বিনতে মুত্তালিবের পুত্র। তা ছাড়া তিনি নবীজিরও দুধভাই। ইসলামের একেবারে প্রথমকালের মুসলমান। প্রথমে স্ত্রী উম্মে সালামাকে নিয়ে হাবশায় হিজরত করেন। পরে একটি ভুল সংবাদের ভিত্তিতে মক্কায় ফিরে আসেন। তারপর যখন মদীনার উদ্দেশ্যে হিজরত করেন, তখন মুশরিক-সম্প্রদায় তার স্ত্রী-পুত্রকে ছিনিয়ে নেয়। তিনি একা মদীনায় এসে পৌছান। তার অনেক পরে তার স্ত্রী-সন্তান মদীনায় আসে। ওহুদ যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হন। এক মাস চিকিৎসার পর যখন জখম কিছুটা সেরে উঠতে শুরু করে, তখন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আরেকটি বাহিনীর আমীর বানিয়ে যুদ্ধে পাঠান। ঘা আবার কাঁচা হয়ে উঠে। এবং এ বছরই ইন্তেকাল করেন। এ বছরেরই শাবান মাসে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ছোট ছেলে হযরত হুসাইন জন্মগ্রহণ করেন। এ বছরের রমযান মাসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়নাব বিনতে খুযায়মাকে বিয়ে করেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ দানশীল। মানুষের প্রতি তার উদারহস্ত দানের কারণে মানুষ তাকে উম্মুল মাসাকীন বলে ডাকত। নবীজির ঘরে অল্প কয়েক মাস কাটাবার পর ইন্তেকাল করেন।

শাওয়াল মাসে হযরত উম্মে সালামার ইদ্দত পূর্ণ হয়। নবীজি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। প্রথমে তিনি এই বলে অপারগতা প্রকাশ করেন—

আমার কয়েকজন সন্তান আছে। তাদের জন্যে আমাকে কাজ-কর্ম করতে হয়। আমাকে ছাড়া তাদের জীবনযাপনের কোনো আশ্রয় নেই। তা ছাড়া আমার ভেতর আত্মমর্যাদাবোধও বেশি। নবীজি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, সন্তানদের ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা করবেন। আর আমি আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করব, আল্লাহ তাআলা তোমার আত্মমর্যাদাবোধ কমিয়ে দেবেন। তারপর তিনি বিয়েতে রাজি হয়ে যান। *তিরমিযী শরীফের* একটি হাদীসে আছে—হযরত উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, একদিন আবু সালামা ঘরে এসে বললেন, আজ হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ যদি কোনো বিপদে পড়ে, তা হলে যেন ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়ে। এতে তার বিপদও কেটে যাবে। আর তার উত্তম প্রতিদান লাভ হবে। নবীজির এ কথাটি আমি মনে রাখি। আবু সালামা যখন মারা যান, আমি ইন্না লিল্লাহ পড়ি। সঙ্গে দুআ করি—হে আল্লাহ, আমাকে এই বিপদ থেকে মুক্তি দাও এবং এর চেয়ে উত্তম বস্তু আমাকে দান করো। তারপর আমি ভাবতে থাকি, আবু সালামার চেয়ে উত্তম স্বামী আমি কোথায় পাব? তার চেয়ে উত্তম স্বামী পাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। যখন আমার ইদ্দত পূর্ণ হলো, তখন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব এল। অথচ এমন সৌভাগ্যের কথা আমি কখনো কল্পনাও করিনি।

এই বছরই হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবী যায়েদ ইবনে সাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে বলেন, যায়েদ, ইহুদিদের প্রতি আমার কোনো আস্থা নেই। তুমি তাদের সুরয়ানি ভাষাটি শিখে নাও। হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহু মাত্র পনেরো দিনে ইহুদিদের ভাষা শিখে নেন। তারপর তিনি তাদের পত্রাবলি পড়তে পারতেন এবং ওই ভাষায় উত্তরও লিখতে পারতেন।[১]

খন্দকের যুদ্ধ

খন্দকের যুদ্ধের অপর নাম জঙ্গে আহযাব। এই যুদ্ধটি সংঘটিত হয় হিজরী পঞ্চম সালের শাওয়াল মাসে। মূলত এটা মদীনার আশপাশে

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪ : ৭৯-৯১।

বসবাসরত ইহুদিদের সুদূরপ্রসারী সুশৃঙ্খল একটি ভয়াবহ ষড়যন্ত্র ছিল। মক্কার মুশরিকদের তৎপরতা প্রায় শীতল হয়ে পড়েছিল। মক্কার পরিবেশ হয়ে পড়েছিল সম্পূর্ণ নীরব। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে শত্রুতা ও প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়েছিল মদীনার আশপাশে বসবাসরত এই ইহুদি-সম্প্রদায়, অথচ তাদের সঙ্গে মুসলমানদের মিত্রচুক্তি ছিল। চুক্তিবিচারে তারা ছিল মুসলমানদের মিত্রপক্ষ। এই ষড়যন্ত্র ও অগ্নিপ্রসারণে সবার আগে ছিল বনু নাজীরের ইহুদি-সম্প্রদায়, অথচ বাঁদরামি ষড়যন্ত্র অঙ্গীকারভঙ্গসহ নানা অপরাধের কারণে এদেরকে বনু নাজীর অঞ্চল থেকে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। এই বজ্জাত ইহুদিদের মধ্যে সালাম ইবনে আবুল হাকীক নাজরী, হুওয়াই ইবনে আখতাব নাজরী, কিনানা ইবনে রবী ইবনে আবুল হাকীক, হাউজাহ ইবনে আবুল কায়েস ইবনে আদ দুওয়ালী এবং আবু আম্মার দুওয়ালী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—অর্থাৎ বনু নাজীর ও বনু ওয়াইল গোত্রের সদস্যরাই এক্ষেত্রে ছিল সবচেয়ে তৎপর। তারা তদের মধ্য থেকে একটি প্রতিনিধিদল মক্কায় প্রেরণ করে। দলটি মক্কায় গিয়ে কুরাইশদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। সেখানে গিয়ে তারা এই বলে কুরাইশদেরকে উসকাতে থাকে—তোমরা যদি মদীনার ওপর হামলা করো, তা হলে আমরা পরিপূর্ণরূপে তোমাদের সঙ্গে থাকব। তোমাদেরকে সব ধরনের সাহায্য করব। মুসলমানদেরকে সমূলে উৎপাটন না করা পর্যন্ত আমরা তোমাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করব।[১]

ইহুদিরা যখন নানাভাবে কুরাইশদেরকে উসকাতে থাকে, তখন তারা ইহুদিদেরকে বলে, আচ্ছা, তোমরা তো আহলে কিতাব। তোমাদের কাছে আসমানি ইলম রয়েছে। দীন-ধর্ম সম্পর্কে তোমাদের জানাশোনা প্রচুর। আমাদেরকে একটা কথা বলো, আমাদের ধর্ম উত্তম, না মুহাম্মাদের ধর্ম? প্রতিনিধি ইহুদিদল তখন মুখের ওপর বলে দেয়, তোমাদের ধর্ম উত্তম এবং তোমরাই অধিকতর সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এটা ছিল কুরাইশদের একটি মনস্তাত্ত্বিক সংশয়। এই সংশয় উন্মোচিত হওয়ার পর তাদের অন্তরে বিশ্বাসের আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে নতুন করে জেগে উঠে আবেগ ও স্বপ্ন। তারপর তারা সম্মিলিতভাবে ইহুদিদের এই আবেদন ও আমন্ত্রণকে

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৩ : ২২৯-২৩০।

খুন করে নেয় এবং মদীনার ওপর হামলা করবে বলে জানিয়ে দেয়।

প্রথম পদক্ষেপেই ইহুদিরা ভাবনাতীত সফলতা অর্জন করে। তারপর তারা মক্কা থেকে বেরিয়ে গিতফান ইবনে কায়েস গোত্রে যায়। তাদেরকেও একই দাওয়াত দেয়। তাদেরকেও কথা দেয়—আমরা যে কোনো পরিস্থিতিতে তোমাদের সঙ্গে থাকব। তাদেরকে এও জানিয়ে দেয়—এ বিষয়ে কুরাইশ আমাদের সঙ্গে একমত হয়েছে। তারা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। গিতফান ইবনে কায়েসের কবিলাও তখন ইহুদিদের পরিকল্পনায় ঐকমত্য পোষণ করে। তাদেরকে কথা দেয়, আমরা আমাদের সর্বশক্তিসহ এই অপারেশনে অংশগ্রহণ করব। তারপর ইহুদিদের এই প্রতিনিধিদলটি বিভিন্ন গোত্রের কাছে ছুটে যায়। প্রতিটি গোত্রকে গিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিতে উৎসাহিত করে। কুরাইশ ও বনু গিতফানের কথা জানার পর অন্য গোত্রগুলো সহজেই যুদ্ধ করতে সম্মত হয়। এভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের লেলিহান ছড়াতে ছড়াতে তারা মদীনায় ফিরে আসে। এককথায় তারা পুরো আরব জুড়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ আগুন ছড়িয়ে দেয়। অল্প কিছু দিনের মধ্যে সবদিক থেকেই বিচ্ছিন্ন গোত্রগুলো সমবেত হয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে চলতে শুরু করে। কুরাইশ-বাহিনী ছিল আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে। বনু গিতফানের নেতৃত্বে ছিল উওয়াইনা ইবনে হুসাইন ইবনে হুযাইফা। বনু মুররার পতাকা ছিল হারেস ইবনে আউন ইবনে আবু হারেসাহ আল মুররীর হাতে। আর মিসআর ইবনে রুহাইলা ইবনে নুআইরা ছিল তার গোত্রের সেনাপতি।

সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে নবীজির পরামর্শ

ইহুদি ও মুশরিকদের সকল তৎপরতা সম্পর্কে বরাবর তথ্য পাচ্ছিলেন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নবীজি অনুমান করছিলেন—এবার মোকাবেলা হবে সবচেয়ে বড় বাহিনীর সঙ্গে। অনুমান করতে অসুবিধা হয়নি, পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। তাই সাহাবায়ে কেরামকে ডেকে কর্মকৌশল সম্পর্কে পরামর্শে বসলেন। ভাবনার বিষয়—এই বিশাল বাহিনীকে আমরা কীভাবে মোকাবেলা করব। হযরত সালমান ফারসি রাযিয়াল্লাহু আনহু পরামর্শ দিলেন—প্রথমেই মদীনাকে সুরক্ষিত শহর

হিসেবে গড়ে তোলা হোক। তারপর মদীনার ভেতরে থেকে শত্রুদের মোকাবেলা করা হোক। মদীনার চারপাশে এমনভাবে পরিখা খনন করা হোক, যেন শত্রুপক্ষ তা পার না করতে পারে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মতকে খুবই পছন্দ করেন। সিদ্ধান্ত হয়—পরিখা খনন এখনই শুরু করা হোক। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের মাঝে পরিখা খননের কাজ ভাগ করে দেন। প্রতি দশজন সাহাবীকে চল্লিশ হাত পরিখা খননের দায়িত্ব দেন। এই কর্মসূচিতে নিজেও অংশগ্রহণ করেন। মাটি খনন, মাটি উত্তোলন ও নিক্ষেপণে তিনি সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে থেকে কাজ করেন। একবার একস্থানে মাটি খনন করতে করতে বড় একটি পাথর পড়ে। সাহাবায়ে কেরাম হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে বললেন, একটি বড় পাথর পড়েছে। কোনোভাবেই ভাঙা যাচ্ছে না। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—যাও, আমি আসছি। তিনি সেখানে গেলেন। কোদাল তুলে নিলেন। আঘাত করামাত্র বালুর স্তূপের মতো চূর্ণ চূর্ণ হয়ে গেল। পরিখা খননের সময় হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিভিন্ন রকমের মোজেযা প্রকাশিত হয়েছে। সেইসব মোজেযার কথা বিশুদ্ধতম বর্ণনাসমূহে রয়েছে।

পরিখা খনন সমাপ্ত। এখন আর মদীনায় প্রবেশের জন্যে শত্রুদের সামনে কোনো পথ খোলা নেই। পরিখা এতটাই প্রশস্ত ও গভীর—কোনো ঘোড়ার পক্ষে তা লাফিয়ে পার করা সম্ভব নয়। ফলে শত্রুপক্ষ এসে উপস্থিত হয়ে খন্দকের অপর তীরে দাঁড়িয়ে যেতে বাধ্য হয়। ওপারে শত্রুপক্ষ আর এপারে শহরের ভেতরে মুসলমানগণ। পরিখা খনন সমাপ্ত হওয়ায় মুসলমানদের মধ্যে আস্থা ও সাহস সঞ্চার হয়। তারপর শত্রুদের বাহিনী আসতে শুরু করে। শত্রুপক্ষ দশ হাজার সৈনিকের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে হাজির হয়। এসে তারা তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান গ্রহণ করে। বিশাল এই বাহিনীতে কুরাইশের বাইরে আছে তিহামার অধিবাসী বনু কিনানা, বনু গিতফান, বনু গিতফানের মিত্র গোত্রসমূহ। দেখতে দেখতে ওহুদ পাহাড়ের পুরো আঁচলটি মানুষের বনে পরিণত হয়।[১]

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৩ : ২৫৩-২৩৬।

এদিকে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী ও শিশুদেরকে মদীনার দুর্গে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর তিন হাজার সৈনিক নিয়ে মোকাবেলার জন্যে ময়দানে আসেন। শত্রুপক্ষ পরিখার ওপারে আর এপারে অবস্থান নিয়েছেন মুসলমানগণ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় শাসক বানিয়ে রেখে এসেছেন আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমকে।

চুক্তিভঙ্গ করল বনু কোরায়যা

ইহুদিদেরই একটি গোত্র বনু কোরায়যা। চুক্তি-সুবাদে তারা ছিল মুসলমানদের মিত্রপক্ষ। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তারা চুক্তি করেছিল। অন্য ইহুদিরা যখন আরবদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের আগুন ছড়াচ্ছে, তখনো তারা তাদের চুক্তির ওপর অবিচল ছিল। মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্রে এ পর্যন্ত বনু কোরায়যার কোনো ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেনি। কিন্তু যখন দশ হাজার সশস্ত্র যোদ্ধা এসে মদীনা ঘেরাও করে বসে, তখন হুওয়াই ইবনে আখতাব বনু কোরায়যাকে সঙ্গে নিতে মরিয়া হয়ে উঠে। বনু কোরায়যা তাদের দুর্গের ফটক বন্ধ করে ভেতরে অবস্থান করে। এই যুদ্ধে কোনোভাবেই তাদের অংশগ্রহণের ইচ্ছে নেই। হুওয়াই ইবনে আখতাব বনু কোরায়যার দুর্গের সামনে গিয়ে দেখে—ফটক বন্ধ। ভেতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করে। বনু কোরায়যার নেতা কাব ইবনে আসাদ আল কুরাজী ফটক খুলে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু হুওয়াই ইবনে আখতাব বরাবর পীড়াপীড়ি করতে থাকে। কাব তখন বলে, তুমি আসলে একজন অভিশপ্ত মানুষ। মুহাম্মাদের সঙ্গে আমি চুক্তিবদ্ধ আছি। সুতরাং আমি আমার চুক্তি ভাঙতে পারব না। তা ছাড়া তিনি তো কখনো আমাদের সঙ্গে চুক্তিপরিপন্থী কিছু করেননি। এমন চুক্তি-অনুগত কোনো ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করা যায় না। তুমি চলে যাও। গেট খোলা যাবে না। কিন্তু হুওয়াই ইবনে আখতাব তার জায়গায় অবিচল। তার এককথা—গেটটা একটু খোলো। আমি কয়েকটি কথা বলে চলে যাব। কাব বলল, আমি তোমার সঙ্গে কোনো কথা বলতে চাচ্ছি না। হুওয়াই ইবনে আখতাব তখন তাকে খোঁটা দিয়ে বলল, ভেতরে এলে খেতে

দিতে হবে বলে তুমি দুর্গের ফটক বন্ধ করে রেখেছ? কথাটা কাবের গায়ে খুব লাগে। ফটক খুলে দিতে আদেশ দেয়। হুওয়াই ইবনে আখতাব ভেতরে এসে বলে, আমি তোমাদের মান-সম্মান বাড়াবার চেষ্টা করছি আর তোমরা বরাবর তা অস্বীকার করছ। দ্যাখো, কুরাইশদের সকল নেতা, বিখ্যাত আরব-গোত্রগুলোর সকল লিডার ও সর্দারদেরকে এখানে এনে নামিয়ে দিয়েছি। তারা সকলে মিলে শেকড়সুদ্ধ মুসলমানদেরকে উপড়ে ফেলবে। এত বড় বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়বার সামর্থ্য মুসলমানদের নেই—এটাই শেষ সুযোগ এবং শেষ যুদ্ধ। কাব বলল, এসব হচ্ছে মূলত আকাশের উড়ন্ত মেঘ ঝলকিত বিদ্যুৎ এবং বজ্রধ্বনি। অহংকারের বাতাস বেরিয়ে গেলে সকলেই পালিয়ে যাবে। তখন আমাদেরকে এখানে পস্তাতে হবে। হুওয়াই ইবনে আখতাব তখন কসম খেয়ে বলল, এইসব গোত্র ও গোত্রপতিগণ যদি সত্যি সত্যি ব্যর্থ হয়ে চলে যায়, তা হলে আমি তোমাদের দুর্গে চলে আসব। মুসলমানদের পক্ষ থেকে আপতিত সকল বিপদাপদে আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব। আমি কখনো আমার অঙ্গীকার ভঙ্গ করব না।

হুওয়াই ইবনে আখতাবের এই শপথ ও কসম শুনে কাব ইবনে আসাদের দৃঢ়তা ভেঙে যায়। সে হুওয়াই ইবনে আখতাবের সঙ্গে থাকবে বলে কথা দিয়ে বসে। তারপর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারনামা ছিঁড়ে ছুঁড়ে মারে। অতঃপর শত্রুদের দলে গিয়ে মিলিত হয়।

কাব ইবনে আসাদ নবীজির সঙ্গে কৃতচুক্তি ভঙ্গ করলেও বনু কোরায়যার কিছু লোক বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি। তাদের কাছে বিষয়টি ছিল অন্যায়। আসআদ, উসাইদ এবং সালাবা—এই তিন ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ছুটে আসে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারেন, বনু কোরায়যা তাঁর সঙ্গে কৃত চুক্তিনামা ছিঁড়ে ফেলেছে। তারা শত্রুশিবিরে যোগদান করেছে। নবীজি তখন তাদের নেতা সাদ ইবনে মুআয এবং খাজরায গোত্রের নেতা সাদ ইবনে উবাদাকে বনু কোরায়যার কাছে পাঠান। সঙ্গে পাঠান আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা এবং খাদাদ ইবনে জুবায়েরকেও। নবীজি

তাদেরকে এই বলে বনু কোরায়যায় পাঠান—গিয়ে দ্যাখো, তারা কি সত্যি সত্যি শত্রুদের সঙ্গে যোগদান করেছে! যদি করে থাকে, তা হলে আমাকে এসে ইশারায় বলো। সাধারণ লোকজন যেন কোনোভাবেই জানতে না পারে। নইলে তাদের মনে হাতাশা ছড়িয়ে পড়তে পারে। তারা সেখানে যান। পরস্পরে উত্তপ্ত কথাবার্তা হয়। কিন্তু আত্মমর্যাদাবোধহীন ইহুদি-সম্প্রদায় পরিষ্কার জানিয়ে দেয়, মুসলমানদের সঙ্গে আমাদের চুক্তি শেষ। এখন আমরা আর সেই চুক্তিনামার অনুগত নই। প্রতিনিধিদল এসে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষয়টি অবহিত করেন।

ঠিক এমন সময় মোনাফেকদের একটি দল এসে নবীজির দরবারে আবেদন করে, আমাদের বাড়ি-ঘর শহরের তীরে অবস্থিত। শত্রুর একেবারে নাগালে। সুতরাং আমাদেরকে আমাদের ঘরে যাওয়ার অনুমতি দিন। তারপর তারা গোপনে গোপনে যুদ্ধের মোর্চা ছেড়ে পালিয়ে যায়। এটা ছিল মুসলমানদের মধ্যে আরেকটি নীরব ভাঙন। এর মধ্যে কোনো কোনো গোত্রকে সরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাবও আসে, কিন্তু তা গৃহীত হয়নি। মুসলমানগণ এইসব মানসিক অস্থিরতার শিকার ছিলেন। সাহস ভেঙে যাওয়ার মতো নানা বিষয় সামনে এসেছে। তারপরও এই সময়ে উভয় পক্ষের মধ্যে কোনো লড়াই হয়নি। মুশরিক-সম্প্রদায় মদীনা ঘেরাও করে পড়ে রয়েছে। সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করার কোনো পথ তাদের সামনে খোলা ছিল না। একবার প্রচণ্ড জোশ ও আবেগে কুরাইশের কয়েকজন ঘোড়সওয়ার—আমর ইবনে আবদুদ ইবনে আবু কায়েস, ইকরিমা ইবনে আবু জেহেল, হুবাইরা ইবনে আবু জাহাব মাখজুমী, যিরার ইবনে খাত্তাব ইবনে মারদাস নিজ নিজ ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ঘোড়ায় চড়ে ছুটে বেড়াতে থাকে এবং পরিখা অতিক্রম করার পথ খুঁজতে থাকে। এক জায়গায় পরিখার পরিসর কিছুটা কম দেখে আমর ইবনে আবদুদ তার ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়। হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে জায়গায় হত্যা করে ফেলেন। সতীর্থের এই পরিণতি দেখে অন্যেরা ছুটে পালায়।[১]

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪ : ১০৫।

মাঝেমধ্যে উভয় পক্ষে তিরন্দাজি হয়েছে। তবে সামনাসামনি কোনো যুদ্ধ হয়নি। এক রাতে শত্রুপক্ষের ঘোড়সওয়ার-বাহিনী খুব হইচই করেছে। চেঁচামেচি করেছে—আজকে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ না করে ছাড়বে না। মুসলমানগণও সারারাত প্রতিরোধ-প্রহরায় কাটিয়েছেন।

ঘেরাওকাল ক্রমাগত প্রলম্বিত হচ্ছিল। বিশ দিনের অধিককাল অতিবাহিত হয়েছে। শত্রুপক্ষের কোনো কৌশলই কোনো ফল বয়ে আনতে পারেনি। মুসলমানদের ওপর আক্রমণ এবং তাদের অস্তিত্বকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার উগ্র কামনা তাদের অন্তরের কবরস্তানেই সমাধিস্থ হয়ে থাকে। এভাবে বাইশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর একদিন হযরত নাঈম ইবনে মাসউদ গিতফানী হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে বললেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি মুসলমান হয়েছি। তবে বিষয়টি আমার সম্প্রদায়ের কাছে এখনো অজানা। তারা জানে না, আমি মুসলমান। আপনি চাইলে আমাকে কোনো কাজে লাগাতে পারেন। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তোমার চিন্তা ও অভিজ্ঞতার আলোকে যা করবার করতে পরো। যুদ্ধের ব্যাপারে সর্বজনস্বীকৃত একটা কথা আছে, যুদ্ধ হলো শত্রুর সঙ্গে কৌশলের খেলা। সুতরাং তোমার কাছে পরিস্থিতি-অনুকূল কোনো কৌশল থাকলে তা ব্যবহার করতে পারো।[১]

যুদ্ধের ময়দানে হযরত নাঈম ইবনে মাসউদ

নাঈম ইবনে মাসউদ গিতফানী মনে মনে একটা কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেন। বিষয়টি কীভাবে বাস্তবায়ন করবেন, মনের মধ্যে তাও সাজিয়ে নেন। সর্বপ্রথম বনু কোরায়যার কাছে যান। ইসলামপূর্ব যুগে তাদের সঙ্গে হযরত নাঈমের ভালো বন্ধুত্ব ছিল। পরস্পরে বেশ অকৃত্রিম সম্পর্ক ছিল। তিনি তাদেরকে গিয়ে বললেন, তোমাদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব এবং পারস্পরিক অকৃত্রিম সম্পর্কের কথা বলার অবকাশ রাখে না। আমরা পরস্পর সর্বদাই ছিলাম একে অপরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং কল্যাণকামী। বনু কোরায়যা বলল, এতে আর সন্দেহের কী আছে? হযরত নাঈম রাযিয়াল্লাহু

১ ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, ১ : ৫৭১।

আনহু যখন তাদের আস্থা লাভ করলেন, তখন বললেন, আসলে কুরাইশ এবং গিতফান গোত্রের লোকদের এখানে সে মূল্য নেই, যে মূল্য তোমাদের আছে। এখানে তোমাদের একটা নিজস্ব অতীত-অবস্থান আছে। তারা বাইরে থেকে এসেছে, আবার চলে যাবে, অথচ এটা তোমাদেরই শহর। তোমাদের সহায়-সম্পদ সবই এখানে। তোমাদের ব্যবসায়িক মাল-পত্র এবং সঞ্চিত ধন-দৌলত সবকিছু এখানেই আছে। এসব কিছু নিয়ে তোমরা কোথাও চলে যাবে, এটা তো হতে পারে না। সর্বাবস্থায় তোমাদেরকে এখানেই থাকতে হবে। ধরো, এরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরাজিত করতে পারল না, তারপর নিজেরাই এখান থেকে পালিয়ে গেল, তখন দেখবে, মুসলমানদের পুরো ক্রোধ ও ক্ষোভ ভেঙে পড়বে তোমাদের ওপর। তোমরা একা তখন তাদের ওই ক্রোধকে ঠেকাতে পারবে না। পরিণতিতে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। অথচ কুরাইশ এবং গিতফানের লোকেরা তখন নিজ নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে উল্লাস করবে। তাই আমার মনে হয় কি—তোমরা একটা কাজ অবশ্যই করে নাও—বহিরাগতদেরকে তোমরা স্পষ্ট জানিয়ে দাও—আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি—কেবল এই শর্তে—যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের শেকড়সুদ্ধ উপড়ে না ফেলবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এই এলাকা ছেড়ে যেতে পারবে না। তারা নিশ্চয় এ বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে একমত হবে। তারপর তোমরা এই অঙ্গীকারের জামানত হিসেবে তাদের কবিলার কিছু গুরুত্বপূর্ণ লোককে বন্ধক রাখতে বলবে। সোজা জানিয়ে দেবে, তোমাদের কবিলার কিছু গুরুত্বপূর্ণ লোক আমাদের কেল্লায় অবস্থান করবে। যদি কোনো কারণে তারা পালিয়ে যায় কিংবা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তা হলে যেন তোমরা তার প্রতিশোধ নিতে পারো। সুতরাং আমার মনে হয় তাদের সঙ্গে যুদ্ধে নামার আগে তাদের কিছু লোক বন্ধক হিসেবে তোমাদের দুর্গে তুলে নেওয়া ভালো। হযরত নাঈমের কথা ছিল একেবারে যৌক্তিক। বনু কোরায়যার লোকেরা সহজেই তার প্রস্তাবকে মেনে নেয় এবং তাকে বলে দেয়—তোমার এই মত একেবারে বাস্তবসম্মত।

নাঈম ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বনু কোরায়যাকে কাচের পাটাতনে নামিয়ে এনে চলে যান কুরাইশদের কাছে। সাক্ষাৎ করেন

কুরাইশ-বাহিনীর প্রধান আবু সুফিয়ানের সঙ্গে। শুরুতেই ভূমিকা হিসেবে বলেন—তোমাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কেমন, সেটা কারও অজানা নয়। মুহাম্মাদের [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সঙ্গে আমার দূরত্বের অবস্থাটাও তোমাদের জানা আছে। তোমাদের বন্ধুত্বের খাতিরেই আমি আজ এখানে আসতে বাধ্য হয়েছি। আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি গোপন তথ্য জানতে পেরেছি। তারপর আমার কর্তব্য মনে হয়েছে—বন্ধু হিসেবে কথাটা তোমাদের জানিয়ে দেওয়া। উদ্দেশ্য, তোমরা যাতে কোনো ধরনের ধোঁকায় না পড়ো। তবে কথাটি খুবই গোপন। এটা আর কাউকে জানাবে না, এই শর্তে তোমাকে বলছি। আবু সুফিয়ান কথা দেয়, না কাউকে জানাব না। হযরত নাঈম ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন বলেন, আমি গোপন সূত্রে জানতে পেরেছি—ইহুদিরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কৃতচুক্তিনামা ছিঁড়ে ফেলে এখন খুবই লজ্জিত। তারা পুনরায় মুহাম্মাদের আস্থা অর্জন করতে চাচ্ছে। নতুন করে মিত্রচুক্তি করতেও চেষ্টা করছে। তারা তাদের কয়েকজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে মুহাম্মাদের কাছে লজ্জা প্রকাশ করেছে। এবং মুহাম্মাদের আস্থা অর্জনের জন্যে এও বলেছে—আমরা কুরাইশ এবং গিতফানের নেতৃস্থানীয় কিছু ব্যক্তি ধরে এনে আপনার হাতে তুলে দেব। আপনি তাদের গর্দান উড়িয়ে দিয়ে পথের কাঁটা পরিষ্কার করে নেবেন। তারপর আমরা পরস্পরে পূর্বের মতো মিত্রচুক্তি করব। আমরা একসঙ্গে পরস্পরে আগের মতো বন্ধু হিসেবেই জীবনযাপন করব। মুসলমানদের পক্ষ থেকে এই প্রস্তাবের প্রতি সম্মতিও দেওয়া হয়েছে। তাই আমার প্রস্তাব হলো, ইহুদিরা যদি তোমাদের কাছ থেকে কিছু লোক বন্ধক রাখতে বলে, তা হলে একজন ব্যক্তিকেও তাদের হাতে তুলে দেবে না। আবু সুফিয়ান বলল, তুমি একেবারে যথার্থ বলেছ। কোনো অবস্থাতেই এর ব্যত্যয় হবে না।

এখান থেকে উঠে নাঈম ইবনে মাসউদ চলে যান বনু গিতফানের কাছে। তাদেরকেও আবু সুফিয়ানের অনুরূপ প্রস্তাব দেন। বনু গিতফানের লোকেরা বলে, তুমি একেবারে যথার্থ বলেছ। যা বলেছ, তা-ই হবে। আমরা একজন ব্যক্তিকেও ওদের হাতে তুলে দেব না।[১]

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৩ : ২৪৭-২৪৯।

হযরত নাঈম ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার স্কিম মোতাবেক কর্মকাণ্ড সম্পাদনের পর মদীনায় ফিরে আসেন। এদিকে কুরাইশ এবং গিতফান বনু কোরায়যার কাছে নিজ নিজ প্রতিনিধিদল পাঠায়। এই প্রতিনিধিদলের নেতা ছিল ইকরিমা ইবনে আবু জেহেল। তার নেতৃত্বে কুরাইশ এবং গিতফানের আরও কিছু লোক বনু কোরায়যায় গিয়ে উঠে। তাদেরকে গিয়ে বলে, আমরা দীর্ঘ দিন হলো এখানে এভাবে পড়ে আছি। যদি এই ঘেরাও কর্মসূচি আরও প্রলম্বিত হয় তা হলে তো আমাদের উট এবং ঘোড়া সবই শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং যত দ্রুত সম্ভব এর একটা ফয়সালা করে নিতে হবে। আমরা এখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আক্রমণ করতে চাচ্ছি। আপনারাও প্রস্তুত হয়ে আমাদের সঙ্গে আসুন। আপনাদের যোদ্ধাদেরকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বনু কোরায়যা বলে, আজ শনিবার। আজ আমরা কোনো ধরনের পদক্ষেপে যাব না। তারপর তাদের সঙ্গে নানা ধরনের কথা প্রসঙ্গে এও বলে—আমাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করছে, যারা বাইরে থেকে এসেছে, তারা যদি এখান থেকে চলে যায়, তা হলে আমরা বিপদে পড়ব। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি—যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের অস্তিত্ব পরিপূর্ণভাবে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা এখান থেকে যেতে পারবেন না। আর আমাদের এই পারস্পরিক চুক্তি ও অঙ্গীকারের জন্যে আমরা এটাও আবশ্যক মনে করছি—আপনাদের মধ্য থেকে কিছু লোক আমাদের কেল্লায় পাঠিয়ে দেবেন। তারা আমাদের এখতিয়ারে থাকবেন। আপনারা আপনাদের অঙ্গীকারে অবিচল থাকবেন—এর ওপর আমরা যেন পূর্ণরূপে ভরসা রাখতে পারি। বনু কোরায়যার সঙ্গে এই প্রতিনিধিদল আলাপ আলোচনা শেষ করে যখন নিজ নিজ গোত্রে ফিরে যায়, তখন গোত্রের লোকেরা পরস্পর বলাবলি করতে থাকে, নাঈম ইবনে মাসউদ ঠিক কথাই বলেছে, তার কথা শতভাগ সত্য। তারপর কুরাইশ এবং গিতফানের লোকেরা প্রতিনিধি পাঠিয়ে বনু কোরায়যাকে জানিয়ে দেয়—আমরা আমাদের একজন ব্যক্তিকেও তোমাদের হাতে তুলে দেব না। তোমরা যদি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চাও, তা হলে বেরিয়ে আসো। কুরাইশ এবং গিতফানের প্রতিনিধিরা যখন বনু কোরায়যাকে গিয়ে তাদের সিদ্ধান্তের কথা

পরিষ্কার জানিয়ে দেয়, তখন বনু কোরায়যা বলতে থাকে, নাঈম ইবনে মাসউদের কথাই সত্য।

কুরাইশ গিতফান এবং বনু কোরায়যা প্রত্যেকেই নাঈম ইবনে মাসউদের কথাকে সত্য বলে স্বীকার করে নেয়। এর ফলাফলও হয় চমৎকার। বনু কোরায়যাও কুরাইশ এবং গিতফানকে অত্যন্ত গরম ভাষায় জানিয়ে দেয়—তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কাছে কিছু লোক বন্ধক না রাখছ, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে নামছি না। এতে করে কুরাইশ এবং গিতফানও অস্বস্তিতে পড়ে। তারাও কোনোভাবে বনু কোরায়যার ওপর ভরসা রাখতে পারে না। ফলে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতার জায়গায় পরস্পর ঘৃণা ও অনাস্থা দানা বেঁধে উঠে। কর্মক্ষেত্রে একে অপরকে পরিপূর্ণরূপে বর্জন করে। চিন্তা ও মানসিকতায় বিশাল দূরত্ব গড়ে উঠে।

আকস্মিকভাবে এই রাতেই প্রচণ্ড ঝড় হয়। বাতাস এতটাই ঝড়ো গতিতে বইতে থাকে—শত্রুপক্ষের চুলার উপরে বসানো ডেগগুলো পর্যন্ত উড়িয়ে নিয়ে যায়। তাদের ভোজপাত্রগুলো শুকনো পাতার মতো শূন্যে উড়তে থাকে। এর কিছুক্ষণ পর শুরু হয় প্রবল শৈত্যপ্রবাহ। এই বরফভেজা বাতাসকে প্রতিরোধ করবার মতো কোনো উপায়-উপকরণ সৈনিকদের কাছে ছিল না। ফলে সেখানে রাত পার করাই তাদের জন্যে মুশকিল হয়ে পড়ে। তারা জায়গায় বসে থরথর করে কাঁপতে থাকে। হিমেল বাতাসের প্রচণ্ড আঘাত তাদের শরীরের রক্তকে বরফের মতো জমিয়ে ফেলে। পুরো বাহিনী খোলা প্রান্তরে তাঁবু পেতে অবস্থান করছিল। ঝড় এরই মধ্যে বহু তাঁবু তুলে নিয়ে গেছে। আগুন নিভে গেছে। শরীরে তাপ নেওয়ার মতো আগুনও অবশিষ্ট নেই। তখন প্রত্যেক ব্যক্তি কীভাবে নিজের জীবন বাঁচাবে, এই নিয়ে অস্থির হয়ে পড়ে। প্রত্যেকেই চাচ্ছিল, যতটা দ্রুত সম্ভব, এই প্রতিকূল পরিবেশ থেকে পালিয়ে যেতে। ফলে যে যখন সুযোগ পেয়েছে, কবিলার লোকদেরকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে পালিয়েছে। ফলে কেউই অন্যের কোনো খবর নিতে পারেনি। প্রভাত হওয়ার আগেই ময়দান শূন্য। যেখানে দশ হাজার সৈনিকের এক বিশাল বন গড়ে উঠেছিল, সেখানে ভোর পর্যন্ত একজন মানুষও নেই। দাম্ভিক ও আত্মম্ভর বিশাল

বাহিনী কোনো ধরনের লড়াই ও যুদ্ধ ছাড়াই পরাজিত হয়ে এমনভাবে বিচ্ছিন্নরূপে হারিয়ে যায়, যেন ঝড়ো বাতাস গাছের ঝরাপাতাগুলো যেদিকে খুশি উড়িয়ে নিয়ে গেছে।[১]

আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে এভাবেই ইহুদিদের এক ভয়াবহ চক্রান্তের হাত থেকে রক্ষা করেন। যখন দশ হাজার বাহিনীর বিশাল শত্রুদল চব্বিশ দিন যুদ্ধের ময়দানে মুসলমানদেরকে অবরোধ করে রাখার পর নিজে নিজে পালিয়ে যায়, তখন মুসলমানগণ আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করেন। এই প্রেক্ষিতে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন—

الأن نغزوهم وهم لا يغزوننا.

এখন থেকে আমরাই তাদের ওপর হামলা করব। তারা আর আমাদের ওপর হামলা করতে পারবে না।

খন্দকের যুদ্ধের পর মক্কার মুশরিক-সম্প্রদায় আর কখনো মদীনার ওপর আক্রমণ করেনি। মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমানগণই হামলা করেছেন।

বনু কোরায়যাকে গাদ্দারির শাস্তি

খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে দশ হাজার সৈন্যের সমাবেশ ঘটিয়ে মুসলমানদের অস্তিত্ব চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল ইহুদি-সম্প্রদায়। বনু কোরায়যার ভেতরেও ইহুদি ছিল। কিন্তু মুসলমানদের সঙ্গে তাদের মিত্রচুক্তি ছিল। মুসলমানদের পক্ষ থেকে কখনো এই চুক্তির বিপরীত কিছু ঘটেনি। এ কথা বনু কোরায়যাও স্বীকার করত। তারপরও ভেতরবজ্জাত বলে তারা চুক্তি ভঙ্গ করেছে। তাদের রক্তে ও অস্তিত্বে গাদ্দারি এবং খেয়ানত মিশে ছিল বলেই বাতাস সামান্য মুসলমানদের প্রতিকূল দেখতেই মুসলমানদের সঙ্গ ছেড়ে দিয়েছে। মুসলমানদের সঙ্গ ছেড়ে দিয়ে ইহুদি এবং মুশরিকদের শিবিরে গিয়ে

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৩ : ২৫০; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪:১১২-১১৩; ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, ১ : ৫৭১-৫৭২; ইবনে সায়্যিদুন নাস, *উয়ুনুল আসার*, ২ : ৯৭; ইবনে সাদ, *আত তাবাকাত*, ২ : ৬৯।

দাঁড়িয়েছে। মুসলমানদের অস্তিত্ব যখন চরম সংকটের মুখে, তখন যারা এভাবে গাদ্দারি করতে পারে, তাদের কথা কিংবা অঙ্গীকারের ওপর কি কোনো ভরসা করা যায়!

মুশরিক-সম্প্রদায় যখন কুদরতের থাপ্পর খেয়ে মদীনার ঘেরাও ছেড়ে দিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয় এবং হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে ফিরে আসেন, তখনই সামনে এসে হাজির হন হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম। এসেই বলেন, এখনই বনু কোরায়যাকে ধাওয়া করা হোক। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে পাঠান। তার হাতে ঝাণ্ডা তুলে দেন। হযরত বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আদেশ করেন—পুরো মদীনা ঘুরে ঘোষণা করে দাও—সকলে যেন বনু কোরায়যায় গিয়ে আসর নামায পড়ে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমকে মদীনার শাসক বানিয়ে অন্য সকল মুসলমানকে সঙ্গে করে বনু কোরায়যার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। নবীজির সঙ্গে তখন এক হাজার মুসলমানের বিশাল বাহিনী। সঙ্গে ছত্রিশটি ঘোড়া। সময়টা ছিল জিলকদ মাসের বাইশ তারিখ বুধবার। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিয়ে বনু কোরায়যাকে ঘেরাও করেন। কেল্লার চারদিকে মুসলিম-বাহিনী ছড়িয়ে দেন। আসা-যাওয়া বন্ধ করে দেন। বাইরে থেকে মুসলমানগণ কেল্লার ভেতরে তির নিক্ষেপ করেন। কিন্তু বনু কোরায়যা ওপর থেকে উঁকি দিয়ে দেখবারও সাহস করেনি। অবরোধ পনেরো দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অবশেষে বনু কোরায়যা বাধ্য হয়ে নবীজির খেদমতে এই মর্মে সংবাদ পাঠায়—আবু লুবাবাকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। আমরা তার সঙ্গে কথা বলব। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু লুবাবাকে বললেন, বনু কোরায়যার কাছে যাও। দ্যাখো, তারা কী বলে? যাওয়ার পর বনু কোরায়যা হযরত আবু লুবাবা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে পরামর্শ চায়—আমাদের এখন কী করা উচিত? হযরত আবু লুবাবা রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন আঙুলে কণ্ঠনালির দিকে ইশারা করেন। যার অর্থ হলো—তোমাদের গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে। হযরত আবু লুবাবা রাযিয়াল্লাহু আনহু সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করতে পারেন—আমি তো ভুল করেছি। আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলকে

অসন্তুষ্ট করেছি। সেখান থেকে ফিরে এসে নিজেকে মসজিদের একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে নেন। আল্লাহ তাআলা যখন তার তওবা কবুল করেন, তখন তাকে এই বাঁধন থেকে অবমুক্ত করা হয়।

বনু কোরায়যা বলে, সাদ ইবনে মুআয আমাদের সম্পর্কে যে ফয়সালা করবেন, আমরা সেটাই মেনে নেব। তারপর তারা দুর্গের ফটক খুলে বেরিয়ে আসে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, এদের সম্পর্কে তুমি তোমার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দাও। হযরত সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন তাদের সম্পর্কে এই ফয়সালা করেন—তাদের মধ্যে যারা তরবারি চালাবার যোগ্য, তাদেরকে হত্যা করা হবে। তাদের নারী ও শিশুদেরকে বন্দি করা হবে। আর সমূহ সহায়-সম্পদ জব্দ করা হবে। সিদ্ধান্ত হওয়ার পর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাকে আদেশ করেন—এদের প্রত্যেককে উভয় হাত পেছনে নিয়ে বেঁধে ফেলো। তারপর এদেরকে একদিকে রেখে দাও। এদের পুরুষদেরকে একদিকে রাখো। নারী ও শিশুদেরকে রাখো অন্যদিকে। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের পাহারাদার নিযুক্ত করা হয়। তারপর তাদের বাড়িঘর তল্লাশি করা হয়। দুর্গে সংরক্ষিত সকল সম্পদ একত্রিত করার আদেশ দেওয়া হয়। দুর্গ থেকে লৌহবর্ম তরবারি তির ধনুক অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী দুর্গের বাইরে এনে রাখা হয়। হিসেব করে দেখা গেছে—জব্দ সম্পদের মধ্যে পনেরোশো তরবারি ছিল। ছিল তিনশো লৌহবর্ম, দুই হাজার বর্শা, দেড় হাজার ঢাল, মদপূর্ণ অসংখ্য মটকা। এইসব মটকা ভেঙে মাটিতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। কারণ, বনু নাজীরের যুদ্ধের সময়ই মদ হারাম হয়ে গিয়েছিল। হারাম হয়ে গিয়েছিল তার বেচাকেনাও। এর বাইরে আরও ছিল পানি আনার বিপুল উট এবং সামানপত্র বহন ও আরোহণের প্রচুর উট। হযরত সাদ ইবনে মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বনু কোরায়যাই সালিস মেনেছিল। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন—তুমি ফয়সালা করে দাও। ফলে হযরত সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-ই ফয়সালা করেছিলেন। তারপর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন, তুমি আল্লাহ তাআলার মর্জি মোতাবেক ফয়সালা করেছ। তুমি

যে ফয়সালা করেছ, সেটাই ছিল আল্লাহর ইচ্ছা। হিজরী পঞ্চম বর্ষের সাত জিলহজ বনু কোরায়যার বন্দিদেরকে মদীনায় আনা হয়। এখানেই তাদের শাস্তি কার্যকর করা হয়। খুমুস আলাদা করার পর গনিমতের অবশিষ্ট সম্পদ মুজাহিদদেরকে বণ্টন করে দেওয়া হয়।[১]

অপরাধীদের অনুসন্ধান ও শাস্তিদান

খন্দকের যুদ্ধে বিভিন্ন আরব-কবিলা চষে বের করা হয়, যারা দশ হাজার সৈন্যের সমাবেশ ঘটিয়েছিল এবং হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে সর্বত্র প্রতিশোধের লেলিহান ছড়িয়ে দিয়েছিল—সেইসব ইহুদিদের মধ্যে সাল্লাম ইবনে আবুল হাকীক এবং হুওয়াই ইবনে আখতাব সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফলে, বনু কোরায়যার সঙ্গে যখন হুওয়াই ইবনে আখতাবও জাহান্নামবাসী হলো, তখন সাল্লাম ইবনে আবুল হাকীককে তার কৃতকর্মের শাস্তিদানও অনিবার্য হয়ে উঠল। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিখ্যাত শত্রু ইহুদি কাব ইবনে আশরাফকে হত্যা করেছিল আউস গোত্রের মুসলমানগণ। এর ফলে খাযরাজ গোত্রের মুসলমানদের মধ্যে একটা আবেগ বরাবর উত্তাপ ছড়াত—আমরাও যদি আল্লাহর নবীর কোনো দুশমনকে জাহান্নামে পাঠাতে পারতাম, তা হলে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টিতে আমরাও ভাগ্যবান হতে পারতাম। এই দুই গোত্রের মধ্যে কল্যাণকর্মে বরাবরই একটা প্রতিযোগিতা চলত। নবীজির প্রতি ভালোবাসার কারণে তাদের এই প্রতিযোগিতা ছিল অসামান্য।

খাযরাজের মুসলমানগণ জানতে পারেন—বর্তমানে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো সাল্লাম ইবনে আবুল হাকীক। এই ইহুদি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর জানবাজ সঙ্গীদেরকে পৃথিবী থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্যে সম্ভব সব রকমের চেষ্টা করছে। এই ভেবে খাযরাজ গোত্রের কয়েকজন যুবক নবীজির দরবারে এসে সাল্লাম ইবনে আবুল হাকীককে হত্যা করার

---

১ ইবনে সাদ, *আত তাবাকাত*, ২ : ৭৪-৭৫।

অনুমতি চায়। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে অনুমতি দেন এবং দুআ দেন। সাল্লাম ইবনে আবুল হাকীক তখন খায়বারে অবস্থান করছিল। ফলে খাযরাজের যুবকদেরকে খায়বারেই যেতে হয়। খায়বারের এই অপারেশনে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তারা হলেন আবদুল্লাহ ইবনে আতীক, মাসউদ ইবনে সিনান, আবদুল্লাহ ইবনে হুনাইস, আবু কাতাদাহ হারেস ইবনে রিবয়ী এবং আসওয়াদ। আবদুল্লাহ ইবনে আতীককে এই দলের আমীর নির্বাচন করা হয়। তাকে এই মর্মে নির্দেশনা দেওয়া হয়—কোনো নারী কিংবা শিশুর ওপর হাত তুলবে না। ক্ষুদ্র এই দলটি খায়বার চলে যায়। আবু রাফে সাল্লাম ইবনে আবুল হাকীকের বাড়িতে রাতের বেলা পৌঁছান। তার আগে বাইরে থেকে প্রতিবেশীদের ঘরের কড়া বন্ধ করে দেন। সাল্লাম ইবনে আবুল হাকীকের ঘরের পাশেই একটি খেজুর গাছ ছিল, ওটাকেই তারা সিঁড়ি বানিয়ে উপরে উঠে যায়। বাইরে থেকে ডাক দেয়। ডাক শুনে তার স্ত্রী বেরিয়ে আসে। জানতে চায় তোমরা কারা? তারা জানায়, আমরা আরবের লোক। আশ্রয়ের সন্ধানে এসেছি। সাল্লামের স্ত্রী তখন বলে, তোমরা ঘরের ভেতর গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলো। এ কথা বলেই সে মোড় নেয়। যখন তারা ঘরের দিকে যায়, তখন মহিলা চিৎকার করে উঠে। আবদুল্লাহ ইবনে আতীক বলেন, আমাদের একজন তখন তার সামনে তরবারি উঁচু করে ধরে। আওয়াজ চিরতরে বন্ধ করে দিতে উদ্যত হয়। নবীজির আদেশ মনে পড়তেই আবার তরবারি নামিয়ে নেয়। এদিকে আবু রাফে সাল্লাম ইবনে আবুল হাকীক নাঙ্গা তরবারি সঙ্গে নিয়ে ঘুমুচ্ছিল। বাইরের চিৎকারে মনে খটকা লাগতেই ঘুম ভেঙে যায়। তরবারি হাতে তুলে নেয়। কিন্তু তার তরবারি সঞ্চলিত হবার আগেই আবদুল্লাহ ইবনে উনাইসের তরবারি তাকে চিরতরে ঠাণ্ডা করে দেয়। তারপর আমরা তার বাড়ি থেকে বের হয়ে আসি। আবদুল্লাহ ইবনে আতীকের দৃষ্টিশক্তি সামান্য দুর্বল ছিল। তাই নেমে আসার সময় তিনি নিচে পড়ে যান। তার হাত মচকে যায়। তারপরও মিশনের পাঁচ সদস্যই সহি সালামতে মদীনায় ফিরে আসেন। ফিরে এসে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পুরো কাহিনী সবিস্তারে শোনান।[১]

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪ : ১৩৭।

দশ হাজার মুশরিক সৈন্যবাহিনীকে ডেকে এনে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সকল মুসলমানদের অস্তিত্ব চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ভয়াবহ সাধনা করেছিল যে বেঈমান লিডার, তাকে হত্যা করে খাযরাজের পাঁচ যুবক মূলত এমন একটি বিষাক্ত সাপকেই মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল—যে সাপ যে কোনো মুহূর্তেই দংশন করতে পারত। এখানে মনে রাখবার কথা হলো, সাল্লাম ইবনে হাকীকের উপনাম আবু রাফে। আমাদের ইসলামী ইতিহাসে এই উপনামেই তার হত্যার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং সাল্লাম ইবনে আবুল হাকীক আর আবু রাফে একই ব্যক্তি।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

সীরাতের কিতাবগুলোতে তারিখের ক্রমানুসারে বিভিন্ন ঘটনা ও বিধান প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা হয়। তা ছাড়া এটা একটা প্রয়োজনীয় বিষয়ও বটে। এর দ্বারা ইসলামের প্রচার প্রসার ও ইসলামী বিধিবিধানের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস পাঠক জানতে পারেন। এটা হিজরতের পঞ্চম সাল। এই বছর আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। বেশ কিছু নতুন বিধি-বিধানও অবতীর্ণ হয়েছে এবং বাস্তবায়িত হয়েছে।

হযরত যায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহা নববী হেরেমে

অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও সীরাতকারের দৃষ্টিতে হিজরতের এই পঞ্চম সালেই হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ রাযিয়াল্লাহু আনহাকে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ে করেন। হযরত যায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন নবীজির ফুপু উমাইমা বিনতে আবদুল মুত্তালিবের কন্যা। কুরাইশের সর্বোচ্চ খান্দানের মেয়ে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকে নবীজির পালকপুত্র যায়েদ ইবনে হারেসার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দেন, তখন তিনি এবং তার ভাই কেউই রাজি হননি। কারণ, হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা ছিলেন আজাদকৃত ক্রীতদাস। তার জীবনে দাসত্বের একটা কলঙ্ক ছিল। সেকালের আরব-সমাজে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মনে করা হতো ক্রীতদাসকে। তাদেরকে চরম তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা হতো।

এটা ইসলামের অনেক বড় অবদান—ইসলাম এই ক্রীতদাসদেরকে মনিবের আসনে সমাসীন করেছে। সমাজের উঁচু-নিচুর ভেদাভেদ চূর্ণ করে দিয়েছে। সকল আদম-সন্তান সমান মর্যাদার অধিকারী বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু শিশুকাল থেকে বংশানুক্রমিকভাবে বয়ে-আনা আবেগ চিন্তা ও চরিত্রকে মানুষ চাইলেই এক মুহূর্তে সমাধিস্থ করতে পারে না। দীর্ঘকাল পর্যন্ত মনের কোণে তার প্রভাব কিছু না কিছু থেকেই যায়। হযরত যায়নাব এবং তার ভাই ইসলাম কবুল করেছেন। তারপরও মূর্খতার কালে মনের মধ্যে রোপিত উঁচু-নিচুর ব্যবধান এখনো পর্যন্ত তারা পূর্ণরূপে তাড়াতে পারেননি। তাই হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত যায়েদের কাছে যায়নাবকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন, তখন তারা তা মানতে পারেননি। সম্ভ্রান্ত কুরাইশ ঘরানার একজন কন্যা একজন ক্রীতদাসকে কীভাবে বিয়ে করবে? কিন্তু হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বারবার বলতে থাকেন, তখন হযরত যায়নাবের পরিবারও বুঝতে পারে—কোনো বিষয়ে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো ফয়সালা দেন, তখন কোনো মুসলমানের জন্যে সে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করার অবকাশ থাকে না। অবশেষে বাধ্য হয়ে হযরত যায়নাব ও তার পরিবারের লোকেরা প্রস্তাবটি মেনে নেন। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদের সঙ্গে হযরত যায়নাবকে বিয়ে দিয়ে দেন। হযরত যায়নাবও যায়েদের ঘরে চলে আসেন। উভয়ের মধ্যে মানসিক দূরত্ব আগেই ছিল। ফলে তাদের মধ্যে বনিবনা আর হয়ে উঠেনি। খুব কষ্টে এক বছর পার করার পর হযরত যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু নবীজির কাছে এসে আবেদন করেন—আমি যায়নাবকে তালাক দিতে চাই। নবীজি তাকে বাধা দেন। বোঝান। যায়েদ থেমে যান। তারপর যখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এই মর্মে ওহী আসে—আমি আপনার সঙ্গে যায়নাবের বিয়ে করিয়ে দিয়েছি—তখন যায়েদকে বোঝানো ছেড়ে দেন। এদিকে যায়েদ আগে থেকেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। অবশেষে তিনি হযরত যায়নাবকে তালাক দিয়ে দেন। হযরত যায়নাব বাবার বাড়িতে ফিরে যান। ইদ্দত পার করার পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। তারপর তিনি উম্মুল মুমিনীনের মহান মর্যাদা নিয়ে নবীজির হেরেমে প্রবেশ করেন।

এই ঘটনার পর মুশরিক-সম্প্রদায় চারদিকে এই বলে ঝড় বইয়ে দেয়—মুহাম্মাদ তার পালকপুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করেছে। আরব-সমাজে পালকপুত্রকে ঔরসজাতপুত্রের মতোই মনে করা হতো, অথচ ইসলামী শরীয়তে এর কোনো ভিত্তি নেই। পালকপুত্র আর ঔরসজাতপুত্র এক নয়। মূলত এই জাতীয় অপবাদ ও অপপ্রচারের ভয়েই হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তালাক দিতে বারবার বারণ করছিলেন। ইসলামের শত্রুরা ক্ষুদ্র এই ঘটনাকে রূপকথার কাহিনী বানিয়ে চারদিকে ছড়াতে থাকে। একালের প্রাচ্যবিদরাও সহজ সরল এই ঘটনাকে উপন্যাসের রঙ দেওয়ার চেষ্টা করছে। এটাকে প্রেম ও ভালোবাসার কাহিনী হিসেবে প্রচার করছে। এটা ঠিক ইসলামে পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা জায়েজ নেই, কিন্তু পালকপুত্র যেহেতু সত্যিকারের পুত্র নয়, তাই তার স্ত্রীকে বিয়ে করতেও কোনো বাধা নেই। মূলত আরব-সমাজে প্রচলিত এই ভুল বিশ্বাসের অপনোদনের জন্যেই আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিল এই বিয়ের আয়োজন। ইউরোপের প্রাচ্যবিদরা এ বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপনের জন্যে এক দিঘল কাহিনী রচনা করেছে। এখানে তার উত্তর দেওয়ার অবকাশ নেই। আমরা আমাদের রচনা *তাফসীরোঁ মে ইসরাইলী রেওয়ায়ত* গ্রন্থে এ বিষয়ে দলিলসমৃদ্ধ বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি। কেউ চাইলে সেখানে দেখে নিতে পারেন।

পর্দার বিধান

স্বাভাবিক সামাজিক রীতিতে আরবদের মধ্যে মেয়েদের কোনো পর্দা ছিল না। যে কোনো জায়গায়, যে কোনো মজলিসে, যে কোনো আলাপ আলোচনায় মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে পাশাপাশি উপস্থিত থাকত—এটাই ছিল আরবদের সামাজিক চেহারা। কিন্তু ইসলামের সততা ও পবিত্রতার জীবনব্যবস্থা এই পর্দাহীনতাকে মেনে নিতে পারেনি। সর্বপ্রথম ফারুকে আজম উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মনে এ কথার উদয় হয়—নবীজির সঙ্গিনীগণ হলেন সকল উম্মতের জননী। তাদের প্রতি আদব ও সম্মান সকল মুসলমানের কর্তব্য। তাদের সম্মান ও মর্যাদা এতটাই উঁচুতে প্রতিষ্ঠিত—যে কোনো ব্যক্তি সরাসরি তাদের মুখোমুখি হয়ে কথা বলা উচিত নয়; তা ছাড়া তারাও সাধারণ মুসলমানদের সামনে না আসাই

সমীচীন—এটাই তাদের ব্যক্তিত্ব ও শান। তিনি তার এই মনের কথা হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও বলেন। হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বিয়ের সময় আকস্মিকভাবে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়—যে পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হয়। ঘটনাটি *বুখারী শরীফে* বর্ণিত হয়েছে। ঘটনা বর্ণনাকারী নবীজির খাদেম হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত যায়নাবকে বিয়ে করেন, তখন ওলিমা অনুষ্ঠানে সাহাবায়ে কেরামকেও আমন্ত্রণ করেন। সকলেই একসঙ্গে খানাপিনা করেন। তারপর সেখানে বসে শান্তচিত্তে গল্প করতে শুরু করেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিস ছেড়ে উঠতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু উপস্থিত কেউই তাঁর মনের ভাব ধরতে পারছিলেন না। অবশেষে একবার তিনি উঠে চলে যান। কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে আসেন। তখনো সকলেই মন খুলে কথা বলছেন। বিষয়টি হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনেও অস্বস্তিকর মনে হয়। তারপর সকলে যখন চলে যান এবং নবীজি ঘরে প্রবেশ করেন, তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়—

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتَ ٱلنَّبِىِّ إِلَّآ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَٰظِرِينَ
إِنىٰهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُوا۟ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُوا۟ وَلَا مُسْتَـْٔنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ
إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِىَّ فَيَسْتَحْىِۦ مِنكُمْ ۖ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْىِۦ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ وَإِذَا
سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَٰعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَ
مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا۟ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓا۟ أَزْوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦٓ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ
كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾ إِن تُبْدُوا۟ شَيْـًٔا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٤﴾

হে মুমিনগণ, তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া না হলে তোমরা খাবার প্রস্তুতির জন্যে অপেক্ষা না করে ভোজনের জন্যে নবীগৃহে প্রবেশ কোরো না। তবে তোমাদেরকে আহবান করলে তোমরা প্রবেশ করো এবং ভোজন শেষে তোমরা চলে যেয়ো। তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পোড়ো না। কারণ, তোমাদের এই আচরণ নবীকে পীড়া দেয়, তিনি তোমাদেরকে তুলে

দিতে সংকোচবোধ করেন, কিন্তু আল্লাহ সত্য বলতে সংকোচবোধ করেন না। তোমরা তাঁর পত্নীদের কাছ থেকে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে। এই বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্যে অধিকতর পবিত্র। তোমাদের কারও পক্ষে আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেওয়া সঙ্গত নয় এবং তাঁর মৃত্যুর পর তার পত্নীগণকে বিয়ে করা তোমাদের জন্যে কখনো বৈধ নয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা ঘোরতর অপরাধ। তোমরা কোনো বিষয় প্রকাশ করো অথবা গোপন রাখো—আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। [আহযাব : ৫৩-৫৪]

এর বাইরে অন্যান্য আয়াতেও সাধারণ মুসলমান নারীদেরকে পর্দার ভেতরে থাকার আদেশ দেওয়া হয়। এইসব আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর ইসলামী সমাজে কোনো মুসলমান নারীর পক্ষে বেপর্দা থাকা অসম্ভব হয়ে উঠে। এটা ছিল হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বিয়ের বরকত। ব্যক্তি-জীবনে হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন অত্যন্ত দানশীল, সত্যবাদী ও অঙ্গীকারে আপসহীন এক নারী। আত্মীয়স্বজন এবং গরিব-দুখীদের সর্বদা খোঁজ-খবর রাখতেন। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার সততা ও দীনদারির খুব প্রশংসা করতেন। নবীজির পর এই পৃথিবীতে ছিলেন নয় কি দশ বছর। বিশ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন। উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু তার জানাজা পড়িয়েছেন। মদীনার জান্নাতুল বাকীতে তাকে দাফন করা হয়েছে।[১]

হিজরতের ষষ্ঠ সাল

হিজরতের ষষ্ঠ সাল শুরু হচ্ছে। এই বছর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। আমাদের ইসলামী ইতিহাসে এসব ঘটনা সবিস্তারে বিবৃত হয়েছে। এই বছরই হুদায়বিয়ার ঐতিহাসিক সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই বছরই হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি অপবাদ আরোপের মতো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে। এই বছরই বনু মুস্তালিকের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। তারপর তারা ইসলাম কবুল করে নিলে তাদের বন্দিদেরকে ফেরত দেওয়া হয়। এই বছরই হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীর

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪ : ১৪৫-১৪৮।

বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানের নামে ইসলামের প্রতি আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র লেখেন। বিভিন্ন বিচারে এই বছরটি আমাদের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাল।

গাযওয়ায়ে যীকারাদ

যীকারাদ একটি জায়গার নাম। এখানে পানি সহজলভ্য ছিল। ঘটনাটি এই জায়গাতেই সংঘটিত হয়। পরে আমাদের ইতিহাসের গ্রন্থাবলিতে এই শিরোনামেই গ্রন্থিত হয়। মূলত এটা ছিল একটি ডাকাতির ঘটনা। এই ঘটনা সম্পর্কে বিপুল পরিমাণে বর্ণনা পাওয়া যায়। আমরা এখানে *মুসলিম শরীফের* বর্ণনার আলোকে ঘটনাটি তুলে ধরছি—[১]

ডাকাতির এ ঐতিহাসিক ঘটনাটি পুরো মদীনায় চরম অস্থিরতা ছড়িয়ে দেয়। আবদুর রহমান ফাযারী নামে এক লোক ছিল আরবের বিখ্যাত ডাকাত। তার অনেক বড় একটা দল ছিল। সে তার দলবল নিয়ে একবার চারণভূমিতে হামলা করেছিল। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর গোলাম রাবাহকে স্বীয় উট রাখার জন্যে চারণভূমিতে পাঠিয়েছিলেন। রাবাহের সঙ্গে ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু। তারা কয়েকদিন পর্যন্ত ওই চারণভূমিতে উট চড়াতে থাকেন। একদিন সকালবেলা আবদুর রহমান ফাযারী তার বাহিনী নিয়ে আসে। তারপর নবীজির সবগুলো উট হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। তার দলে ডাকাতের সংখ্যা ছিল প্রায় ত্রিশজন। অন্যদিকে রাখালমাত্র দুইজন। ডাকাতরা সকলেই ছিল সশস্ত্র।

হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি যখন লক্ষ করলাম, ডাকাতের দল আমাদের সবগুলো উট তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তখন আমি আরবদের রেওয়াজমাফিক উঁচু একটি টিলায় আরোহণ করলাম। তারপর মদীনার দিকে মুখ করে 'ওয়া সবাহা, ওয়া সবাহা!' বলে তিনবার চিৎকার করলাম। যার অর্থ ছিল—ডাকাতের আক্রমণ সম্পর্কে সাধারণ ঘোষণা। তারপর আমি টিলা থেকে নেমে এসে ডাকাতদের ধাওয়া করি। তাদের প্রতি তির ছুঁড়তে শুরু করি। হযরত সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন প্রচণ্ড দ্রুতগামী মানুষ। ফলে তিনি ডাকাতদের খুব কাছে চলে

---

১ *মুসলিম শরীফের সূত্রে মেশকাত*, ৩৪৮।

যেতেন। তার প্রতিটি তির হতো লক্ষ্যভেদী। তার তিরের আঘাতে ডাকাতের দল দিশেহারা হয়ে পড়ে। তার আক্রমণ থেকে তাদের জন্যে জীবন বাঁচানোই মুশকিল হয়ে পড়ে। হযরত সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর আঘাতে ডাকাতের দল এতটাই দিশেহারা হয়ে পড়ে—তারা ঠিক বুঝেই উঠতে পারছিল না—তাদেরকে একজনমাত্র ব্যক্তি ধাওয়া করছেন, না তার সঙ্গে আরো অনেক লোক রয়েছেন? ফলে, তারা দ্রুত ছুটতে থাকে। একসময় জানোয়ারগুলোর প্রতিও আর কোনো নজর থাকেনি, বরং জীবন বাঁচানোটাই তাদের কাছে মুখ্য হয়ে উঠে। ফলে, সবগুলো জানোয়ার হযরত সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পেছনে চলে আসে। ডাকাতের দল তখন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাতে থাকে। নিজেদেরকে হালকা করার জন্যে হাতের বর্শাগুলো পর্যন্ত ছুঁড়ে ফেলতে থাকে। কিছু দূর গিয়ে গায়ের চাদরগুলো পর্যন্ত ফেলে দেয়। নিজেদেরকে হালকা করে ডাকাতের দল নিজ নিজ জীবন নিয়ে যখন তিরের বেগে ছুটতে থাকে, হযরত সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাতে তখন তাদের ত্রিশটি বর্শা ও ত্রিশটি চাদর। তিনি সেগুলোর ওপর পাথরের টুকরো বিছিয়ে দিয়ে ডাকাতদের ধাওয়া করতে থাকেন।

এদিকে মদীনায় বসে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাকাতির সংবাদ পান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘোড়সওয়ারদের ডেকে হযরত সালামার সাহায্যে পাঠিয়ে দেন। তারপর সাহাবায়ে কেরামের আরেকটি দলসহ নিজেও বেরিয়ে পড়েন এবং যীকারাদ নামক জায়গায় গিয়ে পৌঁছান। হযরত আবু কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় ঘোড়ায় চড়ে প্রথমেই চলে গিয়েছিলেন। তিনি গিয়ে দেখেন—হযরত সালামা একাই ডাকাতদের ধাওয়া করছেন। আবু কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু ঘোড়া ছুটিয়ে ডাকাতদের সর্দার আবদুর রহমান ফাযারীকে ধরে ফেলেন। ফাযারী পরে যখন আবু কাতাদার ওপর আক্রমণ করবার চেষ্টা করে, তখন আবু কাতাদার তরবারির এক আঘাতে তার মাথা শরীর থেকে আলাদা হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। অন্য ডাকাতরা পালিয়ে যায়। হযরত সালামা এবং আবু কাতাদা যখন ডাকাতদের তাড়িয়ে দিয়ে ফিরে আসছিলেন, তখন পথে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মোবারকবাদ দেন। তাদের জন্যে দুআ করেন। পুরস্কারে ভূষিত করেন এবং বলেন—

خير فرساننا ابو قتادة وخير رجالتنا سلمة.

আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঘোড়সওয়ার আবু কাতাদা। আর শ্রেষ্ঠ পদব্রজ বীর সালামা ইবনুল আকওয়া।

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালামা ইবনুল আকওয়াকে স্বীয় উটের পিঠে তুলে নেন। তারপর মদীনায় ফিরে আসেন।[১]

গাযওয়ায়ে বনুল মুস্তালিক

ইবনে ইসহাকের মতে, বনুল মুস্তালিকের যুদ্ধটি হয়েছিল হিজরী ষষ্ঠ সালের শাবান মাসে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারেন—বনুল মুস্তালিক মদীনায় আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে সমবেত হচ্ছে। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে হারেস ইবনে আবু যিরার। তাদের এই সমাবেশ হচ্ছে মুরাইসী নামক স্থানে। এই কারণে কোনো কোনো ইতিহাসগ্রন্থে এটাকে মুরাইসী যুদ্ধও বলা হয়েছে। বনুল মুস্তালিক ছিল বনু মুদলিজের মিত্র। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতশো সাহাবী নিয়ে মুরাইসী পৌঁছে যান। মুহাজিরদের পতাকা দেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুকে। আনসারদের পতাকা দেন হযরত সাদ ইবনে উবাদা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, তুমি বনুল মুস্তালিকের লোকদেরকে প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দাও। আদেশ মাফিক হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু গিয়ে এই মর্মে ঘোষণা করেন—যারা কালেমায়ে শাহাদাত পড়ে মুসলমান হয়ে যাবে, তাদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করব না। তাদের জীবন ও সম্পদ সবকিছুই নিরাপদ থাকবে। এর উত্তরে গোত্রবাসী ইসলাম কবুল করতে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃতি জানায়। উল্টো মুসলমানদের দিকে তির নিক্ষেপ করতে শুরু করে। প্রতিউত্তরে

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪ : ১৫০; ইবনে সাদ, *আত তাবাকাত*, ২ : ৮০-৮৪—ইবনে সাদ অবশ্য এই যুদ্ধকে গাযওয়াতুল গাবাহ শিরোনামে উল্লেখ করেছেন। তা ছাড়া ডাকাতদের সংখ্যা বিষয়েও সামান্য ভিন্নমত উল্লেখ করেছেন।–আসীর আদরবী

মুসলমানগণও তির চালাতে শুরু করেন। তারপর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মিলিত আক্রমণ চালাবার আদেশ দেন। সাতশো যোদ্ধার বিশাল বাহিনী একসঙ্গে আক্রমণ করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই সত্য-মিথ্যার ফয়সালা হয়ে যায়। মুশরিকদের মধ্যে দশ জন নিহত হয়। অবশিষ্ট নারী-পুরুষ-শিশু সকলেই বন্দি হয়। মুসলমানদের মধ্যে একজন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। সকল বন্দিকে মদীনায় নিয়ে আসা হয়। মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়। এই বন্দিদের মধ্যে গোত্রপ্রধান হারেস ইবনে আবু যিরারের কন্যা জুয়াইরিয়াও ছিলেন। বণ্টনে তিনি হযরত সাবেত ইবনে কায়েসের চাচাতো ভাইয়ের ভাগে পড়েন। তিনি তখন তার মালিকের সঙ্গে মূল্যের বিনিময়ে মুক্তি লাভের চুক্তি করে নেন। তারপর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে মূল্য পরিশোধ বিষয়ে সাহায্য কামনা করেন। হযরত জুয়াইরিয়া নিজেই বলেছেন, আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে গিয়ে বলি—ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি হারেস ইবনে আবু যিরারের কন্যা। আমি গোত্রপতির দুহিতা। বিপদে পড়েছি। বন্দি হয়ে এখানে এসেছি। সাবেত ইবনে কায়েসের চাচাতো ভাইয়ের ভাগে পড়েছি। তার সঙ্গে আমি মুকাতাবা চুক্তিও করে নিয়েছি। মূল্য পরিশোধ করার মতো অর্থ আমার হাতে নেই। আপনার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছি। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কি তোমাকে এর চেয়ে ভালো কথা বলব? আমি বললাম, সেটা কী, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি এই মূল্য পরিশোধ করে দিচ্ছি। আর তোমাকে বিয়ে করে নিচ্ছি। হযরত জুয়াইরিয়া সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এটা খুবই সুন্দর প্রস্তাব। আমি রাজি আছি।

বিষয়টি যখন মুসলমানদের মাঝে জানাজানি হয়, তখন তারা পরস্পর বলতে থাকে, বনুল মুস্তালিক নবীজির শ্বশুরালয়। আমরা এই গোত্রের লোকদেরকে দাস-দাসী বানিয়ে রাখব, এটা কী করে সম্ভব! তারপর তারা সকল বন্দিকে আজাদ করে দেয়।[১]

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪ : ১৫৯; *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৩ : ৩৩৯।

অপবাদের ঘটনা

এই যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পথেই ইতিহাসের জঘন্যতম সেই ঘটনাটি ঘটে—আমাদের ইতিহাসের গ্রন্থগুলোতে 'ইফকে আয়েশা' নামে যা লিখিত আছে। বিশুদ্ধতম বর্ণনাগুলোতে এই ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। হাদীসের গ্রন্থাবলিতে এ সম্পর্কে অনেক দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে। এসব বর্ণনার রাবী স্বয়ং উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহা। সেখান থেকে আমরা এখানে একটি বর্ণনা তুলে ধরছি—

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে যাওয়ার সময় জীবনসঙ্গিনীদের কাউকে সঙ্গে নিতে চাইলে লটারি করতেন। লটারিতে যার নাম উঠত, তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। বনুল মুস্তালিকের যুদ্ধের সময় লটারি করা হলো। লটারিতে আমার নাম উঠল। ফলে আমি নবীজির সফরসঙ্গী হলাম। এই সফরের নিয়ম ছিল—যখন সফর করার সময় হতো, উটের ওপর হাওদা বেঁধে দেওয়া হতো। আমি হাওদায় উঠে বসতাম। তারপর যেখানে কাফেলা যাত্রাবিরতি করত, সেখানে এসে নির্দিষ্ট লোকজন উটের পিঠ থেকে হাওদা মাটিতে নামিয়ে রাখত। আমি হাওদা থেকে বেরিয়ে কোনো প্রয়োজন থাকলে সম্পাদন করতাম। তারপর যখন যাত্রার সময় হতো, হাওদায় গিয়ে বসতাম। কয়েকজন এসে হাওদাটি উটের ওপর রেখে দিত। পুরো সফর এই নিয়মেই সম্পাদিত হয়েছে।

এই যুদ্ধ থেকে মদীনায় ফেরার পথে যখন আমরা মদীনার একেবারে কাছাকাছি চলে আসি, কাফেলা এক জায়গায় যাত্রাবিরতি করে। সেখানেই রাত কাটায়। রাতের তখন সামান্য প্রহর বাকি। পুনরায় যাত্রা শুরু হবে মর্মে ঘোষণা হয়েছে। লোকজন হাওদা বেঁধে সফরের জন্যে প্রস্তুত হতে থাকে, অথচ আমি তখন প্রাকৃতিক প্রয়োজন সম্পাদনের জন্যে ময়দানে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ফিরে এসে গলায় হাত দিয়ে দেখি, হারটি নেই। কোথাও ছিঁড়ে পড়ে গেছে। আমি হারটির সন্ধানে আবার ফিরে যাই। ইত্যবসরে কাফেলা প্রস্তুত হয়ে যাত্রা শুরু করে দেয়। আমি ফিরে এসে দেখি ময়দান শূন্য। সকলেই চলে গেছে। আমার হাওদাটিও সেখানে নেই। আমি হাওদার ভেতরে আছি, এই অনুমানে যারা উটের পিঠে হাওদা

বাঁধবার দায়িত্বে ছিল, তারা হাওদা বেঁধে দিয়েছে। কেননা, আমি তখন ছিলাম খুবই হালকা। ফলে, হাওদা উত্তোলনের দায়িত্বে যারা ছিলেন, আমি হাওদায় আছি কি নেই, তা তারা বুঝতেই পারেননি। হাওদা বাঁধার পর কাফেলা আমার উটসহ রওনা হয়ে গেছে। ফিরে এসে যখন দেখি সুনসান ময়দান—খুবই পেরেশান হই।

তখনো রাত। কোথাও কোনো প্রাণের চিহ্ন নেই। আমি তখন আমার বড় চাদরটি মুড়ো দিয়ে সেখানেই শুয়ে পড়ি। এমন সময় সেখানে এসে পৌছান নবীজির সাহাবী সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল সুলামী। তার বরাবরকার নিয়ম ছিল—কাফেলা যাত্রা করার খানিকটা পড়ে তিনি কোথাও কিছু রয়ে গেল কিনা ঘুরে দেখতেন। তারপর রওনা হতেন। তিনি তার নিয়মমাফিক কাফেলা চলে যাওয়ার একটু পরে এসে কাউকে শুয়ে থাকতে দেখে কাছে আসেন। আওয়াজ পেয়ে আমি উঠে বসি। মুখের ওপর থেকে চাদর সরিয়ে তাকে দেখি। তিনি আমাকে চিনে ফেলেন। কারণ, পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখেছেন। তিনি ভয় পেয়ে যান এবং বলেন—ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন—এ দেখি উম্মুল মুমিনীন! আমি আমার চাদর জড়িয়ে উঠে বসি। তিনি কাছে এসে জানতে চান, কী হয়েছে? আমি কোনো উত্তর না দিয়ে নীরব বসে থাকি। তিনি আমার কাছে এনে উট বসিয়ে দেন। বলেন, উম্মুল মুমিনীন, আপনি উঠে বসুন। তারপর তিনি সেখান থেকে সরে যান। আমি উটের ওপর উঠে বসি। তিনি কাছে এসে উটকে উঠান। তারপর উটের রশি ধরে সামনে চলতে থাকেন। খুব দ্রুত হাঁটতে থাকেন, যেন আমরা যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব কাফেলায় গিয়ে মিলিত হতে পারি। সকাল হওয়ার পর কাফেলা নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে যাত্রাবিরতি করেছে। চারদিকে পূর্ণ আলো ছড়িয়ে পড়েছে। কাফেলার সকল লোকজন নিশ্চিন্তে নিজ নিজ কাজে মশগুল। কেউ জানেই না—উম্মুল মুমিনীন কাফেলায় নেই, এমন সময় আমার উট সেখানে গিয়ে পৌছায়। তারপর সেখান থেকে কাফেলা মদীনায় চলে আসে।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, এই সফর থেকে ফিরে আসার পর আমি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ি। অসুস্থতায় আমি আমার

ঘরে পড়ে থাকতাম। এদিকে বাইরে দুষ্টমনের কিছু মানুষ আমার বিরুদ্ধে নোংরা অপবাদ রটিয়ে দেয়। কিছু মোনাফেক এই নোংরা অপবাদকে খুব প্রচার করে। তারপর কিছু কিছু মুসলমানও এতে অংশগ্রহণ করে। ধীরে ধীরে কথাটি হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং পরে আমার মা-বাবার কান পর্যন্ত গড়ায়, কিন্তু তাদের কেউ আমাকে একটি হরফও বলেননি। আমাকে এ বিষয়ে কোনো কথাই বলেননি তারা। অবশ্য এর আগে বিভিন্ন অসুস্থতায় আমার প্রতি হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে মনোযোগ আন্তরিকতা ও ভালোবাসা লক্ষ করতাম, এই সময় আমি তেমন মনোযোগ ও আন্তরিকতা লক্ষ করিনি। তিনি যখনই ঘরে আসতেন, শুধু এইটুকু বলতেন—কী অবস্থা? এর বাইরে একটি শব্দও বলতেন না। আমার মনের ভেতর খটকা সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে মানসিক অস্থিরতা বাড়তে থাকে। ভাবতে থাকি—এর কী রহস্য? আমি এমন কী অপরাধ করেছি, যে কারণে আমার সঙ্গে নবীজির আচরণ এভাবে বদলে গেল? আমি যেহেতু এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলাম, তাই হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ব্যতিক্রম আচরণ দেখে আবেদন করলাম, যদি অনুমতি দেন, তা হলে আমি আমার মায়ের কাছে চলে যাই। নবীজি বললেন, যেতে পারো।

আমি আমার মায়ের কাছে চলে আসি। তখনো আমার বিরুদ্ধে প্রচারিত নোংরা প্রোপাগান্ডার কিছুই জানি না আমি। প্রচণ্ড জ্বর ও দীর্ঘ অসুস্থতার কারণে খুবই দুর্বল ও হালকা হয়ে পড়েছি। প্রায় বিশ দিন পরের কথা। প্রয়োজন সারার জন্যে আমি বাড়ির বাইরে যাচ্ছিলাম। সেকালের আরবসমাজে বাড়ির ভেতর পায়খানার ব্যবস্থা ছিল না। ফলে, আমাদের মেয়েদেরও প্রয়োজন সারার জন্যে ময়দানে যেতে হতো। আমার সঙ্গে তখন আবু রাহমের কন্যা উম্মে মিসতাহ ছিলেন। তিনিও আমার সঙ্গে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ আমার গায়ের চাদরের সঙ্গে আমার পা জড়িয়ে যায়। আমি পড়তে পড়তে বেঁচে যাই। মিসতাহের মা তখন বলল, মিসতাহ ধ্বংস হোক। আমি বললাম, আপনি একজন মুহাজির মুসলমানকে ওইভাবে বদদোয়া দিচ্ছেন, এটা ঠিক না। তিনি একজন বদরী সাহাবী এবং মর্যাদাশীল ব্যক্তি। উম্মে মিসতাহ তখন বললেন, আবু বকরের মেয়ে, তুমি

মনে হয় কিছুই জানো না। আমি বললাম, কী? তিনি তখন আমাকে অপবাদ রটনাকারীদের নোংরা কাহিনী সবিস্তারে বললেন। এ কথা শোনার পর আমার পায়ের নিচ থেকে যেন মাটি সরে গেল। আমি দিশেহারা হয়ে পড়ি। কী কাজে যাচ্ছিলাম, তাও ভুলে যাই। সেখান থেকেই ঘরে ফিরে আসি। আমার চোখ তখন অশ্রুতে ছলছল করছে। দুইদিকে অশ্রুর ধারা নেমে গেছে। এ কথা শোনার পর চিন্তা অস্থিরতায় এমন মনে হয়েছে, যেন আমার কলিজা ফেটে যাবে। এত বড় আঘাত বরদাশত করার মতো শক্তি আমার কলিজায় নেই। আমি আমার মাকে গিয়ে বললাম, মানুষ আমার বিরুদ্ধে কীসব কথা বলে বেড়াচ্ছে, আপনি তো একবারও আমাকে বললেন না! আমার মা তখন আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, দ্যাখো মা, কষ্ট পেয়ো না। যেই মেয়ে তার স্বামীর চোখে প্রিয় এবং যার ঘরে কয়েকজন সতিন রয়েছে, তাকে তো এই ধরনের আঘাতের মুখোমুখি হতেই হয়। এমন সংসারে এমন জ্বালাপোড়া সবসময়ই ছিল এবং থাকবে। তোমার সঙ্গে এর ব্যতিক্রম কিছু হয়নি।

একদিন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে খুতবা দিলেন। বললেন, মানুষের একি অবস্থা, তারা আমার পরিবার সম্পর্কে নানা কথা বলে আমাকে কষ্ট দিচ্ছে! আমার পরিবার সম্পর্কে অন্যায় কথা বলছে। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি তো তার মধ্যে সদা কল্যাণই দেখেছি। আর এই ঘটনায় এমন এক ভদ্রমানুষকে যুক্ত করা হয়েছে, যাকে আমি সর্বদা ভালো মানুষ বলেই জানি।

এই রটনা প্রচারে সকলের শীর্ষে ছিল বিখ্যাত মোনাফেক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল। মুসলমানদের মধ্যে এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন মিসতাহ এবং হামনা বিনতে জাহাশ। অথচ হামনার বোন হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ ছিলেন উম্মুল মুমিনীনের একজন। যেহেতু হযরত যায়নাবও ছিলেন সম্ভ্রান্ত ঘরানার মেয়ে তাই হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহা এবং তার মাঝে বিরোধও হতো। কিন্তু হযরত যায়নাব ছিলেন ভদ্র সৎ এবং দীনদার। কখনো তার মুখ থেকে কোনো ভুল কথা উচ্চারিত হয়নি। হামনা বিনতে জাহাশ ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তার মধ্যে লড়াই ঝগড়ার একটা স্বভাব ছিল।

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা শেষ করার পর খাযরাজ গোত্রের সর্দার উসাইদ ইবনে হুযায়ের দাঁড়িয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, যদি এই ধরনের অপবাদ রটনাকারী আউস গোত্রের কেউ হয়ে থাকে, তা হলে তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া তো আপনারাই করবেন। আর যদি আমাদের খাযরাজ গোত্রের কোনো ব্যক্তি এমনটি করে থাকে, তা হলে আপনি আদেশ দিন—খোদার কসম, আমি নিজ হাতে তার গর্দান উড়য়ে দেব। এ কথা শোনামাত্র আউস গোত্রের সর্দার সাদ ইবনে উবাদা দাঁড়িয়ে যান। এমনিতে তিনি অত্যন্ত মার্জিত স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তারপরও ক্ষুব্ধ হয়ে বলতে থাকেন, আল্লাহর কসম, তোমরা তার গর্দান উড়াবে না, যেহেতু তোমরা জানতে পেরেছ—এই অপবাদ রটনাকারী তোমাদের গোত্রের কেউ নয়, তাই এ কথা বলছ। তোমাদের গোত্রের কেউ এমনটা করেছে, এ কথা জেনে যদি অমন ঘোষণা দিতে, তা হলে সেটা বলার কথা ছিল। হযরত উসাইদ ইবনে হুযায়ের অত্যন্ত তপ্ত ভাষায় এর উত্তর দেন। ফলে উভয় পক্ষে উত্তপ্ত তর্কাতর্কি ছড়িয়ে পড়ে। তরবারি কোষমুক্ত হয়ে পড়বার আশঙ্কা দেখা দেয়। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বর থেকে নেমে আসেন এবং বিষয়টি দফারফা করেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, একদিন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঘরে এলেন। তখন একজন আনসারী মহিলা আমার মাথার পাশে বসা ছিল। আমি কাঁদছিলাম। আমার কান্নার কারণে সেও কাঁদছিল। নবীজি এসে বিছানায় উপবেশন করলেন। তারপর আমাকে লক্ষ করে বললেন, আয়েশা, মানুষের কথাবার্তা নিশ্চয় তোমার কানেও হয়তো পড়েছে। আল্লাহকে ভয় করো। যদি তোমার পক্ষ থেকে কোনো ধরনের ভুল হয়ে থাকে, তা হলে আল্লাহর কাছে তওবা করো। আল্লাহ তাআলা বান্দাদের তওবা কবুল করেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে এ কথা উচ্চারিত হওয়ার পর আমি স্তব্ধ হয়ে পড়ি। মুহূর্তে আমার চোখের পানি শুকিয়ে যায়। অপেক্ষায় থাকি, আমার মা-বাবা এর কোনো উত্তর দেবেন, কিন্তু তারা কোনো কথাই বলতে পারেন না। একেবারে নীরব। নীরবতা দীর্ঘ হবার পর আমি নিজেই আমার মা-বাবাকে বললাম, আপনারা এর উত্তর দিচ্ছেন না কেন? তারা তখন

বললেন, মা, আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না—এর কী উত্তর দেব? অবশেষে বাধ্য হয়ে আমাকেই এর উত্তর দিতে হয়।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার মনের ভাব এইভাবে ব্যক্ত করেছেন—আমার মনে এ কথা স্থির হয়েছিল—আল্লাহ তাআলা স্বপ্নে কিংবা অন্য কোনোভাবে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আসল ঘটনা অবশ্যই জানিয়ে দেবেন। তখন নবীজির মনেও কোনো পেরেশানি থাকবে না। আমি কখনো কল্পনাও করিনি আমার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আয়াত অবতীর্ণ হবে। মানুষ সেইসব আয়াত তেলাওয়াত করবে। নামাযে পাঠ করবে। আমার মতো একজন সাধারণ মানুষ এমন কথা কীভাবে ভাবি! কিন্তু দীর্ঘ অপেক্ষার পরও যখন আল্লাহ তাআলা নবীজিকে কিছুই জানালেন না, তখন আমাকেই এর উত্তর দিতে হলো। আমি হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার জবাবে বললাম, আমি খোদার কসম খেয়ে বলছি, যে অপরাধ আমি করিনি, তার জন্যে আল্লাহ তাআলার কাছে তওবা করতে পারব না। আমি কাঁদছিলাম আর কথা বলছিলাম, আমি যদি করিনি এমন পাপের কথা স্বীকার করে নিই—অথচ আল্লাহ তাআলা ভালো করেই জানেন, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা অপবাদ—তা হলে তো আমি তওবা করে সেই অপবাদকেই মেনে নিলাম, অথচ এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আর আমি যদি আমার ওপর আরোপিত এই অপবাদকে অস্বীকার করি, আমার নিষ্কলুষতার দাবি করি, তা হলে আপনারা আমার কথাকে বিশ্বাস করবেন না। আপনারা অপবাদের ওপর অবিচল থাকবেন। সুতরাং এখন আমার এই বিষয়টি একমাত্র আল্লাহর কাছে সোপর্দ করা ছাড়া আমার কাছে আর কোনো পথ খোলা নেই। আমি আল্লাহর কাছেই সবকিছু সমর্পণ করছি। আর ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর বাবা যা বলেছিলেন, আমিও তা-ই বলছি—

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُونَ.

সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়! তোমরা যা বলছ, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল। [ইউসুফ : ১৮]

আবেগে এবং উত্তেজনায় আমি তখন হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম-এর নাম মনে করতে পারছিলাম না। তাই 'হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর বাবা' বলেছি।

আমার এই উত্তর শোনার কয়েক মিনিট পরেই হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে ওহী অবতরণের অবস্থা সৃষ্টি হয়। তিনি চাদর টেনে শুয়ে পড়েন। আমি উঠে গিয়ে মাথার নিচে বালিশ রেখে দিই। কিছুক্ষণ পর ওহী অবতরণ সমাপ্ত হলে নবীজি উঠে বসেন। তখন শীতকাল ছিল। তারপরও চেহারা মোবারকে স্বেদবিন্দু চকচক করছিল। নবীজি চেহারা মোবারকের ঘাম মুছে নেন। এরপর বলেন, আয়েশা, তোমাকে সুসংবাদ। আল্লাহ তাআলা তোমার পবিত্রতা সম্পর্কে আয়াত নাজিল করেছেন—

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ.

যারা এই অপবাদ রচনা করেছে, তারা তো তোমাদেরই একটি দল। একে তোমরা তোমাদের জন্যে অনিষ্টকর মনে কোরো না, বরং ওটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্যে আছে তাদের কৃত পাপকর্মের ফল। [নূর : ১১-২০]

তারপর তিনি ঘর থেকে বের হয়ে যান। সাহাবায়ে কেরামের সামনে গিয়ে ভাষণ দেন। এবং সদ্য অবতীর্ণ আয়াতগুলো পাঠ করে শোনান। এরপর উড়ন্ত এই অপবাদ বন্ধ হয়ে যায়। কারণ, কোনো পবিত্র নারীর প্রতি অপবাদ আরোপের শাস্তি নির্ধারিত করে দেওয়া হয় এই আয়াতে। এই জন্যে তিন ব্যক্তিকে আশিটি করে দোররা মারা হয়। যাদেরকে এই ঘটনায় বেত্রাঘাত করা হয়েছিল তারা হলেন—মিসতাহ ইবনে উসাসাহ, হাসসান ইবনে সাবেত এবং হামনা বিনতে জাহাশ।[১]

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪ : ১৬০-১৬৩; *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৩ : ৩৪২-৩৪৭; ইবনে সায়্যিদুন নাস, *উয়ুনুল আসার*, ২ : ১৩৯-১৪৩; ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, ১ : ৫৭৯-৫৮২।

হুদায়বিয়ার সন্ধি

বায়আতুর রিদওয়ানের কথা পবিত্র কুরআনে সবিস্তারে বিবৃত হয়েছে। মূলত সাহাবায়ে কেরামের এই অগ্নিশপথ ছিল হুদায়বিয়া সন্ধির একটি অংশ। হুদায়বিয়া নামক স্থানে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং কুরাইশদের মাঝে দশ বছর মেয়াদি একটি যুদ্ধ বন্ধের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই ঘটনা দু'টি ঘটেছিল হিজরতের ষষ্ঠ সালে।

খন্দকের যুদ্ধের পর কুরাইশ এবং মক্কার মুশরিকদের মধ্যে আগের মতো কর্মতৎপরতার উত্তাপ আর ছিল না। পরিবেশ অনেকটা নীরব হয়ে পড়েছিল। এই সময় উত্তেজনাকর কোনো ঘটনাও ঘটেনি। খন্দকের যুদ্ধে মুশরিকদের ফড়িংহৃদয় যোদ্ধাবাহিনী পারস্পরিক মতবিরোধ, আকাশের বিদ্যুৎ-ছটা, প্রচণ্ড ঝড় এবং হিমশীতল বাতাসের থাপ্পড় খেয়ে প্রচণ্ড হতাশ এবং বিব্রতভাবে মদীনা থেকে ফিরে এসেছিল। এই সময় হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছিলেন—ভবিষ্যতে এরা আর আমাদের ওপর হামলা করতে পারবে না, বরং আমরাই তাদের ওপর আক্রমণ করব। মূলত এইসব ঘটনা অনুভূতি এবং চিন্তা-ভাবনার আলোকেই হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভেবেছেন—আমরা যদি এখন বায়তুল্লাহ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মক্কায় উমরা করতে যাই, তা হলে মক্কার মুশরিক-সম্প্রদায় প্রতিরোধ করবে না। তারা আমাদেরকে বায়তুল্লাহ তাওয়াফের সুযোগ দেবে। এই ভেবে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরার ঘোষণা দেন। মদীনা এবং মদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এই সংবাদ জানিয়ে দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য ছিল, বিপুল সংখ্যক মুসলমান যেন সফরে অংশগ্রহণ করেন। অধিকন্তু মুশরিক-সম্প্রদায়ও যেন মুসলমানদের অন্তরে প্রোথিত কাবার সম্মান ও বড়ত্ব উপলব্ধি করতে পারে। জানতে পারে, কাবাঘর মুসলমানদেরও কেবলা। মুসলমানদের অন্তরও কাবা শরীফের সম্মান পবিত্রতা ও ভালোবাসায় পূর্ণ আকীর্ণ। মুশরিক-সম্প্রদায় যেহেতু নিজেরাও কাবা শরীফকে সম্মান করত, হজ ও উমরার উদ্দেশ্যে কাবা শরীফ তাওয়াফ করত, তাই আশা করা হয়েছিল, পুরো আরবজাতি যখন জানতে পারবে, মুসলমানগণও তাদের মতোই কাবাকে সম্মান করে, ভালোবাসে—তখন মুসলমানদের প্রতি তাদের বিদ্বেষ

এবং শত্রুতার মাত্রা হালকা হয়ে যাবে—এই ভেবে হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরার ইচ্ছা করেন। ব্যাপক ঘোষণার ফলে মদীনা ও মদীনার চারপাশ থেকে চৌদ্দশো সাহাবী এই সফরে অংশগ্রহণ করেন। মহান এই কাফেলা হিজরী ষষ্ঠ সালের জিলকদ মাসের শুরুর দিকে মদীনা মুনাওওয়ারা থেকে রওনা হয়। হযরত নামীলা ইবনে আবদুল্লাহ লাইসীকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার শাসক নিযুক্ত করেন। সঙ্গে কুরবানীর পশু নেন। ইহরাম বেঁধে নেন। উদ্দেশ্য ছিল—ইহরামের রূপ এবং কুরবানীর পশুর কারণে যেন সকলেই বুঝতে পারে, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুসলমানগণ কেবলমাত্র কাবা শরীফ যিয়ারত এবং উমরার উদ্দেশ্যেই মক্কায় যাচ্ছেন, যুদ্ধ করা তাদের উদ্দেশ্য নয়। মুশরিক-সম্প্রদায় যেন মুসলমানদের বিষয়ে পূর্ণ আশ্বস্ত থাকতে পারে, কুরাইশদের মনে যেন কোনো ধরনের বিরূপ ধারণা সৃষ্টি না হয়। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসফান নামক জায়গায় পৌঁছার পর বিশর ইবনে সুফিয়ান কালবীর সঙ্গে দেখা হয়। বিশর তখন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করেন—মক্কার মুশরিক-সম্প্রদায় যী-তোয়া উপত্যকায় সমবেত হচ্ছে। তারা পরস্পর শপথ গ্রহণ করছে, কোনো মূল্যেই তারা আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। খালেদ ইবনুল ওলীদ তার বাহিনী নিয়ে কারাউত তামীম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইসব শুনে বললেন, কুরাইশদের নির্বুদ্ধিতা দেখে আফসোস করতে হয়। বারবার অভিজ্ঞতা হওয়ার পরও তাদের আচরণে কোনো পরিবর্তন হলো না। তারা বরাবর আমাদের পথে বাধা দিয়েই যাচ্ছে। আমি তো যে কোনো মূল্যেই হোক, নবুওয়তের কর্তব্য পালন করেই যাব।

বিশর ইবনে সুফিয়ানের কথায় বাতাসের গতি অনুমিত হলো। এ কারণে নবীজি মক্কার সাধারণ পথ পরিহার করে অন্য পথে সফর অব্যাহত রাখেন। হুদায়বিয়ার নিকটবর্তী সানিয়্যাতুল মুরাদ নামক জায়গায় পৌঁছার পর তাঁর উষ্ট্রী অভ্যাস ভেঙে বসে পড়ে। কাফেলার সকলেই তখন বলতে শুরু করে—উষ্ট্রী তার অভ্যাস ভেঙে বসে পড়েছে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উষ্ট্রী তার অভ্যাস ভাঙেনি, বরং তার প্রভু

তাকে বসিয়ে দিয়েছেন—যিনি এর আগে হস্তীবাহিনীকে রুখে দিয়েছিলেন। নিশ্চয় এর মধ্যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোনো কল্যাণ রয়েছে। নবীজি সেখানে নেমে পড়েন। সাহাবায়ে কেরাম এসে জানান, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এখানকার কূপে পানি নেই। নবীজি তখন তূণীর থেকে একটি তির বের করে দেন। বলেন, এই তিরটি নিয়ে কূপের মধ্যে গেড়ে দাও। তিরটি কূপের মধ্যে গেড়ে দিতেই কূপের মধ্যে পানি উথলে উঠে। কাফেলার সকলে সেই পানিতে যাবতীয় প্রয়োজন সম্পাদন করে নেয়।

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানেই অবস্থান করছিলেন। এরই মধ্যে বুদাইল ইবনে ওরকা খুযায়ী এসে হাজির হয়। নবীজির সঙ্গে কথাবার্তা বলে। জিজ্ঞেস করে—আপনি কী উদ্দেশ্যে এসেছেন? নবীজি জানিয়ে দেন—আমরা শুধুমাত্র বায়তুল্লাহ যিয়ারত করতে এসেছি, আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি। আমরা এসেছি কাবা ঘরের প্রতি আমাদের হৃদয়ে লালিত শ্রদ্ধা সম্মান ও ভালোবাসা প্রকাশ করতে। বুদাইল ইবনে ওরকা এবং তার সঙ্গীগণ তখন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরাইশদের তৎপরতা সম্পর্কে অবগত করে। বিশর ইবনে সুফিয়ান যেসব তথ্য দিয়েছিল, বুদাইলও সেসব তথ্য দেয়। আলোচনার পর বুদাইল তার সঙ্গীদেরকে নিয়ে ফিরে যায়। কুরাইশদের গিয়ে বলে, আমরা অনর্থক এদের পথে বাধার সৃষ্টি করছি। তারা তো শুধুই বায়তুল্লাহ যিয়ারত করতে এসেছে। তাদের মধ্যে যুদ্ধের বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। সুতরাং তাদেরকে বায়তুল্লাহ যিয়ারত করতে দেওয়া উচিত। কুরাইশ-সম্প্রদায় তখন বলল, যদিও মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যুদ্ধ করতে আসেনি, তবুও আমরা এটা মানতে পারছি না—মুহাম্মাদ শক্তিসহ মক্কায় এসে বায়তুল্লায় যিয়ারত করে যাক। খোদার কসম, এটা কখনো হতে পারে না।

তারপর কুরাইশ মিকরাজ ইবনে হাফসকে পাঠায়। সেও এসে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে চায়। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আগের মতোই বলে দেন—আমরা কেবল উমরা করতে এসেছি, যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নয়। কিন্তু কুরাইশ-সম্প্রদায় কোনোভাবেই

আশ্বস্ত হতে পারছিল না। তাই তারা সায়্যিদুল আহাবীশ হুলাইস ইবনে আলকামাকে পুনরায় প্রতিনিধি করে পাঠায়। তাকে আসতে দেখে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর পশুগুলো সামনের দিকে তাড়িয়ে দিতে বলেন। যেন এই প্রতিনিধি দূর থেকেই বুঝতে পারে—এগুলো কুরবানীর পশু। তা ছাড়া এগুলোর গলায়ও হাঁসুলি ঝুলানো আছে। প্রতিনিধি কাছে এসেই এইসব জানোয়ার দেখে বুঝতে পারে, এগুলো কুরবানীর পশু। সেখান থেকেই সে ফিরে যায়। নবীজির সঙ্গে কথাবার্তা বলার প্রয়োজন অনুভব করেনি এবং কথাবার্তাও বলেনি। কারণ বায়তুল্লাহ যিয়ারতকারীদের প্রতি তার অন্তরে শ্রদ্ধা ছিল। তাই সে তাদের সঙ্গে অনর্থক তর্ক-বিতর্ক করাটাকে পছন্দ করেনি। ফিরে গিয়ে কুরাইশদেরকে তার মনের কথা জানিয়ে দেয়—বায়তুল্লাহর যিয়ারতকারীদেরকে সম্মান করা সকলের কর্তব্য। সুতরাং এদেরকে সম্মান করা উচিত। কুরাইশ তখন তাকে বলে, তুমি একেবারে গ্রাম্য লোক। বেদুইন মানুষ তুমি। তোমার কোনো বুদ্ধিসুদ্ধি নেই। তুমি বসো। তোমাকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না। কুরাইশদের এই তিক্ত ও অনাকাঙ্ক্ষিত কথা হুলাইসের গায়ে লাগে। সে তখন ক্ষেপে গিয়ে কড়া ভাষায় জানিয়ে দেয়—কুরাইশ-সম্প্রদায়, শোনো, তোমাদের সঙ্গে এই জন্যে আমরা সন্ধি করিনি—বায়তুল্লাহ যিয়ারতকারীদের বাধা দেব। যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ, তার কসম খেয়ে বলছি, তোমরা যদি মুহাম্মাদ এবং তাঁর উদ্দেশ্যের মাঝে কোনো ধরনের বাধার সৃষ্টি করো, তা হলে আমি আমার সকল গোত্রকে তোমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলব। আমি নিজেও তোমাদের সঙ্গে থাকব না। তার এই ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখে কুরাইশদের সুর নরম হয়ে পড়ে। তারা তাকে খোশামোদ করতে থাকে। বিনয়ের সঙ্গে বলে, ঠিক আছে, আমাদেরকেও একটু ভাববার সুযোগ দাও। যা সঙ্গত হয়, তা-ই করা হবে।

এবার কুরাইশ-সম্প্রদায় তাদের প্রতিনিধি হিসেবে তীক্ষ্ণ মেধাবী ও বাকপটু ব্যক্তি ওরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফীকে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেয়। ওরওয়া তখন বলে, কুরাইশ-সম্প্রদায়, শোনো, এ পর্যন্ত প্রেরিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে তোমাদের আচরণ আমি লক্ষ করেছি। তাদেরকে যেভাবে অপমান ও তাচ্ছিল্য করেছ, সবই আমি দেখেছি। মনে রেখো, আমি সুহাইলা বিনতে আব্দে শামসের পুত্র। তোমাদের এই আচরণ

মোটেও বরদাশতযোগ্য নয়। আমাকে যদি প্রতিনিধি করো, তা হলে আমি যা সমীচীন মনে করি, তা-ই বলব। কুরাইশ বলল, তোমার প্রতি আমাদের আস্থা আছে। ওরওয়া সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে। তারপর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে গিয়ে বসে পড়ে। অতঃপর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলে, কুরাইশের পরিবেশ খুবই উত্তপ্ত। তারা অঙ্গীকার করেছে, আপনাকে শক্তির সঙ্গে মক্কায় কোনো মূল্যেই প্রবেশ করতে দেবে না। পাশেই হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি ওরওয়ার চেয়েও কড়া ভাষায় বলে দিলেন—তোমরা গিয়ে লাত ও উয্যাকে চাটতে থাকো। তোমাদের সঙ্গে হেরে যাওয়ার মানুষ আমরা নই। মনে রেখো, আমাদেরকে প্রভাবিত করার কোনো প্রয়োজন নেই। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কথা ওরওয়ার কাছে খুবই ভার মনে হয়। সে তখন নবীজির কাছে জানতে চায়, এটা কে? নবীজি বললেন, আবু কুহাফার পুত্র আবু বকর। ওরওয়া তখন বলল, আপনি মাঝখানে না থাকলে আমি তার কথার যুতসই জবাব দিতাম, কিন্তু মাঝখানে আপনি আছেন।

ওরওয়া নবীজির সঙ্গে কথা বলতে বলতে তার হাত নবীজির দাড়ি মোবারকের দিকে বাড়িয়ে দেয়। পাশেই দেহরক্ষীর মতো মুগীরা ইবনে শুবা রাযিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে ছিলেন। আচরণটি তার কাছে ভালো লাগেনি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তরবারির বাঁট দ্বারা আঘাত করে বলেন—ওরওয়া, হাত সরিয়ে কথা বলো। সাবধান, নবীজির দাড়ির দিকে হাত বাড়াবে না। ওরওয়া তখন বলল, এতে এতটা ক্ষুব্ধ হওয়ার কী আছে? হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন। ওরওয়া জানতে চাইল, এটা কে? নবীজি বললেন, তোমার ভাতিজা মুগীরা ইবনে শুবা। ওরওয়া তখন বলল, বড়ই অনুগ্রহবিস্মৃত দেখছি। শিশুকালে আমি তার ময়লা পরিষ্কার করেছি। আজ সে সব ভুলে গেছে। ওরওয়া সঙ্গে সঙ্গে ওই ঘটনাটিও স্মরণ করিয়ে দেয়—মুগীরা একবার তেরো জন মানুষ খুন করেছিলেন। ফলে বড় ধরনের যুদ্ধ বাধার উপক্রম হয়েছিল। ওরওয়া তখন মুগীরার পক্ষ থেকে ওই তেরো জনের রক্তমূল্য পরিশোধ করে দিয়েছিল। নিজের পকেট থেকে অর্থ দিয়ে মুগীরার বিপদকে রফা-দফা করেছিল। এই কাহিনী স্মরণ করিয়ে দিয়ে ওরওয়া বলল, একদা আমি তার জীবন

বাঁচিয়েছি আর আজ সে আমার সঙ্গে এই ধরনের বেয়াদবি করছে! যাই হোক হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতোপূর্বে আগত কুরাইশ-প্রতিনিধিদেরকে যেসব উত্তর দিয়েছেন, তাকেও তা-ই বললেন। সোজা জানিয়ে দিলেন, আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি। এসেছি বায়তুল্লাহ যিয়ারত করতে। আমরা উমরা করেই ফিরে যাব।

আলাপ আলোচনার পর ওরওয়া উঠে পড়ে। তারপর এদিক ওদিক ঘুরে মুসলমানদের আচার-আচরণ লক্ষ করে এবং তাদের কর্মতৎপরতা পর্যবেক্ষণ করে। ওরওয়া মূলত হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তাঁর সঙ্গীদের আবেগ ও আনুগত্যের বিষয়টি সবিশেষ পর্যবেক্ষণ করে। সে দেখে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করছেন মুসলমানগণ তাঁর উযুর পানি তুলে নিয়ে চেহারায় মুছছে। তাঁর মুখ থেকে থুথু পড়তেই ছুটে গিয়ে তারা হাতে তুলে নিচ্ছে। কোনোভাবে মাথা থেকে কোনো চুল ছিঁড়ে পড়লে সেটা সংগ্রহ করার জন্যে তারা পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে।[১]

তাদের এইসব উৎসর্গপ্রাণ অনুপম আবেগ ও আস্থার দৃশ্যাবলি ফিরে গিয়ে চরম বিস্ময় ও প্রভাবান্বিত অনুভূতিসহ তুলে ধরে কুরাইশদের কাছে। বলে, খোদার কসম, আমি কিসরার দরবার দেখেছি। দেখেছি, কায়সারের শাহি প্রভাব ও প্রতিপত্তি। আমি আবিসিনিয়ার বাদশাহর দরবারে গিয়েছি। কসম করে বলতে পারি, কোনো রাজ্যাধিপতিকেই প্রভাব প্রতিপত্তি মহত্ত্ব ও বড়ত্ব এবং গ্রহণযোগ্যতা ও ভালোবাসায় এমনটা বরিত দেখিনি, মুহাম্মাদকে [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁর অনুসারীদের মাঝে যেমনটা দেখেছি।[২]

নবীজির প্রতিনিধি

কুরাইশ-প্রতিনিধিদেরকে বারবার আশ্বস্ত করবার পরও তাদের আচরণ ও মনোভাবে কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি। তাই ওরওয়া ইবনে মাসউদ

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪ : ১৬৭।

২ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৩ : ৩৬২-৩৬৩।

চলে যাওয়ার পর নবীজি নিজের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি পাঠিয়ে তাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাইলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি খিরাজ ইবনে উমাইয়া খুযায়ীকে প্রতিনিধি করে কুরাইশদের কাছে পাঠালেন। আস্থা ও বিশ্বাসের জন্যে স্বীয় উটটি তাকে বাহন হিসেবে দিলেন। উদ্দেশ্য, প্রতিনিধি গিয়ে কুরাইশ-নেতৃবৃন্দকে এই মর্মে আশ্বস্ত করবে—হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরা করতে এসেছেন, যুদ্ধ করতে আসেননি। হযরত খিরাজ এই পয়গাম নিয়ে মক্কায় যান। শহরে প্রবেশ করবার পর তাকে দেখামাত্র মক্কাবাসীর মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আক্রমণ করে তার উটকে জখম করে ফেলে। তাকেও হত্যা করার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। সায়্যিদুল আহাবীশ মাঝখানে এসে দাঁড়ান। তিনি এসে মাঝে পড়ে হযরত খিরাজকে হত্যার হাত থেকে রক্ষা করেন। অবশেষে কুরাইশও তার পথ ছেড়ে দেয়। তিনি নবীজির কাছে ফিরে আসেন। কারও সঙ্গে তার কথা বলারই কোনো সুযোগ হয়নি।

কুরাইশদের গোয়েন্দা

কুরাইশদের মধ্যে তৎপরতা এবং উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তারা চল্লিশ-পঞ্চাশ জন ব্যক্তিকে যৌথবদ্ধভাবে গোপনে মুসলিম-বাহিনীকে পর্যবেক্ষণ করার জন্যে পাঠিয়ে দেয়। তারা বিভিন্ন টিলার আড়াল ধরে ধরে মুসলিম-বাহিনীর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এদিকে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কুরাইশদের যাবতীয় কর্মতৎপরতার প্রতি লক্ষ রাখার উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র একটা বাহিনী নিযুক্ত করে রেখেছিলেন। তারা চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছিল এবং সতর্কভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কুরাইশদের গোয়েন্দাবাহিনী নবীজির এই দলের চোখে পড়ে যায়। তারা তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলে। তারপর গ্রেপ্তার করে কুরাইশ-বাহাদুরদেরকে ছাগলের পালের মতো হাঁকিয়ে নবীজির দরবারে এনে হাজির করে। গ্রেপ্তারকারী দল হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এও জানায়—এরা কৌশলে আমাদের ওপর হামলা করতে চাচ্ছিল। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এদেরকে ছেড়ে দাও। চলে যেতে দাও।

নবীজি তাদেরকে কোনো ধরনের শাস্তি না দিয়ে সহজভাবে ছেড়ে দেন। ফলে, তারা লজ্জাবনত চিত্তে মাথা নামিয়ে আপন গোত্রে ফিরে যায়।[১]

নবীজির দ্বিতীয় প্রতিনিধি

কোনোক্রমে জান বাঁচিয়ে প্রথম প্রতিনিধি মক্কা থেকে ফিরে এসেছেন। তাই দ্বিতীয় কোনো প্রতিনিধি প্রেরণ করা আশঙ্কামুক্ত ছিল না। তারপরও হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ এড়াতে চাচ্ছিলেন। চাচ্ছিলেন কুরাইশ কোনোক্রমেই যেন বায়তুল্লাহ যিয়ারতের সুযোগ করে দেয়। তিনি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে বলেন, তুমি মক্কায় যাও। কুরাইশ-নেতৃবৃন্দকে আমাদের পক্ষ থেকে আশ্বস্ত করে এসো। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমার আশঙ্কা হয় তারা আমার ওপর একসঙ্গে আক্রমণ করে বসবে। কারণ, আমার কঠোরতা এবং তাদের প্রতি আমার শত্রুটা এমন মাত্রায় উন্নীত—তারা এক মুহূর্তের জন্যেও আমাকে মেনে নিতে পারবে না। তা ছাড়া মক্কায় এখন আমাকে হেফাজত করার মতো আমার খান্দানেরও কেউ নেই। আমার মত হলো, আপনি উসমান ইবনে আফফানকে প্রেরণ করুন। তার সঙ্গে কেউ অশুভ আচরণ করতে পারবে না। কারণ, তার সাহায্যে স্বয়ং কুরাইশের অনেক লোক দাঁড়িয়ে যাবে। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর এই পরামর্শ ছিল যথার্থ এবং যুক্তিসঙ্গত। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসমানকে ডেকে আবু সুফিয়ান এবং কুরাইশ-নেতৃবৃন্দের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বলে দিলেন—তুমি তাদেরকে গিয়ে বলো, আমরা লড়াই করতে আসিনি। আমরা এসেছি কেবল বায়তুল্লাহ যিয়ারত করতে।

হযরত উসমান মক্কা শহরে

হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু নবীজির আদেশে মক্কা চলে যান। পথেই দেখা হয় আবান ইবনে সাঈদ ইবনে আসের সঙ্গে। হযরত উসমান তাকে স্বীয় উটের পিঠে তুলে নেন। আবান হযরত উসমানের নিরাপত্তার ভার গ্রহণ করেন। মক্কায় গিয়ে তিনি আবু সুফিয়ান এবং কুরাইশ-

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪ : ১৬৭।

নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাদের কাছে নবীজির বাণী পৌঁছে দেন। তাদেরকে আশ্বস্ত করার সম্ভব সকল চেষ্টা করেন। পুরো কথাবার্তা শোনার পর কুরাইশ-সম্প্রদায় হযরত উসমানকে বলে, আপনি চাইলে এখনই গিয়ে বায়তুল্লাহ-তাওয়াফ করুন। আপনাকে কে বাধা দেবে? হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর রাসূল তাওয়াফ না করা পর্যন্ত আমি তাওয়াফ করব না। হযরত উসমান তাওয়াফ করেননি। কুরাইশের লোকেরাও তাকে আটক করে ফেলে। তার ফিরতে অনেক দেরি হয়। এদিকে একটা কথা ছড়িয়ে পড়ে—মক্কায় হযরত উসমানকে শহীদ করে ফেলা হয়েছে।[১]

বায়আতুর রিদওয়ান

হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হত্যার কথাটি এতটা দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে—সকলেই ধরে নেয় আসলে তাকে হত্যা করা হয়েছে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এ কথা জানতে পারেন, তখন সাহাবায়ে কেরামের সকলকে ডেকে বলেন—আমরা শত্রুদের সঙ্গে পূর্ণ শক্তির পরীক্ষা না করা পর্যন্ত এই এলাকা ছাড়ব না। তোমরা সকলে আমার হাতে হাত রেখে শপথ নাও—আমরা জীবন দেব কিন্তু পালিয়ে যাব না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন একটি বাবলা গাছের নিচে উপবিষ্ট ছিলেন। এর ছায়ায় বসে সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে শপথ নেন। তাই এই শপথকে বায়আতুশ শাজারাও বলা হয়। পবিত্র কুরআনেও এই শপথের কাহিনী এই শব্দেই বর্ণিত হয়েছে। এই শপথে সকল সাহাবী অংশগ্রহণ করেন। হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পক্ষ থেকে নবীজি তাঁর এক হাত আরেক হাতে রেখে শপথ নেন।

এই শপথ সম্পাদিত হওয়ার পর পুনরায় সংবাদ পান হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কিত সংবাদটি ভুল ছিল। তিনি জীবিত আছেন এবং নিরাপদে আছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর একটি হাত আরেক হাতের ওপর রেখে বলেছিলেন—এটা উসমানের শপথ।

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৩ : ২৬৪।

আপসের চেষ্টা

বৃক্ষের ছায়ায় জীবনদানের শপথ পূর্ণ হওয়ার পর জানা যায়, হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাতের সংবাদটি ছিল ভুল। এরপরই কুরাইশদের পক্ষ থেকে আরেকজন প্রতিনিধি আসে। তার নাম ছিল সুহাইল ইবনে আমর। কুরাইশ তাকে সব রকমের এখতিয়ার দিয়ে পাঠিয়েছিল। তাকে বলে দিয়েছিল—মুহাম্মাদের [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সঙ্গে সন্ধি বিষয়ে কথা বলবে। তাকে পরিষ্কার জানিয়ে দেবে—এ বছর যেন তিনি এখান থেকে চলে যান। খোদার কসম, আমরা কোনোভাবেই এটা মেনে নেব না—আরবের লোকেরা মনে করবে, মুহাম্মাদ শক্তির জোরে মক্কায় প্রবেশ করেছেন। তারপর কাবা শরীফ তাওয়াফ করে বিদায় নিয়েছেন। কুরাইশ তাঁর কিছুই করতে পারেনি।

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুহাইল ইবনে আমরকে আসতে দেখেই বললেন—কুরাইশ এখন সন্ধি বিষয়ে কথা বলতে প্রস্তুত। সুহাইলকে দেখে তা-ই মনে হচ্ছে। সুহাইল নবীজির খেদমতে এসে আলোচনা শুরু করে। দীর্ঘ প্রশ্নোত্তর হয়। কথা হয় চুক্তির শর্তাবলি নিয়ে। চুক্তির সবিস্তার শর্তাবলির মীমাংসায় তর্ক-বিতর্কও হয়। অবশেষে চুক্তির একটা নকশা স্থির হয়। সবকিছু মীমাংসিত হওয়ার পর বাকি থাকে শুধু চুক্তিনামা লেখা। মুশরিকদের পক্ষ থেকে যেসব শর্ত উত্থাপন করা হয়, তার প্রত্যেকটিতেই ছিল জোরজবরদস্তি ও উগ্র শক্তির প্রভাব। তাদের বড়ত্ব ও প্রভাবের বাণী প্রতিটি শর্তে চুইয়ে পড়ছিল। অনুমিত হচ্ছিল, মুসলমানগণ যেন নত হয়ে সন্ধি করছে। এভাবে দৃশ্যত নতি স্বীকার করে সন্ধি করায় হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব খুবই অপ্রস্তুত ছিলেন। তিনি কোনোক্রমেই এটাকে মেনে নিতে পারছিলেন না। তার মনের এই সংশয় ও যন্ত্রণার কথা কখনো হযরত আবু বকরকে বলেন। হযরত আবু বকর তাকে বলেন, উমর, আল্লাহর রাসূল যা কিছু করছেন, তার ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো, কিন্তু হযরত উমর স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। ইসলাম ও মুসলমানদের পরাজয়-অনুভূতি তার কাছে ছিল এক অসহ্য বিষয়। অবশেষে তিনি হৃদয়ের চাপে বাধ্য হয়ে নবীজির খেদমতে আরজ করেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কি আল্লাহর রাসূল নন?

: অবশ্যই আমি আল্লাহর রাসূল।

: আমরা কি মুসলমান নই?

: অবশ্যই তোমরা মুসলমান।

: মক্কার লোকেরা কি মুশরিক নয়?

: অবশ্যই তারা মুশরিক।

: তা হলে আমরা এভাবে নত হয়ে সন্ধি করছি কেন?

: আমি আল্লাহর বান্দা এবং তার রাসূল। আল্লাহর হুকুমের বাইরে আমি কিছু করতে পারি না। আর আল্লাহ তাআলা আমাদের চেষ্টাকে নিষ্ফল করবেন না।

এরপর হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু খামোশ হয়ে যান। পরে অবশ্য উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু নবীজির সঙ্গে এইভাবে কথা বলায় খুবই লজ্জিত হন। আল্লাহ তাআলার দরবারে বারবার তওবা করেন। ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এর প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অনেক রোযা রাখেন। গোলাম আজাদ করেন। তা ছাড়া আরও নানা কল্যাণকর্ম শুধু এই ভরসায় করতে থাকেন—কল্যাণকর্মসমূহ অকল্যাণকে নির্মূল করে দেয়।[১]

সন্ধিপত্র

সকল শর্ত মীমাংসিত হওয়ার পর সন্ধিপত্র লেখার প্রসঙ্গ আসে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী ইবনে আবু তালেবকে ডেকে পাঠান। তারপর তাকে সন্ধিপত্র লিখতে আদেশ করেন। বলেন, লেখো—'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'। সুহাইল সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি করে বসে। আমরা তো এই জাতীয় বাক্য আমাদের রচনাবলিতে ব্যবহার করি না। সুতরাং এটা না লেখা হোক। আমাদের প্রচলিত নিয়মমাফিক 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা' লেখা হোক। হযরত আলী নবীজির নির্দেশে এটাই লেখেন। তারপর নবীজি বলেন, লেখো—'এই চুক্তিনামা, যা মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ এবং সুহাইল ইবন আমরের মাঝে সম্পাদিত হয়েছে'...। সুহাইল আবার আপত্তি করে বসে—রাসূলুল্লাহ শব্দটি লেখা যাবে না। আমরা যদি

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪ : ১৬৮।

আপনাকে আল্লাহর রাসূলই মেনে নিতাম, তা হলে তো আপনার সঙ্গে আমাদের কোনো লড়াই হতো না। এখানে শুধু আপনার নাম এবং আপনার পিতার নাম লিপিবদ্ধ করা হোক। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলীকে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহও এবং মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহও। সুতরাং লেখো—

هذا ما صالح محمد بن عبد الله وسهيل ابن عمرو.

উভয় পক্ষ অবশেষে এ বিষয়ে সন্ধি সম্পাদন করে—আমাদের মাঝে দশ বছর পর্যন্ত কোনোরূপ যুদ্ধ হবে না। মানুষ স্বস্তিতে সর্বত্র আসা-যাওয়া করতে পারবে। সন্ধিপত্রে এ কথাও লিপিবদ্ধ হয় কুরাইশের কোনো ব্যক্তি যদি তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া মুহাম্মাদের [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কাছে চলে যায়, তা হলে তিনি তাকে ফেরত দেবেন। পক্ষান্তরে তাঁর কাছ থেকে যদি কেউ কুরাইশের কাছে ফিরে আসে, তা হলে কুরাইশ তাকে ফেরত দেবে না। এই চুক্তিনামায় কোনো ধরনের হ্রাস-বৃদ্ধি হবে না। কেউ এই চুক্তিনামাকে ভঙ্গও করবে না। অধিকন্তু যে কোনো গোত্র উল্লিখিত এই দুই পক্ষের যে কোনো পক্ষের সঙ্গে মিলিত হতে চাইলে হতে পারবে। কেউ চাইলে কুরাইশদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে। আবার কেউ চাইলে মুহাম্মাদের [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সঙ্গেও যুক্ত হতে পারবে। সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ হওয়ার পর উভয় পক্ষ তাতে দস্তখত করে। দস্তখত সম্পাদিত হওয়ার পর বনু খুযায়াহ গোত্র বলে, এই চুক্তিপত্রে আমরা মুহাম্মাদের [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সঙ্গে আছি। এর জবাবে বনু বকর গোত্র বলে, আমরা আছি কুরাইশের সঙ্গে।

চুক্তিনামায় এটাও উল্লেখ ছিল—এ বছর মুসলমানগণ মক্কায় প্রবেশ করতে পারবেন না। আগামী বছর তারা মক্কায় প্রবেশ করতে পারবেন। আগামী বছর যখন আসবেন, তখন তারা মাত্র তিন দিন অবস্থান করে ফিরে যাবেন। সঙ্গে-আনা হাতিয়ার কাপড়ে জড়িয়ে রাখবেন। তাদের তরবারিগুলো থাকবে কোষবদ্ধ।[১]

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৩ : ৩৬৬-৩৬৭।

শেকলপরা এক মুসলমান

সন্ধিপত্র লেখা ও দস্তখত মাত্র সমাপ্ত হয়েছে—ঠিক এমন সময় নবীজির সঙ্গে সন্ধিকারী সুহাইল ইবনে আমরের পুত্র আবু জান্দাল শেকলপরা অবস্থায় উপস্থিত। আবু জান্দাল আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তার বাবা তাকে শেকলে বেঁধে রেখেছিল। কোনোক্রমে পালিয়ে সোজা হুদায়বিয়ায় নবীজির খেদমতে এসে উপস্থিত। সেখানে তার বাবাও উপস্থিত। আবু জান্দাল বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি মক্কায় থাকতে চাই না। এদিকে তাকে দেখামাত্র সুহাইল ইবনে আমর ক্রোধে ফেটে পড়ে। থাপ্পড় মারতে থাকে। ঘাড় ধরে তাকে সরিয়ে দেয়, এবং বলে, মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], আপনার সঙ্গে আমাদের সন্ধি পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। সন্ধিপত্র সম্পাদিত হওয়ার পর এ এসেছে। নবীজি বললেন, এটা ঠিক। সুহাইল তার পুত্র আবু জান্দালকে ধাক্কা দিয়ে কুরাইশদের দিকে পাঠাতে চাচ্ছিল। আবু জান্দাল তখন চিৎকার জুড়ে দেয়। মুসলমানদের দিকে তাকিয়ে বলে, মুসলমানগণ, দ্যাখো, জোর করে আমাকে মুশরিকদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, অথচ ইসলাম কবুল করেছি বলে সেখানে আমার প্রাণের আশঙ্কা রয়েছে। আমি মুশরিকদের কাছে ফিরে যেতে চাই না। হৃদয়বিদারক এই দৃশ্য এবং হযরত আবু জান্দালের চিৎকারে মুসলমানদের কলিজা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়। তার এই নির্যাতনদৃশ্য দেখে তাদের চোখ অশ্রুসজল হয়। সকলের অন্তরে একই অনুরণন—আমাদের ভাই কীভাবে নির্যাতনের চাকায় নিষ্পেষিত হচ্ছে! কিন্তু তাদের করার কী আছে, সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেছে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আবু জান্দাল সবর করো। আল্লাহ তাআলা তোমার এবং তোমার মতো দুর্বলদের জন্যে অবশ্যই মুক্তির কোনো পথ তৈরি করে দেবেন। আমরা সন্ধিপত্রে দস্তখত করে ফেলেছি। এর পরিপন্থী আমরা কিছু করতে পারি না। সন্ধিপত্রে মুশরিকদের পক্ষে সুহাইল ইবনে আমর এবং তার সতীর্থরা সই করে। আর মুসলমানদের পক্ষে দস্তখত করেন আবু বকর সিদ্দীক, উমর ফারুক, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, আবদুল্লাহ ইবনে সুহাইল ইবনে আমর, সাদ ইবনে ওয়াক্কাস, মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ এবং মিকরাজ ইবনে হাফস—যিনি

তখনো ছিলেন মুশরিক। আর হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু দস্তখত করেন সন্ধিপত্রের নবিশ হিসেবে।[১]

হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন

সন্ধিপত্র সম্পাদিত হওয়ার পর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এহরাম খুলে ফেলেন। মুসলমানদেরকে বলেন, তোমরাও এহরাম খুলে ফেলো। কুরবানী করে নাও। মুসলমানগণ ছিলেন তখন হতাশায় বিমর্ষ। এতটা নতি স্বীকার করে সন্ধি করা হলো! স্বাভাবিকভাবে সকলের মধ্যেই একটা মনমরা ভাব। ফলে সঙ্গে সঙ্গে তারা এহরামও খুলছিল না। কুরবানী করতেও পা বাড়াচ্ছিল না। অবশেষে তারা যখন লক্ষ করল, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এহরাম খুলে ফেলেছেন এবং কুরবানী করে ফেলেছেন, তখন সকলেই এহরাম খুলে কুরবানী করে নেয়। হুদায়বিয়া থেকে ফেরার পথে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা ও মদীনার মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছান, তখন তাঁর প্রতি সূরাতুল ফাতহ অবতীর্ণ হয়—

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا.

আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি। [ফাতহ : ১]

দৃশ্যত মুসলমানগণ নত হয়ে সন্ধি করেছেন। মুশরিক-সম্প্রদায় তাদের শর্তাবলি মানতে বাধ্য করেছে। এতে করে মুসলমানগণ আন্তরিকভাবে আহত হয়েছেন। তাদের আবেগ-অনুভূতি শীতল হয়ে পড়েছে অথচ আল্লাহ তাআলা এই সন্ধিকেই বলছেন সুস্পষ্ট বিজয়। এতে এ কথাই প্রতীয়মান হয়—এই সন্ধিতে মুসলমানদের জন্যে এমন অনেক কল্যাণ নিহিত ছিল, যা আল্লাহ তাআলা ভালো করেই জানতেন। কিন্তু মুসলমানদের দৃষ্টি তখন তা ধরতে পারেনি। পরবর্তী ঘটনাবলিও এটাই প্রমাণ করেছে—হুদায়বিয়ার সন্ধি মুসলমানদের পরাজয় ছিল না, ছিল স্পষ্ট বিজয়ের বুনিয়াদি পাথর। অল্প দিনের মধ্যে মুসলমানগণ সেই বিজয় অবাক-বিস্ময়ে অবলোকন করেছেন।

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৩ : ৩৬৮; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪ : ১৬৯।

মক্কার মুশরিকদের কয়েদখানায় অসহায় মুসলমান

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমনের কয়েক দিন পরেই মদীনায় ছুটে আসেন আবু বসীর উতবা ইবনে উসাইদ ইবনে জারিয়া সাকাফী। মক্কার লোকেরা যেসব অসহায় মুসলমানকে বন্দি করে রেখেছিল, হযরত আবু বসীর তাদেরই একজন। একদিন তিনি সুযোগ পেয়ে মুশরিকদের কারাগার থেকে বেরিয়ে পড়েন। তারপর সোজা চলে আসেন মদীনায়। হাজির হন নবীজির দরবারে। বিষয়টি মক্কার মুশরিক-সম্প্রদায় জানতে পারে। তখন আযহার ইবনে আউফ ইবনে আবদুল হারেস ইবনে যাহরা এবং আখনাস ইবনে শারীক সাকাফী নবীজিকে পত্র লেখে এবং বনু আমের গোত্রের এক ব্যক্তিকে ও তার সঙ্গে তাদের আজাদকৃত একজন ক্রীতদাসকে পত্রসহ পাঠিয়ে দেয়। পত্রে আবু বসীরকে ফেরত পাঠাবার দাবি করা হয়। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বসীরকে ডেকে বলেন, কুরাইশদের সঙ্গে আমাদের সন্ধি হয়েছে। আর তুমিও জানো, আমাদের ধর্মে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা বৈধ নয়। আল্লাহ তাআলা তোমার এবং তোমার মতো দুর্বল মুসলমানদের মুক্তির কোনো পথ অবশ্যই করবেন। তুমি এখন এদের সঙ্গে মক্কায় চলে যাও। আবু বসীর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমাকে মুশরিকদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেন? এরা তো আমাকে ইসলাম কবুল করেছি বলে হত্যাও করতে পারে। নবীজি বললেন, আবু বসীর তুমি এখন যাও—

فان الله تعالي سيجعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا.

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমার ও তোমার সতীর্থ দুর্বলদের মুক্তির কোনো পথ করে দেবেন!

নবীজির আদেশে বাধ্য হয়ে হযরত আবু বসীর তাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েন। যুল হুলাইফায় পৌঁছার পর এক জায়গায় তারা যাত্রাবিরতি করে। হযরত আবু বসীর একটি দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়েন। অপর দুই সফরসঙ্গী ঝোলা থেকে খেজুর বের করে। তারপর তিনজন একসঙ্গে খেতে শুরু করে। খাওয়ার সঙ্গে নানা রকমের কথাবার্তা চলতে থাকে। কথায় কথায় তাদের একজনকে হযরত আবু বসীর বললেন, আমেরী, তোমার

তরবারিটি তো খুব চমৎকার মনে হচ্ছে! আমেরী তার তরবারির প্রশংসা শুনে অহংকারের সঙ্গে বলতে থাকে—এই তরবারি আমি অনেক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পরীক্ষা করেছি। তার কার্যক্ষমতা খুবই চমৎকার। আবু বসীর বললেন, আমাকেও একটু দেখতে দাও। দেখি, কী সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে এতে! আমেরী তরবারিটি আবু বসীরের হাতে তুলে দেয়। হযরত আবু বসীর তরবারিটি হাতে নিয়ে প্রথমে খাপ থেকে বের করেন। তারপর উল্টেপাল্টে দেখেন। ক্রমে তার হাত চলে যায় তরবারির বাটে। অতঃপর আকস্মিক এক আঘাতে আমেরীর গর্দান শরীর থেকে আলাদা হয়ে দূরে গিয়ে পড়ে। ভয়ংকর এই দৃশ্য দেখে তার সঙ্গী এক লাফে উঠে দাঁড়ায়। তারপর উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটে পালায় মদীনার দিকে। কোনো রকম হামাগুড়ি দিয়ে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে। তাকে দেখেই হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—নিশ্চয় এ কোনো ভয়ংকর দৃশ্য দেখেছে। তারপর লোকটি নবীজির সামনে এসে আরজ করে—খোদার কসম, আপনার লোক আমার সঙ্গীকে হত্যা করেছে। তার কথা সমাপ্ত হওয়ার আগেই হযরত আবু বসীর সেখানে উপস্থিত। তার কাঁধে ঝুলছে সেই তরবারি। আবু বসীর সামনে এসে আরজ করেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আপনার অঙ্গীকার পূরণ করেছেন। মক্কার লোকদের হাতে আমাকে তুলে দিয়েছেন। আমি আমার জীবন হেফাজতের জন্যে ওকে হত্যা করেছি। নবীজি বললেন, এতে করে তো যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠতে পারে। এই কথায় হযরত আবু বসীর রাযিয়াল্লাহু আনহু বুঝতে পারেন, আমাকে নিশ্চয় পুনরায় মুশরিকদের হাতে তুলে দেওয়া হতে পারে। তাই তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে পড়েন। সমুদ্র উপকূলের কাছাকাছি ঈস নামক জায়গায় গিয়ে বসবাস করতে শুরু করেন। সেখানে একা থাকতেন। শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তার অবস্থানের জায়গাটি ছিল বাণিজ্যপথের তীরে। সে পথেই কুরাইশদের বাণিজ্যকাফেলা সিরিয়ায় যেত এবং সে পথেই মক্কায় ফিরত।

রহিত হলো সন্ধিপত্রের এক দফা

আবু বসীর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর এই ঘটনাটি মক্কার মুশরিকদের কয়েদখানায় নির্যাতিত মুসলমানগণ জানতে পারেন। তারপর তাদের মধ্যে

যে-ই সুযোগ পেত, সে-ই পালিয়ে চলে যেত আবু বসীরের কাছে। কারণ, মদীনায় গেলে নবীজি আবার মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দিতেন। এভাবে একে একে এসে সমবেত হওয়া অসহায় মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়ায় সত্তরে। তাদের সকলের আশ্রয় তখন হযরত আবু বসীর।[১] ফলে, ধীরে ধীরে তাদের একটি মজবুত শক্তি গড়ে উঠে। এই পথে কুরাইশদের কোনো ব্যক্তির পক্ষে যাতায়াত হয়ে উঠে অসম্ভব। কুরাইশদের কোনো কাফেলা এ পথে যেতে দেখলে তারা একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। কাফেলাকে তছনছ করে ফেলতেন। কারণ, তারা সকলেই কুরাইশদের কয়েদখানায় নির্যাতনে নিষ্পেষিত হয়েছেন। ফলে তাদের ক্রোধ ও ক্ষোভ ছিল অগ্নিময়। সুযোগ পেলে তারা প্রতিশোধ নিতেন কড়ায় গণ্ডায়। ধীরে ধীরে এর পরিণতি এই দাঁড়াল—কুরাইশদের সিরিয়ামুখি বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেল। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙে পড়বার উপক্রম হলো। তাদের অনেক বড় বাণিজ্যকাফেলাও এ পথে যাওয়ার হিম্মত করত না, অথচ কুরাইশদের জন্যে সবচেয়ে বেশি মুনাফাজনক বাজার ছিল সিরিয়া। সিরিয়াকেন্দ্রিক বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে তারা অর্থনৈতিক চাপে পড়ে। ফলে বাধ্য হয়ে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আল্লাহর নামের দোহাই দিয়ে অনুরোধ করে—আপনি এদেরকে মদীনায় ডেকে নিন। এদের কাউকেই আমরা আমাদের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি করব না, বরং মক্কা থেকে যার খুশি, সে যেন মদীনায় গিয়ে বসবাস করে। এ বিষয়ে আমরা কোনো আপত্তি করব না।

কুরাইশ যখন নিজেরাই নিজেদের দেওয়া শর্ত তুলে নিল, তখন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোক পাঠিয়ে তাদের সকলকে মদীনায় ডেকে নেন। সঙ্গে সঙ্গে সন্ধিপত্রের এই ধারাটিও চিরতরে রহিত হয়ে যায়। অথচ এই ধারাটিই ছিল তাদের গর্ব ও অহংকারের পালের হাওয়া। একদা এই অহংকারই তাদের জন্যে জীবনের বিষ হয়ে দাঁড়িয়েছে।[২]

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৩ : ৩৭৩।

২ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৩ : ৩৭৩; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪ : ১৭৬।

মুসলিম নারীদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে না

যখন চুক্তিপত্র লেখা হচ্ছিল, তখন কয়েকজন মুসলিম নারীও সেখানে মক্কা থেকে চলে এসেছিল। তারা মুশরিকদের কব্জায় ছিল। এখন তারা মদীনায় চলে যেতে চায়। মক্কার শিরকের পরিবেশে তারা আর থাকতে চায় না। এই জাতীয় নারীদের সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ অবতীর্ণ হয়—মুসলিম নারীদেরকে ফেরত দেওয়া হবে না। খুব বেশি হলে তাদের স্বামীদের প্রদত্ত মোহরের অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এজন্যে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু কোনো নারীকে ফিরিয়ে দেননি। তাদেরকে সঙ্গে করে মদীনায় নিয়ে এসেছেন। উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা যখন মদীনায় আসেন, তখন মুশরিকদের দাবি সত্ত্বেও তাকে ফেরত দেওয়া হয়নি। কারণ, চুক্তিনামায় পুরুষদের ফেরত দেওয়ার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল, নারীদের ফেরত দেওয়া মর্মে কোনো শর্ত ছিল না।[১]

আবুল আসের ইসলাম গ্রহণ

হিজরী ষষ্ঠ সালের সূচনাতে মদীনার চারপাশে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। বিভিন্ন প্রান্তে কুরাইশদের আসা-যাওয়ার তথ্যও তিনি পেতে থাকেন। তাদেরকে ধাওয়া করার জন্যে মুসলমানদের ছোট ছোট দলও প্রেরিত হতে থাকে। এক অপারেশনে যায়েদ ইবনে হারেসাকে, এক অপারেশনে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে দলপতি করে পাঠান। উক্কাশাহ ইবনে মিহসানের নেতৃত্বেও একটি ক্ষুদ্র দল প্রেরিত হয়। এই সকল ঘটনা হুদায়বিয়ার সন্ধির আগের। এই বছর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে।

আবুল আস ইবনে রবী একদা নবীজির জামাতা ছিলেন। ব্যবসা করে ফিরছিলেন। মুসলমানদের একটি প্রতিরক্ষাদল তার কাফেলার ওপর আক্রমণ করে। কাফেলার যাবতীয় সম্পদ কব্জা করে নেয়। আবুল আস ছিলেন নবীনন্দিনী হযরত যায়নাবের স্বামী। বদর যুদ্ধে তিনি বন্দি

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৩ : ৩৭৬।

হয়েছিলেন। বন্দি করে তাকে মদীনায় আনা হয়েছিল। হযরত যায়নাবকে মদীনায় পাঠিয়ে দেওয়ার শর্তে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। কথামতো তিনি হযরত যায়নাবকে মদীনায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। নিজে থেকে গিয়েছিলেন মক্কায় মুশরিকদের সঙ্গে। একবার এক কাফেলা নিয়ে ব্যবসায় বের হন। মুসলমানগণ জানতে পারেন—এ পথে কুরাইশদের কোনো কাফেলা যাচ্ছে। আক্রমণ করেন কাফেলার ওপর। ব্যবসার যাবতীয় সম্পদ হয়ে যায় গনিমত। আবুল আস তখন পালিয়ে মদীনায় চলে আসেন। হযরত যায়নাবের আশ্রয় চান। যায়নাব তাকে আশ্রয় দেন। নবীজি বিষয়টি জানার পর তিনিও তাকে আশ্রয় দেন। সাহাবায়ে কেরামকে ডেকে বলেন—এর যাবতীয় সম্পদ ফিরিয়ে দাও। সাহাবায়ে কেরাম তার পুরো সম্পদ ফিরিয়ে দেন। আবুল আস পুরো সম্পদ নিয়ে মক্কায় চলে যান। এই কাফেলায় যাদের সম্পদ ছিল, সকলকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দেন। কিছু দিন পর মদীনায় ফিরে আসেন এবং ইসলাম কবুল করেন। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়নাবকে পুনরায় তার কাছে বিয়ে দেন।[১]

রাষ্ট্রপ্রধানদের দীনের দাওয়াত

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর যখন ভ্রমণ নিরাপদ হয়ে উঠে, নিরাপদ হয়ে উঠে পথঘাট, তখন মানসিক অস্থিরতাও কেটে যায়। কুরাইশদের সঙ্গে দশ বছরের জন্যে যুদ্ধ বন্ধের এই সন্ধি চিত্তের অস্থিরতাকে দূরে সরিয়ে দেয়। সুযোগ হয়, ব্যাপকভাবে ইসলামের বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার। এই সন্ধির পরই হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবের ভেতরে এবং বাইরে রাজা-বাদশাহ, গোত্রপতি এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ লোকদের নামে প্রায় আড়াইশো চিঠি লেখেন। বিভিন্ন সাহাবীকে দিয়ে ওইসব লোকদের কাছে পত্র প্রেরণ করেন। হানীফা ইবনে খাইয়াত তদীয় ইতিহাসগ্রন্থে পত্রবাহক ও পত্রপ্রাপকদের মাত্র কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেছেন।[২] অবশ্য আল্লামা ইবনে খালদুন উল্লেখযোগ্য এবং বিশিষ্ট আরও

---

১ ইবনুল আসীর, *আল-কামিল ফিত তারীখ*, ১ : ৩৮।

২ *তারীখে হানীফা ইবনে খাইয়্যাত*, ৭৯।

বেশ কিছু ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছেন।[১] তার বিবরণ মোতাবেক পত্রবাহক সাহাবায়ে কেরাম এবং পত্রপ্রাপক ব্যক্তিগণ হলেন—

সাঈদ ইবনে আমর ইবনে আব্দে শামস ইবনে আবদুদ ইয়ামামার শাসক হাওজা ইবনে আলীর কাছে, আলা ইবনে হাজরামী বাহরাইনের অধিপতি মুনযির ইবনে সাবীর কাছে, আমর ইবনুল আস ওমানের শাসক জায়ফর ইবনে জালান্দীর কাছে, হাতেব ইবনে আবু বালতায়া আলেকজান্দ্রিয়ার শাসক মুকাওকিসের কাছে, দাহয়া কালবী রোমের অধিপতির কাছে, আমর ইবনে উমাইয়া জামরী আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর কাছে এবং আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফাহ সাহমী ইরানের অধিপতি কিসরার কাছে নবীজির পত্রসহ প্রেরিত হন।[২]

হাফেজ ইবনে কাসীর অবশ্য এই তালিকা আরেকটু প্রসারিত করেছেন। তিনি লেখেছেন—আরব খ্রিষ্টানদের শাসক হারেস আল ফাসাতীর কাছে দাওয়াতি পত্র নিয়ে গিয়েছিলেন শোজা ইবনে ওয়াহাব ইবনে আসাদ। উল্লিখিত পত্রগুলোর আলোচনা অধিকাংশ গ্রন্থেই আছে। অবশ্য নবীজির পত্রাবলি নিয়ে যারা গবেষণা করেছেন, তারা ইতিহাসের সূত্রে এইসব পত্রের সংখ্যা আরও অনেক বলে উল্লেখ করেছেন। এইসব পত্রের কোনো কোনোটার ভাষ্য সরাসরি *বুখারী* ও *মুসলিম শরীফে* লিখিত রয়েছে। রোমসম্রাটের নামে লেখা চিঠির ভাষ্য হাদীসের অধিকাংশ গ্রন্থেই রয়েছে। ইরানসম্রাট কিসরা নবীজির পত্রকে অপমান করে ছিঁড়ে ফেলেছিল। সে তার নায়েব বাযানকে আদেশ করেছিল নবীজিকে গ্রেপ্তার করার জন্যে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিরুদ্ধে বদদোয়া করেছিলেন। এর অল্প কয়েকদিন পরই তাকে হত্যা করা হয়। তারপর ইরানে বিপ্লব সৃষ্টি হয়।[৩]

---

১ *তারীখে ইবনে খালদুন*, ২ : ৪৪৯-৪৫০।

২ *ইবনে সাইয়্যিদুন নাস*, ২ : ৩৪৪-৩৫৬।

৩ *বুখারী* ও *মুসলিমের* সূত্রে *মেশকাত* , ৩৪১; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪ : ১৮০—*আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়ায়* নাজ্জাশী মুকাওকিস ও মুনযির ইবনে সাওয়ারের নামে প্রেরিত পত্রাবলির পূর্ণ বিবরণ রয়েছে। ওইসব পত্রাবলির মূল কপি উনবিংশ এবং বিংশ শতকে এসে বিশেষ চামড়ায় লিখিতরূপে পাওয়া গেছে। তখনকার পত্রিকা এবং সংবাদপত্রে তার ছবিও ছাপা হয়েছে। ড.মুহাম্মদ

খায়বার যুদ্ধ

হুদায়বিয়া থেকে ফিরে আসেন জিলকদ মাসের শেষের দিকে। সপ্তম হিজরীর জিলহজ ও মহররম মাসের কিছু অংশ পার হওয়ার পরই সংঘটিত হয় খায়বার যুদ্ধ। নুমাইলা ইবনে আবদুল্লাহ লাইসীকে নবীজি মদীনার শাসক নিযুক্ত করেন। তারপর সাহাবায়ে কেরামের বিশাল কাফেলাকে সঙ্গে করে খায়বারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সমগ্র আরবের ইহুদিদের জনবসতি এখন খায়বার। ইহুদি-সম্প্রদায় তাদের স্বভাবজাত প্রেরণায় সদা ষড়যন্ত্রে মশগুল। যে কোনো সময় যে কোনো দিন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের চক্রান্ত করতে পারে। তাই এর আগেই তাদেরকে শেকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলা অনিবার্য ছিল। নবীজি রাতের বেলা খায়বারে পৌঁছান। নিঃশব্দে তাদের কেল্লা ঘেরাও করে ফেলেন। রাতভর ইহুদিরা তাদের কেল্লায় বেখবর ঘুমিয়ে থাকে। সকালবেলা যখন রুটিনমাফিক জমিতে কাজকাম করার উদ্দেশ্যে কোদাল ও টুকড়ি নিয়ে বেরিয়েছে, তখন কেল্লার ফটক খুলতেই দেখে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিরাট বাহিনীসহ তাঁবু পেতে আছেন। এই বিশাল বাহিনীর ওপর নজর পড়তেই তারা উদ্ভ্রান্তের মতো কেল্লার ভেতর ছুটে যায়। কেল্লার ভেতর হৈচৈ পড়ে যায়—মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁর বাহিনী নিয়ে চলে এসেছেন। মুসলমানগণ এবং হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এই দৃশ্য দেখছিলেন। এই প্রেক্ষিতে নবীজি বলেছিলেন—

الله اكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين.

আল্লাহু আকবার, নাশ হোক খায়বারের! আমরা যখন কোনো সম্প্রদায়ের আঙিনায় অবতরণ করি—অপরাধীদের ভোর হয় অশুভ!

নবীজি তাদের এই দৃশ্যকে শুভ লক্ষণ হিসেবে ধরে নেন। তারপর আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করেন। প্রত্যেক দলকে আলাদা আলাদা পতাকা দান করেন। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে একটি পতাকা দেন।

হামীদুল্লাহ লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থ *রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী সিয়াসী যিন্দেগী* গ্রন্থে এর বিশদ বর্ণনা দেখা যেতে পারে।-আসীর আদরবী

দ্বিতীয় পতাকা দেন খাব্বাব ইবনুল মুনযিরকে। আর তৃতীয় পতাকা দেন আসআদ ইবনে উবাদাকে। তারপর তিনি সকলকে পরামর্শ দিয়ে বলেন—আজকের যুদ্ধে মুসলমানদের স্লোগান হবে—

يا منصور امت.

সকল মুসলমান এই শব্দগুলো বারবার উচ্চারণ করবে। কে মুসলমান আর কে ইহুদি, তা যেন পার্থক্য হয়ে যায়। ভুলক্রমে কোনো মুসলমান যেন অপর মুসলমানকে হত্যা না করে। খায়বারে ছোট-বড় অনেকগুলো কেল্লা ছিল। এককথায় পুরো খায়বার ছিল দুর্গপূর্ণ জনবসতি। তবে কোনো কেল্লার ভেতরই একসঙ্গে এতটা শক্তি সঞ্চিত ছিল না—তারা একা মুসলমানদের মোকাবেলা করতে পারে। অবশ্য কিছু কিছু বড় কেল্লা ছিল। সেখানে বাসিন্দাও ছিল বেশি। তারা জীবন দিয়ে মুসলমানদের মোকাবেলা করেছে। ওইসব কেল্লায় শক্ত যুদ্ধ হয়েছে। নবীজি পালাক্রমে একটা একটা করে কেল্লা ঘেরাও করেছেন। একটা একটা করে জয় করেছেন। সর্বপ্রথম নাইম দুর্গ জয় করেন। এই দুর্গটি জয় করার সময় বিখ্যাত সাহাবী মাহমুদ ইবনে মাসলামা শাহাদাত বরণ করেন। তারপর বনু আবুল হাকীক দুর্গে আক্রমণ করেন। তারপর একে একে নাতাত দুর্গ। সাদ ইবনে মুআয দুর্গ। যুবায়ের দুর্গ, নাজ্জার দুর্গ প্রভৃতি জয় করেন।[১]

এইসব যুদ্ধে তিরানব্বইজন ইহুদি নিহত হয়। মুসলমানদের মধ্যে পনেরো জন শাহাদাত বরণ করেন। নবীজিকে বিষ পান করানোর ঘটনা এই যুদ্ধেই ঘটে। এই ঘটনাটি হাদীসের বিখ্যাত ছয় গ্রন্থেই উল্লেখিত হয়েছে। বিখ্যাত ইহুদি সাল্লাম ইবনে মিশকামের স্ত্রী যায়নাব বিনতে হারেস একটি ভুনা ছাগল নবীজির খেদমতে হাদিয়া পাঠিয়েছিল। ওই ছাগলটিকে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। নবীজি সেখান থেকে সামান্য মুখে দিয়েছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের কেউ কেউও সেই খাবারে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে বিশর ইবনে বারা ইবনে মারুরও ছিলেন। এই বিষের ক্রিয়ায় তিনি ইন্তেকাল করেন। যখন হত্যা করার উদ্দেশ্যে বিষ মেশানো হয়েছিল

---

১ *তাবাকাতে ইবনে সাদ*, ২ : ১০৬।

বলে জানা যায়, তখন হযরত বিশর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ইন্তেকালের পর ষড়যন্ত্রকারী ওই নারীকে হত্যা করা হয়।[১]

সর্বশেষ দুর্গ

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একের পর এক দুর্গ জয় করে চলেন। সর্বশেষ তিনি ওয়াতীহ দুর্গ ও সুলালিম দুর্গ ঘেরাও করেন। এখানেই বিখ্যাত ইহুদি পালোয়ান মারহাব বসবাস করত। তার কাছে বিপুল পরিমাণে অস্ত্রের সংগ্রহ ছিল। নিজেও ছিল ভীষণ শক্তিশালী এবং রক্তযোদ্ধা। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে আসে এবং চ্যালেঞ্জ করে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দাম্ভিকতাপূর্ণ চ্যালেঞ্জ শোনার পর সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে বলেন, এর সঙ্গে লড়তে যাবে কে? মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে অনুমতি দিন। গতকাল আমার ভাই মাহমুদ ইবনে মাসলামা এই ইহুদিদের হাতে শাহাদাত বরণ করেছেন। তাই আমি এর সঙ্গে লড়তে চাই। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন এবং এই বলে দুআ করলেন—

قم اليه اللهم اعنه عليه.

যাও, মোকাবেলা করো। হে আল্লাহ, তুমি মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাকে জয়ী করো।

মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা এগিয়ে যান। পালোয়ান মারহাব একটি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। কাছে যাওয়ার পর সে হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামার ওপর আক্রমণ করে আবার গাছের আড়ালে চলে যায়। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা তার ওপর হামলা করার কোনো সুযোগই পাচ্ছিলেন না। এভাবে কিছুক্ষণ চালাকির লড়াই চলার পর দুইজনই গাছের আড়াল ছেড়ে খোলা ময়দানে এসে মুখোমুখি হয়। শুরু হয় তুমুল যুদ্ধ। মারহাব পূর্ণ শক্তিতে হামলা করে। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা ঢাল দিয়ে তরবারি ফিরাতে

---

১ *তাবাকাতে ইবনে সাদ*, ২ : ১০৭।

গেলে তরবারি ঢালের মধ্যে আটকে যায়। মারহাব যেই তরবারি ছাড়িয়ে আনার প্রতি মনোযোগী হয়, মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা সজোরে আঘাত করেন। মারহাব তখন বহু শাখাবিশিষ্ট বৃক্ষের ন্যায় ধপাস করে মাটিতে পড়ে যায়।[১]

সে মারা যাওয়ার পর তার ভাই বীরত্বে টগবগিয়ে উঠে। বেরিয়ে আসে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে। তার নাম ছিল ইয়াসির। বেরিয়ে এসে সেও চ্যালেঞ্জ করে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মোকাবেলা করার জন্যে যুবায়ের ইবনুল আওয়ামকে পাঠান। যুবায়ের ইবনুল আওয়াম নবীজির ফুপাতো ভাই। তার মা সাফিয়্যা বিনতে আবদুল মুত্তালিব। তিনি সেখানেই ছিলেন। প্রশ্ন করলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার ছেলে কি শহীদ হয়ে যাবে? নবীজি বললেন, না, বরং সে ওই ইহুদিকে হত্যা করবে। যুবায়ের ইবনুল আওয়াম এগিয়ে যান। প্রথম আঘাতেই ইহুদিকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন।[২]

প্রচণ্ড লড়াই

খায়বারের আরেকটি দুর্গে প্রচণ্ড লড়াই হয়েছিল। প্রথমে মুসলমানগণ হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নেতৃত্বে হামলা করেন। কিন্তু সফল হতে পারেননি। তারপর হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু এটা জয় করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করেন। তিনিও ব্যর্থ হন। তৃতীয় দিন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেন—আগামী দিন আমি এমন ব্যক্তির হাতে পতাকা দেব, যার হাতে এই দুর্গ জয় হবে। পরের দিন সকালবেলা হযরত আলীকে ডেকে পাঠান। হযরত আলীর চোখে তখন যন্ত্রণা ছিল। নবীজি তার চোখে স্বীয় মুখের লালা মাখিয়ে দেন। তার যন্ত্রণা দূর হয়ে যায়। তারপর তার হাতে পতাকা দিয়ে এই কেল্লাটি জয় করার জন্যে পাঠান। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু ইহুদিদের পরাজয় ও আত্মসমর্পণ পর্যন্ত পূর্ণ বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে যান। অবশেষে মুসলমানগণ দুর্গটি জয় করেন। এই কেল্লাটি জয় করার ভেতর

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪ : ১৮৯।

২ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪ : ১৮৯।

দিয়ে পুরো খায়বার মুসলমানদের করতলগত হয়। মুসলমানগণ যখন বনু ইবনে আবুল হাকীক দুর্গটি জয় করেন, তখন সেখানকার বন্দিদের মধ্যে বিখ্যাত ইহুদি হুওয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা সাফিয়্যাও ছিলেন। কুদরতের ইশারায় তাঁর ভাগ্য উজ্জ্বল হয়ে উঠে। যখন গ্রেপ্তার হন, তখন তিনি ছিলেন একজন সাধারণ দাসী, অথচ তিনিই পরে নববী হেরেমে প্রবেশ করে বিঘোষিত হন উম্মুল মুমিনীনের সুউচ্চ মর্যাদায়। বিশ্ব-মুসলিমের কাছে এই সম্মান অতুলনীয়।[১]

ইহুদি-সম্প্রদায় হলো মজদুর জাতি

ওয়াতীহ এবং সুলালিম কেল্লা অবরোধের সময় ইহুদিরা যখন বুঝতে পারে—আমরা লড়াই করতে গেলে ধ্বংস হয়ে যাব, তখন তারা নিরাপত্তা প্রার্থনা করে। নিরাপত্তা প্রার্থনা করে এই বলে—আমাদেরকে আমাদের জীবনের নিরাপত্তা দান করা হোক এবং আমাদেরকে যেন এই অঞ্চল থেকে নির্বাসিত না করা হয়। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আবেদন মঞ্জুর করেন। ফলে এ পর্যন্ত যতগুলো দুর্গ বিজিত হয়েছে, সবগুলোর ধন-সম্পদ গনিমত হিসেবে একত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু ওয়াতীহ এবং সুলালিম দুর্গের অধিবাসীদেরকে কিছুই করা হয়নি। তাদেরকে তাদের মতো ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের জীবন ও সম্পদ দুটোই সংরক্ষিত হয়েছে।

সামান্য দূরেই ছিল ফিদাক। সেখানকার অধিবাসী ইহুদিরা ওয়াতীহ এবং সুলালিম কেল্লার অধিবাসীদের সঙ্গে মুসলমানদের উত্তম আচরণ লক্ষ করেছে। তাই তারাও একই শর্তে নবীজির হাতে তাদের কেল্লার ভার তুলে দেয়। যেহেতু মুসলমানদের হামলা করার আগেই তারা আত্মসমর্পন করেছে তাই ওয়াতীহ এবং সুলালিম কেল্লার পুরো সম্পদ মুসলমানদের মাঝে বণ্টিত হলেও ফিদাকের সম্পদ বণ্টিত হয়নি। এটা হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একান্ত সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। নবীজি এখানকার আমদানি নিজের মতো করে বিভিন্ন খাতে খরচ করতেন। ওয়াতীহ এবং সুলালিমের সকল বাগান ও ক্ষেত-খামার মুজাহিদদেরকে

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৩ : ৩৮৮।

ভাগ করে দেওয়া হয়। ইহুদিরা তখন আবদার করে—এই বাগান ও ফসলি জমি আমাদেরকে বর্গা হিসেবে দান করা হোক। আমরা যাবতীয় পরিশ্রম করব। এর অর্ধেক ফসল আমরা নেব। বাকি অর্ধেক ফসল বণ্টনে যারা মালিক হয়েছেন, তাদেরকে দেব। ফিদাকের অধিবাসীরাও একই আবদার করে। কিন্তু সেখানে যেহেতু একক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্তৃত্ব ছিল, তাই তিনি একজন দায়িত্বশীল নিযুক্ত করে দেন। যেন ফসল বণ্টনের সময় হলে ইনসাফের সঙ্গে ফিদাকবাসীকে তাদের অধিকার বুঝিয়ে দেওয়া হয়। বণ্টনের এই মূলনীতির ভিত্তিতে উল্লিখিত তিনটি অঞ্চলই ইহুদিদেরকে দান করা হয়। অবশ্য হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন—তোমাদের সঙ্গে এই লেনদেন আমাদের মর্জির ওপর নির্ভরশীল। যতদিন খুশি আমরা তোমাদেরকে এই দায়িত্বে রাখব। আবার যখন আমরা ভালো মনে করি, তোমাদেরকে এখান থেকে নির্বাসিত করব। ইহুদিরা এই শর্ত মেনে নেয়। তাই হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাল এবং আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কাল পর্যন্ত ইহুদিরা উল্লিখিত শর্তে এখানেই বসবাস করে। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার শাসনামলে ইহুদিদেরকে খায়বার থেকে তাড়িয়ে দেন।[১]

আরও কিছু বিধি-বিধান

বনু নাজীর যুদ্ধের সময়ই মদ হারাম করা হয়েছিল। পালিত গাধার গোশত আরবরা খেত। খায়বার যুদ্ধের সময় এটা হারাম বলে ঘোষিত হয়। আরবদের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই মুতা বিয়ের রেওয়াজ ছিল। তারা যখন কোনো শহরে ব্যবসা করতে যেত, তখন সেখানে এক-দুই মাসের জন্যে কোনো একজন নারীকে টাকা-পয়সার বিনিময়ে গ্রহণ করত। ওই নারী তাদের রান্নাবান্না করত। সামানপত্র দেখাশোনা করত। রাতের বেলা স্ত্রীর কর্তব্যও পালন করত। এটা ছিল একটা সাধারণ রেওয়াজ। এখনো পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়নি। খায়বার যুদ্ধের

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪ : ১৯৮-২০০; *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৩ : ৩৮৯; ইবনে সায়্যিদুন নাস, *উয়ুনুল আসার*, ২ : ১৯৪।

সময় সর্বপ্রথম এই মুতা বিয়ে হারাম ঘোষিত হয়। দ্বিতীয়বার আওতাস যুদ্ধের সময় আরও অধিক গুরুত্বের সঙ্গে এই সাময়িক বিয়ে অবৈধ বলে ঘোষিত হয়।[১] এই খায়বার যুদ্ধের সময় এই বিধানও ঘোষিত হয়—গ্রেপ্তারকৃত দাসীদের সঙ্গে এক ঋতুকাল অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত সঙ্গম করা যাবে না। তা ছাড়া দাঁত দ্বারা শিকারকারী প্রাণীও হারাম ঘোষিত হয়। গনিমতের সম্পদ বণ্টিত হওয়ার আগে বেচাকেনাও এই সময় নিষিদ্ধ হয়।

খায়বার থেকে প্রত্যাবর্তন

খায়বার থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় রাতে এক জায়গায় যাত্রাবিরতি করেন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নিয়মমাফিক জানতে চান—এই রাতে আমাদের পাহারাদারি কে করবে? কে আমাদেরকে ফজরের সময় জাগিয়ে দেবে? হযরত বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আজ পাহারা দেব আমি। আমিই নামাযের জন্যে জাগিয়ে দেব। নবীজি এবং সাহাবায়ে কেরাম সকলেই নিশ্চিন্তমনে ঘুমিয়ে পড়েন। হযরত বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় উটের গায়ে হেলান দিয়ে বসে পড়েন। কিছুক্ষণ পর তার চোখেও ঘুম নেমে আসে। অলক্ষে তিনিও ঘুমিয়ে পড়েন। সূর্য ওঠার পর গায়ে যখন তাপ পড়ে, তখন চোখ খুলে যায়। ততক্ষণে ফজরের সময় চলে গেছে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে বললেন, তুমি না আমাদেরকে জাগিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলে? হযরত বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু ক্ষমা চেয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘুমিয়ে পড়েছি। নবীজি সঙ্গে সঙ্গে কাফেলাকে সফর করতে আদেশ করেন। সূর্য খানিকটা উপরে উঠে যাওয়ার পর কাফেলাকে থামতে বলেন। বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আদেশ দেন—সকলকে নামাযের ঘোষণা দিতে। তারপর তিনি জামাতের সঙ্গে ফজর নামায আদায় করেন। অতঃপর বলেন, কোনো অপারগতার কারণে যদি নামায কাযা হয়ে যায়, তা হলে মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আদায় করে নেবে।

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪ : ১৯২-১৯৩।

খায়বারের সম্পদ বণ্টন

যারা এর আগে হুদায়বিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন, অংশগ্রহণ করেছিলেন বায়আতুর রিদওয়ানে—খায়বারের সম্পদ তাদের মাঝেই বণ্টন করা হয়—চাই খায়বার যুদ্ধে সে অংশগ্রহণ করুক আর না করুক। কোনো অপারগতায় কেউ খায়বারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারলেও বৃক্ষের ছায়ায় শপথগ্রহণকারী সকলকে খায়বারের সম্পদে অংশ দান করা হয়। অবশ্য একমাত্র জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হাযাম রাযিয়াল্লাহু আনহু ব্যতীত আর কেউই খায়বার যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন না। শপথে অংশগ্রহণকারী সকলেই খায়বারেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহুকেও খায়বারের সম্পদে অংশগ্রহণকারীদের সমপরিমাণ সম্পদ দেওয়া হয়েছিল।

আবিসিনিয়ার মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন

নবুওয়তের একেবারে সূচনাকালে মুসলমানগণ আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। তাদের মধ্যে কিছু লোক একটি ভুল সংবাদের ভিত্তিতে মক্কায় ফিরে এসেছিলেন। অবশ্য অধিকাংশ মুসলমান রয়ে গিয়েছিলেন আবিসিনিয়াতেই। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর ইবনে উমাইয়া যামরীকে আবিসিনিয়ায় পাঠিয়ে দেন সকল মুহাজিরকে মদীনায় নিয়ে আসার জন্যে। আমর ইবনে উমাইয়া এ সংবাদ নিয়ে আবিসিনিয়া পৌঁছার পর বাদশাহ নাজ্জাশী দু'টি নৌকার ব্যবস্থা করেন। তারপর সকল মুহাজিরকে ওই নৌকায় তুলে দিয়ে মদীনায় পাঠিয়ে দেন। মুহাজিরদের এই কাফেলা আবিসিনিয়া থেকে ঠিক তখন এসে ওঠেন, যখন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার জয় করেছেন মাত্র। এই কাফেলায় জাফর ইবনে আবু তালেব এবং আবু মুসা আশআরীসহ ষোলো জন সদস্য ছিলেন। তারা যখন নবীজির খেদমতে এসে হাজির হন এবং নবীজি যখন তাদেরকে দেখতে পান, তখন অসামান্য খুশি হন। খুশি হয়ে বলেন, আমি ঠিক বলতে পারছি না, খায়বারের বিজয়ে আমি বেশি আনন্দিত, না আবিসিনিয়ার মুহাজিরদের আগমনে বেশি আনন্দিত![১]

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৩ : ৪১৭।

উমরাতুল কাযা

হিজরী সপ্তম সালের শুরুর দিকে খায়বার জয় হয়। খায়বার থেকে ফিরে এসে নবীজি আট-নয় মাস মদীনা মুনাওওয়ারাতেই অবস্থান করেন। এই সময় তিনি বেশ ক'টি দল বিভিন্ন দিকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু কোথাও কোনো যুদ্ধ হয়নি। জিলকদ মাস সমাগত হলে নবীজি উমরার ইচ্ছা করেন। গত বছর যখন তিনি উমরার উদ্দেশ্যে মক্কা সফর করেছিলেন, মক্কাবাসী তখন তাকে বাধা দিয়েছিল। ফলে তাঁকে উমরা না করেই মদীনায় ফিরে আসতে হয়েছিল। যেহেতু উমরার নিয়ত করা সত্ত্বেও উমরা না করেই ফিরে আসতে হয়েছিল এবং সন্ধিমাফিক পরবর্তী বছর উমরার সফর করেছিলেন, তাই আমাদের ইতিহাসগ্রন্থগুলোতে এটাকে উমরাতুল কাযা বলে উল্লেখ করা হয়। এই সফরের সময় নবীজি মদীনার শাসক নিযুক্ত করেন ওয়াইফ ইবনুল আজবাতকে। গত বছর যারা উমরার সফরে ছিলেন এবং হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় উপস্থিত ছিলেন, এবারের সফরে তারা সকলেই শামিল ছিলেন। মক্কাবাসী যখন জানতে পারে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরা করতে আসছেন, তখন তারা পুরো মক্কা খালি করে দেয়। এদিকে মক্কাবাসীকে বলা হয়েছিল—মুসলমানগণ মক্কা থেকে মদীনায় ফিরে গিয়ে দুর্বল ও কমজোর হয়ে পড়েছে। অভাব দারিদ্র্য ও কষ্ট তাদেরকে কাবু করে ফেলেছে। ফলে তাদের মধ্যে আগের মতো শক্তি এখন আর নেই। এই ঘোষণার ফলে মক্কাবাসীর মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি হয়—আসলেই কি মুসলমানগণ দুর্বল ও কাবু হয়ে পড়েছে? তাই তারা মুসলমানদেরকে দেখার জন্যে ভেতরে ভেতরে উদগ্রীব হয়ে উঠে। বিপুল সংখ্যক মুশরিক দারুন নাদওয়ার কাছে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মক্কায় মুসলমানদের প্রবেশদৃশ্য দেখতে থাকে। মসজিদুল হারামে প্রবেশের সময় হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরামের চাদরখানা ডান বগল থেকে তুলে এনে বাম কাঁধের ওপর রেখে দেন। ডান কাঁধটি রেখে দেন সম্পূর্ণ খোলা। হেরেমে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম হাজরে আসওয়াদে চুমু খান। তারপর রামালের সঙ্গে তিনটি তাওয়াফ করেন। সাহাবায়ে কেরামও নবীজির সঙ্গে অনুরূপভাবে তাওয়াফ করেন। তখন সাহাবায়ে কেরাম মনে করেছেন—কুরাইশ মুসলমানদেরকে দুর্বল ভেবে তামাশা দেখতে এসেছে বলেই সাময়িক উদ্দেশ্যে ওইভাবে তাওয়াফ করতে বলা হয়েছে। কিন্তু

পরের বছর যখন হজের সময় তাওয়াফে রামাল করা হয়, তখন সকলেই জানতে পারেন—বায়তুল্লাহ তাওয়াফের এটাও একটা অংশ। সাময়িক স্বার্থে এটা করা হয়নি। ইমাম বুখারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে লিখেছেন, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম যখন উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় আসেন, তখন মুশরিক-সম্প্রদায় পরস্পরে বলাবলি করছিল—আজকে যারা বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে আসছে, ইয়াসরিবের জ্বর তাদেরকে ভেঙে চুরমার করে ফেলেছে। তখন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বলেছিলেন, তিনটি তাওয়াফ রামালসহ করো। অন্য বর্ণনায় আরও স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বলেছেন—

ارملوا ليري المشركون قوتكم.

তোমরা তাওয়াফ করার সময় খানিকটা বীরত্বের সঙ্গে চলো—যেন মুশরিক-সম্প্রদায় তোমাদের শক্তি প্রত্যক্ষ করতে পারে।

উমরা উপলক্ষে নবীজি মক্কা মুকাররমায় তিন দিন অবস্থান করেছেন। কারণ, সন্ধিপত্রে এটাই উল্লেখ ছিল। চতুর্থ দিন সকালবেলা সুহাইল ইবনে আমর এবং হুয়াইতিব ইবনে আবদুল উয্যা আসে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আনসারগণকে নিয়ে বসা ছিলেন। নবীজির সামনে হুয়াইতিব ইবনে আবদুল উয্যা উঁচু স্বরে বলে, চুক্তি অনুযায়ী তিন দিন পার হয়ে গেছে। আপনারা এখনই আমাদের এলাকা ছেড়ে চলে যান। আমাদের এলাকা ছেড়ে চলে যান—কথাটা শোনামাত্র হযরত সাদ ইবনে উবাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর রক্ত টগবগিয়ে উঠে। তিনি কড়া ভাষায় জানিয়ে দেন—

لا ام لك ليس بارضك ولا بأرض ابائك والله لا نخرج.

তোমার মা নিপাত যাক। এটা তোমার ভূমি নয়। তোমার বাপ-দাদাদের ভূমি নয়। খোদার কসম, আমরা বের হব না।

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুহাইল এবং হুয়াইতিবকে কাছে ডেকে বললেন—আমি এখানে বিয়ে করেছি। আমি চাচ্ছি এখানে ওলিমাও করব। তোমরাও ওলিমায় আমাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ কোরো। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মায়মুনা বিনতুল হারিস আল আমেরিয়্যাকে বিয়ে করেছিলেন। হযরত মায়মুনা ছিলেন হযরত আব্বাসের স্ত্রী উম্মুল ফযলের বোন। মুশরিকরা বলল, আমরা আপনার দাওয়াত কবুল করছি না। সন্ধি অনুযায়ী তিনদিন পার হয়ে গেছে। আপনারা মক্কা থেকে চলে যান।

নবীজি হযরত আবু রাফেকে ডেকে বললেন, সকল সফরসঙ্গীকে প্রস্তুত হতে বলো। তারপর নবীজি উটের ওপর উঠে বসেন। নবীজির সঙ্গে সাহাবায়ে কেরামও চলতে শুরু করেন। মক্কা থেকে বের হয়ে সারিফ নামক স্থানে এসে অবতরণ করেন। নবীজি হযরত আবু রাফেকে আগেই দায়িত্ব দিয়ে রেখেছিলেন—হযরত মায়মুনাকে সঙ্গে নিয়ে আসতে। আবু রাফে হযরত মায়মুনাকে সারিফে নিয়ে আসেন। হযরত মায়মুনা মুশরিকদের পক্ষ থেকে অনেক কষ্টের মুখোমুখি হয়েছেন। সারিফ নামক স্থানে এসে নবীজির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। নবীজির হেরেমে প্রবেশ করেন। অলঙ্কৃত হন উম্মুল মুমিনীনের মতো শ্রেষ্ঠ উপাধিতে। তারপর কাফেলা আবার চলতে শুরু করে মদীনার উদ্দেশে। ধীরে ধীরে কাফেলা মদীনায় পৌঁছে যায়।

কাফেলা যখন মক্কা থেকে রওনা হয়, তখন হযরত হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কন্যা 'চাচা, চাচা!' বলে ছুটে আসে। হযরত হামযা উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেছেন। তার কন্যা তখনো মক্কায়। মুশরিকদের পরিবেশেই ছিল। খান্দানের লোকদেরকে দেখে আপ্লুত হয়ে পড়ে। 'চাচা চাচা' বলে ছুটে আসে। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরেন। তাকে নিয়ে মদীনায় আসেন। তারপর সে মদীনায়ই লালিত-পালিত হয়। মদীনায় আসার পর তার তত্ত্বাবধায়ক কে হবে—এই নিয়ে শুরু হয় প্রতিযোগিতা। তিনজন দাবিদার দাঁড়িয়ে যান—হযরত আলী, হযরত জাফর, হযরত যায়েদ। তারা প্রত্যেকেই চাচ্ছিলেন নিজের তত্ত্বাবধানে রেখে বড় করতে। বিষয়টি অবশেষে নবীজির দরবারে উত্থাপিত হয়। প্রত্যেকেই নিজের পক্ষে যুক্তি পেশ করেন। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু

আনহু বলেন, সবার আগে তার হাত ধরেছি আমি, সুতরাং আমিই তাকে লালনপালন করব, তা ছাড়া সে আমার চাচার কন্যা; আমিই তার অধিক হকদার। হযরত জাফর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একে আমার তত্ত্বাবধানে দেওয়া হোক, কারণ, সে আমার চাচার কন্যা এবং আমার স্ত্রী তার খালা। হযরত যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সে আমার দীনি ভাইয়ের কন্যা, তাই আমিই তাকে লালন-পালন করব। নবীজি তাকে তার খালার হাতে তুলে দেন এবং বলেন, মায়ের পরে লালন-পালনের খালাই অধিক হকদার। তারপর সে হযরত জাফর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘরে লালিত-পালিত হয়। যখন বিয়ের বয়স হয়, তখন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামার সাবেক স্বামী আবু সালামার পুত্র সালামার কাছে তাকে বিয়ে দেন। এবং বলেন—

هل جزيت ابا سلمة؟

আমি কি আবু সালামার হক আদায় করেছি?

হযরত আবু সালামার ইন্তেকালের পর তার স্ত্রী উম্মে সালামাকে নবীজি বিয়ে করেছিলেন। তাই তিনি তার খান্দানের আরেক কন্যাকে আবু সালামার পুত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে উত্তম প্রতিদানে সম্মানিত করেন।[১]

মক্কা বিজয়

যখন হিজরতের অষ্টম বছর শুরু হয়, তখন মক্কার মুশরিকদের শক্তি দুর্বল হতে শুরু করে। আর বৃদ্ধি পেতে থাকে মুসলমানদের শক্তি। এই সময়ে মক্কার কয়েকজন তীক্ষ্ণ মেধাবী অভিজ্ঞ যোদ্ধা এবং বীরতম সাহসীর অন্তরে নতুন বিপ্লবের দাপাদাপি শুরু হয়। তাদের হৃদয় ও মস্তিষ্কের আকাশে রেসালাতের সূর্য আলো ছড়াতে শুরু করে। তারা তাদের ঘৃণ্যতম অতীতকে পদদলিত করে নূরের জগতে পা রাখতে যায়। এই ভাগ্যবানদের তালিকায় রয়েছেন—আমর ইবনুল আস, খালেদ ইবনে ওলীদ এবং উসমান ইবনে তালহা। আমর ইবনুল আস আর খালেদ ইবনে ওলীদ কীভাবে মুসলমান হলেন, তার গল্প তারা সবিস্তারে নিজেরাই শুনিয়েছেন।

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪ : ২৩৫।

তাই আমি তাদেরই ভাষায় তাদের সেই ঈমানদীপ্ত কাহিনী এখানে তুলে ধরছি।

আমর ইবনুল আসের গল্প

আমর ইবনুল আস বলেন, আমি ছিলাম ইসলামের ইস্পাতকঠিন শত্রু। বদর-প্রান্তরে মুশরিকদের সঙ্গে ছিলাম। সেখানে বেঁচে গেছি। তারপর ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি মুশরিকদের পক্ষ হয়ে। বেঁচে গেছি সেখানেও। তারপর তাদেরই সঙ্গে খন্দকের যুদ্ধে গিয়েছি। সেখানেও মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়েছি। এই তিনটি লড়াইয়েই হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে চেষ্টায় সামান্যতম ত্রুটি করিনি। কিন্তু ধারাবাহিক পরাজয় ও অবিশ্বাস্য পতনের পর আমি মনে মনে ভাবতে শুরু করি—আসলে বিষয়টি কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে? আমার মন তখন বলল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা কুরাইশদের মূলোৎপাটন করে ছাড়বেন এবং মক্কা জয় করে নেবেন। আমি তখন আমার মন এদিক থেকে আলাদা করে নিই। পূর্ণরূপে নিবিষ্ট হই ব্যবসা-বাণিজ্যে। দেখতে দেখতে হুদায়বিয়ার ঘটনা সমুপস্থিত হলো। সন্ধিচুক্তি লিপিবদ্ধ হলো। উভয় পক্ষ একমত হলো—আগামী বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় আসবেন। তিন দিন অবস্থান করবেন। মনে মনে ভাবতে লাগলাম—এটা আমি কীভাবে বরদাশত করব? আমাকে মক্কা থেকে বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। কারণ, আমার অন্তরে নবীজি এবং ইসলামের বিরুদ্ধে এতটাই শত্রুতা ছিল—আমি মনে মনে শপথ করে রেখেছিলাম—যদি কুরাইশের সকল মানুষ ইসলাম কবুল করে নেয়, তবুও আমি মুসলমান হব না।

হুদায়বিয়ায় সন্ধিপত্র লিখিত হওয়ার পর মক্কায় ফিরে এলাম। আমি আমার কাছের লোকদেরকে সমবেত করে বললাম, আমার সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা? তারা সকলে একবাক্যে বলল, আপনার মত সদা বাস্তবসম্মত হয়। আপনি আমাদের মধ্যে একজন সঠিক মতের অধিকারী। আপনার মত ও চিন্তার প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে। আমি তখন তাদেরকে বললাম, তোমাদের ভালো করেই জানা আছে, আমি কোনো

গরিস্থিতিতেই ইসলামের বিজয়কে মেনে নিতে প্রস্তুত নই। তাই আমি একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি—আমরা আবিসিনিয়া চলে যাব। সেখানেই বসবাস করব। লক্ষ রাখব, মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সত্যি সত্যি মক্কা জয় করে নেন কিনা। যদি মক্কা জয় করে নেন, তা হলে আবিসিনিয়ায়ই থেকে যাব। তখন আমাদেরকে মুহাম্মাদের [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হাতে বন্দি হয়ে অপমানিত হতে হবে না। আর যদি কুরাইশ বিজয়ীরূপে টিকে থাকে, তা হলে আমরা মক্কায় ফিরে আসব। কারণ, আমরা তো কুরাইশেরই সন্তান। আমার বন্ধুরা বলল, এটা চমৎকার চিন্তা। আমি বললাম, তা হলে তোমরা সফরের প্রস্তুতি নাও এবং বাদশাহকে উপহার দেওয়ার জন্যে কিছু চামড়া সংগ্রহ করো। প্রস্তুতি গ্রহণ করার পর আমরা আবিসিনিয়া সফর করি। বাদশাহ নাজ্জাশীর কাছে পৌঁছে যাই। আমরা সেখানে পৌঁছে দেখি, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি আমর ইবনে উমাইয়া যামরী বাদশাহর দরবারে উপস্থিত। আবিসিনিয়ার মুহাজিরদেরকে নিতে এসেছে। সে বাদশাহর দরবারে এসে বাদশাহর হাতে নবীজির পত্র তুলে দেয়। তারপর চলে যায়। আমি তখন আমার সঙ্গীদেরকে বললাম, এ তো আমাদের শত্রু আমর ইবনে উমাইয়া। আমি যখন নাজ্জাশীর সঙ্গে দেখা করব, তখন অনুরোধ করব, তিনি যেন ওকে আমাদের হাতে তুলে দেন। যদি হাতে পাই, তা হলে তার গর্দান উড়িয়ে দেব। যদি আমি এটা করতে পারি, তা হলে কুরাইশরা শুনে খুবই খুশি হবে।

আমি নাজ্জাশীর দরবারে গিয়ে উঠি। তাকে পূর্বের মতো সেজদা করি। তিনিও আমাকে স্বাগত জানান। এবং জিজ্ঞেস করেন—তোমাদের দেশ থেকে কিছু উপহার এনেছ কি? বললাম, হুযুরের জন্যে বিপুল পরিমাণে চামড়া নিয়ে এসেছি। তারপর আমি চামড়াগুলো খেদমতে পেশ করি। আমাদের উপহার তিনি খুবই পছন্দ করেন। দরবারে উপস্থিত রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গকে সেখান থেকে কিছু চামড়া ভাগ করে দেন। বাকিগুলো মুহাফেজখানায় রেখে দেওয়ার জন্যে পাঠিয়ে দেন। যখন লক্ষ করলাম—নাজ্জাশী আমাদের প্রতি খুবই খুশি তখন আমি আরজ করলাম—হুযুর, এইমাত্র এক ব্যক্তিকে আপনার দরবার থেকে বের হয়ে

যেতে দেখলাম। সে আমাদের শত্রুর পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হয়ে এসেছে। এই শত্রু আমাদেরকে বরবাদ করে ফেলেছে। আমাদের নেতৃবৃন্দকে হত্যা করেছে। আপনি যদি এই প্রতিনিধিকে আমাদের হাতে তুলে দেন, তা হলে খুবই অনুগ্রহ হবে। আমরা তাকে হত্যা করে আমাদের প্রতিশোধযন্ত্রণা কিছুটা হলেও হালকা করতে পারব। আমার কথা শোনামাত্র বাদশাহ নাজ্জাশী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। সঙ্গে সঙ্গে মুষ্ঠিবদ্ধ হাতে আমার নাকের ওপর প্রচণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দেন। আমার তখন মনে হচ্ছিল, আমার নাকটি বুঝি আমার চেহারা থেকে পড়ে গেছে। তারপর সজোরে আমার কণ্ঠনালি চেপে ধরেন। আমার শ্বাসপ্রশ্বাস আটকে যায়। আমার মুখ দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে। রক্তে আমার পুরো পোশাক ভিজে যায়। আমি কী ভেবেছিলাম আর কী হলো? আমার অপমানের কোনো অন্ত রইল না। মন চাচ্ছিল—যদি পায়ের নিচের মাটি সরে যেত আর আমি মাটির নিচে হারিয়ে যেতে পারতাম! অনেক কষ্টে আমি তাকে বললাম, হুযুর মনে হয় আমার কথা অপছন্দ করেছেন। যদি এটা জানতাম, তা হলে এই অনুরোধ আমি কখনো করতাম না। নাজ্জাশী তখন আমাকে বললেন, আমর, সেই মহান মর্যাদার অধিকারী মানবের প্রতিনিধিকে তুমি আমার কাছ থেকে তুলে নিতে চাচ্ছ—যাঁর কাছে সেই মহান ফেরেশতার আগমন হয়, যে ফেরেশতা কখনো হযরত মুসা এবং হযরত ঈসার কাছে আগমন করত। তাঁর প্রতিনিধিকে তুমি আমার হাত থেকে নিয়ে হত্যা করতে চাও—এটা কী করে সম্ভব?

নাজ্জাশীর এই কথায় আমার হৃদয়জগত মুহূর্তেই বদলে যায়। আমি মনে মনে বলতে থাকি—হক ও সত্যের বাণী আরব আজম সকলেই জানে। সকলেই চেনে অথচ আমি তার বিরোধী। সকলের কাছে যে সত্য অবিসংবাদিত, আমি তার দুশমন। এটা কত বড় বোকামি এবং কত বড় নির্বুদ্ধিতা। আমি তখন নাজ্জাশীকে বললাম, হুযুর কি সাক্ষ্য দিচ্ছেন—তিনি আল্লাহর সত্য রাসূল? নাজ্জাশী বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি আল্লাহর সত্য রাসূল। এই সাক্ষ্য আমি আল্লাহর কাছেও দেব। আমর, তুমি আমার কথা শোনো এবং এই মহান মানবের অনুসারী হও। আমি কসম খেয়ে বলছি, তিনি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছেন। মুসা

যেভাবে ফেরাউন ও তার বাহিনীর ওপর বিজয়ী হয়েছিলেন, এই মহামানবও তাঁর বিরোধীদের ওপর একদিন বিজয়ী হবেনই। আমি তখন নাজ্জাশীকে বললাম, আপনি চাইলে তাঁর পক্ষ থেকে আমাকে ইসলামের শপথ করাতে পারেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই আমি তোমাকে তাঁর পক্ষ থেকে শপথ পড়াতে পারি। তিনি হাত প্রসারিত করলেন। আমি তার হাতে হাত রেখে ইসলামের বায়আত গ্রহণ করলাম। তারপর তিনি একটি রেকাব আনিয়ে আমার রক্ত পরিষ্কার করালেন। আমাকে নতুন পোশাক দিলেন। আমি সেই পোশাক পরিধান করলাম। রক্তে আমার পোশাক জবজবে হয়ে উঠেছিল। সেগুলো একদিকে ফেলে দিলেন। আমি সেখান থেকে বেরিয়ে আমার সঙ্গীদের কাছে যাই। তারা আমার গায়ে বাদশাহর দেওয়া পোশাক দেখে খুবই আনন্দিত হয়। কাছে যেতেই জানতে চায়—তুমি আমর ইবনে উমাইয়াকে চাইতে গিয়েছিলে। এ বিষয়ে বাদশাহর সঙ্গে কী কথা হয়েছে? আমি বললাম, প্রথম সাক্ষাতেই কোনো অনুরোধ করা সমীচীন নয়। আবার যখন যাব, তখন বলব। আমার বন্ধুরা বলল, তোমার চিন্তাই যথার্থ। তারপর আমি আমার সঙ্গীদেরকে রেখে এমনভাবে উঠে যাই, যেন আশু কোনো প্রয়োজনের কথা আমার মনে পড়েছে। আমি সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা সমুদ্রের তীরে চলে যাই—যেখানে সচরাচর নৌকা পাওয়া যায়। গিয়ে একটি নৌকায় উঠি। নির্দিষ্ট একটি জায়গায় গিয়ে অবতরণ করি। আমার কাছে পয়সা ছিল। সেখানে গিয়ে একটি উট খরিদ করি। তারপর মদীনার উদ্দেশে সফর শুরু করি। চলতে চলতে মাররুয যাহরানে পৌঁছে যাই। সেখান থেকে যখন হুদাহ নামক জায়গায় পৌঁছাই, তখন লক্ষ করি, এক ব্যক্তি সওয়ারির রশি ধরে দাঁড়িয়ে আছে। পাশেই তাঁবুর ভেতরও কেউ আছে। আমি ভালো করে লক্ষ করে দেখি—খালেদ ইবনুল ওলীদ। কাছে গিয়ে প্রশ্ন করি—কোথায় যাওয়ার ইচ্ছে? বলল, মুহাম্মাদের [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কাছে যাচ্ছি। আমরা দুইজন মুসলমান হওয়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছি। জীবনে এখন আর কোনো স্বাদ অবশিষ্ট নেই। আমি বললাম, আমিও তো মদীনার উদ্দেশে বেরিয়েছি। তাঁবু থেকে উসমান ইবনে তালহা বেরিয়ে এল এবং আমাকে মোবারকবাদ জানাল।

আমরা তিনজন একসঙ্গে মদীনায় আসি। বীরে ওয়াইনায় আসার পর এক ব্যক্তিকে শুনতে পাই, কাকে যেন 'ইয়া রাবাহ, ইয়া রাবাহ!' বলে ডাকছে। তার এই উচ্চারণকে আমাদের জন্যে শুভ ইঙ্গিত বলে ধরে নিই—ইনশাআল্লাহ, আমরা ইসলাম কবুল করে লাভবান হব। লোকটি আমাদেরকে দেখল। সম্ভবত চিনেও ফেলল। খুব দ্রুত মসজিদে চলে গেল। হয়তোবা আমাদের আগমনসংবাদ জানাতেই গিয়েছিল। আমরা উট বসালাম। কাপড় বদলালাম। তখন আসর নামাযের আজান হচ্ছিল। আমরা যখন নবীজির সামনে হাজির হই, তখন আনন্দে তাঁর চেহারা চিকচিক করছিল। উপস্থিত সকল মুসলমানকেই বেশ আনন্দিত মনে হচ্ছিল। খালেদ ইবনুল ওলীদ এগিয়ে গেল। নবীজির হাতে বায়আত গ্রহণ করল। তারপর উসমান ইবনে তালহা এগিয়ে গিয়ে শপথ নিল। তাদের পর আমি সামনে গিয়ে বসে পড়লাম। অতীত কৃতকর্মের কথা স্মরণ করে আমি দৃষ্টি তুলতে পারছিলাম না। নবীজি আমাকেও বায়আত করলেন।[১]

খালেদ ইবনুল ওলীদের আত্মকাহিনী

খালেদ ইবনুল ওলীদ কীভাবে মুসলমান হলেন, সেই ঘটনা আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু তার মন ও বিশ্বাসে কখন কীভাবে এই বিশ্বাস সূচিত হলো, সে কথাও তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন।

তার ভাষায়—হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হুদায়বিয়ায় আসছিলেন, আমি তখন মুশরিকদের বাহিনীসহ উসফান নামক স্থানে তার সঙ্গে মিলিত হই। তিনি তার সঙ্গীদেরকে জোহর নামায পড়ালেন। আমরা সেখানেই ছিলাম। মনে মনে ভাবলাম, নামায চলা অবস্থায়ই হামলা করে বসি, কিন্তু কেন যেন সাহস হলো না। আমরা দাঁড়িয়েই রইলাম। হয়তো তিনি আমাদের কথা জানতেন না কিংবা আমাদের মনের অবস্থা সম্পর্কে ছিলেন অজ্ঞাত। যখন আসর নামাযের সময় হলো, তখন তিনি সালাতুল খাওফ আদায় করলেন। অর্ধেক মানুষ নামাযে শরিক হলো আর অর্ধেক দাঁড়িয়ে রইল পাহারায়। আমার

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪ : ২৩৩৬-৩৮; ইবনুল আসীর, *আল-কামিল ফিত তারীখ*, ১ : ৬০৪।

তখন মনে হলো, আল্লাহর রাসূল আল্লাহর হেফাজতে রয়েছেন। তাঁর ওপর হামলা করে কেউ সফল হতে পারবে না। আমরা সেখান থেকে চলে এলাম।

তারপর হুদায়বিয়ায় সন্ধি হলো। তিনিও মদীনায় চলে গেলেন। আমি তখন মনে মনে ভাবতে লাগলাম—এখন আর কী বাকি রইল? এখন তিনি মক্কায় আসবেন। অবস্থান করবেন। আমরা তাঁর কিছুই করতে পারব না। তখন বারবার মন বলত—নাহ, মক্কা ছেড়ে কোথাও চলে যাই। বার কয়েক মনে হলো, আবিসিনিয়া চলে যাই। কিন্তু সেখানে যেতে বাধা হলো, সেখানকার বাদশাহ তো নিজেই ইসলামধর্ম বরণ করে নিয়েছেন। মক্কার অনেক মুসলমান সেখানে স্বস্তিতে জীবনযাপন করছেন। সেখানে যাওয়াটা ঠিক হবে না। তারপর মনে হলো, ইহুদি কিংবা খ্রিষ্টান হয়ে যাই অথবা ইয়েমেনে চলে যাই। এই সিদ্ধান্তহীন অস্থিরতায় পুরো এক বছর কেটে যায়। পরের বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরাতুল কাযার উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেন। আমি তখন মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়ি। নবীজি যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, আমি তখন মক্কায় ছিলাম না। আমার ভাই ওলীদ ইবনুল ওলীদ ছিল মুসলমান। সেও নবীজির সঙ্গে উমরা করতে এসেছিল। আমাকে খুঁজেছে। পায়নি। তারপর আমাকে একটি চিঠি দিয়ে গেছে। সে তার চিঠিতে লিখেছে—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আমি খুবই বিস্মিত—আপনার মতো বুদ্ধিমান এখনো ইসলাম থেকে দূরে সরে আছেন! হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। জানতে চাচ্ছিলেন, খালেদ কোথায়? আমি বলেছি, আল্লাহ তাআলা খুব শীঘ্রই তাকে নিয়ে আসবেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, খালেদের মতো মেধাবী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি এখনো ইসলাম সম্পর্কে নাওয়াকেফ—এটা খুবই তাজ্জবের কথা। আহ, যদি তার এই চেষ্টা-সাধনা মুসলমানদের পক্ষে হতো, তা হলে তার জন্যে কত ভালো হতো! আমরাও খালেদকে অন্যের ওপর প্রাধান্য দিতাম। শ্রদ্ধেয় ভাই, মনে করুন, আপনি খুবই চমৎকার একটা সুযোগ হাতছাড়া করেছেন।

খালেদ ইবনুল ওলীদ বলেন, আমি আমার ভাইয়ের পত্রটি যখন হাতে পাই, তখন মনের ভেতর স্বপ্ন জেগে উঠে। ইসলামের প্রতি মনের মধ্যে আগ্রহ অনুভব করি। বিশেষ করে নবীজি নাম নিয়ে আমার কথা জিজ্ঞেস করেছেন—এটা ভেবে আমি খুবই আনন্দিত হই। এরই মধ্যে একদিন স্বপ্নে দেখলাম—আমি একটি সংকীর্ণ ও দুর্ভিক্ষকবলিত এলাকায় আছি। তারপর সেখান থেকে আমি ছুটে পালিয়ে একটি প্রশস্ত সবুজ সজীব অঞ্চলে গিয়ে পৌছাই। ঘুম থেকে ওঠার পর আমার মনে হতে থাকে—স্বপ্নটি নিশ্চয় তাৎপর্যপূর্ণ। যখন মদীনায় আসি, আবু বকরকে আমার স্বপ্নের কথাটা বলি। তিনি বললেন, এর ব্যাখ্যা হলো, তুমি কুফুর ও শিরকের সংকীর্ণ ও দুর্ভিক্ষকবলিত এলাকা থেকে বেরিয়ে ইসলামের সবুজ শ্যামল উদার এলাকায় এসে উঠবে।

যাই হোক, আমি আমার বন্ধুদের কয়েকজনের সঙ্গে ইসলাম সম্পর্কে পরামর্শ করি। কিন্তু তাদের প্রত্যেকের অন্তরই ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতায় ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। কেউ আমাকে সমর্থন করেনি। অবশেষে আমি উসমান ইবনে তালহার কাছে গেলাম। উসমান ছিল আমার পুরোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাকে আমার মনের কথাটা বললাম। উসমান আমার মতকে সমর্থন দিয়ে বলল, আসলেই আমাদের ইসলাম কবুল করে নেওয়া উচিত। আমরা উভয়ে সফরের জন্যে প্রস্তুত হতে থাকি। উসমান আমাকে বলল, মক্কা থেকে আমরা উভয়ই আলাদা আলাদা বের হব। বাজিজ নামক স্থানে গিয়ে অপেক্ষা করব। অপরজন আসার পর একসঙ্গে সফর করব। তারপর আমরা একসঙ্গে সফর করি। হুদ্দাহ নামক জায়গায় এসে আমর ইবনুল আসের সঙ্গে দেখা হয়। তারপর আমরা তিনজন একসঙ্গে মদীনায় গিয়ে ইসলাম কবুল করি।[১]

মোতার যুদ্ধ

সিরিয়ার একটি এলাকার নাম মোতা। নবীজি জানতে পারেন, সেখানে বিশাল বাহিনীর বিশাল সৈন্যসমাহার হতে যাচ্ছে। বলা হচ্ছে, তাদের

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪ : ২৩৫; ইবনুল আসীর ,*আল-কামিল ফিত তারীখ*, ১ : ৬০৪।

সংখ্যা প্রায় দুই লাখ। সংবাদটি ছিল চরম ভীতিকর ও সংশয়জনক। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অষ্টম হিজরীর জুমাদাল উলায় তিন হাজার মুসলমানের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী এদের মোকাবেলায় প্রেরণ করেন। বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করেন হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে। এও বলে দেন, যদি যায়েদ শাহাদাত বরণ করে, তা হলে বাহিনীর আমীর হবেন জাফর ইবনে আবু তালেব। জাফর যদি শহীদ হয়ে যান, তা হলে আমীর হবেন আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা। যদি আবদুল্লাহও শহীদ হয়ে যান, তা হলে মুসলমানগণ যাকে খুশি আমীর নির্বাচন করে নেবেন।

এই বাহিনী মদীনা থেকে বেরিয়ে সিরিয়ায় উপনীত হয়। মাআন নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করে। সেখানে গিয়ে জানতে পারে—মাআরীব নামক স্থানে রোমসম্রাট হেরাক্লিয়াসের এক লাখ সৈন্যের বিশাল বাহিনী অবস্থান করছে। এই রোম-বাহিনীর বাইরে আরবে বসবাসরত বিভিন্ন কবিলার আরও বিপুল পরিমাণ সৈন্য তাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছে। ফলে, রোমক সৈন্যের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দুই লাখ। তিন হাজার মুসলমানকে দুই লাখ সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। কেউ কেউ পরামর্শ দিলো, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রতিনিধি পাঠিয়ে বিষয়টি অবগত করা হোক। শত্রুদের সৈন্য সংখ্যা জানিয়ে পরামর্শ চাওয়া হোক। হয়তো নবীজি আমাদের সাহায্যে আরও সৈন্য পাঠাবেন অথবা আমাদেরকেই যুদ্ধ করার আদেশ দেবেন। আমরা তখন তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন তাদের এই পরামর্শের কথা জানতে পারেন, তখন মুসলমানদেরকে সমবেত করে এক সাহসজাগানিয়া ভাষণ দেন। তিনি তার সেই আবেগদীপ্ত ভাষণে বলেন—তোমরা শত্রুদের বিশাল সংখ্যা দেখে ভয় পাচ্ছ? তোমাদের লক্ষ্য তো হলো, আল্লাহর পথে শাহাদাতবরণ। আমরা তো আমাদের শক্তির প্রদর্শনীর জন্যে যুদ্ধ করতে আসিনি। আল্লাহ তাআলা যে দীনের উসিলায় আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন, আমরা এসেছি সেই দীনের মাথা উঁচু করতে। আমরা আল্লাহর দীনের হেফাজত করব। হয়তো বিজয়ী হব অথবা শহীদ হব। উভয় পথেই আমাদের সফলতা। সুতরাং এরপর ভয় পাওয়ার কিংবা শঙ্কিত হওয়ার কী আছে?

মুসলমানগণ বলে উঠলেন, আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার কথাই ঠিক। আমাদের উচিত শত্রুর মোকাবেলা করা। তারপর মুসলিমবাহিনী নতুন আবেগে অগ্রসর হতে শুরু করে। বালকার সীমান্তে পৌঁছে মোতা নামক স্থানে মুসলমানগণ তাঁবু পাতেন। বালকায় মাশারিফ নামক স্থানে হেরাক্লিয়াসের বাহিনী এবং আরব-কবিলাগুলোর দুঃসাহসী সৈনিকরা অবস্থান করছিল। উভয় পক্ষ যুদ্ধের মোর্চা তৈরি করে। মুসলমান-বাহিনীর বনু উযরাহ সম্প্রদায়ের এক বীর কুতবা ইবনে কাতাদাহ রোমক বাহিনীর ডান ভাগের ওপর এবং উবাদা ইবনে মালিক বাম ভাগের ওপর আক্রমণ করেন। তারপর পুরো বাহিনী যুদ্ধের ময়দানে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েন। যুদ্ধের পতাকা ছিল যায়েদ ইবনে হারেসার হাতে। তিনি যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন। শত্রুপক্ষ তাকে শহীদ করে ফেলে। ছুটে এসে পতাকা তুলে নেন হযরত জাফর রাযিয়াল্লাহু আনহু। যুদ্ধ করতে করতে তিনিও শাহাদাত বরণ করেন। এবার ঝাণ্ডা তুলে নেন আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা। কিছুক্ষণ পর তিনিও শাহাদাত বরণ করেন। ঝাণ্ডা মাটিতে পড়ে যায়। সাবেত ইবনে আরকাম নামে এক মুসলমান এসে পতাকা তুলে নেন এবং চিৎকার করে বলেন—হে মুসলিম-বাহিনী, তোমরা তোমাদের আমীর নির্বাচন করে নাও। যোদ্ধাগণ বলে ওঠেন—তুমিই আমীর হয়ে যাও। তিনি বলেন, আমি আমীর হওয়ার যোগ্য নই। মুসলমানগণ তখন পরামর্শ করে খালেদ ইবনুল ওলীদকে আমীর নিযুক্ত করেন। হযরত খালেদ ইবনুল ওলীদ পতাকা হাতে তুলেই অনুমান করেন—এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আগে মুসলমানদের হেফাজত জরুরি। দুর্বলমনা শত্রুবাহিনীর হাত থেকে মুসলিম-ফৌজকে বাঁচিয়ে নেওয়াটাই এখন সবচেয়ে বড় কল্যাণের বিষয়। তিনি তখন কৌশলে শত্রুদের মোকাবেলা চালিয়ে যান এবং ধীরে ধীরে মুসলিমবাহিনীকে এক দিকে সরিয়ে আনেন। তারপর পুরো মুসলিম-বাহিনীকে এমনভাবে তুমুল লড়াইয়ের ভেতর থেকে বের করে নিয়ে আসেন—শত্রুপক্ষ টেরই পায়নি মুসলমানগণ গেল কোথায়?

মুসলিম-বাহিনীর প্রত্যাবর্তন

খালেদ ইবনুল ওলীদ কঠিন বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে মুসলমানদেরকে শত্রুর পাঞ্জা থেকে বের করে নিয়ে আসেন। মদীনার কাছাকাছি আসার পর হযরত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মদীনার বাসিন্দাগণ তাদের অভ্যর্থনা জানান। তখন মুসলমানদের কেউ কেউ আগত বাহিনীকে বলেছিল—তোমরা তো পালিয়ে এসেছ। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা শোনার পর বলেন—

ليسوا بالفرار لكنهم الكرار ان شاء الله.

এরা পলাতক নয়, বরং ঘুরে আক্রমণকারী।

এই যুদ্ধে তিনজন বিশিষ্ট মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা, হযরত জাফর ইবনে আবু তালেব এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন। তাদের বাইরে এই যুদ্ধে সাউদ ইবনুল আসওয়া ইবনে হারেসা আল আদাবী, ওয়াহাব ইবনে সাদ ইবনে আবু সারহ, উবাদা ইবনে কায়েস খাযরাযী, হারেস ইবনুন নাবান নাজ্জারী, সুরাকা ইবনে আমর ইবনে আতিয়্যাহ আল মাযানী, আবু কুলাইব ইবনে আমর ইবনে যায়েদ মাযানী, সাবের ইবনে আমর ইবনে যায়েদ মাযানী, আমর ইবনে সাদ ইবনুল হারেস এবং আমের ইবনে সাদ ইবনুল হারেসসহ মোট বারোজন মুসলমান এই যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। এটা খুবই আশ্চর্যের কথা—দুই লাখ সৈন্যের বিরুদ্ধে মাত্র তিন হাজার মুসলমান রুখে দাঁড়িয়েছেন। এই সামান্য সংখ্যা তো দুই লাখ বাহিনীর বিশাল ভিড়ে হারিয়ে যাওয়ার কথা। তাদের একজনও জীবিত ফিরে আসার কথা নয়। অথচ দুই লাখের এই বিশাল বাহিনী তাদের কিছুই করতে পারেনি। তারা হয়তো ভাবছিল, এরা লোহার তৈরি মানুষ। একশো জন মিলে একজনকে কাবু করতে পারছে না—এটা কি সত্যি বিস্ময়ের বিষয় নয়! এরচেয়ে বড় তাজ্জবের কথা হলো, মুসলমানগণ অসংখ্য শত্রুকে হত্যা করেছেন—এক খালেদ ইবনুল ওলীদের অবস্থা হলো এই—তার হাত শত্রুকে জমের ঘরে পাঠাতে নয়টি তরবারি ভেঙেছে। এতে সহজেই অনুমান করতে পারি, মুসলমানদের আঘাত কতটা তরঙ্গময় ছিল। তা ছাড়া শত্রু কী পরিমাণে মারা গেছে, তাও কল্পনা করা যায়। এর বিপরীতে মুসলমানদের মধ্যে শাহাদাত বরণ করেছেন মাত্র বারোজন।

মক্কা বিজয়

কুরাইশ সম্প্রদায় এবং হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে হুদায়বিয়ায় যে সন্ধি হয়েছিল, তাতে উল্লেখ ছিল—দশ বছর পর্যন্ত আমাদের মধ্যে কোনো যুদ্ধ হবে না। এই সন্ধি সম্পাদিত হওয়ার সতেরো কী আঠারো মাস পরেই কুরাইশ সন্ধি ভঙ্গ করে। সন্ধি সম্পাদনকালে হুদায়বিয়াতেই ঘোষণা করা হয়েছিল—আরবগোত্রগুলো উল্লিখিত দুই পক্ষের যে কোনো গোত্র যে কোনো পক্ষের সঙ্গে থাকতে পারবে। সেখানেই বনু খুযায়া গোত্র ঘোষণা করেছিল, আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থাকব। বনু বকর বলেছিল আমরা থাকব কুরাইশের সঙ্গে। এই দুই গোত্রের মাঝে প্রাচীনকাল থেকেই শত্রুতা ছিল। তাদের পরস্পরে ঝগড়া বিবাদ এবং খুন-খারাবি লেগেই থাকত।

মূর্খতার যুগে মালেক ইবনে আব্বাদ হাজরামী নামে এক ব্যক্তি ছিল আসওয়াদ ইবনে আরযাকের মিত্র। সে ছিল বনু বকরের লোক। মালেক একবার ব্যবসার উদ্দেশ্যে বের হয়। বনু খুযায়ার অঞ্চলে আসলে খুযায়ার লোকেরা তাকে হত্যা করে ফেলে। তার সম্পদ লুট করে নেয়। বনু বকর তখন খুযায়ার আরেক ব্যক্তিকে হাতে পেয়ে হত্যা করে ফেলে। এর জবাবে খুযায়াহ গোত্রের লোকেরা আসওয়াদ ইবনে আরযাক আদ দিলীকে খুন করে ফেলে। আসওয়াদ ছিল তার কবিলার একজন সম্মানিত এবং বরিত ব্যক্তি। এইসব ঘটনা ইসলাম-পূর্বকালের। তারপর যখন ইসলামের আগমন ঘটে, তখন সকলের মনোযোগ নিবিষ্ট হয় ইসলামের দিকে। সকলে একজোট হয়ে ইসলামকে রুখে দাঁড়ায়। কিছু দিনের জন্যে খুযায়াহ এবং বনু বকরের শত্রুতা আড়ালে চলে যায়। যখন হুদায়বিয়ায় যুদ্ধ বন্ধের চুক্তি হয়, খুযায়ার লোকেরা তখন মুসলমানদের সঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। বনু বকর শামিল হয়ে যায় কুরাইশদের পার্টিতে।

বনু বকর এই সন্ধিকে একটি সুযোগ মনে করে। তারপর তারা আসওয়াদ ইবনে আরযাকের প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভাবতে থাকে। তারা চিন্তা করে কুরাইশ আমাদের সঙ্গে থাকবে। খুযায়ার লোকদের পাশে দাঁড়াবার এখানে আর কেউ নেই। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো মদীনায় থাকেন। এইসব ভেবে নাওফাল ইবনে মুআবিয়া

দিলী বের হয়। সে তখন আসওয়াদ ইবনে আরযাক বনু বকরের যে শাখার সন্তান, সেই শাখার নেতা। আসওয়াদকে হত্যা করেছিল খুযায়ার লোকেরা। বনু বকরের লোকেরাও তখন নাওফালের সঙ্গে যায়। বনু খুযায়া তখন মাউল ওয়াতীর নামক স্থানে বসবাস করছিল। রাতের বেলা নাওফাল ইবনে মুআবিয়া এবং বনু বকরের লোকেরা মিলে হামলা করে বনু খুযায়ার এক ব্যক্তিকে হত্যা করে প্রতিশোধতৃষ্ণা নিবারণ করে। রুখে দাঁড়ায় বনু খুযায়া। তারপর উভয় পক্ষে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। বনু বকর তখন কুরাইশদের কাছে সাহায্য চায়। কুরাইশদের অনেক যুবক অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে আসে। বনু বকরের সঙ্গে মিলে তারা খুযায়ার ওপর হামলা করে এবং তাদের জীবনকে দুঃসহ করে তোলে। তারা তখন পালিয়ে হেরেমে চলে যায়। বনু বকর নাওফাল ইবনে মুআবিয়াকে বলে—এটা আমাদের মাবুদদের স্থান। এখানে যুদ্ধ করা উচিত নয়। নাওফাল বলে, আজ আমাদের কোনো মাবুদ নেই। আজ যদি আমাদের নিহতের প্রতিশোধ নিতে না পারি, তা হলে কোনোদিন প্রতিশোধ নিতে পারব না। খুযায়া গোত্রের লোকেরা তখন মক্কায় গিয়ে বুদাইল ইবনে ওয়ারকার ঘরে এবং কিছু লোক তার আজাদকৃত ক্রীতদাস রাফের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এভাবে বনু খুযায়া কোনোক্রমে জীবন রক্ষা করে।[১]

শপথ ভঙ্গ করে কুরাইশ

কুরাইশ বনু বকরকে সাহায্য করে। বনু খুযায়াকে হত্যা করে, অথচ বনু খুযায়ার বিরুদ্ধে বনু বকরকে সাহায্য করার কথা ছিল না। কারণ, বনু খুযায়া হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিত্রপক্ষ। তাদের মধ্যে দশ বছরের জন্যে যুদ্ধ বন্ধের চুক্তি হয়েছে। এভাবে বনু বকরকে সাহায্য করে কুরাইশ হুদায়বিয়ায় সম্পাদিত চুক্তিকে ভঙ্গ করে। এই চুক্তিভঙ্গই পরবর্তী সময় মক্কায় আক্রমণের কারণ হয়। মুসলমানগণ বাধ্য হয়ে কুরাইশদেরকে চুক্তিভঙ্গের শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। চুক্তি ভেঙে যখন কুরাইশ বনু বকরকে সাহায্য করে, তখন বনু খুযায়ার অধিকার দাঁড়ায়। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সাহায্য

---

১ ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, ১ : ৬০৯-৬১০।

চায়। আমর ইবনে সালেম আল খুযায়ী সাহায্য চাওয়ার জন্যে মদীনায় গিয়ে নবীজির দরবারে হাজির হয়। কুরাইশদের চুক্তিভঙ্গের ঘটনা নবীজিকে জানায়। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমর ইবনে সালেমকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—নিশ্চিন্ত থেকো। তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে। আকাশের এই মেঘও তোমাদের পক্ষে সুপারিশ করছে।[১]

বনু খুযায়ার দ্বিতীয় প্রতিনিধি

আমর ইবনুস সালেম খুযায়ীর পর বুদাইল ইবনে ওরকা মদীনায় আসে। তার ঘরেই বনু খুযায়ার লোকেরা আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। বুদাইল ইবনে ওরকার সঙ্গে বনু খুযায়ার কিছু লোকও ছিল। তারা গিয়ে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পুরো ঘটনা তুলে ধরে। কুরাইশ যে বনু বকরকে সাহায্য করেছে, সে কথাও উল্লেখ করে। তারা তাদের কাহিনী সবিস্তারে তুলে ধরবার পর মক্কায় ফিরে আসে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেন—আবু সুফিয়ানও শীঘ্রই মদীনায় আগমন করবেন। মদীনায় এসে হুদায়বিয়ার সন্ধি আরও পাকাপোক্ত করতে এবং তার সময়-সীমা বাড়াতে আবেদনও জানাবেন।[২]

বুদাইল ইবনে ওরকা মক্কায় ফেরার পথে আবু সুফিয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সেটা ছিল উসফান নামক স্থানে। আবু সুফিয়ানকে মক্কাবাসী পাঠিয়েছিল—হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে দেখা করে সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদ বাড়াবার উদ্দেশ্যে। দেখা হওয়ার পর আবু সুফিয়ান বুদাইল ইবনে ওরকাকে প্রশ্ন করেছিল, তোমরা কি মদীনা থেকে ফিরছ? বুদাইল তখন কৌশল করে বলেছিল, আমরা সমুদ্র-এলাকা থেকে আসছি। তারপর যখন বুদাইল ও তার সঙ্গীগণ মক্কার পথে নেমে পড়ে, তখন আবু সুফিয়ান তাদের উটের বিষ্ঠা ভেঙে তাতে খেজুরের বিচি দেখতে পায়। আর তখন বলে, খোদার কসম, এরা মদীনা থেকেই ফিরছে। নিশ্চয় এরা মুহাম্মাদের [রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কাছে পুরো ঘটনা পৌঁছে দিয়ে এসেছে। কথায় নিশ্চয় তারা আমাকে ফাঁকি দিয়েছে।

---

১ ইবনে সাদ, *আত তাবাকাত*, ২ : ১৩৪।

২ ইবনে সায়্যিদুন নাস, *উয়ুনুল আসার*, ২ : ২২৫।

আবু সুফিয়ান মদীনায়

আবু সুফিয়ান যথাসময়ে মদীনায় পৌঁছে যান। তারপর সোজা গিয়ে নবীজির পবিত্র হেরেমে স্বীয় কন্যা উম্মে হাবিবার ঘরে ওঠেন। উম্মে হাবিবা প্রিয় নবীজির জীবনসঙ্গিনীগণের অন্যতম। আবু সুফিয়ান উম্মে হাবিবার ঘরে গিয়ে যেই বিছানায় বসতে যাবেন, অমনি হযরত উম্মে হাবিবা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাড়াতাড়ি বিছানা গুটিয়ে ফেলেন। আবু সুফিয়ান তখন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেন, মেয়ে আমার, তুমি একি করছ? বিছানা গুটিয়ে ফেলছ কেন? হযরত উম্মে হাবিবা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, এটা হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা। আপনি একজন নাপাক মুশরিক। আমি চাই না আমার নবীর বিছানায় কোনো নাপাক ব্যক্তি আসন গ্রহণ করুক। আবু সুফিয়ান তখন বলেছেন, আমি তো দেখছি এখানে আসার পর তুমি অনেকটা বদলে গেছ। আবু সুফিয়ান সেখান থেকে বেরিয়ে এসে নবীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। নবীজি তার কোনো কথারই উত্তর দেননি। হতাশ হয়ে পড়েন আবু সুফিয়ান। ছুটে যান হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে। তাঁকে গিয়ে অনুরোধ করেন, আমি যে উদ্দেশ্যে এসেছি, সে বিষয়ে আপনি নবীজির সঙ্গে একটু কথা বলুন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন—আমি তোমার জন্যে কিছুই করতে পারব না। আবু সুফিয়ান তারপর ছুটে যান হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে। তাকেও সুপারিশ করতে অনুরোধ জানান। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, কী, আমি তোমাকে সাহায্য করব? আমার তো মনে চায় আমার হাতে একটি দোররা দেওয়া হোক। আর সে দোররা দিয়ে আমি তোমাকে খানিকটা সেবা করে নিই। আবু সুফিয়ান তারপর হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে যান। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বুঝিয়ে বলেন, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো বিষয়ে কৃতসংকল্প হলে সে বিষয়ে কারও সুপারিশ করবার সাহস কোথায়!

আবু সুফিয়ান মদীনা থেকে ব্যর্থকাম ফিরে আসেন। কুরাইশের লোকজন মক্কায় আসামাত্র তাকে ঘিরে ধরে। সফরের ফলাফল জানতে চায়। আবু সুফিয়ান তখন জানান—মুহাম্মাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম] আমার কোনো কথার উত্তর দেননি। আর সেখানকার কেউ আমার পক্ষে সুপারিশ করতেও রাজি হয়নি।[১]

চুক্তিভঙ্গের শাস্তিদানের প্রস্তুতি

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কৃতসংকল্প হন—কুরাইশকে চুক্তিভঙ্গের শাস্তি দেবেন। শুরু হয়ে যায় প্রস্তুতি। প্রস্তুতি দেখে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় কন্যা উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে ছুটে যান। গিয়ে দেখেন হযরত আয়েশা খুবই ব্যস্ত। জিজ্ঞেস করেন, আয়েশা, কীসের প্রস্তুতি চলছে? হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন। হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জানতে চান—কোথায় যাবেন বলে ইচ্ছে করেছেন? হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, সে কথা আমার জানা নেই। শুরুর দিকে বিষয়টি হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও স্পষ্ট করেননি। শুধু এইটুকু ঘোষণা করেছিলেন—সকলেই সফরের জন্যে প্রস্তুত হও। সফরের সময় একেবারে ঘনিয়ে আসার পর পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেন—আমরা মক্কায় যাব। সকলেই যথাযথভাবে প্রস্তুতি নাও।

একটি গোপন চিঠি

নবীজি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন—কুরাইশকে তার চুক্তিভঙ্গের শাস্তি দেবেন। সকলকে প্রস্তুত হওয়ার জন্যে ঘোষণা দিয়েছেন। সাধারণ মুসলমানগণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেছে। এই সময় হাতেব ইবনে আবু বালতা রাযিয়াল্লাহু আনহু মক্কার কুরাইশদের নামে একটি পত্র লেখেন। সেই পত্রে তিনি কুরাইশবাসীকে এই মর্মে সতর্ক করেন—হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শীঘ্রই মক্কা আক্রমণ করবেন। পত্রটি লেখার পর তিনি মুযাইনাহ কিংবা সারা নামক একজন নারীর হাতে দিয়ে বলেন—পত্রটি তুমি কুরাইশদের হাতে পৌঁছে দেবে। তোমাকে এর উপযুক্ত বিনিময়

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৪ : ১৪; ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, ১ : ৬১১-৬১২।

দেওয়া হবে। সেই মহিলা পত্র হাতে বেরিয়ে পড়ে। এদিকে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসে নবীজিকে এই মর্মে অবগত করেন— হাতেব মক্কাবাসীর উদ্দেশে একটি চিঠি পাঠিয়েছে। নবীজি সঙ্গে সঙ্গে হযরত আলী ইবনে আবু তালেব এবং হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ঘোড়ায় করে প্রেরণ করেন। বলে দেন, একজন মহিলা একটি পত্র নিয়ে মক্কায় যাচ্ছে। তার কাছ থেকে পত্রটি নিয়ে এসো। তারা উভয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে একটি বাগানের কাছে গিয়ে দেখেন উটে করে একজন নারী যাচ্ছে। তার কাছে গিয়ে তাকে উটের পিঠ থেকে নামতে আদেশ করেন। তারপর উটের হাওদা এবং তার সামানপত্র তল্লাশি করেন, কিন্তু কোথাও কোনো পত্র খুঁজে পাননি। সেই মহিলাও পরিষ্কার জানিয়ে দেয়, আমার কাছে কোনো পত্র নেই। তারা যখন কোনোভাবেই পত্র খুঁজে পাচ্ছিলেন না, তখন হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু ধমক দিয়ে বলেন, আল্লাহর রাসূলকে কেউ ভুল তথ্য দিতে পারে না। তোমার কাছে নিশ্চয় পত্র আছে। সোজা চিঠিটি বের করে দাও। নইলে আমরা তোমার পোশাক তল্লাশি করব। শরীরের সকল কাপড় খুলে নিয়ে তারপর পত্র বের করব। মহিলা ঘাবড়ে যায়। সে মাথার বেণি খুলে সেখান থেকে চিঠি বের করে দেয়। তারা উভয়ে পত্র হাতে মদীনায় আসে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাতেব ইবনে আবু বালতা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে পাঠান। জিজ্ঞেস করেন—তুমি এটা কী করেছ? তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি পূর্ণরূপে বিশ্বাসী। আমার ঈমান ও বিশ্বাসে কোনো খাদ নেই। আসলে আমার মাথায় এসেছিল, আমি মক্কার বাইরের মানুষ। মক্কার বাইরে থেকে এসে সেখানে নিবাসী হয়েছি। মক্কায় আমার কোনো জ্ঞাতিবংশ নেই। এদিকে মক্কায় আমার স্ত্রী-সন্তানেরা বসবাস করে। তাই আমি চাচ্ছিলাম, মক্কার কুরাইশদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, যাতে আমার স্ত্রী এবং সন্তানেরা নিরাপদে থাকতে পারে। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অনুমতি দিন, আমি এই মোনাফেকের গর্দান উড়িয়ে দেব। নবীজি বললেন, উমর, তুমি ভুলে গেছ, আল্লাহ তাআলা বদর-যোদ্ধাদের সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জেনে বুঝেই বলেছেন—

اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم.

তোমরা যা খুশি করো। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।

হাতেব একজন বদরযোদ্ধা। আল্লাহ তাআলা তার অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন।[১]

মক্কার পথে

মদীনায় যখন মুসলমানগণ প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন এবং সফরের সময় ঘনিয়ে আসে, তখন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু রাহাম মাকতুম ইবনে হুসাইন আল গিফারীকে মদীনার শাসক নিযুক্ত করেন। অষ্টম হিজরীর দশ রমযান মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশে যাত্রা করেন। তাঁর সঙ্গে তখন মুহাজির ও আনসার মিলে দশ হাজার সশস্ত্র মুসলমান। মদীনা থেকে বেরিয়ে এসে মাররুয যাহরান নামক স্থানে তাঁবু ফেলেন। মক্কার কর্মতৎপরতা সম্পর্কে তখনো কোনোই তথ্য ছিল না নবীজির হাতে। কোনো মাধ্যমে কোনো সংবাদও পাচ্ছিলেন না। কুরাইশ কী পদক্ষেপ নিচ্ছে, তাও অনুমান করতে পারছিলেন না। এদিকে আবু সুফিয়ান ইবনে হারব হাকীম ইবনে হিযাম এবং বুদাইল ইবনে ওরকা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বেরিয়ে আসে। আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব তখন সপরিবারে মক্কা থেকে মদীনার পথে যাত্রা করেছেন। নবীজি তার প্রতি সর্বদা সন্তুষ্ট ছিলেন। কারণ, তিনি নবীজির প্রতিটি প্রয়োজনীয় বাঁকে সঙ্গে থেকেছেন। সাহায্য করেছেন।

মুসলমান হলেন আবু সুফিয়ান

আবু সুফিয়ান এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া মক্কা থেকে বেরিয়ে মদীনার পথে চলতে থাকেন। পথে এক জায়গায় হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। হযরত উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়ার বোন। তিনি তার বোনের সঙ্গে গিয়ে দেখা করেন। নবীজির কাছে সুপারিশ করতে অনুরোধ জানান।

---

১ *বুখারী* ও *মুসলিমের* সূত্রে *মেশকাত* ৫৭৭; *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৪ : ১৬-১৭।

হযরত উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা নবীজির খেদমতে গিয়ে বললেন, আপনার চাচাতো ভাই এবং আমার ভাই আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। নবীজি বললেন, তাদের সঙ্গে দেখা করার কোনো প্রয়োজন নেই। তারা এ পর্যন্ত যা যা করেছে, সকলেই তা জানে। সব কথা আমিও ভুলিনি। নবীজির এই উত্তর শুনে তারাও হতাশ হয়ে পড়ে। আবু সুফিয়ান তখন বলে, খোদার কসম, আমি এই ছেলের হাত ধরে কোথাও চলে যাব। তারপর সেখানে আমি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ধুঁকেধুঁকে জীবন দেব। এখন আর আমাদের বেঁচে থাকার দরকার নেই। কথাটি যখন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারেন, তখন তাঁর অন্তর গলে যায়। সাক্ষাতের অনুমতি দেন। তারা নবীজির খেদমতে উপস্থিত হয়ে নবীজির হাতে ঈমানের শপথ নেন এবং ইসলাম কবুল করেন।[১]

মুসলিম-বাহিনীর দৃশ্য

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, আবু সুফিয়ানকে পথের সংকীর্ণ বাঁকে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিন। উদ্দেশ্য, আবু সুফিয়ান যেন মুসলিম-বাহিনীর প্রবেশদৃশ্য অবলোকন করতে পারে। আদেশমাফিক হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু সুফিয়ানকে নিয়ে সংকীর্ণ একটি পথের তীরে দাঁড় করিয়ে দেন। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমবাহিনীকে মক্কায় প্রবেশের আদেশ দেন। প্রত্যেক কবিলা নিজ নিজ পতাকা হাতে পালাক্রমে মক্কায় প্রবেশ করতে থাকে। তাদের সামনে দিয়ে যখনই কোনো কবিলা পার হয়ে যেত, আবু সুফিয়ান জিজ্ঞেস করতেন, এরা কারা? হযরত আব্বাস বলতেন, এটা সুলাইম গোত্র। ওই যে মুযাইনা গোত্র আসছে। এভাবে প্রবেশরত প্রতিটি গোত্র সম্পর্কে আবু সুফিয়ান প্রশ্ন করছিলেন আর হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু তার উত্তর দিচ্ছিলেন। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আনসার ও মুহাজিরদের সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করতে যান, আবু সুফিয়ান তখন যথারীতি প্রশ্ন করে বসে। হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দেন—

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৪ : ১৮; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪ : ১৮।

هذا رسول الله في المهاجرين والانصار.

এটা হলো মুহাজির ও আনসার বেষ্টিত আল্লাহর রাসূল।

এই দৃশ্য দেখে আবু সুফিয়ান ভীতিসঞ্চারিত কণ্ঠে বলেছিলেন—আব্বাস, তোমার ভাতিজা তো একদিন বাদশাহ হবেন, দেখছি। হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন বলেছিলেন, আবু সুফিয়ান, এটা বাদশাহি নয়, নবুওয়ত। আবু সুফিয়ান বলেছিলেন, তুমি ঠিক বলেছ।[১]

সাধারণ ঘোষণা

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মর্মে ঘোষণা প্রচার করেন—যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। যে ব্যক্তি তার ঘরের দরজা বন্ধ করে দেবে, সে নিরাপদ। কাবা ঘরে যে আশ্রয় নেবে, সেও নিরাপদ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত আবু সুফিয়ানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি হযরত সাদ ইবনে উবাদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে নবীজিকে অবগত করেন—সাদ তো বলছেন—

اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة.

আজ যুদ্ধের দিন। আজ যুদ্ধ হবে পবিত্র হেরেমে।

নবীজি বললেন, সাদ ইবনে উবাদাহ ঠিক বলেনি। আজ তো কাবার সম্মান পূর্ণরূপে বিকশিত হওয়ার দিন। আজ বায়তুল্লাহকে নতুন পোশাকে সুশোভিত করা হবে।[২] নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাজুন নামক স্থানে পতাকা স্থাপন করা হোক। যুদ্ধের সকল সেনাপতিকে তিনি ভিন্ন পথে মক্কায় প্রবেশের আদেশ দিয়েছিলেন। হযরত খালেদ ইবনুল ওলীদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন, তুমি মক্কার উঁচু অঞ্চল দিয়ে প্রবেশ করবে। নবীজি প্রবেশ করেছিলেন ভিন্ন পথে। খালেদ ইবনুল

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৪ : ২৩; ইবনে সাদ, *আত তাবাকাত*, ২ : ১৩৫; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪ : ২৯০।

২ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪ : ২৯১।

ওলীদের নেতৃত্বে যে দলটি মক্কায় প্রবেশ করছিল—প্রবেশের সময় তারা দুইজন ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। তাদের একজন খুনাইস ইবনুল আশআর, আরেকজন কুরজ ইবনুল জাবের আল ফিহরী।[১] নবীজি যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন, তুমি অমুক পথে প্রবেশ করবে। হযরত সাদ ইবনুল উবাদাকে বলেছিলেন, তুমি প্রবেশ করবে অমুক পথে। হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুকেও আদেশ করেছিলেন, ভিন্ন পথে মক্কায় প্রবেশ করতে। স্বয়ং হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবেশ করেছিলেন ইযখিরের দিক থেকে।

প্রতিরোধের ব্যর্থ প্রয়াস

সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া, ইকরিমা ইবনে আবু জেহেল এবং সাহাল ইবনে আমর মিলে কিছু লোক সঙ্গে করে প্রতিরোধের প্রস্তুতি নেয়। ঘটনাক্রমে তারা হযরত খালেদ ইবনুল ওলীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সামনে পড়ে যায়। প্রতিরোধ হয়। বাধ্য হয়ে হযরত খালেদ ইবনুল ওলীদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকেও তরবারি তুলতে হয়। তেরো জন মুশরিক এই আক্রমণে নিহত হয়।[২] বনু বকরের হিমাস ইবনে কায়েসও তার লোকজন নিয়ে প্রতিরোধের ইচ্ছা করেছিল। তার স্ত্রী তাকে বাধা দিয়েছিল। কিন্তু সে বলেছিল, আজ আমি তাদেরকে মজা দেখাব। মুশরিকদের দলে সেও প্রতিরোধযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু যখন মুশরিকদের অধিকাংশকে মারা পড়তে দেখে তখন পালিয়ে গিয়ে নিজের ঘরে আত্মগোপন করে। ভীত-সন্ত্রস্ত কণ্ঠে স্ত্রীকে বলে, তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দাও। স্ত্রী তখন বলেছিল, তখন তো খুব লাফাচ্ছিলে, এখন কেন দরজা বন্ধ করতে বলছ? আমি তো তোমাকে আগেই নিষেধ করেছিলাম।[৩]

ক্ষমার অযোগ্য অপরাধী

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম সৈনিকদের প্রত্যেক দলপতিকে আদেশ করেছিলেন, কেউ যদি অস্ত্র হাতে লড়াই করতে

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪ : ২৯২।

২ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৪ : ২৭।

৩ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৪ : ২৭।

না আসে, তা হলে কারও ওপর তরবারি তুলবে না। অবশ্য নাম নিয়ে কয়েকজন সম্পর্কে ঘোষণা করেছিলেন—তাদেরকে যেখানেই পাবে, হত্যা করবে। তারা যদি কাবা ঘরের গিলাফের ভেতর আশ্রয় গ্রহণ করে, তবুও তাদেরকে ছাড়বে না। তারা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধী। এই অপরাধীদের তালিকায় আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে সারহও ছিল। সে প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ওহী লিপিবদ্ধ করার কাজেও সামান্য অংশগ্রহণ করেছিল। তারপর ইসলাম ত্যাগ করে। সে হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সঙ্গে করে নবীজির খেদমতে আশ্রয় প্রার্থনার জন্যে উপস্থিত হয়। আশ্রয় প্রার্থনা করলে নবীজি নীরব হয়ে যান। দীর্ঘক্ষণ পর বলেন, আচ্ছা, হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে সে চলে যাওয়ার পর নবীজি সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি ছিল না—যে আমাকে নীরব থাকতে দেখে তার গর্দান উড়িয়ে দেবে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা বিষয়টি বুঝতে পারিনি। আপনি যদি সামান্য চোখে ইশারা করতেন, তা হলে আমরা এক মুহূর্তও দেরি করতাম না। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন—

لا ينبغي لنبي ان تكون له خائنة الاعين.

কোনো নবীর জন্যে চোখের খেয়ানত শোভনীয় নয়।

পরবর্তীকালে এই আবদুল্লাহ ইবনে সাদ তাওবা করে নিজেকে সত্য মুসলমান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদার আমলে সরকারি নানা পদেও আসীন হয়েছেন।[১]

এই ক্ষমার অযোগ্য অপরাধীদের তালিকায় আবদুল্লাহ ইবনে খাতালও ছিল। সেও মুসলমান হওয়ার পর মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। সে সর্বদা দুইজন গায়িকা দাসী রাখত। এই দুই দাসী হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুসলমানদের নিন্দা করে গান গেয়ে বেড়াত। এই জঘন্য পাপী পালিয়ে গিয়ে পবিত্র কাবার গিলাফের ভেতর লুকিয়ে

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৪ : ২৮-২৯।

গড়েছিল। তাকে সেখানেই হত্যা করা হয়। তার দুই দাসীর মধ্যে একজন নিহত হয়েছিল। আরেকজন কোনোক্রমে বেঁচে গিয়েছিল।[১]

ক্ষমার অযোগ্য অপরাধীদের তৃতীয় ব্যক্তি ছিল হারিস ইবনে নুফাইল ইবনে ওয়াহাব। এই ব্যক্তি মক্কায় অবস্থানকালে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছিল। হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন নবীজির দুই কন্যা হযরত উম্মে কুলসুম এবং হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহুমাকে মদীনায় নবীজির কাছে পৌঁছে দিতে যাচ্ছিলেন, তখন সে তাদের বাহন উটের ওপর হামলা করেছিল। তারা উভয়ে উটের পিঠ থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। ক্ষমার অযোগ্য এই অপরাধীকে পৃথিবীর পিঠ থেকে বিদায় করেছিলেন হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু।[২]

ক্ষমার অযোগ্য আরেকজন হলো মাকীস ইবনে সুবাবা। তার ভাই নিহত হয়েছিল, সে তার রক্তমূল্য দাবি করেছিল। তার দাবি পূরণ করার পরও সুযোগ পেয়ে তার ভাইয়ের হত্যাকারীকে খুন করেছিল। তা ছাড়া সে একবার মুসলমান হওয়ার পর আবার মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। নবীজির ঘোষণা শোনার পর তার গোত্রেরই নুমাইলাহ ইবনে আবদুল্লাহ নামক এক ব্যক্তি তাকে হত্যা করে।[৩]

এই ক্ষমার অযোগ্য অপরাধীদের তালিকায় উম্মে সারাহ নামী এক নারীও ছিল। সে ছিল মূলত ইকরিমা ইবনে আবু জেহেলের আজাদকৃত দাসী। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছিল। মক্কা বিজয়ের সময় সে পালিয়ে গিয়েছিল। কিছু দিন পর এসে আশ্রয় প্রার্থনা করে। নবীজি তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তারপর সে হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর শাসনামল পর্যন্ত বেঁচে ছিল। ঘটনাক্রমে কোনো এক ঘোড়সওয়ারের ঘোড়ার আঘাতে সে মৃত্যুবরণ করে।[৪]

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৪ : ২৮-২৯।
২ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৪ : ২৮-২৯।
৩ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৪ : ২৮-২৯।
৪ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪ : ২৯৮।

ক্ষমার অযোগ্য এই অপরাধীদের তালিকায় আবু জেহেলের পুত্র ইকরিমার নামও ছিল। মুসলমানগণ মক্কা জয় করে নেবার পর ইকরিমা পালিয়ে ইয়েমেন চলে গিয়েছিল। তার স্ত্রী উম্মে হাকীম বিনতে হারিস ইবনে হিশাম ইসলাম গ্রহণ করেছিল। সে গিয়ে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ইকরিমার জন্যে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে। নবীজি তার আবেদন মঞ্জুর করেন। উম্মে হাকীম ইকরিমার সন্ধানে ইয়েমেন ছুটে যায়। তারপর তাকে অভয় দিয়ে মক্কায় ফিরিয়ে আনে। ইকরিমা নবীজির খেদমতে হাজির হয়ে ইসলাম কবুল করে।[১]

হযরত উম্মে হানীর আশ্রয়ে কয়েকজন অপরাধী

হযরত উম্মে হানী রাযিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বোন। তিনি বলেন, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কার উঁচু অঞ্চলে অবস্থান করছিলেন তখনকার ঘটনা। আমার শ্বশুরবাড়ির সুবাদে আত্মীয় দুই ব্যক্তি আমার ঘরে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। তারা হলো, বনু মাখযুম গোত্রের হারেস ইবনে হিশাম এবং যুহায়ের ইবনে আবু উমাইয়া। তারা উভয়েই মুশরিক ছিল। পুরো মক্কা মুসলিম-বাহিনীর দখলে। তারা পালিয়ে এসে আমার ঘরে আশ্রয় চায়। আমি তাদেরকে আশ্রয় দিই। এমন সময় আমার ভাই আলী ইবনে আবু তালেব এসে বলে, খোদার কসম, আমি এদেরকে হত্যা করব। আমি তাদেরকে আমার ঘরের মধ্যে আটকে রেখে নবীজির খেদমতে ছুটে যাই। নবীজি তখন গোসল করছিলেন। তার কন্যা ফাতেমা একটি চাদর ধরে পর্দা করে দাঁড়িয়ে ছিল। গোসল শেষ করার পর নবীজি চাদর পরিধান করেন। আট রাকাত নামায আদায় করেন। সেটা ছিল চাশতের সময়। তারপর আমার দিকে ফিরে বলেন—খোশ আমদেদ! তুমি কি কোনো কাজে এসেছ? আমি তখন পুরো ঘটনা খুলে বলি। আমি যে তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছি, সে কথা বলি। আমার ভাই আলী যে তাদেরকে হত্যা করতে চাচ্ছে, তাও বলি। সব শুনে নবীজি বলেন—

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪ : ২৯৮; ইবনুল আসীর, *আল-কামিল ফিত তারীখ*, ১ : ৬১৬-৬১৭।

قد اجرنا من اجرت امنا من أمنت.

তুমি যাদেরকে আশ্রয় দিয়েছ, আমিও তাদেরকে আশ্রয় দিলাম। তুমি যাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছ, আমিও তাদেরকে নিরাপত্তা দিলাম।[১]

সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা

যখন একপ্রকার স্বস্তি ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলো, কোথাও কোনো প্রতিরোধের আশঙ্কা রাইল না আর কুরাইশরাও মুসলমানদের বিজয় ও শক্তিকে মেনে নিল, মেনে নিল নিজেদের পরাজয়কেও, তখন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁবু থেকে বের হলেন। আগমন করলেন বায়তুল্লাহ শরীফে। তাওয়াফ করলেন। হাজরে আসওয়াদে চুমু খেলেন। তাওয়াফ সমাপ্ত করার পর পবিত্র কাবার চাবির ধারক উসমান ইবনে তালহাকে ডেকে পাঠালেন। তার হাত থেকে চাবি নিয়ে পবিত্র কাবার দরজা খুললেন। ভেতরে প্রবেশ করলেন। সেখানে প্রতিষ্ঠিত মূর্তি ভেঙে বাইরে ফেলে দিলেন। তারপর এসে দাঁড়ালেন কাবার দুয়ারে। সেখানে তখন বিশাল জনসমাবেশ। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে বেরিয়ে যমযম কূপের কাছে এলেন। যমযমের পানি চাইলেন। যমযম পান করলেন। উযু করলেন। তাঁকে উযু করতে দেখে উযুর পতিত পানি সংগ্রহের জন্যে সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এই দৃশ্য দেখে মক্কার মুশরিক-সম্প্রদায় তো অবাক। তারা সবিস্ময়ে পরস্পর বলাবলি করতে থাকে—আমরা কোথাও কোনো বাদশাহরও তো এমন মর্যাদা শ্রেষ্ঠত্ব ও আকর্ষণ প্রত্যক্ষ করিনি। তা ছাড়া সমর্পণ ও উৎসর্গপ্রাণের এমন দৃশ্যও কোথাও দেখিনি। তারপর তিনি ফিরে আসেন কাবার দুয়ারে। অতঃপর অপেক্ষমাণ জনতার সামনে দাঁড়িয়ে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন—

আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক। তাঁর কোনো শরিক নেই। আল্লাহ তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন। তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন। পথহারা বড় বড় নেতাদেরকে পরাজিত করেছেন। এখন থেকে

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৪ : ৩০-৩১।

অতীতকালের যে কোনো রক্ত কিংবা সুদের দাবি বাতিল করা হলো। অতীতের যে কোনো সুদ ও রক্তের দাবি এখন থেকে আমার পদতলে। তারপর বললেন, হে কুরাইশের লোকসকল, আল্লাহ তাআলা তোমাদের অহংকার এবং মূর্খতাসঞ্জাত আত্মম্ভরিতাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। তোমাদের বাপ-দাদার নামে ছড়ানো অহংকারকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন। পৃথিবীর সকল মানুষ এক ও অভিন্ন। সকলেই আদমের সন্তান। আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে। তারপর তিনি পবিত্র কুরআনের এই আয়াত তেলাওয়াত করেন—

إِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثٰى.

আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। [হুজরাত : ১৩]

তারপর তিনি কুরাইশদের সম্বোধন করে বলেন—

তোমরা কী ভাবছ? আমি তোমাদের সঙ্গে কী আচরণ করতে পারি? উত্তরে কুরাইশ-সম্প্রদায় বলে, আপনি আমাদের সঙ্গে ভালো কিছুই করবেন। কারণ, আপনি একজন সম্ভ্রান্ত মানুষ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র। এরপর তিনি ঘোষণা করেন—

اذهبوا فانتم الطلقاء.

যাও, তোমরা সকলে আজাদ।

তোমাদেরকে অতীত-অপরাধের জন্যে কোনো ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।[১]

তারপর তিনি মসজিদে চলে যান। সেখানে তিনি উপবেশন করেন। পাশে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু দণ্ডায়মান। নবীজির হাতে তখন কাবার চাবি। জানতে চাইলেন—উসমান ইবনে তালহা কোথায়? উসমান এগিয়ে গেলেন। নবীজি তার হাতে চাবি তুলে দিয়ে বললেন—

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৪ : ৩২।

নাও, এই তোমার চাবি। উসমান, আজ হলো কল্যাণ ও অঙ্গীকার পূরণের দিন।[১]

তিনশো ষাটটি মূর্তি

বুখারী শরীফের বর্ণনায় আছে, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন পবিত্র বায়তুল্লাহ ও তার আশপাশে তিনশো ষাটটি মূর্তি স্থাপিত ছিল। নবীজি হাতের লাঠি দ্বারা ওইসব মূর্তিকে আঘাত করছিলেন আর বলছিলেন—'জা আল হাক্কু ওয়া যাহাক্বাল বাতিল!'

পবিত্র বায়তুল্লাহর ভেতরেও ফেরেশতাদের কল্পিত চিত্র আঁকা ছিল। সেখানে হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর একটি মূর্তিও বানিয়েছিল তারা। এই মূর্তির হাতে শোভা পাচ্ছিল ভাগ্যনির্ণায়ক তির। এর দ্বারা মুশরিক-সম্প্রদায় তাদের ভাগ্য নির্ণয় করত। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেন—সবগুলো মূর্তি ভেঙে দাও। কাবার দেয়ালে অঙ্কিত সকল চিত্র নিশ্চিহ্ন করে ফেলো। সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম ঘষে ঘষে কাবার দেয়ালে অঙ্কিত সকল চিত্র মুছে ফেলেন। মূর্তিগুলো ভেঙে বাইরে ছুঁড়ে মারেন। পবিত্র কাবাকে সকল মুশরিকচিহ্ন থেকে পবিত্র করে তোলেন।

মক্কার হেরেমের উদ্দেশ্যে বিশেষ ঘোষণা

তারপর তিনি সাফা পর্বতে গিয়ে ওঠেন। সাফা পর্বতে কাবামুখি হয়ে দাঁড়ান। হাত তুলে দুআ করেন। তারপর ঘোষণা করেন—আল্লাহ তাআলা যেদিন এই আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন, সেদিন থেকেই মক্কাকে হারাম ও সম্মানিত ঘোষণা করেছেন। আল্লাহর ঘোষণায় সেদিন থেকে আজ অবধি এই হারাম পবিত্র। কেয়ামত পর্যন্ত তা হারামই থাকবে। আমার পূর্বে কারও জন্যে এই প্রাঙ্গণকে হালাল করা হয়নি। আমার পরও

---

১ সীরাতে ইবনে হিশাম, ৪ : ৩২; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪ : ৩০১।

কারও জন্যে হালাল করা হবে না। আমার জন্যে সামান্য সময় হালাল করা হয়েছিল। মনে রেখো, এখানে কোনো ধরনের শিকার করা যাবে না। এই প্রাঙ্গণের কোনো কাঁটা কাটা যাবে না। এখানে পতিত কোনো বস্তু পর্যন্ত তুলে নেওয়া যাবে না। হ্যাঁ, কেউ প্রাপ্তির ঘোষণার জন্যে হাতে নিতে পারে।

এই সময় হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু আবদার করেন—ইযখির ঘাসকে এই বিধান থেকে আলাদা রাখা হোক। কারণ, মৃতদেরকে দাফন করার সময় এই ঘাস কবরে দিতে হয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামান্য সময় নীরব থেকে বললেন, তবে ইযখির ঘাস কাটা যাবে।[১]

এরপর সাহাবায়ে কেরামকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে আদেশ করেন—যাও, যেখানে কোনো মূর্তি দেখতে পাবে, ভেঙে ছুঁড়ে মারবে। উয্যা, মানাত, সুওয়া, বাওয়ামাহ এবং যুল কিফতিন ছিল বিখ্যাত মূর্তিগুলোর অন্যতম। এ সকল মূর্তি ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। তারপর তিনি অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তাদের ঘরে যেন কোনো ধরনের মূর্তি না থাকে। তারা যেন তাদের ঘরে স্থাপিত মূর্তিগুলো নিজ হাতে ভেঙে ফেলে দেয়।[২]

মক্কা বিজয়ের পর নবীজি পনেরো দিন সেখানে অবস্থান করেন। এই সময় চার রাকাতের ফরয নামাযগুলো দুই রাকাত করে আদায় করেন।[৩] নবীজি আরও ঘোষণা করেন—

لا هجرة بعد الفتح.

মক্কা বিজয়ের পর আর কোনো হিজরত নেই।

এখন থেকে যারা মুসলমান হবে, তাদের জন্যে আর হিজরত করা ফরয নয়। এই ঘোষণা এ কারণে করা হয়েছিল—মক্কা বিজয়ের পূর্বে

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪ : ৩০৪।

২ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪:৩১৭; *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৪:৬৪।

৩ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪ : ৩১৭; *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৪ : ৬৪।

মুসলমানদের ওপর হিজরত করা ফরয ছিল। হযরত আত্তাব ইবনে উসাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মক্কার শাসক নিযুক্ত করা হয়। হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়োগ করা হয় মক্কার শিক্ষক। মুসলমানদেরকে কুরআনসহ ইসলামের বিধি-বিধান শিক্ষাদানের দায়িত্ব আরোপ করা হয় তার উপরে।[১]

উযযা মূর্তি ভাঙার আদেশ

সতেরো রমযান মক্কা বিজয় হয়। পঁচিশ রমযান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খালেদ ইবনুল ওলীদকে ডেকে পাঠান। আদেশ করেন—যাও, উয্যা মূর্তিটি ভেঙে মূর্তিশালাটিও নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে এসো। হযরত খালেদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ত্রিশ জন ঘোড়সওয়ারসহ বেরিয়ে যান। মূর্তিটি ভেঙে ফেলেন। মূর্তিশালাটিও ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে ফিরে আসেন। নবীজিকে এ বিষয়ে অবহিত করলে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি সেখানে কিছু দেখতে পেয়েছ? হযরত খালেদ বলেন, না সেখানে তো কিছু দেখিনি। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা হলে তুমি মূর্তিশালাটি ভাঙনি। ফিরে যাও। মূর্তিশালাটি গুঁড়িয়ে দিয়ে এসো। এবার যখন হযরত খালেদ রাযিয়াল্লাহু আনহু যাচ্ছিলেন, তখন রাগে ক্রোধে গজগজ করছিলেন। হাতে নাঙ্গা তরবারি। এবার সেখানে গিয়ে দেখেন, একজন কালো কুৎসিত বিবস্ত্র নারী। তার মাথার চুল এলামেলো। মূর্তিশালার এই পূজারি হযরত খালেদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দেখে চিৎকার করতে শুরু করেন। হযরত খালেদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তরবারির আঘাতে তাকে দ্বিখণ্ডিত করেন। ফিরে এসে যখন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পুরো ঘটনা শোনান, তখন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ওটাই উয্যা। এখন থেকে কেয়ামত পর্যন্ত তোমাদের শহরে আর তার পূজা হবে না।

এই মূর্তিশালাটি ছিল কুরাইশদের একটি বাগানে। কুরাইশ এবং বনু কেনানার লোকেরা ছিল উয্যার পূজারি। আরবদের বিখ্যাত মূর্তিগুলোর অন্যতম ছিল এই উয্যা।[২]

---

১ ইবনে সাদ, *আত তাবাকাত*, ২ : ১৩৭।

২ ইবনে সাদ, *আত তাবাকাত*, ২ : ১৪৫।

ইসলামের শপথ

মক্কায় সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা করা হয়েছিল পূর্বেই। এই ঘোষণার ভেতর দিয়ে এখানকার প্রত্যেক নাগরিক স্বাধীনতা লাভ করে। কারও মধ্যে কোনো ধরনের ভয় কিংবা আশঙ্কা অবশিষ্ট থাকেনি। মক্কার সকল নাগরিক এ মর্মে আশ্বস্তবোধ করে—এখন আর আমাদের থেকে কেউ প্রতিশোধ নেবে না। মক্কার মুশরিক-সম্প্রদায় বরাবর বিশ বছর ইসলামের শত্রুতায় আকণ্ঠ নিমগ্ন ছিল। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাধারণ মুসলমানগণকে জুলুম ও নির্যাতন করতে সম্ভব কোনো ধরনের ত্রুটি তারা কখনো করেনি। হিজরতের পর সাত বছর পর্যন্ত বিশাল বিশাল শক্তি সঞ্চয় করে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। ইসলাম ও মুসলমানের নাম মুছে ফেলবার উদ্দেশ্যে সকল চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র ও তৎপরতায় এই কুরাইশবাসী ছিল সবার আগে। যখন মুসলমানগণ এই ঘাতক ও জালেম-সম্প্রদায়ের ওপর বিজয় লাভ করলেন, জয় করলেন বায়তুল্লাহ—যে দারুন নাদওয়ায় নবীজিকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল, সেই দারুন নাদওয়া যখন মুসলমানদের পদানত—তখন জালেম এই অবিচারী শত্রুদের সকলে অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান, তাদের দৃষ্টি নমিত। নিজেদেরকে যে কোনো শাস্তির জন্যে তারা নিজেরাও উপযুক্ত ভাবছিল। এমন নির্দয় ও পাষাণহৃদয় খুনি শত্রুদেরকে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহূর্তে ক্ষমা করে দিলেন। ঘোষণা করলেন—

لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء.

তোমাদের প্রতি কোনো অভিযোগ নেই। যাও, তোমরা সকলে মুক্ত।

তোমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হলো। তোমাদেরকে কোনো ধরনের শাস্তি দেওয়া হবে না। তোমাদের প্রতি কোনো ধরনের চাপ কিংবা শক্তি প্রয়োগ করা হবে না। তোমাদের সঙ্গে অপমানজনক কোনো আচরণও করা হবে না। তাদের কাউকে এ কথাও বলা হয়নি, ইসলাম কবুল করে নাও—তা হলে তোমাদের জীবন সম্পদ ও সম্ভ্রম নিরাপদ হয়ে যাবে, বরং তাদের সকলের নিরাপত্তার ভার নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকেই

নিজ নিজ জায়গায় পূর্ণ নিরাপত্তা ও স্বস্তি লাভ করেছে। প্রত্যেকেই বুঝতে পেরেছে—মক্কায় আমাদের জন্যে আর কোনো আশঙ্কা নেই।

প্রশাসনিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রায় পনেরো দিন অবস্থান করেন। শহরের বাইরে সাফা পর্বতে তাঁর জন্যে তাঁবু স্থাপন করা হয়। সেখানে মক্কার বাসিন্দাদের ভিড় লেগে যায়। তারা তাদের মনের দাবিতেই হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে দল বেঁধে উপস্থিত হতে থাকে এবং অনুরোধ করতে থাকে—আমাদেরকে মুসলমান করে ধন্য করুন।

মক্কার মুশরিক-সম্প্রদায় পূর্ণ আস্থার সঙ্গে উপলব্ধি করতে পারে—যে ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে আমরা সম্ভব সব ধরনের চেষ্টা সাধনা করেছি, যদি আল্লাহ তাআলার সাহায্য এর পক্ষে না হতো, তা হলে এই ধর্ম অনেক আগেই পৃথিবীর পিঠ থেকে মুছে যেত; কিন্তু আমরা লক্ষ করেছি, এই ধর্ম ক্রমাগত মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে, নিশ্চয় হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সত্য রাসূল। এই চিন্তা থেকেই মক্কাবাসী স্বপ্রণোদিত হয়ে নবীজির দরবারে ভেঙে পড়ে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক তাবারী লেখেন—মক্কার সকল লোক ইসলাম কবুল করার জন্যে নবীজির খেদমতে উপস্থিত হয়। নবীজি তখন সাফা পর্বতের ওপর উপবেশন করেন। নিচে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু। নবীজি তাদেরকে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করাচ্ছিলেন আর আনুগত্যের শপথ নিচ্ছিলেন। বলছিলেন, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মেনে চলবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে। ইসলাম কবুল ও শপথের এই ধারাবাহিকতা বরাবর চলতে থাকে।

পুরুষদের শপথ শেষ হওয়ার পর মক্কার মুশরিক নারীগণ আসতে থাকে। বিপুল সংখ্যক নারী একসঙ্গে এসে নবীজির সামনে বসে পড়ে। নবীজি তাদেরকে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করান। অতঃপর সৎকর্ম সম্পাদন ও অন্যায় থেকে বিরত থাকার শপথবাক্য পাঠ করান। তারপর তাদেরকে বিদায় করে দেন। পুরুষদের মতো মেয়েদেরকে হাতে হাত দিয়ে শপথ করাতেন না, বরং শুধুমাত্র মুখে মুখে শপথবাক্য পাঠ করাতেন।

শপথে অংশগ্রহণকারী এই নারীদের মধ্যে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবাও ছিল। শক্তিমান অবয়বের অধিকারী হিন্দ শপথগ্রহণ ও কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করার জন্যে উপবেশন করেন আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাদেরকে শপথবাক্য পাঠ করাতে থাকেন, তখন তার স্বভাবজাত দুঃসাহসের প্রকাশও বারবার ঘটতে থাকে। বারবার নবীজির কথার পিঠে কথা বলতে থাকেন। নবীজি কোমল কণ্ঠে তার উত্তর দিতে থাকেন। হিন্দ ভীতসন্ত্রস্ত মনে শপথ-অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তার ভয় ছিল হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার স্বীয় চাচার লাশ বিকৃত করা সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করে বসেন কিনা! কিন্তু নবীজি সে কথা উল্লেখ করেননি।

হিন্দের সঙ্গে আরও কিছু নারী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সকলকে বলেন, তোমরা এ মর্মে শপথগ্রহণ করো—আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না। তোমরা শপথ নাও কখনো চুরি করবে না। হিন্দ তখন বলে ওঠেন, আমি তো সবসময়ই আবু সুফিয়ানের সম্পদ থেকে কিছু কিছু গ্রহণ করে থাকি। এটা আমার জন্যে হালাল হবে না হারাম? কাছেই অবু সুফিয়ান উপবিষ্ট ছিলেন। স্ত্রীর এই কথা শোনার পর বলে ওঠেন—আমার পক্ষ থেকে এর অনুমতি আছে। আবু সুফিয়ানের এ কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পারেন, আড়ালে উপবিষ্ট নারী নিশ্চয় আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ। নবীজি তখন জিজ্ঞেস করেন—তুমি নিশ্চয় হিন্দ বিনতে উতবা? হিন্দ বললেন, হ্যাঁ, আমি উতবার কন্যা হিন্দ। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা অতীতের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তারপর তিনি শপথবাক্য পাঠ করান। বলেন—এই মর্মে শপথ করো, কখনো ব্যভিচার করবে না। আরও শপথ করো নিজেদের সন্তানদের কখনো হত্যা করবে না। হিন্দ তখন বলে ওঠেন—আমরা আমাদের সন্তানদেরকে শিশুবয়সে লালন-পালন করেছি। তারা যখন বড় হয়েছে, তখন আপনি ও আপনার সঙ্গীগণ বদর ময়দানে তাদেরকে মেরে ফেলেছেন। নবীজি এর কোনো উত্তর দেননি। তারপর বললেন—এ মর্মে শপথ নাও, কারও প্রতি কোনো ধরনের অপবাদ আরোপ করবে না এবং

আমার কোনো আদেশ লঙ্ঘন করবে না। বায়আত ও শপথ সম্পন্ন হওয়ার পর তাদেরকে উঠে যেতে বলেন। এমন সময় আড়াল থকে একজন নারী বলে উঠে—

بايعوني يا رسول الله!

ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে বায়আত করুন।

অর্থাৎ এই নারী মনে করছিল পুরুষদের মতো নারীদেরও নবীজির হাতে হাত রেখে বায়আত করা হবে। নবীজি তখন বললেন, মুখে মুখে সম্পাদিত এই বায়আতই যথেষ্ট। বায়আতের এই ধারাবাহিকতা দীর্ঘ সময় চলতে থাকে। অবশেষে নবীজি হযরত উমরকে বললেন, এখন যারা আসবে, তুমিই তাদেরকে বায়আত করে নিয়ো।[১]

গাযওয়ায়ে হাওয়াযিন

দুই সপ্তাহকাল মক্কায় অবস্থান করত এখানকার শাসনব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এর মধ্যে মক্কার বাসিন্দাদের প্রায় সকলেই ইসলাম কবুল করে। আত্তাব ইবনে উসাইদকে সর্বপ্রথম শাসক নিযুক্ত করা হয়। তারপর নবীজি মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়েন। পুরো রমযান মক্কায় কেটে যায়। মক্কায় থাকতেই শাওয়ালের চাঁদ উঠে। হিজরী অষ্টম সালের পাঁচ শাওয়াল হাওয়াযিনের উদ্দেশে যাত্রা করেন। হুনাইন নামক স্থানে গিয়ে তাঁবু স্থাপন করেন। নবীজির সঙ্গে তখন বারো হাজার মুসলমান। তাদের মধ্যে মদীনা থেকে আগত মুসলমান দশ হাজার। মক্কায় যারা সদ্য ইসলাম কবুল করেছেন, তাদের মধ্য থেকে আরও দুই হাজার এই কাফেলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন।

এদিকে হাওয়াযিন এবং সাকীফের নানা গোত্রের বিপুল সংখ্যক মানুষ যুদ্ধের জন্যে সমবেত হয়ে আছে। বিশেষ করে জীবনভর যুদ্ধ-করা অভিজ্ঞ যোদ্ধাদেরকে তারা এখানে উপস্থিত করেছিল। বিভিন্ন কবিলা প্রবল জোশ ও খেদের সঙ্গে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। তারা পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪ : ৩১৮-৩১৯; ইবনুল আসীর, *আল-কামিল ফিত তারীখ*, ১ : ৬১৮-৬১৯।

নারী শিশু উট ছাগল এবং পালে পালে ভেড়াও সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। তারা অবস্থান নিয়েছিল আওতাস ময়দানে। তাদেরকে দেখলে মনে হতো, যেন জানোয়ারের হাট বসেছে। চারদিকে পশু আর পশু। মুসলমানগণ তাঁবু পেতেছেন হুনাইনে। মক্কা থেকে বারো হাজার সৈনিক রওনা করেছিলেন। হুনাইনে আসতে আসতে আশপাশ থেকে আরও প্রায় দুই হাজার মুসলমান এসে এই বাহিনীতে অংশগ্রহণ করে।

একটি অসঙ্গত আবদার

হুনাইন যুদ্ধে যাওয়ার পথে একটি ঘটনা ঘটে। এই ঘটনাটির কথা সিহাহ সিত্তায়ও উল্লিখিত হয়েছে। হারেস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমরা হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হুনাইনের উদ্দেশে বেরিয়েছি। আমরা সবেমাত্র মুসলমান হয়েছি। আমাদের মন থেকে তখনো মূর্খযুগের অন্ধকার কাটেনি। তখনো আমাদের চিন্তা ও বিশ্বাসে পূর্ণ রূপান্তর সাধিত হয়নি। পুরোনো কালের আচার-আচরণ ও নানা সংশয় আমাদের চিন্তার ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে ছিল। মূর্খতার কালে কুরাইশ এবং আরবদের অন্যান্য কবিলার লোকেরা একটি বড় এবং শাখা প্রসারিত সবুজ বৃক্ষকে নির্বাচন করে নিত। তারপর প্রতি বছর ওই বৃক্ষের ছায়ায় মেলার আয়োজন করত। গাছের শাখে শাখে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত। সেই মেলায় বিভিন্ন পশু উৎসর্গ করা হতো। কয়েকদিন পর্যন্ত তারা সেখানে উৎসবে মেতে থাকত।

আমরা মক্কা থেকে নবীজির সঙ্গে যখন হুনাইনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি, তখন আমরা নবীজির খেদমতে গিয়ে আবদার করি—ইয়া রাসূলাল্লাহ, জাহেলি যুগের মতো আমাদের জন্যে ছায়াপ্রসারিত একটি বৃক্ষ নির্বাচিত করে দিন। আমাদের আবদার শুনে নবীজি বলেন, আল্লাহু আকবার। আল্লাহর কসম, তোমরা তো হযরত মুসার কাছে তার সম্প্রদায় যেমন মূর্খতাপূর্ণ আবদার করেছিল—সেই রকম আবদার করলে। তারা একটি মূর্তিশালা দেখে হযরত মুসাকে বলেছিল, আমাদের জন্যেও এমন একটি মাবুদ তৈরি করে দিন। এ কেমন মূর্খতার কথা![১]

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪ : ৩২৫।

গনিমতের সুসংবাদ

তখন ছিল ফজরের সময়। একজন ঘোড়সওয়ার এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনার কাছ থেকে উঠে গিয়ে সামনের পাহাড়টিতে আরোহণ করেছি। তখন দেখলাম, হাওয়াযিনের লোকেরা তাদের নারী শিশু ও চতুষ্পদ প্রাণীদের নিয়ে হুনাইনের দিকে আসছে। এ কথা শোনার পর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হেসে বললেন—

تلك غنيمة المسلمين غداً ان شاء الله تعالى.

ইনশাআল্লাহ, এইসব সম্পদ আগামীকাল মুসলমানদের গনিমত হবে।

তারপর জিজ্ঞেস করলেন, আজ রাতে আমাদের পাহারা দেবে কে? হযরত আনাস ইবনে আবু মারসাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এই খেদমত আমি করব। তার সঙ্গে আরেকজন সাহাবী এসে যোগ দেন। সামনের পাহাড়ের ওপর তাদের দুইজনকে প্রহরী নিযুক্ত করা হয়। তারা সারা রাত সেখানে পাহারা দিয়ে কাটান। সকালে যখন নেমে আসেন, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে কল্যাণের দুআ দেন এবং বলেন, তোমরা যদি এই যুদ্ধে কোনো রকম অংশগ্রহণ নাও করো, তা হলেও তোমরা পরিপূর্ণ প্রতিদান লাভ করবে।

শত্রুদলের সঙ্গে লড়াই

পরের দিন উভয় দল মুখোমুখি হয়। কিছু যুবক তখন প্রচণ্ড আবেগ ও উৎসাহে সামনে এগিয়ে যায়। এই সময় নিজেদের কর্ম প্রদর্শনের জন্যে মক্কা থেকে আগত কিছু নওমুসলিম প্রথম সারিতে চলে আসে। হাওয়াযিন কবিলার লোকেরা ছিল দক্ষ তিরন্দাজ। শত শত তিরন্দাজ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যায়। তূণীর থেকে তির ছুঁড়তে থাকে। নিক্ষিপ্ত তিরগুলো মুসলমানদের প্রথম সারিতে এসে পড়তে থাকে। তারা এতটা দক্ষতা ও দ্রুততার সঙ্গে তির ছুঁড়তে শুরু করে—মুসলমানদের প্রথম সারির জন্যে টিকে থাকা মুশকিল হয়ে পড়ে। তারা মোর্চা ভেঙে সরে পড়ে। চারদিকে এমনভাবে হৈচৈ পড়ে যায়—যেন শত্রুপক্ষের জয় হয়ে গেছে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাঁর সাদা খচ্চরের ওপর

উপবিষ্ট ছিলেন। নবীজি শত্রুবাহিনীর দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-ও সামনে চলে আসেন। নবীজি তাকে বলেন, আনসার ও মুহাজিরদেরকে উচ্চ আওয়াজে ডাকুন। এমনিতেই হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন দরাজ কণ্ঠের অধিকারী। তিনি উচ্চ আওয়াজে সকলকে ডাকতে শুরু করেন। এই সময় নবীজির ডানে এবং বামে খুব সামান্য লোক ছিল। তাদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক, উমর ইবনুল খাত্তাব, আলী ইবনে আবু তালেব, আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিব, রাবীআ ইবনুল হারিস, ফযল ইবনে আব্বাস, আয়মান ইবনে উম্মে আয়মান এবং উসামা ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুমও ছিলেন। হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু নবীজির খচ্চরের লাগাম টেনে ধরছিলেন। ময়দান খালি দেখে হাওয়াযিন গোত্রের এক শত্রু একটি লাল উটে চড়ে একেবারে সামনে চলে আসে। তার হাতে ছিল কালো পতাকা। আরেক হাতে একটি লম্বা বর্শা। তার পেছনে পুরো হাওয়াযিন গোত্র। সে নবীজিকে আক্রমণ করার জন্যে যেই তার বর্শাটি উত্তোলন করে অমনি হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং এক আনসারী সাহাবী দেখে ফেলে। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু ঘুরে তার উটের পেছনে চলে যান এবং তরবারির এক আঘাতে তার উটের পেছনের দুই পা কেটে ফেলেন। সে ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে ধপাস করে মাটিতে পড়ে যায়। আনসারী সাহাবী ছুটে গিয়ে এই বর্শাধারীর উভয় পায়ে এমনভাবে আঘাত করেন—তার উভয় পা গোছা থেকে আলাদা হয়ে দূরে গিয়ে পড়ে।

বিজয়

হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর আওয়াজ শুনে মুসলমানগণ ঘুরে দাঁড়ান। একসঙ্গে হামলা করেন। তখন আর তারা বেশিক্ষণ টিকতে পারেনি। এই সময় নবীজি ঘোষণা করে দেন—

من قتل قتيلا فله سلبه.

যে ব্যক্তি কোনো কাফেরকে হত্যা করবে, তার সকল সামানপত্র ওই মুজাহিদকে পুরস্কারস্বরূপ দেওয়া হবে।

এই যুদ্ধে হযরত আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু বিশ জন মুশরিককে হত্যা করেছিলেন। পুরস্কার হিসেবে তাদের সমূহ সম্পদ তিনি লাভ করেছিলেন। এই ঘটনায় হযরত আবু কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর একটি চমৎকার ঘটনা *বুখারী* এবং *মুসলিম শরীফে* বর্ণিত হয়েছে। আবু কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হুনাইন যুদ্ধে যখন মুসলমানদের জয় হয়, নবীজি তখন সাহাবায়ে কেরামের মজলিসে উপস্থিত। তিনি বারবার ঘোষণা করছিলেন, যে ব্যক্তি কোনো মুশরিককে হত্যা করেছে, সে যেন সাক্ষী পেশ করে, আমরা তাকে নিহত মুশরিকের সম্পদ পুরস্কার হিসেবে দিয়ে দেব। আবু কাতাদা বলেন, নবীজি যখনই এই ঘোষণা করতেন, আমি উঠে দাঁড়াতাম। কিন্তু যখন আমার মনে হতো, আমার পক্ষে কে সাক্ষ্য দেবে! কারণ, আমি যখন মুশরিককে হত্যা করেছি, তখন সেখানে অন্য কেউ ছিল না। আমার জানা মতে, এই ঘটনার কোনো প্রত্যক্ষ সাক্ষী নেই। এই ভেবে আমি বসে পড়তাম। নবীজি যখন তৃতীয়বার ঘোষণা করলেন, আমি উঠে দাঁড়ালাম। নবীজি তখন জিজ্ঞেস করলেন—আবু কাতাদা, কী বিষয়? তুমি প্রতিবারই দাঁড়াচ্ছ, আবার বসে পড়ছ। আমি তখন পুরো ঘটনা বললাম। এও বললাম, আমার কাছে কোনো সাক্ষী নেই, তাই বসে পড়ছি। আমার কথা শুনে এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আবু কাতাদা সত্য বলছে। এই নিহত ব্যক্তির সম্পদ আমার কাছে আছে। আপনি সুপারিশ করে দিন—আবু কাতাদা যেন এগুলো আমাকে দিয়ে দেয়। হযরত আবু বকর সিদ্দীকও সেখানে ছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলেন। বললেন, এটা কক্ষনো হতে পারে না। আল্লাহর পথের এক সিংহ বীরত্ব প্রদর্শন করবে আর অন্য ব্যক্তি এসে তার ফায়দা ভোগ করবে? হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কথাকে সমর্থন করলেন। বললেন, এই সম্পদ আবু কাতাদাকে দেওয়া হোক। হযরত আবু কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইসলাম কবুল করার পর এই সম্পদই আমার জীবিকার বুনিয়াদ হয়েছিল। এর মূল্য দিয়ে আমি একটি বাগান কিনেছিলাম।[১]

---

১ *বুখারী* ও *মুসলিমের* সূত্রে *মেশকাত*, ৩৪৮।

সংরক্ষিত হলো গনিমতের সম্পদ

এই যুদ্ধে হাওয়াযিন এবং সাকীফ গোত্রের বিশিষ্ট এবং নেতা পর্যায়ের অনেক ইসলামদুশমন নিহত হয়। পরাজয়ের পর বিভিন্ন কবিলা নিজ নিজ নিবাস ছেড়ে পালিয়ে যায়। ফলে তাদের সমূহ সম্পদ মুসলিম-বাহিনীর হস্তগত হয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসউদ ইবনে আমর আল গিফারীকে আদেশ দেন—গনিমতের সকল উট ছাগল ও দাস-দাসীদের একত্রিত করে যিইরানায় পাঠিয়ে দাও। তারপর সেখানে কিছু লোক পাহারাদার নিযুক্ত করো। সেখানেই গনিমতের সম্পদ বণ্টিত হবে। তখনো কিছু কাজ অবশিষ্ট ছিল। কারণ, যেভাবে বিভিন্ন গোত্রের লোকজন পালিয়ে গিয়েছিল, তাতে আশঙ্কা ছিল, তারা ঘুরে আক্রমণ করতে পারে। তাই আশপাশের সকল শত্রুকে পরাজিত না করা পর্যন্ত এ আশঙ্কা থেকেই যাবে। এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গনিমতের সম্পদ বণ্টনকে মুলতবি করে দেন। মাসউদ গিফারী রাযিয়াল্লাহু আনহু-সহ একদল সাহাবীকে তার পাহারায় নিযুক্ত করেন।[১]

আওতাস যুদ্ধ

আওতাস যুদ্ধ মূলত হুনাইন যুদ্ধেরই পরিশিষ্ট ছিল। এই যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ছিল—হাওয়াযিন গোত্রের সর্দার মালেক ইবনে আউফ ছিলেন পলাতকদের অন্তর্ভুক্ত। তার নেতৃত্বে হাওয়াযিন গোত্রের একটি দল তায়েফে চলে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে তায়েফের কেল্লায় আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের সাধারণ সৈনিকরা আওতাস নামক জায়গায় তাঁবু স্থাপন করে। বিষয়টি হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানতে পারেন, তখন আবু আমের আশআরীর নেতৃত্বে একটি দল প্রেরণ করেন। তারা গিয়ে এদের ওপর আক্রমণ করেন। শত্রুপক্ষ পরাজিত হয়। ফলে তায়েফের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়।

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৪ : ৯২।

নবীজির দুধবোন শাইমা

এই হুনাইন যুদ্ধেরই আরেকটি ঘটনা। হযরত খালেদ ইবনুল ওলীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একটি দলের প্রধান। তার দলটি সবার আগে চলছিল। নবীজি এক জায়গায় গিয়ে লক্ষ করেন—অনেক লোক একজন নারীর লাশের কাছে জড়ো হয়ে আছে। কী হয়েছে, জানতে চাইলে সাহাবায়ে কেরাম বললেন, এখানে একজন নারীর লাশ পড়ে আছে। নবীজি তখন বললেন, সে তো যুদ্ধ করছিল না, তাকে হত্যা করা হলো কেন? তারপর নবীজি খালেদ ইবনুল ওলীদকে হুকুম পাঠান—কখনো কোনো নারীর ওপর হাত তুলবে না। ঘরের কোনো চাকর-বাকরকে হত্যা করবে না। বনু সাদ ইবনে বকরের নাজ্জার নামক ব্যক্তিকে যদি পাও, তাকেও হত্যা করবে না। মুসলমানগণ যখন বনু সাদ জয় করেন, তখন নাজ্জারকে গ্রেফতার করেন। তার সঙ্গে শাইমা নামক একজন নারীও গ্রেপ্তার হয়। এই নারী দাবি করেন—আমি তোমাদের মনিবের দুধবোন, কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তারা তাকে নবীজির কাছে নিয়ে আসেন।

নবীজি তখন যিইরানায় অবস্থান করছিলেন। শাইমাকে যখন নবীজির সামনে আনা হয়, তিনি তখন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনার দুধবোন শাইমা। নবীজি বললেন, এর কোনো লক্ষণ কিংবা প্রমাণ আছে? তুমি আমার দুধবোন কীভাবে বুঝব? শাইমা বললেন, একদিন আমি আপনাকে আমার পিঠের ওপর নিয়ে হাঁটছিলাম। তখন আপনি আমার পিঠে দাঁত দিয়ে কামড় বসিয়েছিলেন। আপনার সেই দাঁতের চিহ্ন আমার পিঠে আজও আছে। নবীজি তখন গায়ের চাদর খুলে তাকে বিছিয়ে দেন। বলেন, তুমি এই চাদরের ওপর বসো। তারপর জিজ্ঞেস করেন—তুমি কি আমার সঙ্গে থাকতে চাও? আমার সঙ্গে থাকতে চাইলে পূর্ণ ইজ্জত ও ভালোবাসার সঙ্গে থাকতে পারবে। আমি তোমার জন্যে যাবতীয় সামানপত্রের ব্যবস্থা করে দেব। আর যদি তোমার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যেতে চাও, আমি তার ব্যবস্থাও করব। শাইমা বললেন, আপনি আমাকে যা কিছু দান করবেন, তা নিয়ে আমি আমার সম্প্রদায়ের সঙ্গে থাকতে চাই। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে অনেক কিছু দান

করেন। তারপর তাকে তার আপনজনদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আদেশ দেন। কেউ কেউ বলেছেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাইমাকে একজন দাস এবং একজন দাসী দিয়েছিলেন। শাইমা তাদের পরস্পরকে বিবাহ বন্ধনে গেঁথে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাদের বংশ সম্প্রসারিত হয়েছিল।[১]

তায়েফ যুদ্ধ

হিজরী অষ্টম সালের দশ শাওয়াল হুনাইন যুদ্ধের পরপরই তায়েফ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। নবীজি হুনাইন যুদ্ধ শেষ করে তায়েফের উদ্দেশে যাত্রা করেন। এ সময় অগ্রবর্তী দলের নেতৃত্বে ছিলেন হযরত খালেদ ইবনুল ওলীদ। তায়েফবাসীর কেল্লাটি ছিল সংরক্ষিত শক্ত ও সুগঠিত। তায়েফবাসী কেল্লার ভেতর আশ্রয় নিয়েছিল। দুর্গের রক্ষাপ্রাচীরের ওপর বিপুল সংখ্যক তিরন্দাজ নিযুক্ত করেছিল। তা ছাড়া তারা তাদের দুর্গের ভেতর বিপুল পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র এবং যুদ্ধের উপকরণ সংগ্রহ করে রেখেছিল। তাদের কাছে ট্যাংক ও কামান জাতীয় আধুনিক অস্ত্রও ছিল। মুসলমানগণ এসে দুর্গ ঘেরাও করে বসেন। দুর্গের ভেতর প্রবেশের কোনো পথ ছিল না। সাকীফ এবং অন্যান্য কবিলার লোকেরা পরাজিত হওয়ার পর এই দুর্গে এসে আশ্রয় নিয়েছে। এরই মধ্যে তারা পর্যাপ্ত প্রস্তুতিও গ্রহণ করে ফেলেছে। মুসলমানদের সৈন্যবাহিনী ছিল দুর্গের চারপাশে ছড়ানো। ফলে তায়েফবাসী যখন দুর্গের প্রাচীর থেকে তির ছুঁড়তে শুরু করে, তখন একটি তিরও ব্যর্থ হতো না। কোনো না কোনো মুসলমানের গায়ে গিয়ে পড়ত। জীবন কেড়ে নিত। মুসলমানগণ নবীজির কাছে এসে আরজ করেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ, বনু সাকীফের তির আমাদেরকে জ্বালিয়ে ফেলেছে। বারো জন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেছেন, অথচ শত্রুপক্ষের কোনো ব্যক্তি সামান্য আহতও হয়নি। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন কামান স্থাপন করেন। কিন্তু যারা কামান চালাবে, তাদের ওপর তিরের বৃষ্টি বর্ষণ হতে থাকে। ফলে, তাদেরকে সেখান থেকে দূরে পালিয়ে যেতে হয়। যখন শত্রুর ওপর হামলা করার কোনো পথই পাওয়া

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৪ : ৯২।

যাচ্ছিল না, তখন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুর্গ থেকে বেশ দূরে অবস্থান গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে এই জায়গাটায় মসজিদ নির্মিত হয়। প্রায় তিন সপ্তাহ পর্যন্ত নবীজি তাদের ঘেরাও করে রাখেন। শত্রুকে দুর্গ থেকে বের করে আনা এবং সম্পদের প্রতি তাদের প্রেরণাকে জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে আদেশ দেন—এদের আঙ্গুর ও খেজুর-বাগান কেটে ফেলো। তা হলে বাধ্য হয়ে বেরিয়ে আসবে। মুসলমানগণ তখন গাছ কাটতে শুরু করেন। দুর্গের ভেতর থেকে তারা তখন নবীজিকে আবদার জানায়, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাদের বাগানগুলো কাটাবেন না। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা আল্লাহর নামে দোহাই দিয়েছ, তাই গাছ কাটা বন্ধ করে দিচ্ছি। এরপর নবীজি এই মর্মে ঘোষণা দেন—যেসব ক্রীতদাস কেল্লা ছেড়ে বেরিয়ে আসবে, তারা আজাদ। সংবাদ শুনে প্রায় বারো জন ক্রীতদাস দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসে। এদের মধ্যে হযরত আবু বাকরাও ছিলেন। নবীজি সঙ্গে সঙ্গে এদেরকে আজাদ করে দেন। ঘোষণা করে দেন—একেকজন মুসলমান এদের একেকজনের দায়িত্ব নিয়ে নাও। এদের যাবতীয় প্রয়োজনের ব্যবস্থা করো। এই ঘটনা তায়েফবাসীকে আহত করে। তারপরও তারা পরাজয় বরণ করেনি। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাওফাল ইবনে মুআবিয়ার সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করেন—এখন আমরা কী করতে পারি? হযরত নাওফাল তখন বলেন—

يا رسول الله! ثعلب في جحر ان اقمت عليه اخذته وان تركته لم يضرك.

ইয়া রাসূলাল্লাহ, শৃগাল গর্তে ঢুকে পড়েছে। যদি সামান্য অপেক্ষা করেন, তা হলে ধরে ফেলতে পারবেন। আর যদি ছেড়ে চলে যান, আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে বললেন, সকলকে এখনই রওনা হতে বলো। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সফরের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে ঘোষণা করে দিলেন। ঘোষণা চারদিক ছড়িয়ে পড়ার পর লোকজন বলাবলি শুরু করল—তায়েফ জয় হয়নি, এমতাবস্থায় আমরা

কীভাবে চলে যাই। এ কথা শোনার পর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় ঘোষণা করলেন, সকলে প্রস্তুত থেকো। কাল সকালে যুদ্ধ হবে। পরের দিন সকালবেলা যখন সকলে ময়দানে অবতীর্ণ হলো, তখন এত পরিমাণে মুসলমান আহত হলো—সকলেই আশ্রয় প্রার্থনা করতে লাগল। এবার সকলেই বুঝতে পারল, আমরা নবীজির কথা অমান্য করে ভুল করেছি। নবীজি তখন পুনরায় ঘোষণা করলেন—ইনশাআল্লাহ, আমরা ফিরে যাব। এই ঘোষণা শোনার পর সকলেই আনন্দচিত্তে সফরের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল। ফেরার পথে সাহাবায়ে কেরাম বনু সাকীফের বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে আবদার জানালেন। এর উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

اللهم اهد ثقيفا وات بهم.

হে আল্লাহ, সাকীফকে হেদায়েত দান করো এবং ইসলাম কবুল করার জন্যে তাদেরকে আমার কাছে এনে দাও।

নবীজি বলেছেন, আমাকে তায়েফবাসীর বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে বারণ করা হয়েছে, অথচ এই তায়েফেই দীনের দাওয়াত দিতে এসে নবীজিকে এমন নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিল—জীবনে কখনো যে নির্যাতনের কথা তিনি ভুলতে পারেননি, কিন্তু তখনো তিনি তাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করেননি। এ কারণে আজকের এই ঘটনায়ও তিনি তাদের জন্যে কল্যাণের দুআই করেছেন।[১]

গনিমতের সম্পদ বণ্টন

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফের ঘেরাও প্রত্যাহার করেন। তারপর পুরো বাহিনীসহ যিইরানায় গিয়ে তাঁবু পাতেন। সেখানে আগেই গনিমতের সম্পদ সংরক্ষণ করা হয়েছিল। গনিমতের এই সম্পদের মধ্যে শুধু নারী ও শিশু বন্দির সংখ্যা ছিল ছয় হাজার। উট ছাগল ও অন্যান্য পশুর তো কোনো হিসেবই ছিল না। তিন সপ্তাহ হলো হুনাইন জয় হয়েছে। এই সময়ে হুনাইনবাসীর মধ্যে এক বিপ্লব বয়ে গেছে। পুরো

১ ইবনে সাদ, *আত তাবাকাত*, ২ : ১৫৯।

কবিলা সম্মিলিতভাবে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে। এরই মধ্যে তারা ভেবেছে—এখন আমাদের যা অবস্থা, তাতে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আমাদের স্ত্রী সন্তানদের ফেরত চাইতে পারি। আমাদের যেসব সহায়-সম্পদ গনিমতের সম্পদে যুক্ত হয়েছে, তাও ফিরিয়ে দেওয়ার আবদার করতে পারি। এসব চিন্তা করে বনু হাওয়াযিনের একটি বড় দল নবীজির খেদমতে হাজির হয় এবং সবিনয়ে আবদার জানায়। সবকিছু শোনার পর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের কাছে তোমাদের ধন-সম্পদ অধিক প্রিয়, না পরিবার-পরিজন? তারা নবীজির প্রশ্নের মর্ম বুঝতে পারে। তাই সবিনয়ে আবদার জানায়—ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদেরকে আমাদের পরিবার-পরিজন ফিরিয়ে দেওয়া হোক। এ কথা শোনার পর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার এবং আমার বংশের ভাগে যারা আছে, তাদেরকে তো আমি এখনই দিয়ে দিলাম। আর যারা সাধারণ মুসলমানদের অধিকারে আছে, তাদের ব্যাপারে আমি সুপারিশ করব। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শেষ করেন, তখন আগত প্রতিনিধিদল আবার তাদের অনুরোধের কথা বলে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, আমার ও বনু আবদুল মুত্তালিবের ভাগে যারা আছে, তাদেরকে তো আমি দিয়ে দিয়েছি। নবীজির কণ্ঠে এই ঘোষণা শোনার পর মুহাজির সাহাবীগণ সমস্বরে বলে ওঠেন, আমরাও আমাদের অংশ ফেরত দিলাম। তারা এও বললেন, আমাদের অংশ আমরা হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ছেড়ে দিয়েছি। এইভাবে হাওয়াযিন গোত্রের অধিকাংশ শিশু ও নারী আজাদ হয়ে যায়। তবে কোনো কোনো গোত্র কোনো কোনো ব্যক্তি তাদের অংশ ফিরিয়ে দেয়নি। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ঘোষণা করেন—যারা তাদের অংশ ফেরত দিতে চায়নি, তারা যেন তাদের অংশ ফিরিয়ে দেয়। আমি কথা দিচ্ছি, আগামীতে সর্বপ্রথম যে সম্পদ আমার হাতে আসবে, তা থেকে আমি তাদের অংশ আদায় করে দেব। এই ঘোষণার পর সকলেই নিজ নিজ অংশ ফিরিয়ে দেয়। হাওয়াযিন গোত্র তাদের সকল পরিবার-পরিজন ফিরে পায়।

বনু হাওয়াযিনের সর্দার আগেই পালিয়ে তায়েফের দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাওয়াযিন গোত্রকে বললেন, তোমাদের সর্দার মালেক ইবনে আউফ যদি ইসলাম কবুল করে, তা হলে তার পরিবার-পরিজনকেও ফিরিয়ে দেওয়া হবে, সেই সঙ্গে তাকে অতিরিক্ত একশো উট দান করা হবে। গোত্রের লোকেরা তখন কোনোভাবে খবরটি মালেক ইবনে আউফের কানে পৌঁছায়। মালেক ইবনে আউফ মনে মনে আশঙ্কা করে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই প্রস্তাব যদি বনু সাকীফ জানতে পারে, তা হলে তারা আমাকে কেল্লা থেকে বের হতে দেবে না। তাই সে কথাটি গোপন রাখে। সংবাদদাতাকে বলে, তায়েফের অমুক জায়গায় আমার ঘোড়াটি নিয়ে রেখে দিয়ো। কথামতো নির্দিষ্ট জায়গায় ঘোড়াটি পৌঁছে দেওয়া হয়। মালেক ইবনে আউফ রাতের বেলা দুর্গ থেকে বেরিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসে। তারপর সোজা যিইরানায় পৌঁছে যায়—যেখানে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থান করছিলেন। নবীজি তাকে তার পরিবার-পরিজন ফিরিয়ে দেন এবং কথামতো একশো উটও তাকে দেওয়া হয়। তারপর মালেক ইবনে আউফ নবীজির হাতে বায়আত গ্রহণ করেন এবং মুসলমান হয়ে যান।[১]

পুরো হাওয়াযিন গোত্র তো পূর্বেই ইসলাম কবুল করেছে। মালেক ইবনে আউফ মুসলমান হওয়ার পর নবীজি তাকে হাওয়াযিন গোত্রের শাসক নিযুক্ত করেন। অপর তিনটি গোত্র সুমামা সালামা এবং ফাহামকেও তার অধীনস্থ করে দেন। হযরত মালেক ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু এখন একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান। ইসলামের প্রচার ও প্রসারের প্রতিও তার ভেতরে প্রেরণা জেগে উঠেছে। তিনি তখন তার এবং অন্য গোত্রগুলো সঙ্গে নিয়ে সাকীফ গোত্রের জীবন ওষ্ঠাগত করে তোলেন। তাদের তৎপরতায় বনু সাকীফ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। দুর্গের ভেতর থেকে তাদের পালিত কোনো পশুর পাল বেরিয়ে এলে তা লুট করে নিতেন। ফলে বনু সাকীফ চরম কোনঠাসা হয়ে পড়ে।

বনু হাওয়াযিনের সংকট সমাধানের পর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গনিমতের সম্পদ-বণ্টনে মনোনিবেশ করেন। মক্কা

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৪ :১২৭।

থেকে নওমুসলিম যারা সঙ্গে এসেছেন, মন জয়ের উদ্দেশ্যে তাদেরকে খানিকটা বেশি অংশ প্রদান করা হয়। আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান, হাকীম ইবনে হিযাম, হারেস ইবনুল হারেস, হারেস ইবনে হিশাম, সুহাইল ইবনে আমর, হুওয়াইতিব ইবনে আবদুল উযযা, আলা ইবনে জারিয়া সাকাফী, ওয়াইনা ইবনে হুসাইন ইবনে হুযাইফা আকরা ইবনে হাবিস—এদের প্রত্যেককে একশো করে উট প্রদান করা হয়।[১] এদের অধিকাংশই ছিলেন মক্কার নওমুসলিম। তারা মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। তারপর বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন পরিমাণে উট এবং ছাগল দান করা হয়। বনু উমাইয়া, বনু আবদুদ দার, বনু মাখযুম, বনু আদী ইবনে কাব, বনু জাম্হ ইবনে আমর, বনু সাহাম, বনু আমের ইবনে লুই, বনু বকর ইবনে আব্দে মানাত, বনু কায়েস, বনু আমের ইবনে সসআ ইবনু কিলাব, বনু আমের ইবনে রাবীআ, বনু নজর ইবনে মুআবিয়া, বনু সুলাইম ইবনে মানসুর, বনু গিতফান, বনু ফাযারা, বনু হানযালা, বনু মাশাজি—এইসব কবিলা ও খান্দানকে গনিমতের অংশ প্রদান করা হয়। শুধু মদীনার আনসারীগণকে এই গনিমতের সম্পদ থেকে কোনো অংশ দেওয়া হয়নি।[২]

বিষণ্ন মদীনার আনসার

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গনিমতের সম্পদ থেকে বিরাট অংক কুরাইশদেরকে দান করেছেন। বিশেষ করে যারা গত এক-দুই সপ্তাহের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদেরকে। তারা সবেমাত্র মুসলমান হয়েছেন। ইসলামের পক্ষে তাদের কোনো অবদানও নেই। তাদের বাইরে আরও অনেককেই বিশাল পরিমাণে গনিমতের সম্পদ দেওয়া হয়েছে। মদীনার আনসারী সাহাবীগণ এই দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছেন, অথচ ইসলামের পক্ষে তাদের ত্যাগ ও বিসর্জনের কোনো অন্ত ছিল না। এই দৃশ্য দেখে তাদের অন্তরে কিছুটা আঘাত লেগেছে। বিষণ্ন মনে তারা এইসব দেখা শোনার পর পরস্পরে এ নিয়ে কথা বলতে শুরু করে—হযরত রাসূল

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৪ : ১৪০; ইবনে সাদ, *আত তাবাকাত*, ২ : ১৫-১৫৩ অবশ্য *তাবাকাতে ইবনে সাদের* বর্ণনায় আছে—এই একশো উটের সঙ্গে প্রত্যেককে আরও চল্লিশ উকিয়া করেও দান করা হয়েছে।

২ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৪ : ১৪৩-১৪৫।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্প্রদায়কে এত বিশাল পরিমাণে সম্পদ দান করছেন, অথচ আমাদের প্রতি সামান্য নজর দিচ্ছেন না। ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে আমরা সদা যুদ্ধ করেছি। শত্রুদের রক্ত এখনো আমাদের তরবারিতে শুকিয়ে যায়নি। হযরত সাদ ইবনে উবাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু-ও একজন আনসারী সাহাবী ছিলেন। কথাগুলো তিনিও শুনতে পান। তারপর ভাবেন, নবীজিকে এ বিষয়ে অবগত করা উচিত। ছুটে যান নবীজির দরবারে। সবিস্তারে বিষয়টি নবীজির খেদমতে তুলে ধরেন। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এ বিষয়ে তোমার মত কী? হযরত সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমিও তো আনসারদেরই একজন। এ কথা শোনার পর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশের সুরে বলেন—আনসারীগণকে একটি তাঁবুর ভেতর সমবেত করো। এই তাঁবুতে যেন আনসারী ব্যতীত আর কেউ না থাকে। হযরত সাদ ইবনে উবাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু সকল আনসারী সাহাবীকে বিষয়টি অবগত করেন। তারা একটি তাঁবুর ভেতর সমবেত হন। হযরত সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু গিয়ে নবীজিকে জানান—আনসারীগণ একটি তাঁবুর মধ্যে সমবেত হয়েছে। নবীজি সঙ্গে সঙ্গে সেখানে আগমন করেন। অতঃপর আনসারীগণের উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন—

হে আনসার-সম্প্রদায়, আমি তোমাদের পক্ষ থেকে এসব কী কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছি! তোমাদের অন্তরে কেমন করে এমন বিষণ্নতার সৃষ্টি হলো? তোমরা কি পথহারা ছিলে না? আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে সরল পথ দেখিয়েছেন। তোমরা অভাবী ছিলে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ধনসম্পদ দান করেছেন। তোমরা ছিলে পরস্পরে শত্রু। আল্লাহ তাআলাই তোমাদের অন্তরে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আনসারগণ তখন সমস্বরে বলে ওঠেন—আপনি ঠিক বলেছেন। আমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার অসীম দয়া ও করুণা।

নবীজি বললেন, হে আনসারীগণ, তোমরা আমার কথার উত্তর দাও। তারা বললেন, আমরা কী উত্তর দেব? নবীজি বললেন, তোমরা বলতে পারো এবং তোমাদের সে বলা অবশ্যই সত্য—যখন পৃথিবীর সকল মানুষ আপনাকে মিথ্যারোপ করেছে, আমরা আপনাকে সত্যরূপে মেনে নিয়েছি।

যখন আপনার কোনো সাহায্যকারী ছিল না, তখন আমরা আপনাকে সাহায্য করেছি। সকলে যখন আপনাকে তাড়িয়ে দিচ্ছিল, আমরা তখন আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। আপনার তখন অভাব ছিল, আমরা সেই অভাব পূরণ করেছি।

হে আনসারীগণ, তোমরা এই পার্থিব জগতের ক্ষণস্থায়ী সামান্য তুচ্ছ সম্পদের কারণে মনোকষ্ট পেয়েছ? আমি তো তাদেরকে এসব সম্পদ এই কারণে দিয়েছি—তাদের অন্তরে ঈমান এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই সম্পদের উসিলায় হয়তো তাদের বিশ্বাস পরিপক্ক হবে। আর আমি তো তোমাদের জন্যে তোমাদের ইসলামকেই যথেষ্ট মনে করি।

হে আনসারীগণ, তোমরা আমাকে বলো, অন্য সকল লোক এখান থেকে উট ছাগল এবং অন্য পশুর পাল নিয়ে নিজ নিজ ঘরে যাবে আর তোমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাবে আল্লাহর রাসূলকে। যাঁর হাতে আমার প্রাণ, সেই আল্লাহর কসম করে বলছি—যদি হিজরত না হতো, তা হলে আমি আনসারদেরই একজন সদস্য হতাম। সকল মানুষ যদি এক পথে চলে আর আনসারগণ যদি চলে অন্য পথে, আমি চলব আনসারদের পথে। হে আল্লাহ, আনসারদের প্রতি রহম করো। তাদের সন্তানদের প্রতি দয়া করো। তাদের সন্তানদের সন্তানদের প্রতি করুণা করো।[১]

নবীজির এই কথাগুলো শুনবার পর আনসারগণ কান্নায় ভেঙে পড়েন। চোখের পানিতে তাদের দাড়ি ভিজে যায়। অশ্রুস্রোতে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে উঠে অন্তরের সকল ধুলোবালি। সম্পদের কল্পনাও তাদের অন্তর থেকে উড়ে যায়। বরং তারা সম্পদ থেকে বঞ্চিত হওয়াটাকে গর্বের বিষয় মনে করতে থাকে। তাদের এই ভাগ্য তাদের কাছে হয়ে উঠে পরম গৌরবের বিষয়।

মদীনায় প্রত্যাবর্তন

যিইরানায় গনিমতের সম্পদ বণ্টন সমাপ্ত হওয়ার পর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার পথে যাত্রা করেন। এই যাত্রা ছিল

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৪ : ১৪৮।

উমরার উদ্দেশ্যে। উমরা সম্পন্ন করার পর হযরত আত্তাব ইবনে উসাইদকে মক্কার যথারীতি শাসক নিযুক্ত করেন। হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিযুক্ত করেন তার নায়েব। তারা পূর্ব থেকেই এই দায়িত্ব পালন করছিলেন। সেই পূর্ব আদেশই আবার নবায়ন করা হয়। মক্কা জয় হয়েছিল রমযানের মাঝামাঝিতে। হুনাইন এবং তায়েফের যুদ্ধ হয় শাওয়াল মাসে। জিলকদ মাসে নবীজি উমরা করেন। তারপর মদীনার উদ্দেশে যাত্রা করেন।

বিখ্যাত এক কবির ইসলাম গ্রহণ

কাব ইবনে যুহাইরা ইবনে আবু সালমান ছিলেন তৎকালীন সময়ে আরবদের অন্যতম বিখ্যাত কবি। এখনো মুসলিম জাতির বিদ্বানজনেরা তার কবিতার কথা জানেন। তার কাব্যগ্রন্থের নাম—

قصيدة بانت سعاد

আরবের অন্য কবিরা যেমন নবীজির বিরুদ্ধে নিন্দামূলক বেয়াদবিপূর্ণ নানা কবিতা রচনা করেছিল, বিষাক্ত তিরের ফলার মতো যেসব কবিদের কবিতা মুসলমানদের হৃদয় ও বিশ্বাসকে বরাবর দীর্ণ করেছিল, তন্মধ্যে কাব ইবনে যুহাইরের কবিতাও ছিল। বিষাক্ত ওসব কবিতার রচয়িতাদের এবং তাদের কবিতা আবৃত্তি করে বেড়াত যেসব নারী—মক্কা বিজয়ের সময় তাদেরকে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধী বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। আদেশ করা হয়েছিল—তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে, সেখানেই হত্যা করা হবে। ফলে, মক্কা ও তার আশপাশে এমন বেশ কিছু অপরাধী তাদের কৃতকর্মের যথার্থ স্বাদ আস্বাদন করেছে। কাব ইবনে যুহাইরের ভাই বুহাইর ছিলেন মুসলমান। তিনি দুর্ভাগা সেসব কবিদের পরিণতি দেখেছেন। দেখার পর তিনি তার ভাই কাব ইবনে যুহাইরকে এই মর্মে চিঠি লিখেছিলেন—তুমি এই জাতীয় কবিতা লেখা বন্ধ করো। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম কবুল করে নাও। তোমার মতো বেশ ক'জন কবির গর্দান এরই মধ্যে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য যারা তওবা করে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া

হয়েছে। তাই আমি তোমার জন্যে এটাই কল্যাণকর মনে করছি—যত তাড়াতাড়ি পারো, নবীজির খেদমতে এসে তওবা করো।

কাব ইবনে যুহাইর যখন এই পত্র পান, তার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যেতে থাকে। অস্থির হয়ে পড়েন। ভাবতে থাকেন—শীঘ্রই আমাকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে! তার কাছে মনে হতে থাকে, মৃত্যু যেন তার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে কোনো মুহূর্তে মৃত্যু তার লৌহপাঞ্জা আমার কণ্ঠে বসিয়ে দেবে। কারণ, কাব যেখানে বসবাস করত, তার কাছেই বেশ কিছু মুসলমানও বসবাস করত। ফলে, যে কেউ যে কোনো সময় তার ঠিকানা বলে দিতে পারে। নবীজিও তাদের যে কাউকে হত্যার আদেশ দিতে পারেন। কেউ এ মর্মে আদিষ্ট হলে তার আর রক্ষা নেই। এই ভয় ও আশঙ্কা তাকে সর্বদা তাড়া করে ফিরতে থাকে। অবশেষে চরম শঙ্কা ও অস্থিরতায় সোজা ছুটে আসেন মদীনায়। জুহাইনা গোত্রের এক ব্যক্তির বসবাস ছিল এখানে। তার সঙ্গে কাব ইবনে যুহাইরের পরিচয় ছিল। কবি কাব তার ঘরে গিয়ে ওঠেন। তখন ছিল রাত। লোকটি তাকে রাতে সঙ্গে রাখে। ফজর নামাযের পর তাকে সঙ্গে করে নবীজির মসজিদে উপস্থিত হয়। ফজর নামায নবীজির মসজিদে আদায় করার পর ওই সাহাবী কাব ইবনে যুহাইরকে ইশারা করে দেখায়—ওই যে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! চলুন, আমরা নবীজির খেদমতে হাজির হয়ে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। কাব ইবনে যুহাইর নবীজির মজলিসে এসে বসে পড়েন। নবীজির হাতে নিজের হাত সমর্পণ করেন। নবীজি কাব ইবনে যুহাইরকে চিনতেন না। জুহাইনা গোত্রের সেই ব্যক্তি আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, কাব ইবনে যুহাইর উপস্থিত। আপনার কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছে এবং ইসলাম কবুল করতে চায়। আপনি কি তার প্রার্থনা কবুল করবেন? হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, যদি তওবা করে মুসলমান হয়, তা হলে তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে। তখন সঙ্গে সঙ্গে কাব ইবনে যুহাইর বলে ওঠেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি উপস্থিত। আমি কাব ইবনে যুহাইর। এদিকে মজলিসে একজন আনসারী যুবক ছিলেন। যখন জানতে পারলেন—এটা কাব ইবনে যুহাইর তখন সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। নবীজিকে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে

অনুমতি দিন, আমি এখনই এর গর্দান উড়িয়ে দেব। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। সে তার কৃতকর্মের জন্যে লজ্জিত হয়ে তওবা করতে এসেছে। এই ঘটনার কারণেই কাব ইবনে যুহাইর বরাবর আনসারদের প্রতি মনমলিন ছিলেন। কারণ, সেখানে মুহাজিরদের সকলেই উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাদের কেউ তাকে কিছু বলেনি, অথচ আনসারদের এক ব্যক্তি তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার কথা বলেছে। কাব তার দীর্ঘকবিতা—

بانت سعاد

রচনা করার পর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়েছিলেন। চুয়ান্ন পঙ্‌ক্তিবিশিষ্ট তার সেই দীর্ঘকবিতা নবীজিকে শুনিয়েছিলেন। কাব ইবনে যুহাইর এই মজলিসেই ইসলাম গ্রহণ করেন।[১]

অষ্টম হিজরীর আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

মক্কা বিজয় হয় রমযান মাসে। শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয় হুনাইন যুদ্ধ। তারপর তায়েফ ঘেরাও করা হয়। জিলকদ মাসে নবীজি যিইরানা থেকে মক্কায় আসেন এবং উমরা আদায় করেন। জিলহজের শেষের দিকে মদীনায় পৌঁছান। এই বছরই মুশরিক এবং অগ্নিপূজকদের থেকে জিযিয়া আদায় করা হয়। জিলহজ মাসেই মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় পুত্র হযরত ইবরাহিম রাযিয়াল্লাহু আনহু জন্মগ্রহণ করেন। এই বছরই নবীজির নির্দেশে খালেদ ইবনুল ওলীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু আরবদের বিখ্যাত মূর্তি উযযার পূজাঘর গুঁড়িয়ে দেন। এই পূজাঘরটি ছিল মক্কা ও তায়েফের মাঝখানে একটি খেজুরবাগানে। আরেকটি বিখ্যাত মূর্তি ছিল সোয়া নামে। এর পূজারি ছিল হুযাইল গোত্র। নবীজির নির্দেশে আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু সোয়ার পূজাঘর গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন। তৃতীয় আরেকটি বিখ্যাত মূর্তি মানাত। পবিত্র কুরআনেও এই মানাতের কথা আছে। আনসারদের বিখ্যাত দুই গোত্র

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪ : ৩৬৪-৩৭৪; *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৪ : ১৫২-১৬৬।

আউস এবং খাজরায ছিল মানাতপূজারি। মানাতের মূর্তিশালা গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন হযরত সাদ ইবনে যায়েদ আশহালী রাযিয়াল্লাহু আনহু। এই বছরই যুলখালসার বিখ্যাত মূর্তিশালা ভেঙে দেওয়া হয়। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন, তুমি কি যুলখালসার মূর্তিশালাটি ভেঙে আমার অন্তরে স্বস্তির ব্যবস্থা করবে না? হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অবশ্যই করব। কিন্তু আমার সমস্যা হলো, যখনই ঘোড়ার পিঠে উঠে বসি, পড়ে যাই। নবীজি তখন তার বুকে মৃদু হস্তাঘাত করে বলেছিলেন—

اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا.

হে আল্লাহ, তুমি তাকে সুদৃঢ় রেখো। তাকে পথপ্রাপ্ত এবং পথপ্রদর্শক হিসেবে কবুল করো।

এরপর তিনি কখনো আর ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়েননি। তারপর তিনি দেড়শো ঘোড়সওয়ার নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। ইয়েমেনের একটি মূর্তিশালা ছিল যুলখালসা। খাসআম এবং বুজাইলাহ গোত্রের লোকেরা এর পূজা করত। এই মূর্তিশালাটিকে ইয়েমেনের কাবাও বলা হতো। এই ঘোড়সওয়ার-বাহিনী সেখানে গিয়ে মূর্তিশালাটি গুঁড়িয়ে ফেলে। আগুন ধরিয়ে দেয়। একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে।

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর এই দল যখন মূর্তিশালাটিতে গিয়ে পৌঁছয়, তখন এক ব্যক্তি সেখানে দাঁড়িয়ে ভাগ্যনির্ণায়ক তির দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করছিল। তাকে বলা হলো, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি এখানে উপস্থিত। তারা যদি এখানে এসে তোমাকে পায়, তা হলে তোমাকে মেরে ফেলবে। ঘটনাক্রমে ঠিক ওই সময় হযরত জারীর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার মাথার কাছে এসে দাঁড়ান। শাসনের সুরে বলেন—হাতের তিরগুলো ভেঙে ফেলে দাও, নইলে এখনই তোমার গর্দান উড়িয়ে ফেলা হবে। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে হাতের তিরগুলো ভেঙে ছুড়ে কালেমায়ে শাহাদাত পড়ে ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত জারীর রাযিয়াল্লাহু আনহু আরতাত নামক এক ব্যক্তিকে এই

বলে মদীনায় পাঠিয়ে দেন—নবীজিকে সুসংবাদ দাও, মূর্তিশালাটিকে ভেঙে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সংবাদ পাওয়ার পর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচবার ওই ঘোড়সওয়ারদের জন্যে দুআ করেন।

তাবুক যুদ্ধ

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে ফিরে আসার পর ছয়-সাত মাস মদীনাতেই ছিলেন। নবম হিজরীর রজব মাসে সংবাদ পান—রোমসম্রাট বিশাল এক সৈন্যবাহিনী সমবেত করেছে। পুরো বাহিনীকে এক বছরের বেতন পরিশোধ করে দিয়েছে। তা ছাড়া লাখম জুযাম ও গাসসান প্রভৃতি গোত্রের লোকজনও এই বাহিনীর সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে। এই বাহিনীর অগ্রদল বালকা নামক স্থানে পৌঁছে গেছে। সংবাদটি দ্রুত পুরো মদীনায় ছড়িয়ে পড়ে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সংবাদ শোনার পর সকলকে এর প্রতিরোধের জন্যে প্রস্তুত হতে বলেন। নবীজি সকল মুসলমান গোত্রে লোক পাঠিয়ে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্যে মদীনায় ডেকে পাঠান। তখন ছিল গ্রীষ্মকাল। তা ছাড়া মদীনা ছিল দুর্ভিক্ষকবলিত। তখনো মদীনার বাগানগুলোতে ফল পাকেনি। সর্বত্র অভাব। যুদ্ধের খরচেরও সংকট ছিল। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে মসজিদে ডেকে দানের প্রতি উৎসাহিত করেন। এ উপলক্ষে হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু দান করেছিলেন সবচেয়ে বেশি সম্পদ। হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ঘরের সামানপত্র এনে নবীজির সামনে রেখে দিয়েছিলেন। ধনী সাহাবীগণ প্রত্যেকেই সামর্থ্যমাফিক অংশগ্রহণ করেছেন। যাদের কোনো বাহন ছিল না, তারা কাঁদতে কাঁদতে নবীজির খেদমতে এসে হাজির হয়েছেন। কিন্তু নবীজিও বলতে বাধ্য হয়েছেন—মুসলমানদের কাছে উট নেই যে, তোমাদেরকে দেব। তখন সামর্থ্যবান মুসলমানগণ তাদেরকে সাহায্য করেছেন।

মদীনায় বসবাসরত মোনাফেক-সম্প্রদায় সর্বদাই চাতুর্যের আশ্রয় নিত। তারা কখনো সরল মনে মুসলমানদেরকে সঙ্গ দেয়নি। তাবুক যুদ্ধের সময়ও

তারা মুসলমানদের সঙ্গে যেতে চাচ্ছিল না। তাই নবীজির খেদমতে এসে কল্পিত নানা বাহানা তুলে ধরে। এদের সংখ্যা ছিল প্রায় আশিজন। নবীজি তাদের অবস্থা ভালো করেই জানতেন। তাদের কথাবার্তা শোনার পর সোজা বলে দিয়েছেন, তোমরা যেতে না চাইলে না যাবে। অবশ্য খাঁটি মুসলমানদের মধ্যেও কোনো কোনো কবিলার লোকজন এসে তাদের অপারগতার কথা বলেছেন। নবীজি তাদের অপারগতা কবুল করেননি। তাদেরকে সোজা প্রস্তুতি নিতে বলেছেন। এদের সংখ্যাও ছিল প্রায় বিরাশি। মদীনাতে এমন কিছু লোকও ছিলেন, যারা ছিলেন সত্যিই নিষ্ঠাবান। সত্যবাদী এবং সরল দিলের। তাদের এখলাস ও সততায় কোনো সন্দেহ ছিল না। তারপরও তারা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। এদের মধ্যে কাব ইবনে মালেক, হেলাল ইবনে উমাইয়াহ, মুরারা ইবনে রবী, আবু খায়সামাহ আসসায়ী এবং আবু যর গিফারীও ছিলেন। বিখ্যাত মোনাফেক-সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল সকল মোনাফেক এবং তাদের সন্ধিবদ্ধ ইহুদিদেরকে নিয়ে নবীজির চলতিপথ সানিয়্যাতুল বিদায় আগে থেকেই উপস্থিত ছিল। উদ্দেশ্য ছিল নবীজি যেন ধরে নেয়— আমরাও তাঁর সঙ্গে সফরে যাচ্ছি। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তখন ত্রিশ হাজার যোদ্ধা। তন্মধ্যে দশ হাজার ঘোড়সওয়ার। বিশাল এই বাহিনী পথ চলতে থাকে। ধীরে ধীরে সানিয়্যাতুল বিদা পার করে চলে যায়। তারপর আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল গোপনে তার সঙ্গীদেরকে নিয়ে কেটে পড়ে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ঘরে চলে যায়। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদেরকে বলেছিলেন, প্রত্যেক গোত্র যেন নিজেদের জন্যে স্বতন্ত্র পতাকা বানিয়ে নেয়। মদীনার বাইরে থেকে আগত কবিলাগুলোকেও আলাদা আলাদা পতাকা তৈরি করে নিতে আদেশ করা হয়েছিল। তারপর ত্রিশ হাজার সৈন্যের এই বিশাল বাহিনী নিয়ে তাবুকে পৌঁছান। তাবুকে বিশ দিন অবস্থান করেন।

মদীনার কোনো কোনো সাহাবী এই বাহিনীতে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তারা যখন তাদের ভুল ধরতে পারেন, তখন একাই তাবুকের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন

তাবুকে তাঁবুর মধ্যে অবস্থান করছেন, হযরত আবু খায়সামা এবং আবু যর গিফারী তখন গিয়ে তাবুকে ওঠেন। তারপর মদীনায় অবশিষ্ট থাকেন মাত্র তিন ব্যক্তি—কাব ইবনে মালেক, হেলাল ইবনে উমাইয়া এবং মুরারা ইবনে রবী।

প্রচারিত সংবাদটি ছিল ভুল

তাবুকে পৌছে জানতে পারেন—প্রচারিত সংবাদটি ভুল ছিল। রোমের কোনো সৈন্যবাহিনী মদীনায় আক্রমণ করার লক্ষ্যে বের হয়নি। হেরাক্লিয়াস তখন হিমসে অবস্থান করছিল। ফলে রোমকদের পক্ষ থেকে হামলার কোনো আশঙ্কা ছিল না। এজন্যে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য জনবসতির প্রতি মনযোগী হোন। হযরত খালেদ ইবনুল ওলীদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে চারশো ঘোড়সওয়ারসহ উকাইদির ইবনে আবদুল মালেকের কাছে দুমাতুল জানদালে পাঠিয়ে দেন। দুমাতুল জানদাল মদীনা থেকে পনেরো দিনের পথ। উকাইদির মূলত কিন্দার বাসিন্দা ছিল। ওখানে গিয়ে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। সে ছিল খ্রিস্টান। হযরত খালেদ ইবনুল ওলীদ যখন দুমাতুল জানদালে পৌছান, তখন ছিল ভরা পূর্ণিমার রাত। উকাইদির এবং তার ভাই হাসসান তাদের জনবসতি থেকে বেরিয়ে এসে তাদের পালিত পশুগুলো তাড়াচ্ছিল। খালেদ ইবনুল ওলীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বাহিনী উকাইদিরকে গ্রেপ্তার করে ফেলে। হাসসান প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করে সাহাবায়ে কেরামের হাতে নিহত হয়। তাদের সঙ্গে যারা ছিল তারা পালিয়ে দুর্গের ভেতর চলে যায়। হযরত খালেদ ইবনুল ওলীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু উকাইদিরকে ধরে নবীজির খেদমতে নিয়ে আসেন। উকাইদির নবীজির সঙ্গে সন্ধি করে নেয়। তার ওপর আরোপিত যুদ্ধজরিমানা আদায় করে দেয়। এর পরিমাণ ছিল—দুই হাজার উট চারশো লৌহবর্ম এবং চারশো বর্শা। তার ওপর বার্ষিক জিযিয়া আরোপ করা হয়। এর বিনিময়ে তার ইজ্জত আব্রু এবং জান-মালের নিরাপত্তাবিধান করা হয়। এই মর্মে তাকে একটি চুক্তিনামাও লিখে দেওয়া হয়। তখনো হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো মোহর ছিল না। ফলে তিনি নখে ওই চুক্তিনামায় সিল করেছিলেন। রোমকদের

পক্ষ থেকে তাবুক গমন কিংবা তার কোনো আশঙ্কাও লক্ষ করা যায়নি। তাই রমযানেই নবীজি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় ফিরে আসেন।[১]

মসজিদে যেরার

মদীনা থেকে এক প্রহর দূরত্বে একটি জনবসতি ছিল—যি-ওয়ান। সেখানে বারো জন ব্যক্তি মিলে একটি মসজিদ বানিয়েছিল। ইসলামের ইতিহাসে একে মসজিদে যেরার বলা হয়। এই মসজিদ নির্মাতাদের উদ্দেশ্য ভালো ছিল না। তারা মসজিদ বানিয়েছিল মুসলমানদের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে। মসজিদ তৈরি করার পর তাদের কয়েকজন মদীনায় এসে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন জানায়—আপনি আমাদের মসজিদটি উদ্বোধন করে দিন। নবীজি বললেন, আমি এখন সফরে যাচ্ছি। দীর্ঘ সফর। ফেরার পথে যখন এ পথে আসব, তখন দেখা যাবে। তাবুক থেকে মদীনায় ফেরার সময় যখন যি-ওয়ান পৌঁছান, তখন নবীজি মালেক ইবনে দাখশাম মাআন ইবনে আদী এবং আসেম ইবনে আদীকে ডেকে বলেন—দুর্ভাগাদের ওই মসজিদটি গিয়ে গুঁড়িয়ে দাও। ওতে আগুন ধরিয়ে দাও। আদেশ পাওয়ামাত্র তারা দ্রুত বেরিয়ে পড়েন। মালেক ইবনে দাখশাম ছিলেন বনু সালেম গোত্রের লোক। তিনি তার গোত্রের কাছে এসে হযরত মাআনকে বলেন. তোমরা এখানে দাঁড়াও। আমি বাড়ি থেকে আগুন নিয়ে আসছি। তিনি ঘরে যান। খেজুরের একটি শুকনো শাখায় আগুন ধরিয়ে ছুটে আসেন। তারপর সেই মসজিদটির কাছে গিয়ে আগুন ধরিয়ে দেন। তারপর মসজিদটি ভেঙে চুরমার করে ফেলেন। ফিরে আসেন নবীজির খেদমতে। পবিত্র কুরআনে এই মসজিদ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে—

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

---

১ ইবনে সাদ, *আত তাবাকাত* : ১৬৫-১৬৭।

এবং যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে ক্ষতিসাধন কুফুরি ও মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। [তাওবা : ১০৭][১]

হযরত কাব ইবনে মালেকের ঘটনা

তিনজন মুখলিস ও নিষ্ঠাবান মুসলমান কোনো কারণ ছাড়াই তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। তারা হলেন—কাব ইবনে মালেক, মুরারা ইবনে রবী এবং হেলাল ইবনে উমাইয়া। যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার মতো শরীয়তসমর্থিত কোনো কারণ তাদের কাছে ছিল না। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাবুক থেকে ফিরে আসেন, সাহাবায়ে কেরামের মাঝে ঘোষণা করে দেন—এই তিনজনের সঙ্গে কেউ কথা বলবে না। সালাম দেবে না। তবে মোনাফেকদের বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। নবীজি মদীনায় আসামাত্র তারা দলে দলে ছুটে আসে। তারপর কসম করে করে নানা ধরনের কৈফিয়ত পেশ করতে থাকে। তাদের ওসব কৈফিয়ত ছিল মিথ্যা। তারপরও নবীজি তাদেরকে কিছুই বলেননি। তাদের বিষয়টাকে সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে গেছেন। তারা তো প্রকৃত অর্থে মুসলমানই ছিল না। এর বিপরীতে এই তিনজন সাহাবী ছিলেন পরিপূর্ণ ঈমানদার। তাই তাদের এই অবহেলা ছিল ক্ষমার অযোগ্য। এই কারণেই বয়কট করে তাদের সতর্ক করা হয়েছিল।

হযরত কাব ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজেই তার সে দুর্দিনের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। *বুখারী শরীফে* তার যবানিতে বর্ণিত সেই দীর্ঘ হাদীস উল্লিখিত হয়েছে। তিনি বলেছেন—

তাবুক যুদ্ধের সময় আমার কাছে সব রকমের উপায়-উপকরণ ছিল। আমি মূলত অবহেলা করেছি। অলসতাবশত ভাবতাম, আজ যাব না, কাল চলে যাব। কাল ভাবতাম, পরশু যাব। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বিশাল বাহিনী ছিল। সকলের নাম তালিকাভুক্ত করবার মতো কোনো রেজিস্টার খাতাও ছিল না। আমি ভাবতাম, প্রস্তুত হওয়া দরকার। অবহেলায় প্রস্তুতি হয়ে উঠছিল না। আজ যাব, কাল যাব করে

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৪ : ১৮৫; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৫ : ২১-২২।

করে বিলম্ব হতে থাকে। প্রস্তুতি আর হয়ে উঠে না। অবশেষে ভাবতে থাকি, নবীজি তাবুকে থাকতে থাকতেই পৌঁছে যাব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটাও হয়ে উঠেনি। পরিণতিতে আমার আর তাবুকে অংশগ্রহণ করা হয়ে উঠেনি। পরে জানতে পারি, নবীজি তাবুকে আমার নাম নিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন—কাব ইবনে মালেক কোথায়? বনু সালামার এক ব্যক্তি তখন আমার সম্পর্কে কিছু কষ্টদায়ক কথা বলেছে। অবশ্য হযরত মুআয ইবনে জাবাল বলেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, কাব ইবনে মালেকের মাঝে তো আমরা বরাবর ভালোই পেয়েছি।

আমরা যখন জানতে পারি, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক থেকে ফিরছেন, তখন আমার দুশ্চিন্তা সীমা ছাড়িয়ে যায়। ভাবতে থাকি—মিথ্যা বলে নিজেকে নবীজির ক্ষোভ থেকে রক্ষা পাব, কিন্তু আমার মন তাতে সায় দিলো না। সিদ্ধান্ত নিলাম, যা বলার সত্য বলব। এর ব্যতিক্রম কিছু বলব না। নবীজি মদীনায় আগমন করেন। অভ্যাসমাফিক মসজিদে দুই রাকাত নামায পড়ে সাক্ষাৎদানের উদ্দেশ্যে সেখানেই উপবেশন করেন। এই যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করতে পারেনি—যাদের সংখ্যা প্রায় আশিজন—নবীজির খেদমতে এসে কসম করে করে কৈফিয়ত দিতে থাকে। নবীজিও তাদের কৈফিয়ত মেনে নিতে থাকেন। তাদের জন্যে মাগফেরাতের দুআ করতে থাকেন। আমি নবীজির সামনে গিয়ে সালাম দিই। নবীজি রাগে মুচকি হেসে বলেন, এদিকে আসো। আমি সামনে গিয়ে বসে যাই। নবীজি বললেন, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করোনি কেন? তুমি কি যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে বাহন কেনোনি? আমি বললাম, আমার কোনো সমস্যা ছিল না। যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করাটা আমার ভুল ছিল। নবীজি বললেন, তুমি সত্য কথা বলেছ। সুতরাং এখন চলে যাও। আল্লাহ তাআলাই তোমার ফয়সালা করবেন। আমি সেখান থেকে উঠে চলে আসি। বাইরে এসে লোকজনকে জিজ্ঞেস করি—আমার মতো এমন ঘটনা আর কারও ক্ষেত্রে ঘটেছে কি? তারা জানাল—হ্যাঁ, আরও দুইজনের ক্ষেত্রে ঘটেছে। তারা হলেন মুরারা ইবনে রবী এবং হেলাল ইবনে উমাইয়া।

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলকে আমাদের সঙ্গে সালাম এবং কথাবার্তা বলতেও নিষেধ করে দেন। ফলে আমরা সম্পূর্ণরূপে

বয়কটের শিকার হয়ে পড়ি। কেউ আমাদেরকে সালাম দিত না। আমরা সালাম দিলে কেউ জবাব দিত না। কোনো কথা জিজ্ঞেস করলে তার উত্তরও দিত না। এভাবে পঞ্চাশ দিন কেটে যায়। আমার অপর দুই সঙ্গী তো একেবারে গৃহবাসী হয়ে পড়ে। তারা ঘরের বাইরে যেত না, কিন্তু আমি ঘর থেকে বের হতাম। পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে মসজিদে যেতাম। মসজিদেই নামায পড়তাম। আমি রীতিমতো বাজারেও যেতাম। কথা বলতাম। কেউ আমার সঙ্গে কথা বলত না। আমার কথার উত্তরও দিত না। মসজিদে নামায শেষ করে নবীজির সামনে গিয়ে সালাম দিতাম। গভীরভাবে লক্ষ করতাম, তার ঠোঁট মোবারকে কোনো সঞ্চলন লক্ষ করা যায় কিনা? আমি নবীজির কাছেই নামায পড়তাম। আড়চোখে নবীজির দিকে তাকাতাম। আমি যখন নামাযে নিমগ্ন হতাম, তিনি আমার দিকে তাকাতেন। আমি যখন তাকাতাম, চেহারা ফিরিয়ে নিতেন। মানুষ আমার সঙ্গে কথাবার্তা বর্জন করায় আমার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। চরম অস্থিরতায় আমি বেসামাল হয়ে পড়ি। একদিন আমি আমার চাচাতো ভাই আবু কাতাদার দেয়ালের ওপর উঠে দাঁড়াই। তার সঙ্গে ছিল আমার দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক। সেই সম্পর্কও ছিল গভীর। আমি দেয়ালে উঠে তাকে সালাম দিই। খোদার কসম, সে আমার সালামের কোনো উত্তরই দেয়নি। আমি তখন আবু কাতাদাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দোহাই দিয়ে বলি—তুমি কি জানো না, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে খাঁটি মনে ভালোবাসি! আমি তাকে বারবার কসম দেওয়ার পরও আবু কাতাদা একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি। বেদনার জলে আমার চোখ ভরে উঠে। যন্ত্রণায় আমার অন্তর জুড়ে কান্নার রোল উঠে। আমি দেয়ালের ওপর থেকে লাফিয়ে নেমে আসি। তারপর বাজারে চলে যাই। বাজারে যাওয়ার পর সেখানে একজন অনারব যাযাবরের সঙ্গে দেখা হয়। সে মানুষের কাছে আমার ঠিকানা খুঁজে ফিরছিল। মানুষ ইশারায় আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে—এটাই কাব ইবনে মালেক। লোকটি আমার হাতে একটি পত্র তুলে দেয়। পত্রটি পাঠিয়েছে গাসসানের বাদশাহ। সে ওই পত্রে লিখেছে—আমি জানতে পারলাম, তোমার মনিব তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট। তার নির্দেশে সাধারণ মুসলমানগণও তোমার সঙ্গে বয়কট করেছে। তুমি কষ্টে নিপতিত আছ। তাই আমি

তোমাকে দাওয়াত দিচ্ছি, আমাদের কাছে চলে আসো। আমরা তোমাকে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেব।

এই চিঠি পড়ামাত্র আমার শরীরের সবগুলো লোম দাঁড়িয়ে যায়। মনে মনে ভাবতে থাকি—আমি এতটাই দুর্ভাগা হয়ে পড়লাম—একজন মুশরিক আমাকে তার সঙ্গী করার দুঃসাহস দেখাচ্ছে! আমি চিঠিটি এনে জ্বলন্ত চুলায় ছেড়ে দিই। বয়কটের চল্লিশদিন পার হওয়ার পর নবীজির পক্ষ থেকে আদেশ আসে—তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে আলাদা করে দাও। আমি জানতে চাই, তালাক দিয়ে দেব? হুকুম হলো—না, তালাক দেওয়ার প্রয়োজন নেই। শুধু আলাদা থাকলেই চলবে। আমার অপর দুই সঙ্গীকেও এই একই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, তুমি তোমার মায়ের কাছে চলে যাও। আল্লাহ তাআলা যখন ফয়সালা করবেন, তখন ফিরে এসো।

এই নির্দেশের পর দশ দিন কেটে যায়। পঞ্চাশতম দিনে আমি আমার বাড়ির ছাদে ফজরের নামায আদায় করি। আমি সলম পর্বতে একটি তাঁবু পেতে নিয়েছিলাম। সেখানেই একাকী থাকতাম। ফজর নামায পড়ে একাকী বসে আছি। এমন সময় লক্ষ করলাম—ওই পাহাড়ের ওপর থেকে কে যেন উচ্চ আওয়াজে ঘোষণা করছে—কাব ইবনে মালেক, সুসংবাদ! আমি সঙ্গে সঙ্গে সেজদায় পড়ে যাই। আমি বুঝতে পারি, নিঃসন্দেহে আমার তওবা কবুল হয়েছে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই কথা সকলকে জানিয়ে দিয়েছেন। মানুষ আমাদেরকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্যে বেরিয়ে পড়েছে। বনু আসলামের এক ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়ে আমার কাছে ছুটে আসে। আমাকে সুসংবাদ দেয়। আমি আনন্দে আমার গায়ের কাপড় খুলে তাকে পরিয়ে দিই। কারণ, তখন দেওয়ার মতো আমার কাছে আর কিছুই ছিল না। পরে আরেকজনের কাছ থেকে কাপড় ধার নিয়ে শরীর ঢাকি। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হই। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন উপবিষ্ট ছিলেন। তাকে ঘিরে রেখেছেন সাহাবায়ে কেরাম। আমাকে দেখে তারা উঠে এসে সাক্ষাৎ করে এবং মোবারকবাদ জানাতে থাকে। আমি মসজিদে প্রবেশ করি। তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ আমাকে দেখে উঠে এসে

মোবারকবাদ জানায়। আমি এগিয়ে গিয়ে নবীজিকে সালাম দিই। আনন্দে তখন নবীজির চেহারা জ্বলজ্বল করছিল। নবীজি তখন বললেন, তোমাকে সুসংবাদ! এমন দুর্দিন হয়তো তোমার জীবনে খুব কমই এসেছে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সুসংবাদ আপনার পক্ষ থেকে না আল্লাহর পক্ষ থেকে। নবীজি বললেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে।[১]

এরপর হযরত কাব ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সকল সহায়-সম্পদ আল্লাহর পথে এই কারণে দান করে দেন—এই দুনিয়াবি সহায়-সম্পদের কারণেই তাকে অলসতা পেয়েছিল। সম্পদের মধ্যে জীবিকার জন্যে শুধু খায়বারের জায়গাটুকু রেখেছিলেন।

সাকীফ গোত্রের ইসলাম গ্রহণ

শেষ পর্যন্ত তায়েফ বিজয় হয়নি। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিজয় ছাড়াই ঘেরাও প্রত্যাহার করে নেন। ফেরার সময় তাদের হেদায়েতের জন্যে দুআ করেন। পরে এই অঞ্চলের নেতা মালেক ইবনে আউফ ইসলাম কবুল করে নেন। তার আগেই অবশ্য ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিল তার পুরো গোত্র। মালেক ইবনে আউফ মুসলমানদের সঙ্গে করে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন বনু সাকীফের বিরুদ্ধে। তাদের তৎপরতায় বনু সাকীফ গোত্রের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। ফলে বনু সাকীফ অল্প কিছু দিন তাদের জিদ এবং গোমরাহির ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। কোনোভাবেই তাদের ভেতর ইসলাম কবুল করার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। অবশেষে তারা যখন ঠাণ্ডা মাথায় বিষয়টি বিচার করে—চারদিককার আরব-কবিলাগুলোর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তখন তারা লক্ষ করে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরই মধ্যে মক্কা জয় করে নিয়েছেন। মক্কা বিজয়ের মহান ঘটনা তাদের ভাবনাকে আমূল বদলে দেয়। তারা যথার্থভাবেই উপলব্ধি করতে পারে—আমাদের পক্ষে পুরো আরবজাতির বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব নয়। কারণ, এরই মধ্যে আরবের অধিকাংশ মানুষ ইসলামের ছায়াতলে এসে ঠাঁই নিয়েছে। তারা তখন

---

১ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৪ : ১৮৬-১৯২; ইবনে সায়্যিদুননাস, *উয়ুনুল আসার*, ২ : ৩১২-৩১৩; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৫ : ২২-২৬।

পরস্পর পরামর্শ করে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে। এই দলে আব্দে ইয়ালীল ইবনে আমর ইবনে উমায়ের, তার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ কবিলা থেকে আরও দুই ব্যক্তি, বনু মালেকের পক্ষ থেকে তিনজন—হাকীম ইবনে আমর ইবনে ওয়াহাব, শুরাহবীল ইবনে গায়লান এবং উসমান ইবনে আবুল আস—এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পুরো প্রতিনিধিদলের সদস্যসংখ্যা ছিল দশজন। বনু কিনানার আব্দে ইয়ালীল ছিলেন এই প্রতিনিধি দলের নেতা। এদের মধ্যে সবচেয়ে অল্পবয়স্ক ছিলেন উসমান ইবনে আবুল আস। প্রতিনিধিদলটি যখন মদীনার কাছে পৌছায়, হযরত মুগীরা ইবনে শুবা রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উট দেখাশোনা করছিলেন। প্রতিনিধিদলটি নজরে পড়তেই তিনি নবীজিকে সংবাদ দেওয়ার জন্যে ছুটে যান। পথে দেখা হয় হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে। বিষয়টি তিনি হযরত আবু বকরকে জানান। তিনি তখন বলেন, তুমি যাও। আমিই নবীজিকে বিষয়টি জানাচ্ছি। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু গিয়ে নবীজিকে প্রতিনিধিদল সম্পর্কে অবহিত করেন। তাদের জন্যে মসজিদের আঙিনায় তাঁবু পাতা হয়। খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনুল আস হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং বনু সাকীফের মাঝে দূতিয়ালির ভার গ্রহণ করেন। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে বনু সাকীফকে যে চুক্তিনামা প্রদান করা হয়, সেটাও খালেদ ইবনে সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু লেখেন। এই প্রতিনিধিদল ইসলাম কবুল করবার সময় শর্ত দিয়েছিল—তিন বছর পর্যন্ত যেন আমাদের মূর্তিশালাটি ভাঙা না হয়। কারণ, এতে করে মূর্খদের মাঝে অনেক অনর্থক উত্তেজনা ছড়াতে পারে। আপসে বুঝিয়ে তাদেরকে ইসলামের কাছে আনার চেষ্টা করা হবে। তাদের এই শর্ত মেনে নেওয়া হয়েছে। তিন বছর পূর্ণ হওয়ার পর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুগীরা ইবনে শুবা এবং আবু সুফিয়ান ইবনে হরবকে আদেশ দিয়েছিলেন তায়েফে গিয়ে সেখানকার মূর্তিশালাটি ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দাও।

সাকীফ প্রতিনিধিদল আরও শর্ত করেছিল—আমরা জিহাদে অংশগ্রহণ করব না। তাদের তৃতীয় শর্ত ছিল, আমাদের ওপর কোনো শাসক নিযুক্ত

করা যাবে না। তাদের এই দুই শর্তও মেনে নেওয়া হয়েছিল। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান ইবনে আবুল আসকে বনু সাকীফের ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তাকে মদীনায় কিছু দিন রেখে পবিত্র কুরআন এবং প্রয়োজনীয় মাসআলা শিক্ষা দান করা হয়েছিল। তারপর তাকে তায়েফ পাঠানো হয়। তাদের এইসব শর্ত মেনে নেওয়া সম্পর্কে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বলেছেন, তারা সবেমাত্র ইসলাম কবুল করছে। যখন তাদের ঈমান পরিপক্ক হয়ে উঠবে নিজেরাই জিহাদে যাবে। আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করবে এবং পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করবে।[১]

বিখ্যাত মোনাফেকের মৃত্যু

এই বছর মোনাফেকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল মারা যায়। শাওয়াল মাসের শেষ দিকে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। বিশ দিন মৃত্যুশয্যায় পড়ে থাকে। মারা যায় জিলকদ মাসে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝেমধ্যে তাকে দেখতে যেতেন। যেদিন সে মারা যায়, সেদিন তাকে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, আমি বরাবর তোমাকে বলেছি—ইহুদিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব কোরো না। তুমি আমার কথা মানোনি। কিন্তু এই শেষ সময় এসেও সে তার ভুল ধরতে পারেনি। হেসে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাকে উড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে, আসআদ ইবনে যুরারা তাদের সঙ্গে দুশমনি করে কী পেয়েছে? তারপর বলেছে, এখন রাগ করার সময় নয়। আমার জীবনের শেষ সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। আপনি আমার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করবেন। আমার কাফনের সঙ্গে আপনার গায়ের জামাটি দেবেন। আপনি আমার জানাযা পড়াবেন। আমার জন্যে মাগফেরাতের দুআ করবেন। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সবগুলো ওসিয়ত পূরণ করেছেন। নিজের গায়ের জামা দিয়ে তাকে কাফন দিয়েছেন। নিজে তার জানাযা পড়িয়েছেন। বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে তার জানাযা পড়ানোর এখতিয়ার দিয়েছেন। তার জন্যে ক্ষমা

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৫ : ৩৩-৩৪; *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৪ : ১৯৪-১৯৬।

প্রার্থনার এখতিয়ার দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۚ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ.

আপনি তার জন্যে ক্ষমা প্রর্থনা করুন আর নাই করুন, যদি আপনি তার জন্যে সত্তরবার ক্ষমা প্রর্থনা করেন, তবুও আল্লাহ তাআলা তাকে কোনো দিন ক্ষমা করবেন না। [তাওবা :৮০][১]

হজের আমীর করা হলো হযরত আবু বকরকে

হিজরী নবম সাল। এ বছর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর সিদ্দীককে হজের আমীর বানিয়ে মক্কা মুকাররমায় প্রেরণ করেন। তিনিই মুসলমানদেরকে হজের নেতৃত্ব দেন। এর আগে আরবের মুশরিক-সম্প্রদায়ও নিজেদের মতো করে হজের নামে কিছু রীতি-নীতি পালন করত। কুরাইশের লোকজন ছিল ওই সময়ে নেতৃত্বের আসনে। হজের নামে আগত মুশরিকদেরকে তারা নির্দেশনা দিত। তাদের পক্ষ থেকে নির্ধারিত রীতি মোতাবেক হজ সম্পাদিত হতো। মক্কা বিজয়ের পর এটা ছিল প্রথম বছর। এ বছরই মুসলমানগণ সর্বপ্রথম হজ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করে। ফলে তাদেরকে শরীয়ত মোতাবেক দিকনির্দেশনার প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল, ইসলামের বিধি-বিধান মোতাবেক হজ সম্পাদনের। যেহেতু এ বছর মুসলমানদের সঙ্গে মুশরিক-সম্প্রদায়ও হজে অংশগ্রহণ করবে এবং তারা হজ সম্পাদন করবে তাদের মতো করে—তাই মুসলমানদের একজন আমীর আবশ্যক ছিল। এও উল্লেখযোগ্য, এ বছর হজে মুশরিকদের সংখ্যা ছিল বেশি। এদিকে এক বছর ধরে মক্কায় মুসলমানদের শাসন চলছিল। মক্কাসহ বায়তুল্লাহর শাসন ছিল মুসলমানদের হাতে। ফলে মুসলমানদের পথে এখন আর কোনো বাধা ছিল না। আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদের সঙ্গে নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৫ : ৩৪; *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৪ : ৩১০-৩১১।

ওয়াসাল্লাম থেকে যান মদীনা মুনাওওয়ারায়। আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং মুসলমানগণ মদীনা থেকে বেরিয়ে পড়ার পর নবীজির প্রতি সূরা বারাআত নাযিল হয়—

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَسِيْحُوْا فِي الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ.

এটা সম্পর্কচ্ছেদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সেইসব মুশরিকদের সঙ্গে, যাদের সঙ্গে তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে! সুতরাং তোমরা দেশে চার মাসকাল পরিভ্রমণ করো। [তাওবা : ১-২]

এই সূরায় ঘোষিত হয়—

وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِيْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ وَرَسُوْلُهٗ.

মহান হজের দিবসে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি এটা এক ঘোষণা—নিশ্চয় মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ দায়মুক্ত এবং তার রাসূলও। [তাওবা : ৩]

আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর নবীজি হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে পাঠান এবং বলেন—এই সূরাটি নিয়ে এখনই মক্কায় চলে যাও। যেহেতু হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুকে হজের আমীর নির্বাচন করা হয়েছে, তাই তার নির্দেশনা মোতাবেকই হজ সম্পাদিত হবে—এটাই ছিল সিদ্ধান্ত। ফলে, যে কোনো বিধান ঘোষণা করবার তিনিই ছিলেন বৈধ প্রতিনিধি। এ কারণে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু মিনায় ঘোষণা করে দেন—আগামী বছর কোনো মুশরিক হজ করতে পারবে না। কোনো ব্যক্তি বিবস্ত্র অবস্থায় কাবা শরীফ তাওয়াফ করতে পারবে না। সময়টা ছিল হজের মওসুম। বিশাল জনসমাবেশ। প্রত্যেক কবিলা নিজ নিজ তাঁবুতে অবস্থানরত। আর সেই তাঁবু বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই কারণে এই ঘোষণাটি প্রচারের উদ্দেশ্যে আবু বকর

সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু বিপুল সংখ্যক ঘোষক নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। *বুখারী শরীফে* বর্ণিত একটি হাদীসে হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু বিশাল এক দলসহ আমাকে আদেশ করেছিলেন, আমরা যেন কুরবানীর দিন মিনা প্রান্তরে এই ঘোষণা দিয়ে বেড়াই—আগামী বছর কোনো মুশরিক হজ করতে পারবে না এবং কোনো বিবস্ত্র ব্যক্তি কাবা ঘর তাওয়াফ করতে পারবে না। হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এই ঘোষকদের মধ্যে হযরত আলীও ছিলেন। সূরা বারাআত নিয়ে যখন হযরত আলী মক্কায় পৌঁছান এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন—হযরত আবু বকর তখন তাকে প্রশ্ন করেন, আপনি আমীর, না অধীনস্থ? হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আপনিই আমীর। আমি আপনার অধীনে থেকে কাজ করব। তারপর মিনায় হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর উপস্থিতিতে উল্লিখিত আয়াতগুলো সমবেত জনতাকে পাঠ করে শোনান। পরের বছর আর কোনো মুশরিক হজে অংশগ্রহণ করেনি। আর সেটা ছিল বিদায় হজ।[১]

নবম হিজরীর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

আবিসিনিয়ার বাদশাহ পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এই বছর তিনি ইন্তেকাল করেন। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে তার ইন্তেকালের সংবাদ জানান। এই বছরই হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর স্ত্রী এবং নবীজির দ্বিতীয় কন্যা হযরত উম্মে কুলসুম রাযিয়াল্লাহু আনহার ইন্তেকাল হয়। নবীজি তার জানাযার নামায পড়ান। এই বছরই তাবুক যুদ্ধের সময় বেশ কিছু কবিলা হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সন্ধি করে। এসব কবিলার মধ্যে আইলার বাদশাহ, জিরয়াবাসী, আযরাহবাসী এবং দুমাতুল জান্দালের শাসকও ছিলেন। এ বছরই যেরার নামক মসজিদ পুড়িয়ে মাটির সঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। মুসলমানদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৫ : ৩৭; *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৪ : ৩০০-৩০২।

মোনাফেক-সম্প্রদায় এই মসজিদটি নির্মাণ করেছিল। এই বছরই নবীজির খেদমতে বনু সাকীফের প্রতিনিধিদল এসেছিল। তারা ইসলাম কবুল করেছিল এবং তাদের বিখ্যাত মূর্তিশালা এবং বিখ্যাত মূর্তি লাতকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই বছরই বিখ্যাত মোনাফেক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলের মৃত্যু হয়েছিল। এই বছরই তাবুকে মুআবিয়া ইবনে আবু মুআবিয়া লাইসী নামক সাহাবীর ইন্তেকাল হয়েছিল। নবীজি তার জানাযার নামায পড়িয়েছিলেন। এ বছরই হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুকে হজের আমীর নিযুক্ত করা হয়েছিল। এ বছর পুরো আরব থেকে বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধিদল নবীজির খেদমতে হাজির হয়েছিল। দলের পর দল নবীজির খেদমতে এসেছে। ইসলামের ধন বুকে ধারণ করে স্বদেশে ফিরে গেছে। এই কারণে এই বছরকে ইসলামের ইতিহাসে আমুল উফুদ বা প্রতিনিধিদলের বছর বলা হয়। এই বছর দূর-দূরান্তে অবস্থিত আরব-কবিলাগুলোয়ও ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছিল।

বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের আগমন এবং ইসলাম কবুল

নবম হিজরীকে প্রতিনিধিবর্ষ বলা হয়। আরবের দূর-দূরান্ত থেকে যৌথবদ্ধভাবে মানুষ মদীনায় আগমন করতে থাকে। ইসলাম কবুল করে আবার নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যেতে থাকে। পুরো আরবব্যাপী ইসলামের আলোচনা ছিল উল্লেখ করার মতো। প্রতিটি কবিলা স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুল করার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে। কোনো ধরনের দাওয়াত ছাড়াই দলে দলে মানুষ আগমন করতে থাকে। চারদিকে এক অভাবিত সাড়ায় পুরো আরব চঞ্চল হয়ে উঠে। এর কারণ ছিল এই—পুরো আরববিশ্বের ধর্মীয় নেতৃত্ব ছিল কুরাইশদের হাতে। ফলে সকলে অপেক্ষা করছিল—কুরাইশ কী করে? কেননা, তারাই ছিল আরবদের ইমাম। কুরাইশ ছিল বায়তুল্লাহর মুতাওয়াল্লী এবং হেরেমের নিয়ন্ত্রক। হযরত ইসমাইল ইবনে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর সন্তান ছিল তারা। পুরো আরববাসী নিজেদেরকে ইবরাহিমী ধর্মের অনুসারী মনে করত। এই কারণে কুরাইশ ছিল পুরো আরবজাতির অবিসংবাদিত নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত। পুরো আরব জুড়ে তাদের সম্মান ছিল প্রশ্নাতীত। তাদের যে কোনো সিদ্ধান্ত

সকলে মাথা পেতে নিত। তাদের প্রতি আরবদের এই মানসিক আনুগত্যের বলেই তারা পুরো আরবের মন-মস্তিষ্কের নেতা হয়ে উঠে। আর এই কুরাইশ ছিল হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কঠোর শত্রু। তারা তাদের জাতীয় সম্মান এবং সর্বজনস্বীকৃত নেতৃত্ব রক্ষার জন্যে মরণপন লড়াই করে যাচ্ছিল। সুদীর্ঘ বিশ বছর তারা এই লক্ষ্যে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে সম্ভব সকল চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। পুরো আরববাসী অপেক্ষা করছিল—এই যুদ্ধের শেষ পরিণতিটা দেখার। যখন এই কুরাইশই ইসলামের ছায়ায় এসে আশ্রিত হয়, তখন অবিলম্বে পুরো আরব দলে দলে ইসলাম কবুল করতে শুরু করে। কারণ, এখন তাদের পথে কোনো বাধা নেই। তাদের মন ও বিশ্বাসে কোনো সংশয় নেই। প্রতিদিনই চারদিক থেকে দলের পর দল মদীনা মুনাওওয়ারায় আগমন করতে থাকে। সমাজের বিশিষ্ট এবং নেতৃস্থানীয় অনেক ব্যক্তি একাকীও আগমন করতে থাকে। নবীজির দরবারে এসে ইসলাম কবুল করতে থাকে। এই সকল প্রতিনিধিদল সম্পর্কে সবিস্তারে আলোকপাত করা এখানে খুবই কঠিন। এখানে আমরা সংক্ষেপে শুধু তালিকাটুকু উল্লেখ করছি।

প্রতিনিধিদলগুলোর সংক্ষিপ্ত তালিকা

বনু তামিমের প্রতিনিধিদল, বনু আব্দে কায়েসের প্রতিনিধিদল, নাজরানের প্রতিনিধিদল, বনু আমের, তাই, আশআরী, ইয়েমেন, আমর ইবনে মাদী কারিব, আশআস ইবনে কায়েস, হিময়ার বাদশাহদের প্রতিনিধিদল, ইয়েমেনের বাদশাহদের প্রতিনিধিদল, বনু আসাদ, বনু আবাস, বনু ফাযারাহ, বনু মুররাহ, বনু সালাবাহ, বনু মুহারিব, বনু কিলাব, বনু আরদাস ইবনে কিলাব, বনু কিনানাহ, বনু আকিল ইবনে কাব, বনু কুশাইর ইবনে কাব, বনু আবুল বাক্কা, বনু আশজা, বনু বাহেলা, বনু সুলাইম, বনু হিলাল ইবনে আমের, বনু বকর ইবনে ওয়াইল, বনু তাগলিব, বনু নাখীব, বনু খাওলান এবং বনু জুফীর প্রতিনিধিদল। তা ছাড়া বনু কিন্দা, বনুল আউফ, বনু খুশাইন, বনু সাদ, বনু সিবা প্রভৃতি গোত্রের প্রতিনিধিদল মদীনায় আগমন করে এবং ইসলাম কবুল করে চলে যায়। এইসব প্রতিনিধিদলের কোনোটি ছিল স্বল্প সংখ্যক আবার কোনোটি ছিল

বিশাল সংখ্যক সদস্যমণ্ডিত। এইসব প্রতিনিধিদলের মাধ্যমে অল্প কয়েক মাসের মধ্যে পুরো আরবে ইসলামধর্ম ছেয়ে যায়।[১]

বিদায় হজ

হিজরী নবম সালে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নেতৃত্বে হজ সম্পাদিত হয়। এখন হিজরতের দশম সাল। এরই মধ্যে পুরো আরবব্যাপী ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে। অবশ্য এখনো কোনো কোনো অঞ্চল এমন রয়েছে, যেখানে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি। এ কারণে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওইসব অঞ্চলে দীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্যে বেশ কিছু বিশিষ্ট সাহাবীকে প্রেরণ করেন। দশম হিজরীর রবিউল আউওয়াল মাসে খালেদ ইবনুল ওলীদকে বনুল হারেস ইবনে কাবের অঞ্চল নাজরানে পাঠান। পাঠাবার সময় উপদেশ দেন—যতটা সম্ভব, তাদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়াবে না। তাদের সামনে ইসলামের দাওয়াত তুলে ধরবে।

খালেদ ইবনুল ওলীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু নাজরানে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দেন। তারা সানন্দ চিত্তে ইসলাম কবুল করে নেয়। খালেদ ইবনুল ওলীদ তাদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কুরআন ও সুন্নাহর তালীমের ব্যবস্থা করেন। তাদের সামনে নবীজির নির্দেশনামাফিক ইসলামের বিধি-বিধান তুলে ধরেন। অতঃপর পুরো বিষয়টি সম্পর্কে নবীজিকে অবগত করেন। প্রতিনিধি মারফত সবকিছু জানার পর নবীজি এই মর্মে পত্র পাঠান—তাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে মদীনায় চলে এসো। খালেদ ইবনুল ওলীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আদেশ পালন করেন। বনু হারেসের বিশিষ্ট কয়েকজন—কায়েস ইবনে হুসাইন, ইয়াযিদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে মুহাজ্জাল, উবায়দুল্লাহ ইবনে কারাদ আয যিয়াদী, শাদ্দাদ ইবনে আবদুল্লাহ কাত্তানী এবং আমর ইবনে আবদুল্লাহ জব্বাবীকে সঙ্গে করে মদীনা মুনাওওয়ারায় নবীজির খেদমতে হাজির হন। তাদেরকে দেখে

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৫ : ৪০-৯৭; *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৪ : ২২১-২৬৭; *ইবনে সায়্যিদুন নাস*, ২ : ৩০২।

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন—

من هؤلاء القوم؟ الذين كأنهم رجال الهند.

এরা কারা? এরা তো ভারতীয় মানুষের মতো।

এ কথা শুনে খালেদ ইবনুল ওলীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন—এরা বনু হারেস গোত্রের লোক। নাজরান থেকে এসেছে। নবীজি তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা দান করেন। তারপর একটি লিখিত নির্দেশনাপত্র দেন—যাতে তাদের দায়-দায়িত্বের কথা সবিস্তারে উল্লিখিত ছিল। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত কায়েস ইবনে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বনু হারেসের আমীর নিযুক্ত করেন।[১]

ইয়েমেনে ইসলামের দাওয়াত

ইয়েমেন মদীনা থেকে প্রায় এক হাজার মাইল দূরে অবস্থিত। ইয়েমেনে ইসলামের দাওয়াত দানের উদ্দেশ্যে নবীজি আবু মুসা আশআরী এবং মুআয ইবনে জাবালকে পাঠান। পাঠাবার সময় পরামর্শ দেন—তোমরা তাদের সঙ্গে কোমল আচরণ করবে, কঠোরতা করবে না। তোমরা উভয়ে পরস্পরে শলাপরামর্শ করে কাজ করবে, পরস্পরের বিরোধিতা করবে না। হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন সওয়ারির ওপর উঠে বসেন, তখন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এইসব পরামর্শ দিচ্ছিলেন আর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআযের সঙ্গে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআযকে তখন এও বলেছিলেন, তোমরা যাদের কাছে যাচ্ছ, তারা আহলে কিতাব। যখন তাদের কাছে পৌঁছুবে, তাদেরকে এই মর্মে দাওয়াত দেবে—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। তারা যদি কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যায়, তা হলে এই মর্মে দাওয়াত দেবে—আল্লাহ তাআলা দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে নামায আদায় করা আবশ্যক। যদি তারা এটা মেনে

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৫ : ৯৮; *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৪ : ২৬২-২৬৫।

নেয়, তা হলে বলবে, নিজেদের সম্পদ থেকে বছরে একবার নির্ধারিত পরিমাণে যেন যাকাত আদায় করা হয়। সংগৃহীত এই যাকাতের অর্থ ধনীদের কাছ থেকে নিয়ে গরিব ও অভাবীদের মাঝে বণ্টন করা হবে। তারা যদি এ কথা মেনে নেয়, তা হলে তাদের উত্তম এবং ভালো সম্পদ যাকাত হিসেবে নেওয়ার চেষ্টা করবে না। তাদের প্রতি কোনো ধরনের জুলুম ও অবিচার করবে না। সর্বদা মজলুমের দুআ থেকে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করবে। কারণ, মজলুমের দুআ কবুল হতে দেরি হয় না।

ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুআয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ইয়েমেনের উদ্দেশ্যে বিদায় জানাচ্ছিলেন এবং সর্বশেষ উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন এও বলেছিলেন—মুআয, হতে পারে, ভবিষ্যতে আমার সঙ্গে তোমার আর দেখা হবে না। তুমি যখন ইয়েমেন থেকে ফিরে আসবে, তখন হয়তো আমার মসজিদ এবং আমার কবরই দেখতে পাবে। এ কথা শুনে হযরত মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু কাঁদতে শুরু করেন। কারণ, তিনি কল্পনাও করতে পারছিলেন না—নবীজির বিয়োগযন্ত্রণা তিনি কীভাবে বরদাশত করবেন। নবীজি হযরত মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এই ভবিষ্যদ্বাণীটুকু করে সঙ্গে সঙ্গে মদীনায় ফিরে আসেন। পরে এই ভবিষ্যদ্বাণী হরফে হরফে বাস্তবায়িত হয়। মুআয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন ইয়েমেন থেকে ফিরে আসেন, তখন নবীজির কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ঢেকুর তুলে কাঁদতে থাকেন।

বিদায় হজ

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়ত লাভের পর আর হজ করেননি। হিজরতের দশম বছর সর্বপ্রথম হজ করেন—এটাই তাঁর নববী-কালের প্রথম এবং শেষ হজ। এই হজ সম্পাদনকালে তিনি বলেছিলেন, হয়তো এটাই আমার শেষ হজ। দ্বিতীয়বার হয়তো আমি হজে আসতে পারব না। যারা আমার কথা শুনতে পাচ্ছ, তারা অনুপস্থিতদের কাছে তা পৌঁছে দিয়ো। তিনি যেন উপস্থিত সকলকে বিদায় জানিয়েছেন। এই কারণে এই হজকে বিদায় হজ বলা হয়।

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হজ করার ইচ্ছা করেন, তখন সকলের মাঝে ঘোষণা করে দেন। উদ্দেশ্য, যেন অধিক পরিমাণে মুসলমান এই হজে অংশগ্রহণ করতে পারে। সাধারণ এই ঘোষণার ফলে বিপুল সংখ্যক মানুষ মদীনায় এসে উপস্থিত হয়। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিলকদ মাসের পঁচিশ তারিখে মদীনা থেকে বের হন। হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবীজি যখন মক্কার নিকটবর্তী পৌছান, তখন যত দূর চোখ যাচ্ছিল, শুধু মানুষ আর মানুষ নজরে পড়ছিল। ডানদিকে দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত জনসমুদ্র। বাম দিকেও দৃষ্টির শেষ অবধি জনস্রোত। যেদিকেই নজর যাচ্ছিল শুধু মানুষ আর মানুষ।

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল বিবিই এই হজে সঙ্গী হয়েছিলেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ হাওদায় করে সফর করছিলেন। মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত যুল হুলাইফায় পৌছে নবীজি দুই রাকাত জোহর নামায আদায় করেন। কুরবানীর পশুগুলোর গলায় কুরবানীর চিহ্ন পরিয়ে দিয়ে উটের ওপর বসেন এবং এহরাম বেঁধে নেন। সোমবারে মাররুয যাহরান নামক জায়গায় পৌছান। সারিফ নামক স্থানে পৌছার পর সূর্য অস্তমিত হয়। সেখানেই রাত যাপন করেন। সকালে গোসল করেন। তারপর সেখান থেকে মক্কার উদ্দেশে যাত্রা করেন। স্বীয় উষ্ট্রীর ওপর আরোহণ করে মক্কায় প্রবেশ করেন। বাবে শায়বায় পৌছার পর যখন সর্বপ্রথম কাবা শরীফ নজরে পড়ে, তখন এই দুআ পাঠ করেন—

اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من عظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما ومهابة وتعظيما.

হে আল্লাহ, তুমি এই ঘরের সম্মান মহত্ত্ব মর্যাদা ও প্রভাব বাড়িয়ে দাও। আর যে ব্যক্তি এই ঘরকে সম্মান করবে, এই ঘরের হজ ও উমরা করবে, তাকেও তুমি সম্মান মহত্ত্ব প্রভাব ও কল্যাণ বাড়িয়ে দাও।

এরপর নবীজি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেন। প্রথম তিন চক্করে রমল করেন। নবীজির চাদরটি তখন ডান বগল থেকে বের করে এনে বাম কাঁধের ওপর রাখা ছিল। তাওয়াফ শেষ করার পর মাকামে ইবরাহিমে দুই

রাকাত নামায পড়েন। তারপর সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সায়ী করেন। তালবিয়ার দিন মিনায় আগমন করেন। সেখানেই রাত পার করেন। সকালে আরাফার ময়দানে যান। সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফার ময়দানে অবস্থান করেন। এই সময় দুআয় মগ্ন থাকেন। তারপর মুজদালিফায় চলে যান। সেখানে মাগরিব ও এশা এক আজান ও দুই একামতে আদায় করেন। তারপর সেখানেই রাত কাটান। যখন প্রভাত হয়, তখন বুড়ো দুর্বল নারী ও শিশুদেরকে মিনায় চলে যাওয়ার অনুমতি দেন। উদ্দেশ্য, তারা যেন ভিড় থেকে বাঁচতে পারে। ফজর নামাযের সময় হওয়ার পর নামায পড়ে সওয়ারির ওপর উঠে বসেন। মুহাসসারে পৌঁছার পর মাথা মোবারক ঝুঁকিয়ে ফেলেন এবং বরাবর তালবিয়া পড়তে থাকেন। তারপর রমিয়ে জিমার করেন। অতঃপর নিজ হাতে কুরবানী করেন। এরপর মাথা মুণ্ডন করেন এবং এহরাম খুলে ফেলেন। খুশবু ব্যবহার করেন। জামা গায়ে দেন। মিনায় ঘোষণা করে দেওয়া হয়—আজ হলো খানাপিনার দিন।[১]

কুরবানীর দ্বিতীয় দিন জোহর নামাযের পর স্বীয় উষ্ট্রীর ওপর আরোহণ করে ঐতিহাসিক সেই ভাষণ প্রদান করেন—আমাদের ইসলামের ইতিহাসে যাকে হাজ্জাতুল বিদার ভাষণ নামে স্মরণ করা হয়। এই ভাষণের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়। এখানে এই ভাষণের কয়েকটি টুকরো তুলে ধরা হচ্ছে—

يا أيها الناس! أتدرون في أي شهر أنتم وفي أي يوم أنتم وفي أي بلد أنتم؟ قالوا: في يوم حرام وشهر حرام وبلد حرام، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه، ثم قال: اسمعوا مني تعيشوا ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، ألا وإن كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هذه إلى يوم القيامة، وإن أول دم يوضع دم ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني ليث، فقتلته هذيل.

---

১ ইবনে সাদ, *আত তাবাকাত*, ২ : ১৭৪।

ألا وإن كل ربا كان في الجاهلية موضوع. وإن الله عز و جل قضى إن أول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض ثم قرأ {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتٰبِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ} ألا لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا أن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون ولكنه في التحريش بينكم، فاتقوا الله عز و جل في النساء، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا وإن لهن عليكم ولكم عليهن حقا.

হে লোকসকল, তোমরা কি জানো, তোমরা এখন কোন মাস কোন দিন এবং কোন শহরে আছ? তারা বলল, আমরা সম্মানিত দিন সম্মানিত মাস এবং সম্মানিত শহরে আছি। নবীজি বললেন, তোমাদের রক্ত তোমাদের সম্পদ তোমাদের সম্মান তোমাদের জন্যে ঠিক এমনই হারাম, যেমন এই মাস এই দিন এবং এই শহর। এই হারাম আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হওয়া পর্যন্ত। তারপর বললেন, তোমরা আমার কথা শুনে নাও। এমনভাবে জীবনযাপন করবে, তোমরা কারও প্রতি জুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও যেন জুলুম না করা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত আনন্দচিত্তে না দেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো মুসলমানের সম্পদ কারও জন্যে হালাল নয়। শোনো, জাহেলি যুগের রক্ত সম্পদ ও বদলা সব আমার পদতলে এবং তা কেয়ামত পর্যন্তের জন্যে।

সর্বপ্রথম রক্ত রাবীআ ইবনে হারেস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের—যাকে হুযাইল হত্যা করেছিল—আমি রহিত করছি। আজ সকল সুদ রহিত করা হচ্ছে। সর্বপ্রথম রহিত করা হচ্ছে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সুদ। শুধু মূলধন নেবে কোনো রকমের বাড়াবাড়ি করবে না এবং বাড়াবাড়ি করাও হবে না। আর শোনো, যামানা ঠিক সেই রূপে ঘুরে এসেছে, যে

রূপে আল্লাহ তাআলা প্রথম দিন আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করেন—

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۭ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ.

নিশ্চয় আকাশমণ্ডলি ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহর বিধানে আল্লাহর নিকট মাস-গণনায় মাস বারোটি, তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস—এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম কোরো না। [তাওবা : ৩৬]

আর মনে রেখো, আমার পর তোমরা কাফের হয়ে যেয়ো না, যাতে একে অপরকে হত্যা করবে। সাবধান, শয়তান এই মর্মে নিরাশ হয়ে পড়েছে—এই শহরে আর তার পূজা হবে না। তবে সে বরাবর তোমাদেরকে পরস্পরে লড়াতে চেষ্টা করবে। নারীদের ক্ষেত্রে আল্লাহকে সর্বদা ভয় করবে। তারা তোমাদেরই সহযোগী। তারা নিজেদের জন্যে কোনো কিছুর মালিক নয়। তোমাদের ওপর তাদের অধিকার আছে, তাদের ওপরও তোমাদের অধিকার আছে।

এই ভাষণে নবীজি এ কথাও বলেছিলেন, আমি এখান থেকে চলে যাব। তার ভাষণের শব্দগুলো ছিল এই—

يا أيها الناس! اسمعوا ما أقول: لكم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في هذا الموقف. إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا أمرين بينين: كتاب الله وسنة نبيكم.

হে লোকসকল, আমি যা বলি, শোনো। আমি জানি না, এই বছরের পর এই জায়গায় তোমাদের সঙ্গে হয়তো আমার সাক্ষাৎ হবে না... আমি তোমাদের মাঝে এমন সম্পদ রেখে যাচ্ছি, যাকে আঁকড়ে ধরলে তোমরা কোনো দিন পথহারা হবে না। আর সে হচ্ছে দু'টি স্পষ্ট বিষয়—আল্লাহর কিতাব এবং তোমাদের নবীর সুন্নাত।[১]

---

১ বায়হাকী, *দালাইলুন নবুওয়ত*, ৫ : ৪৪৮; ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, ১ : ৬৫২।

মিনায় ইসলামের পূর্ণতা মর্মে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়—

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.

আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দীন পূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করলাম। আর তোমাদের জন্যে দীন হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করলাম। [মায়েদা : ৩]

দীনের পরিপূর্ণতার ঘোষণার অর্থ এটাই—হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়ত ও রেসালাতের যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিপূর্ণরূপে সম্পাদন করেছেন। আর দীন যখন পূর্ণতা লাভ করেছে, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে কাছে ডেকে নেওয়ার সময়ও ঘনিয়ে এসেছে। তারপর এই বিদায় হজেই মিনার প্রান্তরে অবতীর্ণ হয়—

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ.

এ থেকেও এ কথাই প্রতিভাত হয়—হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণের সময় ঘনিয়ে এসেছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনায়ও এ কথাই উল্লেখিত হয়েছে। হজের কার্যক্রম সম্পাদনের পর নবীজি মদীনার উদ্দেশে রওনা করেন।[১]

হিজরতের একাদশ বছর

বুখারী এবং *মুসলিমে* হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনায় এ কথা রয়েছে, পবিত্র কুরআনের এই আয়াত—

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি জুমার দিন আরাফার ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে। যখন এই আয়াত নবীজির প্রতি

---

১ বায়হাকী, *দালাইলুন নবুওয়ত*, ৫ : ৪৪৯; ইবনে সাদ, *আত তাবাকাত*, ২ : ১৮৮; ইবনে সায়্যিদুননাস, *উয়ুনুল আসার*, ২ : ৩২৫।

অবতীর্ণ হয়, তখন হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কাঁদতে শুরু করেন। সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহু কান্নার কারণ জানতে চাইলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন—দীনের পূর্ণতার পর অপূর্ণতা ছাড়া আর কী থাকতে পারে? অর্থাৎ হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এই আয়াত শুনেই বুঝে নিয়েছিলেন, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত ঘনিয়ে এসেছে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এই আয়াতের মধ্যে এই ইঙ্গিতই পেয়েছিলেন। এ কারণেই তিনি জামারায়ে উকবার কাছে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—

خذوا عني مناسككم لعلي لا احج بعد هذا.

তোমরা আমার কাছ থেকে হজের বিধান বুঝে নাও। হয়তোবা আগামী বছর তোমাদের সঙ্গে আমি হজ করব না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে—

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ.

এই সূরাটি আইয়ামে তাশরীকের সময় অবতীর্ণ হয়েছিল। আর তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে। তিনি তখন তার উষ্ট্রী কাসওয়াকে প্রস্তুত করতে বলেন এবং মদীনার উদ্দেশে রওনা হন।

বর্ণিত আছে, একবার হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু সাহাবায়ে কেরামের মজলিসে প্রশ্ন করেছিলেন—সূরা নাসরের মর্ম কী? তারা তখন আরজ করেছিলেন, এই সূরায় ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যখন বিজয় দান করেছেন, তখন আমাদের উচিত আল্লাহকে স্মরণ করা। তার গুণকীর্তন করা এবং আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা। এরই প্রেক্ষিতে হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করেছিলেন। মজলিসে তিনি ছিলেন বয়সে সবার ছোট। উত্তরে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন, এই সূরায় হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের কথা বলা হয়েছে। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু

তখন বলেছিলেন, তুমি যা বুঝেছ, আমিও তা-ই বুঝেছি। এতে এ কথাই অনুমিত হয়—সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের অনেকেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় এবং আসন্ন হৃদয়বিদারক ঘটনার কথা পূর্বেই আঁচ করতে পেরেছিলেন। এই ভেবে তারা মনে মনে পূর্ব থেকেই ভীত-শঙ্কিত ছিলেন।

রুটিনে পরিবর্তন

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হযরত জিবরাঈল প্রতি বছর আমার সঙ্গে একবার কুরআনের দাওর করতেন। এ বছর দাওর করেছেন দুইবার। আমার মনে হচ্ছে, আমার আখেরাতের সফর ঘনিয়ে এসেছে।

বুখারী শরীফে আছে হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রমযানে দশ দিন এতেকাফ করতেন। যে বছর তাঁর ওফাত হয়, সে বছর এতেকাফ করেছেন বিশ দিন।[১]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ শেষ করে জিলহজের শেষের দিকে মদীনা মুনাওওয়ারায় আগমন করেন। মহররম এবং সফর মাস এখানেই কাটিয়েছেন। এই সময় উসামা ইবনে যায়েদকে একটি বাহিনীর প্রধান করে পাঠিয়েছেন। এটা ছিল সফর মাসের শেষ দিককার ঘটনা। এই সময় নবীজির অসুস্থতা শুরু হয়। সফর মাসের এই শেষ সময়েই একদিন মধ্যরাতে জান্নাতুল বাকীতে চলে যান। সেখানে গিয়ে বাকীর অধিবাসীদের জন্যে মাগফেরাতের দুআ করেন। তারপর ঘরে ফিরে আসেন। যখন সকাল হলো, দেখা গেল, অসুস্থতা অনেকটা বেড়ে গেছে। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নবীজি যখন জান্নাতুল বাকী থেকে ফিরে আসেন, তখন আমি ছিলাম প্রচণ্ড মাথাব্যথায় আক্রান্ত। আমি যন্ত্রণায় অস্থির ছিলাম। আমার এই কষ্ট দেখে নবীজি বললেন—আয়েশা, আমার মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে।[২]

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৫ : ২২৩।

২ *মেশকাত শরীফ*, ৫৪৯।

এই অসুস্থতার সময় রুটিন মোতাবেক বিবিদের ঘরে অবস্থান করতে থাকেন। যেদিন উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা রাযিয়াল্লাহু আনহার পালা ছিল, সেদিন নবীজি সেখানেই অবস্থান করছিলেন। সেদিন সেখানে অন্য সকল বিবিকে ডেকে পাঠান। তারপর তাদের কাছ থেকে অনুমতি চান—তোমরা বললে আমি আমার এই অসুস্থতার দিনগুলো আয়েশার ঘরে কাটাতে চাই। জীবনসঙ্গিনীগণ প্রসন্নচিত্তে আরজ করেন—আপনার যেখানে ভালো লাগে, সেখানেই থাকুন। আমাদের পক্ষ থেকে অনুমতি আছে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, হযরত মায়মুনার ঘর থেকে দুইজনের কাঁধে ভর করে নবীজি আমার ঘরে আগমন করেন। তাদের দুইজনের একজন ছিলেন ফযল ইবনে আব্বাস, আরেকজন অন্য এক ব্যক্তি। নবীজির মাথায় তখন কাপড়ের পট্টি বাঁধা ছিল। হাঁটবার সময় তিনি পা তুলতে পারছিলেন না।[১] হযরত মায়মুনা রাযিয়াল্লাহু আনহার ঘরে থাকতেই অসুস্থতা প্রচণ্ড রূপ ধারণ করেছিল। পরিবারের সকলেই তখন সেখানে ছুটে এসেছিলেন। নবীজির চাচা আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তাঁর হয়তো পাঁজরে যন্ত্রণা হচ্ছে। আরবের তৎকালীন রেওয়াজ মোতাবেক চিকিৎসা করার পরামর্শ দেন। তারা তখন নবীজির মুখে ওষুধ ঢেলে দেয়। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূলত তখন বেহুঁশ ছিলেন। হুঁশ ফিরে আসার পর তিনি মুখে ওষুধের প্রভাব অনুভব করেন। জিজ্ঞেস করেন—এ কাজ কে করেছে? তারা বললেন, আপনার চাচা আব্বাস। আপনার মুখে ঔষধ দিয়েছেন। তিনি বলছিলেন, আপনি হয়তো পার্শ্বব্যথায় আক্রান্ত হয়েছেন। নবীজি বললেন, এই ব্যথা তো শয়তানের প্রভাব থেকে হয়। আল্লাহ তাআলা আমাকে শয়তানের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত রেখেছেন। তারপর তিনি বললেন, যে ওষুধ আমার মুখে দেওয়া হয়েছে, একমাত্র আব্বাস ছাড়া সকলের মুখেই তা দেওয়া হোক—এটাই ভুলের শাস্তি। আদেশমাফিক সকলের মুখেই ওষুধ দেওয়া হয়। হযরত মায়মুনা রোযা ছিলেন। তার মুখেও ওষুধ দেওয়া হয়। ঘটনাটি নবীজির চোখের সামনেই ঘটে।

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৫ : ২২৫; ইবনে সায়্যিদুননাস, *উয়ুনুল আসার*, ২ : ৪৪৫।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নবীজি যেদিন আমার ঘরে আসেন, সেদিন অসুস্থতা অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করলেন—আমার গায়ে সাত মশক পানি ঢালো। আমি সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। হযরত হাফসার কাছে বড় একটি পাত্র ছিল। আমরা নবীজিকে ধরে নিয়ে সেই পাত্রে বসিয়ে দিই। তারপর মশক থেকে পানি ঢালতে শুরু করি। অবশেষে তিনি হাতে ইশারা করে পানি ঢালতে বারণ করেন। তারপর উঠে এসে মসজিদে গমন করেন। সাহাবায়ে কেরামকে নামায পড়ান এবং খুতবা দেন।[১]

বুখারী শরীফের আরেকটি বর্ণনায় আছে, অসুস্থতার সময় নবীজি জীবনসঙ্গিনীগণকে বারবার জিজ্ঞেস করতেন—

اين انا غداً اين انا غداً.

আগামীকাল আমি কোথায় থাকব?

তার এই বারবার প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য ছিল—আয়েশার পালা কবে আসবে? তখন জীবনসঙ্গিনীগণ আরজ করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, পালার অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। আপনার যেখানে খুশি, সেখানে থাকুন। এরপর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশার ঘরে চলে আসেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথা মোবারক আমার বুকের সঙ্গে লাগিয়ে বসেছিলাম। জীবনের এই শেষ মুহূর্তে তাঁর মুখের লালা আমার লালার সঙ্গে এসে মিশে গিয়েছিল। ঘটনাটি ছিল এই—আমার ভাই আবদুর রহমান মেসওয়াক হাতে আমার ঘরে আসেন। নবীজি তখন তার দিকে তাকান। আমি তখন জিজ্ঞেস করি, মেসওয়াকটি কি নেব? নবীজি মাথার ইশারায় বলেন—হ্যাঁ। আমি আবদুর রহমানের কাছ থেকে মেসওয়াকটি নিই এবং নবীজিকে দিই। মেসওয়াকটি শক্ত ছিল। আমি বলি, নরম করে দেব? নবীজি ইশারায় বলেন—হ্যাঁ। আমি চিবিয়ে নরম করে মেসওয়াকটি তাঁকে দিই। তিনি

---

১ ইবনে সায়্যিদুননাস, *উয়ুনুল আসার*, ২ : ৪৪৫।

মেসওয়াক করে আবার আমাকে দেন। আমি তখন ওই মেসওয়াকটি আমার দাঁতে ঘষি।[১]

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি যখনই অসুস্থ হয়ে পড়তাম, নবীজি সূরা নাস ও ফালাক পড়ে আমার গায়ে ফুঁ দিয়ে দিতেন। নবীজির এই অসুস্থতার কালে আমিও বরাবর সূরা নাস ও ফালাক পড়ে তার গায়ে ফুঁ দিতে থাকি। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-ই বর্ণনা করেছেন, একদিন ঘরে জীবনসঙ্গিনীদের সকলেই উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় নবীজির প্রিয় দুলালি ফাতেমা আসেন। নবীজি তাকে মাথার কাছে ডেকে ডান পাশে বসান। তারপর আস্তে আস্তে কী যেন বলেন। নবীজির কথা শুনে ফাতেমা কাঁদতে শুরু করেন। তারপর আবার নবীজি আস্তে আস্তে কী যেন বলেন। ফাতেমা অমনি হাসতে শুরু করেন।[২]

উপস্থিত আমরা কেউই কিছু শুনিনি। ফাতেমা সেখান থেকে ওঠার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, নবীজি তোমাকে কী বলেছেন যে, তুমি কাঁদতে শুরু করলে, আবার কিছু বললেন অমনি হাসতে শুরু করলে! ফাতেমা বলল, নবীজি যে বিষয়টি গোপন রেখেছেন, সেটা প্রচার করে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এ বিষয়ে আমি অপারগ। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর আমি ফাতেমাকে বললাম, তোমার ওপর আমার অধিকার রয়েছে—অর্থাৎ, আমি তোমার মা আর তুমি আমার কন্যা। আমাকে বলতে হবে—সেদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে কী বলেছেন—যে কারণে তুমি প্রথমে কেঁদেছ, আবার পরে হেসেছ। হযরত ফাতেমা বললেন, হ্যাঁ, এখন আমি বলতে পারি। সেদিন নবীজি আমাকে বলেছেন, জিবরাঈল প্রতি বছর আমার সঙ্গে কুরআন শরীফ একবার দাওর করেন, এ বছর দাওর করেছেন দুইবার। এতে আমি বুঝতে পেরেছি, আমার পরকালের সফর ঘনিয়ে এসেছে। আল্লাহকে ভয় করবে। ধৈর্য ধারণ করবে। আমি তোমার আগে যাওয়াটাই ভালো। নবীজির এ কথা শুনেই আমি কেঁদেছি। তারপর তিনি আমাকে বলেছেন, তুমি কি এতে আনন্দিত নও—আল্লাহ তাআলা তোমাকে সকল মুসলমান নারীদের সর্দার

---

১ *সহীহ বুখারীর সূত্রে মেশকাত*, ৫৪৭।

২ *মেশকাত শরীফ*, ৫৪৯।

বানিয়েছেন? আমি এ কথা শুনে হেসেছি।[১] হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত অন্য একটি হাদীসে আছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আয়েশা, খায়বারে আমি যে বিষমিশ্রিত খাবার খেয়েছিলাম, তার যন্ত্রণা আমি এখন বোধ করছি। মনে হচ্ছে, ওই বিষের যন্ত্রণায় আমার শরীরের রগগুলো যেন কেটে ফেলা হচ্ছে।

ইবনে আব্বাস এবং আলী ইবনে আবু তালেব

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু আলী ইবনে আবু তালেবের সঙ্গে দেখা করে বললেন, হাসানের বাবা, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় ঘনিয়ে এসেছে। আবদুল মুত্তালিবের সন্তানদের ওফাতের সময় যে অবস্থা হয়, ঠিক সেই রকমের অবস্থা নবীজির মধ্যে লক্ষ করছি। চলুন, নবীজির খেদমতে হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করি—আপনার পর শাসন-ক্ষমতা কার হাতে থাকবে? যদি সেটা আমাদের খান্দানে থাকে, তা হলে আমাদের আগেই জানা থাকা উচিত। আর যদি অন্য লোকদের হাতে যায়, সেটাও আমাদের জানা থাকা ভালো। নবীজি হয়তো আমাদেরকে তখন উপদেশ দেবেন। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে বললেন, খোদার কসম, এ কথা আমি কক্ষনো জিজ্ঞেস করব না। কারণ, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এই কাজ থেকে আমাদেরকে একবার বারণ করেন, তা হলে পুরো উম্মত কখনো আমাদেরকে এর অধিকারী করবে না। সুতরাং কোনোক্রমেই আমি এ বিষয়ে প্রশ্ন করব না।[২]

লেখার ঘটনা

বুখারী শরীফে আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। নবীজির অসুস্থতা চরম আকার ধারণ করেছিল। এ সময় তিনি উপস্থিত সকলকে বললেন, লেখার সামান-পত্র আনো। আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে কিছু লিখিয়ে দেব, যাতে এরপর

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৫ : ২২৬।

২ ইবনে সাদ, *আত তাবাকাত*, ২ : ২৪৫।

তোমরা পথহারা না হও। তখন তিনি প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। তাই সকলেই বলল, এখন নবীজির খুবই কষ্ট হচ্ছে। তা ছাড়া আমাদের কাছে আল্লাহর কিতাব—কুরআন আছে—এটাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। এখন নবীজিকে লেখার কষ্ট দেওয়ার দরকার নেই। এ সময় ঘরে উপস্থিত সকলেই পরস্পরে উচ্চ স্বরে নিজ নিজ মত ব্যক্ত করতে থাকে। কেউ কেউ বলছিলেন, লেখার ব্যবস্থা করো। উপদেশনামা এখনই লিখিয়ে নেওয়া উচিত—যেন আমরা পরে পথহারা না হই। আবার কেউ কেউ বলছিলেন, এখন লেখার প্রয়োজন নেই। পরস্পর এই মতবিরোধের কারণে আওয়াজ বেড়ে যেতে থাকে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, তোমরা আমার এখান থেকে উঠে যাও। কিছুক্ষণ পর কয়েকজন এসে জানতে চান—ইয়া রাসূলাল্লাহ, লেখার ব্যবস্থা কি করা হবে? নবীজি তখন বললেন, আমাকে আমার মতো থাকতে দাও। তোমরা আমাকে যেদিকে ডাকছ, তার চেয়ে আমি যে অবস্থায় আছি, সেটাই ভালো।[১]

তিনটি উপদেশ

এরপর হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে তিনটি উপদেশ দেন—

أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ولا تتخذوا قبري وثنا.

পুরো আরব-দ্বীপপুঞ্জ থেকে মুশরিকদেরকে বের করে দেবে। আগত লোকদেরকে সেভাবেই দান করবে, যেভাবে আমি দান করি। আর আমার কবরকে মূর্তি বানাবে না।[২]

মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বলে আছে—হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, এই ঘটনাটিও নবীজির ওফাতপূর্ব অসুস্থতার সময়। লেখার ঘটনার পর নবীজি এই উপদেশ দিয়েছিলেন।

---

১ *মেশকাত* , ৫৪৮; ইবনে সাদ, *আত তাবাকাত*, ২ : ২৪২।

২ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৫ : ৫২৭; বুখারী ও মুসলিমের সূত্রে *মেশকাত শরীফ*, ৫৪৮।

স্মরণ করলেন আবু বকর সিদ্দীককে

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নবীজির যখন ওফাতপূর্ব অসুস্থতা শুরু হয়, তখন তিনি একদিন বললেন—

ادعوا لي أبا بكر وابنه لكي لا يطمع في أمر أبي بكر طامع، ولا يتمنى متمن. ثم قال: يأبى الله ذلك والمؤمنون— مرتين.

আবু বকর এবং তার পুত্রকে আমার কাছে ডেকে আনো—যাতে আবু বকরের বিষয়ে কোনো লোভী লোভ না করে এবং কেউ কোনো আকাঙ্ক্ষা না করে। তারপর বলেন, আল্লাহ এবং মুমিনগণ এটা মেনে নেবে না—কথাটি তিনি দুইবার বলেন।

সাহাবায়ে কেরামের আশঙ্কা

সাহাবায়ে কেরামের কেউ কেউ আশঙ্কা করছিলেন—ভবিষ্যতে ইসলামের এই কেন্দ্রীয় শক্তি কীভাবে টিকে থাকবে? মানুষ তাদের প্রয়োজনের কথা নিয়ে কার কাছে যাবে? এমন কোনো কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব থাকা চাই, প্রয়োজনে যার শরণাপন্ন হওয়া যায়। এ কথা যেমন বিশিষ্টজনরা ভাবতেন, তেমনি সাধারণদের কেউ কেউও ভাবতেন। *বুখারী শরীফের* হাদীসে আছে—একজন মহিলা তার প্রয়োজন নিয়ে নবীজির খেদমতে এসেছিল। তার সমস্যাটির তখন সমাধান হয়নি। তখন নবীজি তাকে বলেছিলেন, তুমি এখন যাও পরে এসো—তখন তোমার সমস্যার সমাধান করা হবে। ওই মহিলা তখন বলেছিল, ধরুন, পরে এসে আমি আপনাকে পেলাম না, তখন কার কাছে যাব? কার কাছে আমার প্রয়োজনের কথা বলব? হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেছিলেন, তুমি যদি আমাকে না পাও আবু বকরের কাছে গিয়ে তোমার সমস্যার সমাধান করিয়ে নিয়ো। হাফেজ ইবনে কাসীরের মত হলো, এটাও নবীজির ওফাতপূর্ব অসুস্থতাকালীন সময়ের ঘটনা।[১]

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৫ : ২৩৮; *মেশকাত শরীফ*, ৫৫৫।

সর্বশেষ ভাষণ

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করে মসজিদে আগমন করেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন নামায পড়াচ্ছেন। নবীজির আগমন অনুমান করতে পেরে তিনি পেছনে সরে আসেন। নবীজি মুসল্লায় বসে নামায পড়ান। সাহাবায়ে কেরাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার ইকতেদা করেন। আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু মুকাব্বিরের দায়িত্ব পালন করেন। নামায শেষে নবীজি মিম্বরে উপবেশন করেন এবং জীবনের সর্বশেষ ভাষণ প্রদান করেন। আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও গুণকীর্তনের পর বলেন—হে লোকসকল, আল্লাহ তাআলা তাঁর এক বান্দাকে এই মর্মে অধিকার দিয়েছেন—সে চাইলে দুনিয়াতে থাকতে পারে, আবার আল্লাহ তাআলার কাছেও ফিরে যেতে পারে। সেই বান্দা দুনিয়ার ওপর অখেরাতকে প্রাধান্য দিয়েছে। এই কথাগুলো শোনার পর আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু কাঁদতে শুরু করেন এবং বারবার বলতে থাকেন—আমার মা-বাবা আপনার জন্যে কুরবান হোক! আমার মা-বাবা আপনার জন্যে কুরবান হোক! আমরা আমাদের জীবন সম্পদ সন্তান-সন্ততি সবকিছু আপনার জন্যে বিসর্জন দিতে পারি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, আবু বকর, আত্মহারা হয়ো না।[১] এই সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মসজিদসংলগ্ন যে সকল ঘর রয়েছে, মসজিদের দিকে ওইসব ঘরের দরজাগুলো বন্ধ করে দাও। তবে আবু বকরের ঘরের দরজা খোলা থাকবে।[২] নবীজি তাঁর এই ভাষণে এমন কিছু কথাও বলেছেন, যাতে তাঁর পরকালীন সফরের কথা প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। নবীজি বলেছিলেন, তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা তাদের নবীগণ এবং নেক লোকেদের কবরগুলোকে সেজদার জায়গায় পরিণত করেছে, তোমরা এমন ভুল কোরো না।

নামায পড়াবে আবু বকর

বুখারী শরীফের বর্ণনায় আছে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন—হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাতের

---

১ *মেশকাত শরীফ*, ৫৪৮।

২ *বুখারী* ও *মুসলিমের* সূত্রে *মেশকাত শরীফ*, ৫৫৪।

আগে যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন নামাযের সময় হলে হযরত বেলাল আজান দেন। নবীজি তখন লোকেদেরকে ডেকে বলেন, আবু বকরকে বলো, যেন নামায পড়িয়ে দেয়। কেউ কেউ বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আবু বকর খুবই কোমল মনের মানুষ। তিনি যখন আপনার জায়গায় দাঁড়াবেন, বরদাশত করতে পারবেন না। নামাযও পড়াতে পারবেন না। নবীজি বললেন, আবু বকরকে গিয়ে বলো, সে-ই নামায পড়াবে। সাহাবায়ে কেরাম আবার একই আবদার করেন। নবীজি তখন বললেন, তোমরা তো দেখছি ইউসুফের ভাইদের মতো। আবু বকরকে গিয়ে বলো, সে-ই নামায পড়াবে। আদেশমতো হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইমামের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ান। তিনি মুসল্লায় দাঁড়াবার পর নবীজি দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর করে মসজিদে আগমন করেন। পা হেঁচড়ে হাঁটছিলেন। যন্ত্রণায় ভালোভাবে পা তুলতে পারছিলেন না। আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু নবীজির আগমন অনুমান করতে পেরে মুসল্লা থেকে সরে যেতে চান। নবীজি ইশারা করেন—সোরো না। তারপর তিনি সামনে গিয়ে আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু বরাবর মুসল্লায় বসে পড়েন। নবীজি নামায পড়াতে থাকেন। আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু মুকাব্বিরের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। সাহাবায়ে কেরাম হযরত আবু বকরের আওয়াজ অনুসরণ করে রুকু সেজদা করতে থাকেন। নবীজি মুসল্লায় বসা ছিলেন। হযরত আবু বকরসহ সকল সাহাবায়ে কেরাম নামায আদায় করছিলেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।[১]

ওফাতের পূর্বে

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবীজির খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলাম—ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার গায়ে তো প্রচণ্ড জ্বর। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দুইজন ব্যক্তির গায়ে যে পরিমাণ জ্বর থাকে, আমার গায়ে এখন ওই পরিমাণ জ্বর। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৫ : ২৩২; ইবনে সায়্যিদুননাস, *উয়ুনুল আসার*, ২ : ২২৬; ইবনুল আসীর, *আল-কামিল ফিত তারীখ*, ২ : ৮।

আমি নবীজির হাত মোবারকে হাত রেখে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার শরীর এতটাই গরম—হাত রাখাই মুশকিল হচ্ছে। নবীজি বললেন, হ্যাঁ, নবীগণের ওপর মসিবতও অনেক বড় আসে। আর তারা প্রতিদানও প্রাপ্ত হন সেই অনুপাতেই।

উসামা ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কয়েকদিন আগে নবীজি এক যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। নবীজি হযরত হাসান এবং হযরত হুসাইনকে যেমন ভালোবাসতেন, উসামা ইবনে যায়েদকেও তেমন ভালোবাসতেন। হযরত উসামা প্রেরিত যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে নবীজির খেদমতে হাজির হন। হযরত উসামা বলেন, আমি যখন ফিরে আসি, নবীজির যবান তখন বন্ধ। তিনি তখন কথা বলতে পারছিলেন না। আমাকে দেখে হস্ত মোবারক উত্তোলন করে দুআ করেন। তারপর হাত দিয়ে স্বীয় চেহারা মুছে নেন।[১]

ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আয়েশা এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, পরকালের সফর যখন ঘনিয়ে আসে, তখন নবীজি বারবার মুখের ওপর চাদর টেনে নিচ্ছিলেন, আবার চেহারা থেকে চাদর সরিয়ে দিচ্ছিলেন। এই অবস্থায় একবার চেহারা উন্মুক্ত করে এরশাদ করেন—

لعنة الله علي اليهود والنصاري اتخذوا قبور انبيائهم مساجداً.

ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের প্রতি লানত হোক—তারা তাদের নবীগণের কবরকে সেজদার জায়গা বানিয়ে নিয়েছে।

নবীজি এই সময় বারবার ওসিয়ত করেন—নিয়মিত নামায পড়বে। ক্রীতদাসদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে—এটাই ছিল তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তের ওসিয়ত। এই সময় তাঁর কথাগুলোও স্পষ্ট হচ্ছিল না।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, শেষ মুহূর্তে নবীজির কাছে বড় একটি পেয়ালায় পানি রেখে দেওয়া হয়েছিল। নবীজি ওই পেয়ালায় হাত ভিজিয়ে চেহারা মুছতেন। আর বলতেন—

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৫ : ২৩৭; ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, ২ : ৮।

اللهم اعني علي سكرات الموت.

হে আল্লাহ, এই মৃত্যুযন্ত্রণায় আমাকে সাহায্য করো।[১]

তারপর বলতেন—

لا اله الا الله ان للموت سكراً.

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! মৃত্যু খুবই যন্ত্রণাদায়ক।

তারপর তিনি বাম হাতের অঙ্গুলি উঁচু করে বলেন—

في الرفيق الاعلي.

শ্রেষ্ঠ বন্ধুর সান্নিধ্য।

অবশেষে তাঁর পবিত্র আত্মা উড়ে যায়। হাত পানির মধ্যে পড়ে যায়। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বর্ণনায় আছে—

كان رسول الله يقول— وهو صحيح— أنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، قالت عائشة: فلما نزل برسول الله صلي الله عليه وسلم ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت، قال: اللهم الرفيق الأعلى، فعرفت أنه الحديث الذي كان حدثنا به هو صحيح، أنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، قالت عائشة، قلت: اذًا لا تختارنا وقالت عائشة: كانت تلك الكلمة آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرفيق الأعلى.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সুস্থতার সময় বলতেন—কোনো নবীর ওফাতের পূর্বেই তাকে তার বেহেশতের ঠিকানা দেখিয়ে দেওয়া হয়। তারপর তাঁকে এখতিয়ার দেওয়া হয়। হযরত আয়েশা বলেন, যখন নবীজির শেষ সময় সমুপস্থিত, তখন তাঁর মাথা মোবারক ছিল আমার

---

১ *জামে তিরমিযী*।

রানের ওপর। তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর হুঁশ ফিরে আসে। তারপর ঘরের ছাদের দিকে চোখ তুলে বলেন—হে আল্লাহ, শ্রেষ্ঠ বন্ধুর সান্নিধ্যে। তখন আমি বুঝতে পারি, তিনি যে কথা বলেছিলেন, তা-ই সত্য হয়েছে—নবীকে তার জান কবজ করার আগে তার বেহেশতের ঠিকানা দেখিয়ে দেওয়া হয়। আমি তখন বললাম, এখন আর আল্লাহর রাসূল আমাদেরকে এখতিয়ার করবেন না। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, নবীজির মুখনিঃসৃত সর্বশেষ বাণী ছিল—

اللهم الرفيق الاعلي.

হযরত আবু বকরের অন্তর্দৃষ্টি

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালে মুসলমানদের জীবনে এক অভাবিত ঝড় বয়ে যায়। মানুষ মসজিদে নববীতে বসে কাঁদতে থাকে। সকলেই ছিল অস্থির। উড়ন্ত পরোয়ানার মতো ঝাঁকে ঝাঁকে নবীজির ঘরের দিকে ছুটে আসছিল, আবার কেঁদে কেঁদে ফিরে যাচ্ছিল। ছুটে আসেন হযরত উমর ফারুক। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে বাইরে এসে একেবারে ভেঙে পড়েন। তার মধ্যে এক বিস্ময়কর অবস্থার সৃষ্টি হয়। অস্থির ও বিচলিত হয়ে পড়েন। সকলকে এই বলে শাসাতে থাকেন—কেউ যদি বলে, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত লাভ করেছেন, তা হলে তরবারির আঘাতে তার গর্দান উড়িয়ে দেব।[১]

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, ঠিক এই সময় ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে আবু বকর আগমন করেন। প্রথমেই মসজিদে যান। কিন্তু কারও সঙ্গে কোনো কথা বলেননি। তারপর আমার ঘরে ফিরে আসেন—নবীজি কী অবস্থায় আছেন, দেখার জন্যে। নবীজির দেহ মোবারক চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল। চাদর সরিয়ে নত হয়ে কপাল মোবারকে চুমু খান। তারপর কাঁদতে শুরু করেন এবং বলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার মা-বাবা আপনার জন্যে উৎসর্গিত হোক![২] আল্লাহর

---

১ ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, ২ : ৯।

২ ইবনুল আসীর, *আল-কামিল ফিত তারীখ*, ২ : ৯।

কসম, আপনার জীবনে দুইবার মৃত্যু আসবে না। যেই মৃত্যু লেখা ছিল, তা এসে পড়েছে।[১]

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহার বর্ণনায় আছে, আবু বকর আয়েশার ঘর থেকে বেরিয়ে দেখেন, উমর ইবনুল খাত্তাব লোকদেরকে শাসাচ্ছেন। অত্যন্ত উত্তেজিত ভাব ও ভাষায় কথা বলছেন। হযরত আবু বকর কাছে গিয়ে বলেন—উমর, বসো। হযরত উমর বসতে অস্বীকার করেন। হযরত আবু বকর জোর দিয়ে বলেন, উমর, বসে পড়ো। কিন্তু উমর বসেননি। তৃতীয়বার হযরত আবু বকর ধমকের সুরে বলেন, উমর, বসছ না কেন? তখন উমর খামোশ হয়ে যান। সকল মানুষ তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীকের দিকে নিবিষ্ট হন। তিনি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করত সংক্ষিপ্ত একটি ভাষণ দেন। এই ভাষণে বলেন—যারা মুহাম্মাদুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদত করতে তাদের বুঝে নেওয়া উচিত, তিনি ওফাত লাভ করেছেন। আর যারা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতে তারা জেনে নাও, আল্লাহ তাআলা চিরঞ্জীব। তাঁকে কখনো মৃত্যু পাবে না। তারপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করেন—

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاۡئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ.

মুহাম্মাদ তো একজন রাসূলই। তার পূর্বেও অনেক রাসূল অতীত হয়েছেন। সুতরাং তিনি যদি মৃত্যু বরণ করেন কিংবা শহীদ হন, তোমরা কি তোমাদের পশ্চাতে ফিরে যাবে? [আলে ইমরান : ১৪৪]

কুরআনের এই আয়াত শোনার পর সকলের চোখ খুলে যায়। সকলেই বিশ্বাস করতে সক্ষম হয়—হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখন দুনিয়াতে নেই।[২]

---

১ *তিরমিযী* ও *আবু দাউদ*।

২ ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, ২ : ৯-১০।

বর্ণনায় এ কথাও আছে—উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম অনেকটা এমন অনুভব করেছেন, যেন এই আয়াত জীবনে প্রথমবার শুনছেন। এর পূর্বে যেন তারা এই আয়াত কখনো শোনেননি, অথচ এই আয়াত পূর্ব থেকেই কুরআনে ছিল, তারা তেলাওয়াতও করতেন। আবু বকরের কণ্ঠে শোনার পর মনে হয়েছে, আয়াতটি যেন এই মাত্র অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর বিড়বিড় করে সকলেই এই আয়াত তেলাওয়াত করতে থাকেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলে ওঠেন—আমার চোখের পর্দা তখন সরে যায়। আমি বিশ্বাস করে নিই, আবু বকর যা বলছেন, তা-ই সত্য। নবীজির ওফাতের কথা আমার বিশ্বাসকে স্পর্শ করতেই আমার পা কাঁপতে শুরু করে। মনে হতে থাকে, আমি এখনই বুঝি মাটিতে পড়ে যাব।[১]

ওফাতের পর

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয় রবিউল আউয়াল মাসের সোমবারে সূর্য হেলার পর। অসুস্থতায় তিনি তেরো দিন শয্যাশায়ী ছিলেন। অসুস্থতার সূচনা হয় আটাশ সফর। বারো রবিউল আউয়াল সোমবার তাঁর ইন্তেকাল হয়।[২] ওফাতের সময় নবীজির বয়স হয়েছিল তেষট্টি বছর। বুধবার রাতে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়।

ওফাত হয়েছিল সোমবারে। কিন্তু পরিস্থিতি কিছুটা এমন ছিল—যার কারণে কাফন-দাফনে বিলম্ব করতে হয়। বনু সায়েদার মাঠে খলীফা নির্বাচন বিষয়ে আলোচনা চলছিল। হযরত আবু বকর এবং হযরত উমরকেও গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর এই বিষয়টিতে এই কারণে মনোনিবেশ করতে হয়—যেন উম্মতের মাঝে কোনো ধরনের বিভেদ সৃষ্টি না হয়। ফলে পুরো মঙ্গলবার তারা এই সংকট-নিরসনে কাটিয়ে দেন। এই সংকট থেকে উত্তরণের পর যখন হযরত আবু বকরের হাতে খেলাফতের শপথ সম্পন্ন হয়, তখন মঙ্গলবারের বেলা ডুবে গেছে। তাই বুধবার তাঁকে দাফন করা হয়।

---

১ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৫ : ২৪২; *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস : ৪৪০৪; *ফাতহুল বারী*, ৮ : ১৪৫।

২ ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৫ : ২৫৫।

গোসল

যখন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গোসলদানের প্রস্তুতি শুরু হয়, তখন প্রশ্ন উঠে—তাকে কি কাপড় খুলে গোসল দেওয়া হবে, না কাপড়সহ? সাহাবায়ে কেরাম কোনো ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারছিলেন না। সাধারণ মৃতদেরকে তো কাপড় খুলে গোসল দেওয়া হয়। কিন্তু হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র শরীর কি বসনমুক্ত করা যাবে?—আলোচনা পর্যালোচনা চলতে থাকে, কিন্তু মীমাংসা হচ্ছিল না। প্রত্যেকের মতই ভিন্ন ভিন্ন। অবশেষে কুদরতিভাবে যা ঘটল, তা হলো—যারা নবীজিকে গোসল দেওয়ার জন্যে উপস্থিত ছিলেন, হঠাৎ তাদের মধ্যে তন্দ্রাচ্ছন্নতা ছড়িয়ে পড়ে। তারা এই তন্দ্রাচ্ছন্নতায় ডুবে যান। তাদের চিবুক বুকের সাথে লেগে যায়। এই অবস্থায় তাদের কানে আওয়াজ ভেসে আসতে থাকে—কে যেন বলছে—নবীজির কাপড় খোলা যাবে না। এই আওয়াজ তারা সকলেই শুনতে পায়। কিন্তু কে বলেছেন?—তা কারোরই জানা নেই। তারপর সকলের চোখ খুলে যায়। সকলেই আশ্বস্ত হয়ে ওঠেন। নবীজির গায়ে পরিহিত জামার ওপরই পানি ঢেলে দেওয়া হয়। জামার ওপর দিয়েই ঘষে শরীর পরিষ্কার করা হয়। নবীজির গোসলদানে অংশগ্রহণ করেছিলেন—আলী ইবনে আবু তালেব, আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব, ফযল ইবনে আব্বাস, উসামা ইবনে যায়েদ এবং শুকরান—রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন। প্রথমে সাদা পানি, তারপর বরই পাতার পানি দিয়ে গোসল দেওয়া হয়। তিন কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়। জানাযার নামায এক ইমামের পেছনে সম্মিলিতভাবে পড়া হয়নি, বরং পালাক্রমে সকলেই আলাদা আলাদা জানাযা পড়েছেন।

দাফন

গোসল সম্পন্ন হওয়ার পর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখা দেয়—নবীজির কবর কোথায় হবে? হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-ই এই প্রশ্নের সমাধান দেন। তিনি বলেন, আমি হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি—নবীর যেখানে ওফাত হয়, সেখানেই তাকে দাফন করা হয়।[১]

এই সিদ্ধান্তের পর সেখান থেকে নবীজির বিছানা সরিয়ে ফেলা হয়। অতঃপর সেখানেই কবর খনন করা হয়। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ঘরে নবীজির ওফাত হয়েছিল। যে ঘরে নবীজি রাতের বেলা আরাম করতেন, সেখানেই তার কবর খনন করা হয় এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হয়।

اللهم صل وسلم دائماً ابداً.

দাফনের পর

নবীজিকে দাফন করার পর সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের অবস্থা কী হয়েছিল, এ সম্পর্কে নবীজির খাদেম হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বাণীটি স্মরণযোগ্য—

في رواية الترمذي عن أنس قال : لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منه كل شيء، لما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب، وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا.

*তিরমিযী*র বর্ণনায় আছে—হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন মদীনায় প্রবেশ করেন, তাঁর আগমনে মদীনার প্রতিটি বস্তু আলোকিত হয়ে উঠেছিল। আবার যেদিন নবীজি ওফাত লাভ করেন, সেদিন মদীনার সবকিছু অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল। নবীজিকে আমরা যখন দাফন করছিলাম, তখন আমরা আমাদের নিজেদেরকে ভুলে গিয়েছিলাম।[২]

---

১ *তিরমিযীর সূত্রে মেশকাত শরীফ*, ৫৪৭; ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, ২ : ১৬; *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ৪ : ৩৪৩।

২ *মেশকাত শরীফ*, ৫৪৭।

সর্বত্র ছেয়ে যায় বেদনার মেঘ

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাফনের পর হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহা সেই ঘরেই বসবাস করেন। তারপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু ওফাত লাভ করেন। তাকে ওই ঘরেই দাফন করা হয়। এরপর হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহা পূর্বের মতোই এই ঘরে বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু যখন হযরত উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু ওফাত লাভ করলেন, তাকেও দাফন করা হলো ওই ঘরে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহা তখন ওই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। মাঝখানে একটি দেয়াল তুলে নেন। দেয়ালের একপাশে তিনখানা কবর। অপরপাশে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহার বসবাসের ছোট্ট ঠিকানা। আজ হযরত আয়েশার এই ঘরের ওপরই প্রতিষ্ঠিত সবুজ গম্বুজ। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের আবেগ ও বিশ্বাস জড়িয়ে আছে এই সবুজ গম্বুজের সঙ্গে। তারা যখন পাক মদীনায় ছুটে আসেন, বিশ্বাস ও ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকান এই সবুজ গম্বুজের দিকে, তখন তাদের বুকের ভেতর বইতে থাকে বিয়োগ ও বিষাদের ঝড়।

হেরাগুহায় নবুওয়তের যে সূর্য উদিত হয়েছিল, এই সবুজ গম্বুজে এসে তা অস্তমিত হয়েছে। আর পৃথিবী ছেয়ে গেছে বিয়োগ ও বিষাদের রজনীতে।

সমাপ্ত

নূরের পর্বত থেকে সবুজ গম্বুজ:
রাসূল সা.-এর জীবন নিয়ে সহজ ভাষায় রচিত এক প্রামাণ্য সীরাতগ্রন্থ। তাঁর জন্ম, রিসালাত ও হিজরতের অনুপ্রেরণামূলক কাহিনী পাঠককে মুগ্ধ করবে। আধ্যাত্মিক পথের নির্দেশক।



মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন

ISBN 978-984-93339-0-1

রাহনুমা প্রকাশনী